ভারতী

৩৪শ বর্ষ।] ১৩১৭, বঙ্গাব্দ [১৯১০।১১ খৃষ্টাব্দ।



শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

১৩১৭ সালের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

সন ১৩১৭ সালের বর্ণানুক্রমণিক চিত্র সূচী

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

শক্তিময়ীর স্বপ্ন।

"আমি কি চাহি,—

সে আমার, আমি তার, আমার কি নাহি।"

ফুলের মালা।

ভারতী।

৩৪শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩১৭ [১ম সংখ্যা।

বর্ষ বরণ।

আদিহীন অন্তহীন কাল পুরাতন,
মুহূর্ত্ত কণিকা তাহে তুমি হে নূতন!
অন্ধকার অমঙ্গল আলোক মহান,
সকলি বিশাল, তুমি ক্ষুদ্র বর্ত্তমান!
তবুও সামান্য নহ, আত্মদানে তব,
পলে পলে মহাকালে সৃজিছ, হে নব!
দ্যুলোক ভূলোক সবই সচঞ্চল গতি,
তুমি বিন্দু বর্ত্তমান একা স্থির জ্যোতি!
অপ্রত্যক্ষ স্পর্শাতীত ভূত ভবিষ্যৎ,
প্রত্যক্ষ বন্ধন তার তুমি চিৎ সৎ!
ওহে ক্ষুদ্র, অসামান্য, প্রত্যক্ষ প্রতিমা,
নিরাকার কালে তুমি সাকার মহিমা!
এস হে নূতন এস লই গো বরিয়া,
অসীম সসীমরূপে উঠুক ভরিয়া!

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

যুঝাযুঝি অনিবার, ওঠা পড়া বারবার,
তা বলে কি ভূমিতল করিব আশ্রয়!
প্রাণ সাথে থাকে কান্না আলো সাথে
আছে ছায়া
চিরদিন এক সাথে জয় পরাজয়।
দূর করি দিয়া গ্লানি, হে নাথ, তোমার বাণী
নূতন বরষ আজি আনিছে বহিয়া,
আশীষ বারতা তব কাণে বাজিতেছে নব
নবীন আশার বলে ভরিতেছে হিয়া।
আর না করিব ভয় হউক তোমার জয়
সুখ দুঃখ যাহা দাও লব পাতি শিরে,
মহাধন্য হব আমি যদি হে জীবন স্বামি
কণা-মসী ঘুচে এই জীবনের নীরে।

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী।

গতবর্ষ।

ওগো বর্ষ,—ওগো বৃদ্ধ তুমি যবে এলে
হাসিটুকু এনেছিলে; কি লইয়া গেলে?
কারো প্রার্থনার পানে চাহিলেনা ফিরি,
যার যাহা প্রাপ্য ছিল দিলে চুল চিরি!
তবুও শুধাই তোমা এক বৎসরের
এই সুখ দুঃখ,—একি শুধু অতীতের?
তোমার স্মৃতির চিহ্ন কিছু কি এমন,
ধরারাণী ধরে নাই হৃদয়ে আপন?
দিলে না বুঝিতে ওগো কতটুকু কার
রেখে গেলে, নিয়ে গেলে কতটুকু আর!
তবু আজ ভাবিতেছি বসে' মনে মনে
তুমি গেলে তোমারেই পড়িবে স্মরণে।
তুমি যাহা দিয়ে গেলে তার তুলনায়
কে জানে এ নব বর্ষ দাঁড়াবে কোথায়!

নববর্ষ।

এস বর্ষ,—এস বন্ধু সুখের দুখের,
এস মোর ক্ষুদ্র সঙ্গী দ্বাদশ মাসের।
ভাগ্যলিপি নিয়ে এস পক্ষ পুটে ধরি',
প্রত্যেক দিনের প্রাপ্য এক্ একটী করি'
ঝরে পড়া পক্ষ সম ফেলে দিয়ে যেও
আমার কোলের পরে।—দেখাও না স্নেহ
যদি তার মাঝে থাকে কঠিন কঠোর
দুঃস্বপ্নের মত দুষ্ট ভাগ্যখানি মোর।
যদি তার মাঝে থাকে হাসি এক কণা
ওগো বন্ধু, তা হ'তেও বঞ্চিত ক'রোনা।
যা কিছু তোমার দান শুভ ও অশুভ,
তাহাই অদৃষ্ট জানি তাহাই যে ধ্রুব।
তাহারি অপেক্ষা করি তোমার কুটিরে
হে বর্ষ দাঁড়ায়ে আজি নত নম্র শিরে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

নববর্ষে।

এ বিশ্বসৃষ্টি যেমন আদিহীন অন্তহীন, ইহার অনন্ত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধ্যে যেমন কোথাও বিচ্ছেদ নাই, বিরাম নাই, কোনটিকেই স্বতন্ত্র করিয়া স্বাধীন করিয়া দেখিবার কোন উপায় নাই, তেমনি এবিশ্ব-জন্মের প্রথমপ্রভাত হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত জন্মমৃত্যু যাতায়াতকে আচ্ছন্ন করিয়া, সার্থক ও সম্পূর্ণ করিয়া যে মহাকাল দাঁড়াইয়া আছে তাহাকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন করিয়া দেখাও আমাদের সাধ্যাতীত। কে বলিবে কোন্ সূর্য্যকিরণের অরুণরাগে তাহার প্রথম জন্ম, কোন্ জ্যোৎস্নার ম্লান ছায়াতলে তাহার মৃত্যু শয্যা! কিন্তু এ বিশ্ব-বিধান, এ কালস্রোত যদি আপনাকে বিচিত্র রূপ রস গন্ধ স্পর্শে নিত্য নূতন, চির মধুর করিয়া আমাদের মর্ম্মদ্বারে আসিয়া আঘাত না করিত, অমৃত উৎসের আস্বাদ দান না করিত, তাহা হইলে এ সংসারকে একটা লৌহ কঠিন প্রাণহীন কারাগার ভিন্ন আর কিছু মনে করা সম্ভবই হইত না।

তাই আজ পূর্ব্বগগনে উষার প্রথম উন্মেষের পবিত্র স্পর্শে চক্ষু খুলিয়া আকাশ আলোক বাতাস বিশ্ব সকলই নূতন, সকলই মধুর মনে হইতেছে। অসীম কালকে আজ আপনার ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া নবীন রূপে উপলব্ধি করিতেছি; আজ নব-বর্ষের প্রথম প্রভাতকে নব আনন্দে আলিঙ্গন করিয়া ধন্য হইতেছি!

এ পুলকস্পর্শের মধ্যে দেশ নাই কাল নাই, জাতি নাই ধর্ম্ম নাই। এ আনন্দ-জাগরণ বিশ্ব মানবের নিত্যধন। অন্তরের এই আনন্দ অনুভূতি আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র মানব সমাজের বাহ্যজীবনকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে। আজ বহুশতাব্দীর সঞ্চিত হীনতা জড়ত্ব হইতে মুক্তি লাভের জন্য হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান সকলেই সচেষ্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার সামান্য শ্রমজীবী ভারতবাসী হইতে প্রবল পরাক্রান্ত ইংলণ্ডবাসী পর্য্যন্ত আজ এ জাগ-রণের আন্দোলনে বিচলিত। চীন, তিব্বত, ভারত, পারস্য, তুরস্ক, মিশর ইত্যাদি প্রাচ্য-প্রতীচ্য সকল দেশই আজ নবজীবনের সাধনার জন্য, মনুষ্যত্বের সম্মানরক্ষার জন্য, আত্মলাভের জন্য অগ্রসর!

আজিকার এই শুভ্রোজ্জ্বল আকাশের তলে দাঁড়াইয়া পৃথিবীর 'এই পুলক চাঞ্চল্য' এই আত্মসাধন ও আত্মোৎসর্গ যখন দেখি, তখন কবির মোহন সুরে মুগ্ধ প্রাণ আপনিই গাহিয়া উঠে—

"নব আনন্দে জাগো আজি নব রবি কিরণে,
শুভ্র সুন্দর প্রীতি উজ্জ্বল নির্ম্মল জীবনে।"

নববর্ষে কবির এই 'মর্ম্মবাণী' সত্য ও সার্থক হউক, এ সংসার শুভ্র সুন্দর প্রীতি-সমুজ্জ্বল নির্ম্মল জীবনে পূর্ণ ও পবিত্র হইয়া উঠুক, আজ ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

ভারতী-বন্দনা।

ওগো কমল-আসনা,—রঙ্গিনী-বীণাপাণি!
আমি কাহারেও আর জানি না, ভারতি
তোমারেই শুধু জানি।
ওগো মধুর-ছন্দা, হৃদয়ানন্দা
জানি না প্রভাত, না জানি সন্ধ্যা—
তোমারি পর্ব্বে অর্ঘ্য রচিয়া
জীবন ধন্য মানি!

আমি জানিনাত তাহা ভাল কি মন্দ,
বাসহীন কিবা মধুর গন্ধ,
শুধু প্রীতিপূরিত পরমানন্দ
তোমার চরণে দানি।
আমি না চাহি অন্য বিভব ঋদ্ধি
চাহি না মুক্তি, চাহি না সিদ্ধি
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ
তোমারি অমৃত বাণী।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

স্বরলিপি।

ইমনভূপালী—একতালা।

সা সা ॥ {সা সা রা। গা-র্সা সর্না। ধপা- । -া। -ক্মা-পা-ক্মা I গা- । রা।
ও গো ক ম ল আ ০ স না ০ ০ ০ ০ ০ র ০ ঙ্গি

॥
। গা গা মা। ঋগা- রা সা। (-া সা সা)I} -া সা সা I সা সা ধ্া। সা সরা-গা।
ণী বী ণা পা ০ ণি ০ "ওগো" ০ আ মি কা হা রে ই আর ০

। গা গা গা। গা গা গা I রা রা গা। ক্মা ক্মা ক্মা। গক্মা- পা পা। -া পা পা ॥
জা নি না ভা র তি তোমারে ই শু ধু জা ০ নি ০ "ও গো"

[গা গা]
। -া পা পা I {পা ক্মপা গা। পা- । ধা। ধা ধর্সা র্সা। র্সা- । র্সা I র্সা র্রা র্রা।
০ ও গো ম ধু র ছ ০ ন্দা হৃ দ য়া ন ০ ন্দা জা নি না

। র্রা র্সর্রা- র্গা। র্রা র্সা না। ধা- পা ক্মপা I} পা ধা ধা। ধা- র্সা র্সা।
প্র ভা ত্ না জা নি স ০ ন্ধ্যা তো মা রি প ০ র্ব্বে

। পা- ধা ধর্সা। র্সা র্সা র্সা I সা সা রা। গা- ক্মা ক্মপা। গক্মা- গক্মপা পা।
অ ০ র্ঘ্য র চি য়া জী ব ন ধ ০ ন্য মা ০ নি

। -া পা পা ॥ -া সা সা I সা সা ধ্‌া। সা সা ঋা। ঋা সরগা গা। গা -া গা I
০ "ও গো" ০ আ মি জা নি না ত তা হা ভা ল কি ম ০ ন্দ

I ঋা গা ঋগা। ক্ষা ক্ষা ক্ষা। ক্ষা গক্ষপা পা। পা- া পপপা I পা- ক্ষপধা ধা।
বা স হী ন্‌ কি বা ম ধু র গ ০ ন্ধগুধু প্রী ০ তি

। ধা ধা ধা। পা পক্ষা ধা। পা- ক্ষা ক্ষপা I গা গা ঋা। গা গা মা।
পূ রি ত প র মা ন ০ ন্দ তো মা র চ র ণে

। ঋগা- ঋা সা। -া পা পা I {পা ক্ষপা গা। পা- া ধা। ধা ধর্সা র্সা।
দা ০ নি ০ আ মি না চা হি অ ০ ন্য বি ভ ব

। র্সা- া র্সা I র্সা র্ঋা র্ঋা। র্সর্ঋা- র্গা র্গা। র্ঋা র্সা না। ধা- পা পা I}
ঋ ০ দ্ধি চা হি না মু ০ ক্তি চা হি না সি ০ দ্ধি

। পা- ধা ধা। ধর্সা- র্সা -া। পা ধা ধর্সা। র্সা র্সা -া I সা সা ঋা। গা ক্ষা ক্ষা।
তো মা রি প্র সা দ ০ ল ভি বা রে সা ধ ০ তো মা র অ মৃ ত

। গক্ষা- পা পা। -া পা পা ॥
বা ০ ণী ০ "ও গো

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

স্বরলিপির ব্যাখ্যা।

১। স, র, গ, ম, প, ধ, ন—সপ্তস্বরের এই সাতটি স্বরাক্ষর।

২। ঋ=কোমল র ; জ্ঞ=কোমল গ ; ক্ষ=কড়ি ম ; দ=কোমল ধ , ণ=কোমল ন।

৩। উচ্চ সপ্তকের স্বরের মাথায় রেফ-চিহ্ন ও খাদ সপ্তকের নীচে হসন্ত-চিহ্ন থাকে ; মধ্য-সপ্তকের স্বরে কোন চিহ্ন থাকে না। যথা প্‌, ধ্‌, ন্‌, স, র, গ, ম, প, ধ, ন, র্স, র্র, র্গ ইত্যাদি।

৪। স্বরোচ্চারণের কাল পরিমাণকে মাত্রা বলে। এক, উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাহাকে এক মাত্রা ; এক, দুই উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাকে দুই মাত্রা ; এক, দুই, তিন উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাকে তিন মাত্রা বলে ; ইত্যাদি ক্রমে মাত্রা যথেচ্ছা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

মাত্রার চিহ্ন আকার। যথা সা একমাত্রা ; সা -া দুই মাত্রা ; সা -া -া তিন মাত্রা ইত্যাদি। দুইটি স্বর একমাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইলে, দুইটি স্বরাক্ষর যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে ; যথা, গমা, পধা ; এইরূপ স্থলে প্রতি স্বরটি অর্দ্ধমাত্রা। চারিটি স্বর একমাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইলে, চারিটি স্বরাক্ষর যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে ; যথা, সরগমা, এই স্থলে প্রত্যেক স্বরটি সিকিমাত্রা। এইরূপ একমাত্রার মধ্যে যতগুলিই স্বর উচ্চারিত হোক্‌ না কেন, তাহাদের স্বরাক্ষরগুলি যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে। যথা সরগমপধা, মপধনসা ইত্যাদি। অর্দ্ধমাত্রার বিশেষ চিহ্ন=ঃ বিসর্গ।

৫। সাধারণত উপরোক্ত যুক্তস্বরগুলি গড়ানে ভাবেই উচ্চারিত হয় ; যদি কোন স্থলে, উহার প্রত্যেক স্বর পৃথক ঝোঁকে উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে শিরোদেশে বিন্দু-চিহ্ন দেওয়া হইয়া থাকে, যথা সরগমা। উক্তরূপ

এক স্বর যখন আর এক স্বরে বিশেষরূপে গড়াইয়া যায়, তখন স্বরের নীচে এইরূপ ‿ চিহ্ন থাকে; যথা, গা-পা।

৬। যখন স্বরাক্ষরের নীচে গানের অক্ষর না থাকে তখন স্বরাক্ষরগুলির মধ্যে হাইফেন (-) চিহ্ন থাকে এবং গানের পংক্তিতে শূন্য (০) চিহ্ন দেওয়া হয়।

৭। কোন আনুসঙ্গিক সুর কোন প্রধান সুরকে ঈষৎ ছুঁইয়া গেলে প্রধান সুরের গায়ে ক্ষুদ্র অক্ষরে এইরূপ লিখিত হয়; যথা রসা সাব ইত্যাদি।

৮। আস্থায়ীর আরম্ভে,—যেখান হইতে রীতিমত তাল সুরু হয়—সেইখানে এইরূপ ॥ যুগল-ছেদ অথবা যুগল II স্তম্ভচিহ্ন এবং প্রত্যেক কলির শেষে যেখানে থামিয়া আস্থায়ীতে আবার ফিরিতে হয়, সেইখানেও এইরূপ ॥ যুগল-ছেদ অথবা যুগল II স্তম্ভচিহ্ন বসে।

৯। { }=পৌনরুক্তির চিহ্ন, যথা { সা রা গা মা } অর্থাৎ এই অংশ দুইবার আবৃত্তি করিতে হইবে।

১০। ( )=পুনরুক্তি-কালে লঙ্ঘনের চিহ্ন; যথা { সা রা (গা মা) পা ধা। অর্থাৎ সা রা গা মা—এই অংশ দ্বিতীয়বার আবৃত্তি করিবার সময় (গা মা) এই অংশ লঙ্ঘন করিয়া একেবারে "পা ধা" এই অংশ ধরিতে হইবে।

১১। প্রতি তাল বিভাগের পর ছেদ-চিহ্ন বসে, তালের এক আওর্দ্দা পূর্ণ হইলে এই I স্তম্ভ-চিহ্ন দেওয়া হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহাকবি কালিদাসের চিতাভূমি ও তাঁহার অন্তিম কবিতা।

লঙ্কার মাতর নগর। লঙ্কার দক্ষিণ বিভাগে মাতর নামে একটী নগর আছে। বিশুদ্ধ ভাষায় উহাকে মহাতীর্থ বলে। উহা কোলম্ব নগরের ১০০ মাইল দক্ষিণে সমুদ্র তীরে অবস্থিত। কোলম্ব হইতে ধূমরথে চড়িয়া উপকূল পথে এই স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। কালিন্দী নামে এক নদী মাতর নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভারত মহাসাগরে নিপতিত হইয়াছে। এই নদী সাধারণতঃ কিরিন্দী নামে প্রসিদ্ধ। ইহার কয়েক মাইল দূরে সমান্তরাল রেখাক্রমে প্রবাহিত হইয়া আর একটি বৃহত্তর নদী ভারত মহাসাগরে পড়িয়াছে। উহার নাম নীলব গঙ্গা। উহার উৎপত্তি স্থান সমন্তকূট পর্ব্বত। কালিন্দী নদী ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গম স্থলের সন্নিকটে তিস্যারাম নামে এক বৌদ্ধ বিহার বিদ্যমান আছে। এই বিহারের প্রাঙ্গণ ভূমি নানা পুষ্পলতা দ্বারা পরিশোভিত। তাহার চতুঃপার্শ্বে অসংখ্য পূগ ও নারিকেল বৃক্ষ।

তথায় কালিদাসের মৃত্যুসম্বন্ধে প্রবাদ। লঙ্কা দ্বীপে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে "ভারতের মহাকবি কালিদাস মাতর নগরে দেহত্যাগ করেন। কালিন্দী তীরে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং অধুনা যে স্থলে তিস্যারাম বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহার সীমা কালিদাসের চিতাস্থল।"

এই প্রবাদের মূলে কোন সত্য আছে

কিনা জানিবার জন্ত আমি লঙ্কার বিভিন্ন প্রদেশের সুবিদ্বান্ ভিক্ষুগণের নিকট অনুসন্ধান করি। তাঁহারা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে বলেন এই প্রবাদ অতি প্রাচীন * এবং ইহার সহ আরও অনেক কিংবদন্তীর সংস্রব আছে। এই সকল কিংবদন্তী লঙ্কার প্রকৃত ইতিহাসের সহ এরূপ ভাবে সংসৃষ্ট যে অনেক স্থলে উভয়ের পার্থক্য করা যায় না। নিম্নে কয়েকটী ঐতিহাসিক ঘটনা ও কিংবদন্তী উদ্ধৃত করিলাম।

লঙ্কার রাজা কুমারদাস। লঙ্কার প্রামাণিক ইতিহাস মহাবংশ। উহাতে বর্ণিত আছে যে ধাতুসেন নামে মৌর্য্যবংশীয় কোন নরপতি খৃঃ ৪৬৩—৪৭৯ পর্য্যন্ত লঙ্কার শাসন দণ্ড পরিচালনা করেন। তাঁহার কোন নীচ কুলোৎপন্না ভার্য্যার গর্ভে কাশ্যপ এবং উচ্চ কুলোৎপন্না পত্নীর গর্ভে মৌদ্গল্যায়ন নামে পুত্র জন্মে। কাশ্যপ স্বীয় পিতাকে নিহত করিয়া ৪৭৯ খৃঃ অব্দে লঙ্কার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। মৌদ্গল্যায়ন কাশ্যপের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন কিন্তু প্রজাবর্গের সম্পূর্ণ সহায়তা লাভ করিতে না পারিয়া পুত্র কলত্রাদি সহ ভারতবর্ষে পলায়ন করেন। মৌদ্গল্যায়নের কুমার ধাতুসেন নামে এক পুত্র ছিল। ঐ পুত্র সাধারণতঃ কুমারদাস নামে খ্যাত। মৌদ্গল্যায়ন অষ্টাদশ বর্ষ ভারতে অবস্থান করেন। এই দীর্ঘ সময় কুমারদাস ভারতে থাকিয়া সংস্কৃত ভাষার সবিশেষ অনুশীলন করেন। ৪৯৭ খৃঃ অব্দে মৌদ্গল্যায়ন বহু ভারতীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বদেশে প্রতিগমন করেন এবং কাশ্যপকে পরাজিত করিয়া লঙ্কার সিংহাসন অধিকার করেন। ৫১৫ খৃঃ অব্দে মৌদ্গল্যায়নের মৃত্যু হয়। এই বৎসর কুমারদাস লঙ্কার রাজা হন। ৫২৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

তাঁহার জানকী হরণ কাব্য।

এই স্থলে রাজা কুমারদাস সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইল উহা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। উহাতে কোন প্রকার কল্পনার সম্পর্ক নাই। ইতঃপর একটী কিংবদন্তীর উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রাজা কুমারদাস ভারতে অবস্থান কালে গীর্বাণবাণীর অনুশীলন করিয়া উহাতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি লঙ্কায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় জানকী হরণ নামে এক মহাকাব্য বিরচন করেন। এই মহাকাব্যের উৎকর্ষ পরীক্ষার নিমিত্ত তিনি উহার এক প্রতিলিপি উজ্জয়িনী নগরীতে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নিকট প্রেরণ করেন। কালিদাস ব্যতীত অপর সকল পণ্ডিতই ঐ কাব্যের প্রশংসা করিবেন এই ভাবিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য ইহা স্বীয় সভাসদ্ পণ্ডিতগণের হস্তে অর্পণ করিলেন, কেবল কালিদাসকে উহা দেখান হইল না। পণ্ডিতগণ উহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিলেন "মহারাজ আমরা যদি এই কাব্যের প্রশংসা করিতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয় হইত কিন্তু

* পেরকুম্ব সিরিথ (পরাক্রম বাহু চরিত্র), হেলদিউ রাজনিয় (সিংহল দ্বীপ রাজনীতি), পূজাবলি প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

হায় আমরা সে আনন্দে বঞ্চিত।" কথিত আছে তাঁহারা এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছিলেন :—

জানকী হরণং কর্ত্তুং রঘুবংশে স্থিতে সতি।
কবিঃ কুমারদাসশ্চ রাবণশ্চ যদি ক্ষমঃ ॥ *

তাঁহাদের এই বাক্য শ্লেষপূর্ণ। ইহার এক অর্থ—রঘুবংশ বিদ্যমান থাকিতে জানকীকে হরণ করা কেবল রাবণেরই সাধ্য। অপর অর্থ—রঘুবংশ কাব্য বিদ্যমান থাকিতে জানকী হরণ কাব্য বিরচন করা একমাত্র কবি কুমার-দাসেরই যোগ্য।

কালিদাসের সহ কুমারদাসের সখ্য ও কালিদাসের লঙ্কা যাত্রা। সভাসদ্ পণ্ডিতগণের মন্তব্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য বিষণ্ণ হইলেন। তিনি লঙ্কেশ্বরকে কবি সম্মান প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে যথোচিত রাজসম্মান প্রদান করিবার জন্য মনঃস্থ করিলেন। তদনুসারে তিনি জানকী হরণ কাব্য রাজ্যের প্রধানতম হস্তীর পৃচ্ছে বন্ধন করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইলেন। যখন হস্তী মহাসমারোহে নগরের মধ্য দিয়া চলিতেছিল তখন কালিদাস তথায় উপস্থিত হইয়া জানকীহরণ কাব্য দেখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সাধারণ রীতি অনুসারে তাঁহার প্রার্থনা অঙ্গীকৃত হইল। তিনি উক্ত কাব্যের প্রথম শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন—

আসীদবন্ধ্যামভিভোগভারাদ্
দিবোঽবতীর্ণা নগরীব দিব্যা।
ক্ষত্রানলস্থানশমী সমৃদ্ধ্যা
পুরামযোধ্যেতি পুরী পরার্দ্ধ্যা ॥

(জানকী হরণ ১।১)॥

"নগর সমূহের মধ্যে অযোধ্যাপুরী শ্রেষ্ঠা। অগ্নি যেমন শমী বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়াছিল ক্ষত্রিয় তেজঃ সেইরূপ এই নগরীকে আশ্রয় করিয়া আছে। এই দিব্য নগরী বহুভোগ্য দ্রব্যের ভারেই যেন স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে।"

এই প্রথম শ্লোক পড়িয়াই কালিদাস কুমারদাসের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ ঐ কাব্য পড়িয়া কালিদাস এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি উহা স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিয়া হস্তীর সঙ্গে সঙ্গে নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বাগ্দেবীর বরেণ্য পুত্র কালিদাস লঙ্কেশ্বরকে সাধারণের সমক্ষে কবিসম্মান প্রদান করিলেন, এই সংবাদ অনতিবিলম্বে লঙ্কায় পঁহুছিল। রাজা কুমার-দাস কৃতজ্ঞতাভরে মহাকবি কালিদাসকে লঙ্কায় যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। লঙ্কেশ্বরের আহ্বান অনুসারে মহাকবি লঙ্কায় গমন করেন। এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম অত্যধিক হয় নাই।

জানকীহরণ কাব্যের মৌলিকতা। উপরে যে কিংবদন্তী উল্লেখ করিলাম উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে। উহার অন্ততঃ কিয়দংশ সত্য ঘটনার উপর ন্যস্ত। জানকীহরণ কাব্য আকাশকুসুমের ন্যায়

---

* কেহ বলেন খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কবি রাজশেখর এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। জহ্লনের সূক্তি মুক্তাবলী গ্রন্থে এই মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

অলীক নহে।* দশসর্গাত্মক এই মহাকাব্য বোম্বাই নগরে দেবনাগর অক্ষরে ও কোলম্ব নগরে সিংহলাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক সর্গের অন্তে "ইতি জানকীহরণে মহাকাব্যে সিংহলকবেরতিশয়ভূতস্য কুমারদাসস্য কৃতৌ অমুকোনামঃ অমুকঃসর্গঃ" এইরূপ লিখিত আছে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কবি রাজশেখর, দ্বাদশ শতাব্দীতে মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র, তদ্ব্যতীত বৈয়াকরণ উজ্জ্বল দত্ত, কবি জল্হন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকগণ কুমারদাসকৃত জানকীহরণ কাব্য হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঔচিত্যালঙ্কার, শার্ঙ্গধর পদ্ধতি, সুভাষিতাবলী ও সূক্তি মুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থেও জানকীহরণ কাব্যের শ্লোক নিবদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ রাজা কুমারদাস ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তাঁহার জানকীহরণ কাব্য আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর। মহাকবি কালিদাসেরও অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করেন না। তথাপি এই তিনের সম্বন্ধ যেভাবে উল্লিখিত হইল উহা যথার্থ কি কাল্পনিক তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

লঙ্কার রাজসভায় কালিদাস।

কথিত আছে কালিদাস লঙ্কার রাজসভায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন; এ বিষয়ে নিম্নে একটী কথা উদ্ধৃত হইতেছে। রাজা কুমারদাসের পাঁচ পত্নী ছিল। একদিন তাঁহার দুই পত্নী নির্জ্জনে এমনভাবে পরস্পর কথোপকথন করিতেছিলেন যে উঁহাদের চরিত্র বিষয়ে রাজার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। পত্নীদ্বয়ের বিশ্রম্ভালাপ শ্রবণে কৌতূহলী হইয়া রাজা গবাক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া এক পত্নী ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন "মূর্খ"। রাজা উঁহাদের অন্য কোন কথাই শুনিতে পাইলেন না, কেবল "মূর্খ" এই কথাটি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। উঁহারা মূর্খ শব্দ কেন ব্যবহার করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য জানিবার জন্য রাজা পরদিন প্রাতঃকালে সভাসদ্ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিতগণ সভায় উপস্থিত হইবা মাত্র রাজা উঁহাদের প্রত্যেককে "মূর্খ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এই নূতন রীতির অভ্যর্থনায় প্রীত না হইয়া পণ্ডিতগণ পরস্পর গোপনে বলাবলি করিতেছেন এমন সময়ে মহাকবি কালিদাস সভায় উপস্থিত হইলেন। "মূর্খ" এই অভিনব সম্বোধনে অভ্যর্থিত হইয়া তিনি রাজাকে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

> গতং ন শোচামি কৃতং ন মন্যে
> খাদন্ ন গচ্ছামি হসন্ ন ভাষে।
> দ্বাভ্যাং তৃতীয়ো ন ভবামি রাজন্
> কিং কারণাদেব বদাস্মি মূর্খঃ॥

"আমি গত বিষয়ের শোচনা করি না, কৃত কর্ম্মের বিষয় পুনঃ পুনঃ ভাবনা করি না, চলিতে চলিতে ভোজন করি না, কথা বলিতে বলিতে উচ্চ হাসি হাসি না, যেখানে দুই ব্যক্তি গোপনে কথা বলিতেছে তথায় আমি প্রবেশ করি না। মূর্খের যে পঞ্চ লক্ষণ আছে

* মূল জানকীহরণ কাব্যের কিয়দংশ কালসহকারে নষ্ট হইয়াছিল। লঙ্কায় "সন্ন" নামে উহার এক অতি প্রাচীন অনুবাদ আছে। ভিক্ষু ধর্ম্মারাম ঐ অনুবাদ দেখিয়া সংস্কৃত শ্লোক বিরচনপূর্ব্বক মূলের লুপ্ত অংশের উদ্ধার করিয়াছেন।

আমাতে তাহার একটীও নাই। মহারাজ তবে কেন আমাকে মূর্খ বলিলেন।"

উল্লিখিত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে কেন "মূর্খ" বলিয়াছেন। পত্নীদ্বয় যেখানে গোপনে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন তথায় প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। কালিদাসের বুদ্ধিকৌশলে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে যথোচিত পুরস্কৃত করিলেন।

উপরে যে কথা উদ্ধৃত হইল উহা বিশ্বাস-যোগ্য কিনা শ্রোতৃবর্গ বিবেচনা করিবেন। উহার সমর্থন বা নিরাকরণের জন্য আমার কোন প্রকার ব্যগ্রতা নাই, কারণ উহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্যাঙ্গ নহে। নিম্নে অন্য একটী কিংবদন্তী বিবৃত হইতেছে, শ্রোতৃগণ উহার প্রতি মনোনিবেশ করিলেই আমি চরিতার্থ হইব। বলিতে কি এই কিংবদন্তী বর্ত্তমান প্রস্তাবের মূল ভিত্তি।

কালিদাসের অন্তিম কবিতা।

কথিত আছে রাজা কুমারদাস কোন রূপবতী রমণীর প্রণয়ে আসক্ত ছিলেন। একদিন তিনি অপরাহ্ন সময়ে উক্ত রমণীর গৃহে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন পুরোবর্ত্তী সরোবরে শতদলপদ্মসমূহ বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। সহসা একটী মধুকর আসিয়া একটী পদ্মের উপর নিপতিত হইল এবং উহার মধুপান করিবার জন্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মটী মুদ্রিত হইয়া যাওয়ায় মধুকর উহার মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া রহিল। মধুকরের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া রাজার হৃদয়ে কবিত্বের উচ্ছ্বাস হইল। তিনি বলিলেন ;—

সিয় তঁবরা সিয় তঁবরা সিয় সেবেনী
সিয়স পূরা নিদি নো লবা উন্ সেবেনী

রাজা এই দুই পংক্তি গৃহের কুড্যে লিখিয়া রমণীকে বলিলেন যিনি ইহার আর দুই পংক্তি পূরণ করিতে পারিবেন তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইবে। রাজা জানিতেন কালিদাস ভিন্ন অপর কেহ এই কবিতা পূরণ করিতে পারিবেন না। ফলতঃও কালিদাস পরদিন ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অপর দুই পংক্তি নিম্নলিখিত ভাবে পূরণ করিলেন—

বন বঁবরা মল নোতলা রোণট বনী
মল দেদরা পণ গলবা গিয় সুবেনী ॥

কালিদাসের মৃত্যু স্থান।

রমণী প্রতিশ্রুত পুরস্কারের লোভে কালিদাসকে নিহত করিয়া রাজার নিকট ব্যক্ত করিল যে সে নিজেই দুই পংক্তি রচনা করিয়া কবিতা পূরণ করিয়াছে। রাজা তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া কালিদাসের মৃতদেহ বাহির করিলেন এবং উঁহার জলন্ত চিতায় সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া আত্মবিসর্জ্জন দিলেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি ও লঙ্কার বিদ্বত্তম নরপতি এতদুভয়ের এইরূপে জীবনাবসান হইল। তাঁহাদের চিতাভূমি ভারত মহাসাগরের উপকণ্ঠে মাতর নগরে কালিন্দী তীরে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। সেখানে এখন দেখিবার আর কিছুই নাই, কেবল কতকগুলি বন্য পুষ্পলতা সেই স্থানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে এবং উহার চক্ষুঃ-

পার্শ্বে অসংখ্য পূগ ও নারিকেল বৃক্ষ দণ্ডায়মান হইয়া পথিকদিগকে চিতাভূমি প্রদর্শন করিতেছে। কথিত আছে পুরাকালে লাঙ্কিকগণ চিতাভূমির উপর সাতটী বোধি বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। অধুনা সেই সকল বৃক্ষের কোন চিহ্ন নাই বটে কিন্তু চিতা স্থানটীকে এখনও হথ্‌বোধিবত্ত বলে। বলা বাহুল্য এই হথ্‌বোধিবত্ত শব্দ সপ্তবোধি-বর্ত্ম শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

কালিদাসের এ কবিতা কোন্ ভাষায় লিখিত ? এক্ষণে কালিদাস ও কুমারদাস পরস্পর যে কবিতা পূরণ করিয়াছিলেন উহার অর্থের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কবিতাটী লঙ্কার প্রধান প্রধান ভিক্ষু মাত্রেরই জানা আছে। কিন্তু উহার তাৎপর্য্য যথার্থতঃ কেহই জানেন না। কেহ উহার একভাবে অর্থ বুঝেন, অপরে অন্যভাবে বুঝিয়া থাকেন। কেহ দুই তিনটী পদ একত্র করিয়া, কেহ বা একটী পদকে দ্বিখণ্ডে ও ত্রিখণ্ডে বিভাগ পূর্ব্বক অর্থের নিষ্কাশন করেন। কাহারও মতে কবিতাটী প্রাচীন সিংহলীভাষায় লিখিত, কেহ বা বলেন উহা কালিদাসের সমসাময়িক ভারতের কোন কথিত ভাষায় রচিত। আমার বোধ হয় উহা প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। বস্তুতঃ কালিদাসের সময়ে পূর্ব্বে ও পরে লাঢ়দেশের সিংহপুর নগর হইতে অনেক হিন্দু লঙ্কায় গমন করিয়া মাতর প্রভৃতি স্থানে বসতি করেন। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান রাঢ় দেশই লাঢ় নামে খ্যাত ছিল। মহাবংশের বর্ণনায় জানা যায় সিংহপুর নগর বঙ্গ হইতে মগধে যাইবার পথে অবস্থিত। ইহাতে অনুমিত হয় হুগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুর নামক স্থানই পূর্ব্বে সিংহপুর নামে খ্যাত ছিল। এই অনুমান যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে পঞ্চদশ শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশ হইতে যে সকল হিন্দু লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন কবিতাটী তাঁহাদের ভাষায় লিখিত।

কবিতার পাঠান্তর। কালসহকারে এই কবিতার নানা পাঠান্তর ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্তচ্ছলে কয়েকটী পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পাঠ।	পাঠান্তর।
তাঁবরা	ভমরা
সেবেনী	সুবেনী
সুবেনী	সেবেনী
বঁবরা	বমরা
মল নোতলা	বন বঁবরা
পণ গলবা	পেনি বীলা
গিয়	গিয়ে

ইত্যাদি।

কবিতার শব্দ বিশ্লেষণ। কোন কোন ভিক্ষুর মতে কবিতাটীর প্রথম দুই পংক্তি কালিদাসের এবং শেষ দুই পংক্তি কুমারদাসের রচিত। অর্থাৎ কুমারদাস শেষ দুই চরণ রচনা করেন এবং কালিদাস আদ্য দুই চরণ রচনা করিয়া কবিতা পূরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবিতাটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধেও অনেক মতভেদ আছে। উহাতে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার যথাসম্ভব অর্থ নিম্নে লিখিত হইল ;—

শব্দ।	অর্থ।
সিয়	(১) স্বকীয়, (২) শত, (৩) স্বাদু, (৪) সম্বন্ধী, (৫) শীত।

তাঁবরা	তামরস অর্থাৎ পদ্ম।
সেবেনী	(১) সেবন করিতে করিতে, (২) সুখে, (৩) বন্ধন, (৪) ছায়া, (৫) গৃহ।
সিয়স	স্বীয় অক্ষি।
পুরা	পুরিয়া, পূর্ণ করিয়া।
নিদি	নিদ্রা।
নো লবা	ন লব্ধ্বা, লাভ না করিয়া।
উন্	(১) উদ্বেগ, (২) উপবিষ্ট, (৩)প্রবেশ করিল।
বন	(১) অরণ্য, (২) জল।
বঁবরা	ভ্রমর।
মল	(১) পুষ্প, (২) মালা।
নোতলা	উত্তোলন না করিয়া, নষ্ট না করিয়া।
রোণট	(১) রেণোরর্থে, রেণুর নিমিত্ত, (২) রুণু ইতি গুঞ্জন করিতে করিতে।
বনী	প্রবেশ করিল।
দেদরা	অত্যন্ত বিদীর্ণ বা বিকসিত হইলে।
পণ	প্রাণ।
গলবা	গলাইয়া, মোচন করিয়া।
গিয়	গেল।
সুবেনী	সুখে।

কবিতাটীর তাৎপর্য্য। সম্পূর্ণ কবিতাটী নিম্নে লিখিত হইল :—

সিয় তাঁবরা সিয় তাঁবরা সিয় সেবেনী
সিয়স পূরা নিদি নো লবা উন্ সেবেনী।
(কুমার দাস)।

বন বঁবরা মল নোতলা রোণট বনী
মল দেদরা পণ গবলা গিয় সুবেনী ॥
(কালিদাস)।

এই কবিতার তাৎপর্য্য নিম্ন লিখিত ভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে—কুমার দাসের দুই পংক্তির অর্থ :—

[সন্ধ্যার প্রাক্কালে] ভ্রমর মধুলোভে শতদল পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার শতদলে বদ্ধ হইল। [রাত্রিতে] চক্ষুঃ পুরিয়া নিদ্রা লাভ করিতে না পারিয়া বসিয়া বসিয়া কেবল উদ্বেগ ভোগ করিতে লাগিল। কালিদাসের দুই পংক্তির অর্থ :—

[সন্ধ্যার প্রাক্কালে] বন ভ্রমর পুষ্প নষ্ট না করিয়া মকরন্দ পানের নিমিত্ত উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। [প্রাতঃকালে পুনরায়] পুষ্প বিকসিত হইলে উহার মধ্য হইতে প্রাণ (নিজকে) উদ্ধার করিয়া সুখে চলিয়া গেল।

কবিতার অর্থ লইয়া এ স্থলে আমি কোন বাদানুবাদ করিব না। যাঁহারা প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি লইয়া আলোচনা করিতেছেন অথবা যাঁহাদের হৃদয় কবিত্ব রসে পূর্ণ তাঁহারা উহার যথার্থ মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করুন ইহাই আমার নিবেদন।

কালিদাসের মৃত্যুকাল। উপরে যে শোচনীয় ঘটনা উল্লিখিত হইল উহা যদি যথার্থ হয় তাহা হইলে নিশ্চয়রূপে বলিতে পারা যায় কালিদাস ও কুমারদাস উভয়েই ৫২৪ খৃঃ অব্দে দেহ ত্যাগ করেন। মহাবংশ অনুসারে ঐ বৎসর কুমারদাসের মৃত্যু হয়। এইরূপ সিদ্ধান্তের সহিত অন্যান্য সুবিজ্ঞাত ঘটনা সমূহের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। কালিদাসের সম-সাময়িক বরাহমিহির ৫০৫ খৃঃ অব্দে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থ বিরচন করেন। উহাদের সমকালে ক্ষপণক নামক এক জৈন পণ্ডিত বলভী নগরীতে বিদ্যমান ছিলেন। ক্ষপণকের প্রকৃত নাম সিদ্ধসেন দিবাকর। ইনি অনুমান ৫২০ খৃঃ অব্দে ন্যায়াবতার, সম্মতি তর্কসূত্র প্রভৃতি জৈন দর্শন গ্রন্থ বিরচন করেন।

মৎপ্রণীত মধ্য যুগের ন্যায় দর্শনের ইতিহাস (History of the Medieval School of Indian Logic) নামক গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে যে কালিদাসের প্রতিপক্ষ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ খৃষ্টীয় ৫০০ অব্দে অন্ধ্রদেশে বসিয়া প্রমাণসমুচ্চয়, ন্যায়প্রবেশ, হেতুচক্র প্রভৃতি ন্যায় শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া কালিদাসকে কুমারদাসের সমকালিক বলিতে আমার কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ হয় না।

লঙ্কায় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ—কালিদাসের লঙ্কাযাত্রাও অসম্ভব ব্যাপার নহে। তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে অনেক ভারতীয় ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ পণ্ডিত লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন। বহুকালের কথা নয় ১৪৫৬ খৃঃ অব্দে রামচন্দ্র কবি ভারতী নামক একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ লঙ্কায় গমন করিয়া শ্রীমৎ রাহুল সংঘরাজের নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। রামচন্দ্র যে সংঘারামে বাস করিতেন উহা তীর্থগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ। অধুনা চলিত কথায় উহাকে টৌ টৌ গাম বলে। আমি স্বয়ং ঐ সংঘারাম পরিদর্শন করিয়াছি। উহার বর্ত্তমান সংঘনায়ক আমাকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে একটী চন্দন কাষ্ঠময়ী বুদ্ধ মূর্ত্তি ও কয়েকখানি প্রাচীন পালিপুথি উপহার দিয়া অভিনন্দন প্রদান কালে বলেন "রামচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র এই দুই নামের যেরূপ সৌসাদৃশ্য তাহাতে আমাদের বোধ হইতেছে আপনি রামচন্দ্রের আত্মীয় ও তাঁহার বংশের অনেক সংবাদ জানেন।" রামচন্দ্র কবিভারতীর বিস্তৃত বিবরণ এই প্রবন্ধের বিষয় নহে। তিনি লঙ্কায় আত্ম পরিচায়ক যে সকল শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন তাহা হইতে একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

ভারদ্বাজ কুলোদ্ভবা হি জননী দেবীতি নাম্নী সতী
শ্রীকাত্যায়ন বংশজো গণপতি র্ধীমান্ পিতা মে প্রভুঃ।
সোদর্য্যৌ তু হলায়ুধশ্চ গুণিনৌ লক্ষ্মীধরশ্চানুজৌ
গ্রামো মে বিরবাটিকোঽথ বিবুধানন্দো মুকুন্দাশ্রমঃ॥

"আমার মাতা ভারদ্বাজ গোত্র সম্ভূতা। তাঁহার নাম সতী দেবী। আমার বুদ্ধিমান্ প্রভু পিতা কাত্যায়ন বংশ সম্ভূত। তাঁহার নাম গণপতি। হলায়ুধ ও লক্ষ্মীধর নামে আমার দুই গুণবান্ অনুজ সহোদর আছে। বিরবাটিক গ্রাম আমার জন্মভূমি। ঐ গ্রাম পণ্ডিতগণের বাসস্থান ও মুকুন্দের আশ্রম"।

সেতুবন্ধে কালিদাস। পুরাকালে ভারতবাসিগণ লঙ্কায় গমন করিতেন ইহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। এই বিষয়ে অধিক প্রমাণ প্রয়োগ করিতে গেলে সিদ্ধ-সাধন দোষ হইবে। সুতরাং সেই উদ্যোগ হইতে আমি নিরস্ত হইলাম। কালিদাস সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার স্বরচিত কাব্য হইতেই প্রমাণিত হয়। তিনি রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে সমুদ্র বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্ বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্॥

"হে বৈদেহি মলয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত আমার সেতু দ্বারা বিভক্ত ফেনিল জলরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত কর"।

রামেশ্বরের মন্দিরের বাহিরে অগস্ত্য তীর্থ সমীপে দাঁড়াইয়া সেতুর দিকে অবলোকন করিলে বোধ হয় কালিদাস "ঐ [illegible] স্বয়ং

দেখিয়া উদ্ধৃত পংক্তি লিখিয়াছেন। স্থানীয় লোকে বলে সেতুর একদিকে কলিকাতার-সমুদ্র ও অপর দিকে বোম্বাইয়ের সমুদ্র। এই দুই সমুদ্র পরস্পর মিলিতে না পারিয়াই যেন ক্রোধ ভরে সেতুর দুই ধারে ফেন উদ্গিরণ করিতেছে। ঐ সেতুর উপর দিয়া চতুর্দশ মাইল অগ্রসর হইলে ধনুষ্কোটি তীর্থে উপস্থিত হওয়া যায়। কথিত আছে রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া প্রত্যাগমন কালে ব্রহ্মহত্যার পাপ ক্ষালনের নিমিত্ত এই স্থানে স্নান ও ধনু ধৌত করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে লঙ্কার দিকে তাকাইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৬৪ দ্বীপ দৃষ্ট হয়। উহা নাকি প্রাচীন সেতুর ধ্বংসাবশেষ। দাক্ষিণাত্য হইতে জলযানে চড়িয়া রামেশ্বর যাইতে হইলে প্রথমতঃ যে স্থানে উপস্থিত হওয়া যায় উহাকে পাম্বান্ বলে। পাম্বান্, রামেশ্বর ও ধনুষ্কোটি এই তিন লইয়া একটী দ্বীপ। ঐ দ্বীপ প্রাচীন কালে বোধ হয় পাম্বান্ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পাম্বান্ শব্দটী দ্রাবিড়ীয়। সংস্কৃতে উহাকে নাগ দ্বীপ বলে। নাগদ্বীপ নিতান্ত আধুনিক নহে। কালিদাসের সময়ে উহা বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল। পালি গ্রন্থে বর্ণিত আছে বুদ্ধদেব নাগ দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। ঐ নাগদ্বীপ হইতে ভারতে ফিরিবার কালে তমালতালী বনরাজি শোভিত তীরভূমির প্রতি তাকাইলে যথার্থতঃ যাহা দেখা যায় উহা কালিদাস নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

> দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী তমালতালী-
> বনরাজি নীলা।
> আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে র্ধারানিবদ্ধেব
> কলঙ্ক রেখা।
> (রঘুবংশ ১৩। ১৫)॥

পাণ্ড্যদেশে কালিদাস। দক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য নৃপতির বর্ণন প্রসঙ্গে কালিদাস লিখিয়াছেন :—

> পাণ্ড্যোঽয়মংসার্পিত লম্বহারঃ
> কৢপ্তাঙ্গরাগো হরিচন্দনেন।
> আভাতি বালাতপ রক্তসানুঃ
> সনির্ঝরোদ্গার ইবাদ্রিরাজঃ॥
> (রঘুবংশ ৬। ৬০)॥

কালিদাসের সময়ে পাণ্ড্য নরপতির স্কন্ধে যেরূপ লম্বমান হার ও অঙ্গে হরিচন্দনের অনুলেপন ছিল, দ্রাবিড়ীয় ভূম্যধিকারিগণের অঙ্গভূষণ অদ্যাপি তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। কালিদাসের জীবৎকালে পাণ্ড্যরাজের যেরূপ "ইন্দীবর-শ্যামতনু" ছিল এখনও উহার অধিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কালিদাসের সময়ে পাণ্ড্য দেশের রাজধানী উরগপুরে অবস্থিত ছিল। এই উরগপুর বর্ত্তমান ত্রিচিনপল্লীর অন্তর্গত। ত্রিচিন পল্লীর এক দিকে পর্ব্বতের উপর শিবের মন্দির এবং অপর দিকে কাবেরী নদী পার হইয়া শ্রীরঙ্গমে পঁহুছিলেই ভারতের সর্ব্ব প্রধান বিষ্ণুমন্দির দৃষ্ট হয়। যদিও সমগ্র দাক্ষিণাত্য শৈব ধর্ম্মে পরিপ্লাবিত, কাবেরীর উভয় পার্শ্বে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের তুল্য প্রভাব অনুভূত হইয়া থাকে। মনে হয় উরগপুরে অবস্থান কালেই যেন কালিদাস হরি ও হর এতদুভয়ের কে জ্যেষ্ঠ ও কে কনিষ্ঠ ইহা নির্দ্ধারণ করিতে-না পারিয়া লিখিয়াছেন :—

> একৈব মূর্ত্তির্বিভিদে ত্রিধা সা
> সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্।
> বিষ্ণোর্হরস্তস্য হরিঃ কদাচিৎ
> বেধাস্তয়োস্তাবপি ধাতুরাদ্যৌ।
> কুমারসম্ভব ৭।৪৪

কাবেরীতীরে কালিদাস। "কাবেরী

নদী গভীর নহে। এখন উহা শুষ্ক প্রায়। বর্ষাকালে এই নদী বিস্তীর্ণ হয় বটে কিন্তু শরৎকালে উহার জলময় ভাগ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে। গত অগ্রহায়ণ মাসে কাবেরীতে স্নান কালে শত শত গো মহিষ ও হস্তী অনায়াসে এক পার হইতে অপর পারে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কালিদাসের নিম্ন লিখিত শ্লোকটী আমার স্মৃতি পথে উদিত হইল :—

সসৈন্যপরিভোগেণ গজদানসুগন্ধিনা।
কাবেরীং সরিতাং পত্যুঃ শঙ্কনীয়ামিবাকরোৎ॥

রঘুবংশ ৪।৪৫

শরৎকালে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে কালিদাস লিখিয়াছেন হস্তিগণের মদধারায় কাবেরীর জল আমোদিত হইয়াছিল, তাঁহার এই বর্ণনায় কিঞ্চিন্মাত্র অত্যুক্তি নাই।

কালিদাসের দাক্ষিণাত্য পরিদর্শন।

টিউটিকোরিন্ নামক বন্দরের কয়েক মাইল দূরে তাম্রপর্ণী নদী। এই নদী যেখানে সমুদ্রে পড়িয়াছে সেই স্থান এক্ষণে মুক্তার আকর। কালিদাসের সময়েও ঐ স্থান মুক্তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে অনুভূত হয় :—

তাম্রপর্ণী সমেতস্য মুক্তাসারং মহোদধেঃ।
তে নিপত্য দদুস্তস্মৈ যশঃ স্বমিব সঞ্চিতম্॥

রঘুবংশ ৪।৫০

যাঁহারা কেবল রমণীগণের কেশ বিন্যাস স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই কেবল কালিদাসের নিম্নলিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন :—

ভয়োৎসৃষ্ট বিভূষাণাং তেন কেরল যোষিতাম্।
অলকেষু চমূরেণুশ্চূর্ণ প্রতিনিধী কৃতঃ॥

রঘুবংশ ৪।৫৪

লঙ্কেশ্বরের সহ পাণ্ড্যরাজের সন্ধি।

অধিক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর অকারণ বৃদ্ধি করা আমার অভিপ্রেত নহে। কালিদাস দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থলই স্বয়ং পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত বর্ণনায় অনেক সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাসের সময়ে ও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের সহ লঙ্কার রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল। অনেকেই জানেন খৃঃ অঃ ৪৩৬ হইতে খৃঃ অঃ ৪৬৩ মধ্যে ৬ জন তামিল রাজা দাক্ষিণাত্য হইতে লঙ্কায় গমন করিয়া তথায় রাজত্ব করেন। রাজা কুমারদাসের পিতামহ ধাতুসেন শেষ তামিল রাজকে নিহত করিয়া ৪৬৩ খৃঃ অব্দে লঙ্কার সিংহাসন অধিকার করেন। কুমারদাসের পিতা মৌদ্গল্যায়ন বোধ হয় পাণ্ড্য রাজের সহায়তা পাইয়াই কাশ্যপকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কালিদাস লিখিয়াছেন :—

অস্ত্রং হরাদাপ্তবতা দুরাপং
যেনেন্দ্রলোকাবজয়ায় দৃপ্তঃ।
পুরা জনস্থান বিমর্দ শঙ্কী
সংধায় লঙ্কাধিপতিঃ প্রতস্থে॥ রঘুবংশ ৬।৬২

"পাণ্ড্যরাজ শিবের নিকট দুর্লভ অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। এই হেতু জনস্থানের আক্রমণাশঙ্কী গর্ব্বিত লঙ্কেশ্বর পাণ্ড্য নৃপতির সহ সন্ধি করিয়াই ইন্দ্রলোক জয় করিতে যাইতেন"।

এই বর্ণনায় রাবণ ও ইন্দ্রলোক কবির কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু কালিদাসের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা জীবদ্দশায় লঙ্কেশ্বরের সহ পাণ্ড্যরাজের যে সন্ধি হইয়াছিল ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। পাণ্ড্যরাজ শৈব ছিলেন ইহা প্রকাশ

করিবার জন্তই লিখিত হইয়াছে তিনি শিবের নিকট দুর্লভ অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।

উপসংহার।

লঙ্কায় আজ কাল শৈব ও বৌদ্ধের সংখ্যা প্রায় তুল্য। বৌদ্ধগণ সিংহলী। শৈবগণ তামিল বা দাক্ষিণাত্যের লোক। লঙ্কাব প্রাচীন রাজধানী পুলস্ত্যপুরের ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া অনেক প্রস্তর ও পিত্তল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে নটরাজ শিব, পার্ব্বতী, চণ্ডেশ্বর ও সূর্য্যের মূর্ত্তিই অধিক। ভারতের লোক লঙ্কায় যাইয়া এই সকল মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ পুরাকালে ভারতের সহ লঙ্কার বিশেষ সংস্রব ছিল। অতএব কালিদাস লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন এই প্রবাদ আমার নিকট অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

নববর্ষে সুধা।

আজ বৈশাখী সংক্রান্তি। হিন্দুর নববর্ষ। সুতরাং ঘরে ঘরে মহা আয়োজন। স্নান ও দান এই উৎসবের প্রধান কার্য্য। ও পাড়ার বড় ও মেজ গিন্নি, ঝি, বউ, লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইবেন এবং পথে ভাসুরঝি সুধাকে সঙ্গী করিবেন মনস্থ করিয়াছেন।

ভোর চারিটা হইতে কাজ কর্ম্মের আয়োজনে,দাসী চাকরের ডাকাডাকিতে,ছেলে মেয়ের কোলাহলে ও গৃহিণীগণের ব্যস্ততায় আজ গৃহ মুখরিত।

একে একে বাড়ী শুদ্ধ সকলের মৃত আত্মীয়গণের গুরু, ও ইষ্টদেবতার উদ্দেশে প্রায় পঞ্চাশটি গঙ্গাজল পূর্ণ মৃণ্ময় কলসী সিন্দুর চন্দনচর্চ্চিত এবং ফুল ও সূতাধারে সজ্জিত,—আর একটি পাত্র নানাবিধ ফল, মিষ্টান্ন, ছোলা মটর যব যজ্ঞোপবীত ও দক্ষিণা ধারণ করিয়া নূতন গামছা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তৎপার্শ্বে এক একখানি তালবৃন্ত এবং পুষ্পমাল্য চন্দন ধূপদীপ প্রভৃতি সংরক্ষিত হইয়াছে! গৃহিণী ও অন্যান্য ব্রতকারিণীরা গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলে, পুরোহিত ঠাকুর যথা বিধান মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ঘটোৎসর্গ করাইবেন। ইহা নিদাঘের প্রারম্ভেই প্রেতাত্মার উদ্দেশে দান।

ব্রতায়োজন শেষ হইলে বড় গিন্নি শ্যামা-ঠাকুরাণী তাঁহার মেজ যা দুর্গাসুন্দরীকে ডাকিয়া কহিলেন, "মেজ বৌ, আমি সুধাকে নিয়ে আগে স্নান করে আসি পরে তুমি বেলা হলে বউকে সঙ্গে করে যেয়ো।"

একটি ক্ষুদ্র উদ্যান পথের মধ্যে দিয়া শ্যামাসুন্দরী একটি একতল ক্ষুদ্র বাটীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাটীটি নিস্তব্ধ।

কেন এ বাড়ীর লোকেরা সকলেই কি এরই মধ্যে গঙ্গাস্নানে গিয়াছে নাকি? এই ভাবিয়া সত্বরপদে শ্যামা ঠাকুরাণী সুধাকে ডাকিতে ডাকিতে, পশ্চাৎদিকের বারাণ্ডায় আসিয়া সুধার কনিষ্ঠা বিধুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কি হয়েছে গা বিধু। সুধা কোথা গেল?"

বিধু বলিল "দিদি পুকুর পাড়ে।" জ্যাঠাইমাকে সঙ্গে লইয়া সে পুষ্করণীর তীরে উপস্থিত হইল।

চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালবিধবা সুধা শ্যামাসুন্দরীর জ্ঞাতিকন্যা; বিষয় সম্পত্তি যাহা আছে ইঁহারাই তাহার তত্ত্বাবধারক।

স্বামীর সহিত সুধার সাধ আহ্লাদ সকলি ফুরাইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহার হৃদয়ভরা স্নেহ ফুরাইয়া যায় নাই। মৃত স্বামীর একটি পাখী ছিল তাহাকেই সে সন্তানের স্থলে অভিষিক্ত করিয়াছে। কিন্তু এমনি তাহার দুর্ভাগ্য পুষ্করিণীতে স্নান করাইবাব সময় পাখীটিও তাহাকে ত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল, সুধা শোকাকুল হইয়া কাঁদিতেছে।

শ্যামা ঠাকরুণ সুধার শূন্য পিঞ্জর দেখিয়া কহিলেন 'আকপাল পাখীটাও বুঝি গেছে! কোথায় গেল খুঁজলিনি কেন?'

সুধা কাতরকণ্ঠে কহিল "ঢের খুঁজেছি।"

"আচ্ছা আয় গঙ্গাস্নান করে আসি। মিছি মিছি কেঁদে কি তাকে পাওয়া যাবে! আজ বচ্ছরকার পুণ্যাহ দিন তুই একটা পাখী পাখী করে কেবল পাগল হয়ে বসে থাকবি! এখন কি আর ও সব ভাবতে আছে? তোর এখন ব্রত নিয়ম পূজা আর্চ্চা উপাস কাপাস করবার সময়"।

সুধা একটু রাগ করিয়া উত্তর করিল, 'না আমি গঙ্গা স্নানে যাব না।'

বালিকা বিধু মুখখানি মলিন করিয়া মৃদু স্বরে দিদির কাণের কাছে গিয়া কহিল "না গেলে জ্যাঠাইমা রাগ করবে, চল ভাই।"

তখন সুধা অগত্যা শূন্য পিঞ্জরটি তুলিয়া নিজ শয়নাগারে রাখিয়া জ্যাঠাইমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

শ্যামাঠাকরুণ মনে মনে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হইলেন। একালের মেয়েদের মোটেই ধর্ম্ম কর্ম্মে শ্রদ্ধা নাই। তাইতেই ত সংসারে এত অমঙ্গল অশান্তি!

স্নানান্তে শ্যামাসুন্দরী বাড়ী আসিয়া দেখেন, পুরোহিত আসিয়াছেন কর্ত্তার ঘটোৎসর্গ হইয়াছে, গৃহিণীর অপেক্ষায় সকলে বসিয়া আছেন। তাঁহার হইলে তবে অন্যান্য সকলের উৎসর্গ শেষে ব্রাহ্মণসধবা ও কুমারী ভোজনান্তে ব্রত সমাধা হইবে। শ্যামাসুন্দরী, বাড়ী আসিয়া হস্তপদ প্রক্ষালনান্তে তশরের কাপড় ছাড়িয়া আর একখানি গরদের শাড়ী পরিধানপূর্ব্বক ব্রত স্থানে গিয়া বসিলেন। পুরোহিত যথারীতি ঘটের পূজা করাইয়া নিম্নোক্তমন্ত্র পাঠ করাইলেন।

এষ ধর্ম্মঘটো দত্তো ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মকঃ।
অস্য প্রদানাৎ সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ॥
ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপোঽসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
ত্বয়ি লিপ্ত সন্তু লিপ্তাশ্চন্দনৈঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥
পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং
প্রাণিনাং মহৎ।
পানীয়স্য প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতু শাশ্বতী॥

পরে দক্ষিণাদান, বিষ্ণু, গুরু ও পিতৃ-প্রণামান্তে গৃহিনী উৎসর্গ কার্য্য শেষ করিলেন।

ক্রমান্বয়ে বড় বউ, মেজ বউ, পিসি, শাশুড়ি, জ্যাঠাই প্রভৃতি সকলের ঘটোৎসর্গ হইয়া গেলে সুধার খোঁজ পড়িল। তখন বেলা প্রায় তিনটা; চারিদিকে ডাকাডাকি হাঁকা হাকি, কিন্তু সুধার কোনই খোঁজ নাই। বুড়ো দিদিমা বলিলেন "আর বাপু এখনকার মেয়েদের ধর্ম্মে কর্ম্মে কি মতি আছে? তারা বলে মরাগুরু বাপ্ খাম্না। এই

বৈশাখের প্রতপ্ত গ্রীষ্মে সুশীতল জল দান করা কি কম পুণ্যি! প্রেতলোকে তাদের আত্মাকে শীতল করা হয় না কি? কে জানে সুধা কি ধরণের মেয়ে!" এই বলিয়া বুড়ী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

এদিকে শ্রান্তক্লান্ত ক্ষুধাতুর সুধা বাগানে অশ্বত্থ তলায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। উঠিয়া দেখিল রাস্তার পরপারে দুইটি বালক সেই রৌদ্রে মাঠের উপর ফুটবল খেলিতেছে। তাহাদের খেলা দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি সমস্ত ভুলিয়া গেল। মাঝে মাঝে বলটা রাস্তায় আসিয়া পড়িতেছিল তাহার মনে হইতেছিল—এই বুঝি তাহার উপর আসিয়া পড়ে—সে ভীত হইয়া উঠিতেছিল অথচ খেলা হইতে নয়ন ফিরাইতেও পারিতেছিল না। একবার একটা গরুর গাড়ির উপর বলটা পড়িয়া ঠিকরিয়া দূরে চলিয়া গেল; গাড়োয়ানটা সুমধুর কণ্ঠে বালকদিগকে আত্মীয়তা সম্ভাষণ করিতে করিতে গরুর লেজ মলিয়া দিল, গরু দুইটা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। সুধা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে অন্য মনে অশ্বত্থ তল হইতে উঠিয়া রাস্তার নিকটবর্ত্তী আর একটি বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সময় একটি বালক একটি ক্ষুদ্র পিঞ্জর হস্তে লইয়া চলিয়াছিল, সুধা ভাবিল 'আহা এটি যদি আমার পাখী হয়'। সুধা আত্মহারা ভাবে সেইদিকে ধাবিত হইল। সহসা ফুটবলের গোলাটা তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল। সুধা যে বেশী আঘাত পাইয়াছিল তাহা নহে, আকস্মিক একটা আতঙ্কে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল,—সে পথিমধ্যে বসিয়া পড়িল।—কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। তখনো তাহার মন হইতে সে ভয়ের ভাব যায় নাই, তখনো তাহার দেহ বিকম্পিত হইতেছে মস্তক ঘুরিতেছে তথাপি সে করুণকণ্ঠে ডাকিল—"ওগো এদিকে, এদিকে; ওটি কি আমার পাখী—একবার দেখাও না গো?" এই সময় একটি তীক্ষ্ণ স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল—"বাবারে এমন মেয়ে ভূভারতে দেখিনি! ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পড়ে রইল, উনি এই খানে এসে খেলা দেখছেন!" —সুধা অপরাধীর করুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। পার্শ্ব হইতে সেই পিঞ্জরধারী বালক আসিয়া কহিল, এটি কি আপনার পাখী আমি ধরে এনেছি।" বিধু কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া খাঁচাটি লইয়া আনন্দে বলিয়া উঠিল "দিদি দিদি তোমার পাখী, সত্যি তোমার পাখী, দেখ।" সুধার গণ্ড বাহিয়া ধীরে ধীরে অশ্রুধারা বাহিয়া পড়িল।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য।

বৈদিককালের সামগান হইতে আমরা জানিতে পারি যে তুগ্রার পুত্র হতভাগ্য ভুজ বাণিজ্যব্যপদেশে যেখানে "জল" হইতে স্থল দেখা যায় না এমন স্থলেও যাতায়াত করিতেন। পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন ভারতের সভ্যতা" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সমুদ্রযাত্রা করিতেন

বেদের অনেকস্থলে, তাহার উল্লেখ আছে। (১।১১৬,৩ এবং ৪)। পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে বরুণদেব আকাশচারী পক্ষী ও সমুদ্রগামী জাহাজের গতায়াতের পথ যে অবগত ছিলেন তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।* ৪।৫৫,৬,—যাঁহারা অর্থোপার্জ্জনের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিতেন, তাঁহারা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সমুদ্রের উপাসনা করিতেন। ৭.৮৮,৩,—বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, তিনি এবং বরুণ নৌকা করিয়া একবার সমুদ্রে গিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আদিম হিন্দুজাতীয় ব্যক্তিগণ সমুদ্রযাত্রা এবং বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে গমনাগমন করিতেন।

মনুর অষ্টম অধ্যায়ে ১৫৭ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই যে, যেস্থলে টাকা কর্জ্জ দিলে টাকা আদায়ের কিছুই নিশ্চয়তা নাই, সেই প্রকার টাকার সুদ যে সকল ব্যক্তি সমুদ্র-যাত্রায় অভ্যস্থ তাঁহারাই নির্দ্ধারণ করিবেন। ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এই শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মনুর সময়েও হিন্দুগণ সমুদ্রযাত্রা করিতেন †। মনুকে যদি আমরা খৃষ্ট জন্মের দশ শতাব্দী পূর্ব্বে স্থান দান করি, তাহা হইলে আমরা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইব যে ইহার পূর্ব্বেও পূর্ব্বদেশের সহিত পশ্চিমের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। খৃষ্ট জন্মের ত্রিশ কি পঁচিশ শতাব্দী পূর্ব্বে ফিনিসিয়ান জাতি যে পথে স্বদেশত্যাগ করিয়াছিলেন, স্থলপথে সেই পথ দিয়া পণ্যাদি পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইত। এই পথ দিয়াই জর্ম্মাণি এবং স্কাণ্ডিনেভিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলের হস্তিদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্যাদি সরবরাহ হইত।‡ এলফিনষ্টোন সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন যে মনুর সময়ের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষীয়েরা ভূমধ্যসাগরান্তর্গত বন্দরের সহিত বাণিজ্য করিতেন। কিন্তু তাঁহার মতে বাণিজ্যকারিগণ সমুদ্রপথে কি স্থলপথে যাত্রা করিতেন তাহা ঠিক বলা যায় না।

---

* "The Chinese and Indian navigators were conducted by the flight of birds." Gibbon : Fall & Decline of the Roman Empire. (Vol. III. Chap.XLI.)

† "As the word used in the original for Sea is not applicable to any inland waters, the fact may be considered as established, that the Hindus navigated the ocean as early as the age of the Code."

‡ "By it also the eastern arts of pottery, ivory-turning, glass-making, enamelling, and wood carving were at last carried into the remotest recesses of Germany & Scandinavia and profoundly influenced the primitive civilizations of those countries. The appearance among the pre-historic remains of Switzerland and Denmark of arms and implements of bronze, in succession to spear and arrowheads of flint, generally affirmed to be one to the displacement of the primeval savage tribe of the west by the immigration of a new races of a higher civilization from the East &c."

—Birdwood ; "Reports of the Old records of the India Office."

তবে তাঁহারা, যে পথেই যাত্রা করুন, ইহা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত যে ভারতবর্ষের সহিত 'পশ্চিমের' বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। *

প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষের মূল্যবান বাণিজ্য সম্ভার পুরাকালের সকল দেশবাসীকেই প্রভূত পরিমাণে প্রলুব্ধ করিত। ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থ পথ আবিষ্কারে যে সকল জাতি সচেষ্টিত ছিলেন—তাহার মধ্যে ইহুদীগণ বাণিজ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জেনেসিসের ৩৭ অধ্যায়ের ২৫,২৮ এবং ৩৬ প্যারাগ্রাফে আমরা এ বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাই। ভারতবর্ষে উৎপন্ন নানাপ্রকার দ্রব্যাদি রাজা সলোমানের দরবারে শোভা পাইত। বাইবেল পাঠে (I. Kings X 22) স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অনেক ভারতীয় দ্রব্য ফিনিশিয়ান এবং ইহুদী বণিকদিগের দ্বারা তথায় নীত হইত। অনেকগুলি হিব্রু কথার উৎপত্তি দেখিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় যে ভারতীয় শব্দ হইতেই সেগুলির ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত 'কাপ' শব্দ হইতে হিব্রু কফ্ এবং Shenhabbim (হস্তী-দন্ত—Shen-a-hibbim শব্দের সংক্ষেপ) শেষাংশ সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে। রাজা সলোমানের কপি, ময়ূর এবং চন্দনকাষ্ঠ সমস্তই ভারত হইতে নীত হইয়াছিল। রাজা হিরামের জাহাজের বোঝাই মাল মধ্যে আমরা যে সমস্ত দ্রব্যাদি দেখিতে পাই তাহা সমস্তই ভারতীয়। কেবলমাত্র যে শুধু দ্রব্যবাচক কতকগুলি শব্দ হিব্রু ভাষান্তরিত হইয়াছিল তাহা নহে,—বস্তুতঃ বাইবেলে Ophir (অফীর) বলিয়া যে স্থানের কথা উল্লেখ আছে তাহা নিঃসন্দেহে মালাবার উপকূলেই অবস্থিত। সম্ভবতঃ ভারতীয় বণিকগণ জাহাজে করিয়া সিন্ধুনদ হইতে বোম্বাই বন্দরে এই সমস্ত প্রেরণ করিতেন এবং সেই স্থান হইতে ফিনিশিয়ান বা অন্যান্য জাতিরা জেরুজালেম পৌঁছাইতেন।

খৃষ্টজন্মের ৫৮৮ বৎসর পূর্ব্বে নেবু-চাডেজর ইহুদীদিগের নগর ধ্বংস করিলে, ইহুদীজাতীয় কয়েকজন বণিক নেবুচাডেজারের সহিত বেবিলনে আইসেন। জনপরিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধিশালী নগরে আসিয়াও তাঁহারা সমভাবে তাঁহাদের বাণিজ্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। নরপতি নেবুচাডেজর তাঁহাদের যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং বাণিজ্যদ্বারা তাঁহারা শীঘ্রই অত্যন্ত ধনশালী হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ, এই সময়ে ভারতবর্ষের সহিত বাবিলোনের সম্পর্ক কিছু ঘনিষ্টতর হওয়াতে তাঁহারা ভারতীয় পণ্যাদি দ্বারা বিশেষ লাভবান হইতে লাগিলেন। ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীদিগের জনবৃদ্ধিও হইতে লাগিল। পারস্য এবং সিরিয়ায় ইহাদের অনেকে বসবাস করিতে লাগিলেন এবং ভারতবর্ষ ও বিশেষতঃ মালাবার উপকূলের সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক

---

* "It seems not improbable that it was in the hands of the Arabs and that part crossed the narrow Sea from the Coast on the west of Sind to Muscat and then passed through Arabia to Egypt & Syria ; while another branch might go by land or along the Coast to Babylon & Persia.—Elphinstone.

আরও ঘনিষ্ঠতর হইল। ঠিক কোন সময়ে ইহাদের বংশধরগণ কোচিনে স্থায়িভাবে আসিয়াছিলেন তাহা সঠিক বলা যায় না; তবে কোচিনে ইঁহাদের যে মন্দির (Synagogue) আছে, তথায় রক্ষিত তাম্রপাত্রে যে সমস্ত বিবরণ খোদিত আছে, তাহাতে বোঝা যায় যে, ইঁহারা নেবুচান্দারের রাজত্বের শেষভাগে এদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। এই সমস্ত খোদিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে সংখ্যায় তাঁহারা তখন দুই সহস্র ছিলেন, তাঁহারা জামোরিনের দ্বারা বিশেষরূপে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন এবং ইচ্ছামত তাঁহাদের ধর্ম্মযাজনা করিতে পারিতেন। তাঁহারা ভূমি ক্রয় করিয়া সেস্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং নিজেরাই তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া নিজেদের পরিবারবর্গের শাসনভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন।

হোমার পাঠে আমরা অবগত হই যে, রাজা মেনেলিয়াসের শয়ন-পালঙ্কে হিন্দুস্থানের হস্তিদন্তসুশোভিত কারুকার্য্য ছিল। গ্রীক ভাষায় হস্তীর কোন প্রতিশব্দ ছিল না এবং সেইজন্য প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হেরাডোটাস যখন প্রথম হস্তী দেখেন তখন ইহাকে Ivory বা গজদন্ত বলেন।* অনেক সংস্কৃত-শব্দ গ্রীসদেশীয় ভাষায় এখনও পাওয়া যায় এবং ইহাতেই প্রতীয়মান হয় যে তখন ভারতের সহিত গ্রীসের বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত করকাই নামক স্থানের নাম গ্রীসদেশীয় পুস্তকে পাওয়া যায়। এই করকাই অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া খ্যাত ছিল এবং তখন এস্থানে যথেষ্ট পরিমাণ মুক্তা আমদানী হইত।

কতিপয় গ্রীকগ্রন্থকারদের মতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কেবলমাত্র "নদী" লইয়া থাকিতেন। তবে জাহাজাদি যে সে সময় প্রস্তুত হইত সেবিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। Arrian নামক গ্রীক গ্রন্থকার ভারতীয় জাতিসমূহের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধকালীন বলিয়াছেন যে, চতুর্থশ্রেণীর লোক "জাহাজপ্রস্তুতকারক ও নাবিক" এবং ইহারা নদীতে যাতায়াত করে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, তৎকালে সমুদ্রে পোতবাহী নাবিক কেহই ছিল না। আলেকজান্দারের নৌ সেনাপতি নিয়ার্কাসও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। সিন্ধু হইতে ইউফ্রেটিস পর্য্যন্ত জলপথে নিয়ার্কাস অতি অল্পসংখ্যক মৎস্যতরী ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার তরী দেখেন নাই। সিন্ধুতীরেও বেশী নৌকা ছিল না। এবং আলেকজান্দারের জন্য ব্যবহৃত বৃহৎ রণতরীগুলি তাঁহাকে নিজেই প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী নাবিকদ্বারাই চালনা করিতে হইয়াছিল। নিয়ার্কাসের এ বৃত্তান্ত আমরা পরে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিব।

মাসিডনাধিপতি আলেকজান্দারের অভিযানের অন্য যে ফলই হউক না কেন, ইহাতে যে ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা করিয়াছিল সেবিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বেভারিজ সত্যই বলিয়াছেন যে "It is impossible to deny that Con-

* "Used the Sanskrit-derived word by which the tusks were known in Commerce."

querors were often in early times pioneers of civilisation! Commerce following peacefully along their bloody track and compensating for their devastation by the blessings which it diffused." Mr. Crindleও তাঁহার ভূমিকায় ঠিক এই কথাই লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ আলেক-জান্দার-কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম-ভারত বিজয় ও মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া নগরী স্থাপনে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হইয়া উঠিয়াছিল। এই অভিযানের পরোক্ষ ফলেই চন্দ্রগুপ্তের রাজদরবারে গ্রীসদূত মেগাস্থিনিস আগমন করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস ভারতীয় বন্দরাদির কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালীন রাজমন্ত্রী চাণক্য "বাণিজ্য" দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, এবং তখন যে সোন ও গঙ্গা নদীতীরে অনেক বৃহৎ বন্দর ছিল তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। শোন নদীর তীরবর্ত্তী লুপ্তপ্রায় প্রস্তরের বাঁধ এখনও বৃহৎ বন্দরের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এলফিনষ্টোনের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে যখন নিয়ার্কাস সিন্ধুতীরে বাণিজ্যের আভাসমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন গঙ্গাগর্ভে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকার আদৌ অভাব ছিল না।

সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর চাণক্য প্রণীত একখানি হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তক মহিশূরের পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী ইংরাজীতে অনুবাদ করিতেছেন। এই পুস্তকপাঠে তদানীন্তন ভারতের অনেক বিষয় বিশেষভাবে জানা যায়। পুস্তকখানির নাম "অর্থশাস্ত্র"। অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ে দেখা যায় যে চাণক্য বাণিজ্যাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহারা বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী করিবে তাহাদের অনুগ্রহ দেখাইতে হইবে এবং যে সমস্ত নাবিক ও বণিকগণ এই সমস্ত দ্রব্যাদি আনয়ন করিবে তাহাদের কোনরূপ শুল্ক প্রদান করিতে হইবে না। অষ্টাদশ অধ্যায়ে জাহাজের অধ্যক্ষের এবং সার্থবাহের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা ধারণা করিতে পারি যে বাণিজ্যবহুল দেশ না হইলে চাণক্য তদীয় পুস্তকে এই সমস্ত বিধান লিপিবদ্ধ করিতেন না।

খৃষ্টের জন্মের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে আগা থারকাইডিস নামক অন্ত একজন গ্রীসীয় গ্রন্থকার ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী বন্দর সমূহের সহিত মিশর এবং দক্ষিণ-আরবের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষ হইতে ইমেন বন্দরে জাহাজাদি আসিত।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আমরা এই বাণিজ্য-সংক্রান্ত অনেক বিষয় Periplus of the Erythrean sea নামক গ্রন্থে জানিতে পাই। এই গ্রন্থকার লোহিতসাগর ও আরবদেশের দক্ষিণপূর্ব্ব-সমুদ্রতীরের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সিন্ধুতীর হইতে কমরিণ অন্তরীপ দিয়া করমণ্ডল উপকূলের বৃত্তান্ত এবং তৎসহ এই সমস্ত স্থানের বাণিজ্যাদি বিষয়ক প্রত্যেক বিষয়ই বিস্তারিত লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে জাহাজাদি পারস্য উপসাগর হইয়া আরব দিয়া লোহিতসমুদ্রে যাতায়াত

করিত এবং মিশর হইতে গ্রীক বণিকগণ লোহিতসাগর হইয়া মালাবার কূলে আসিত। ভারতীয় উপকূলে ভারতীয়েরা নানারূপ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত—এবং যে সকল জাহাজ সিন্ধুনদ দিয়া দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিতে পারিত তাহাদের দ্রব্যাদি বহন করিবার জন্য নদ মুখে অনেক নৌকা অপেক্ষা করিত। বরোচ আসিবার জন্য এবং পথ দেখাইবার জন্য অনেক মৎস্যতরী পরিচালকের (Pilot) কার্য্য করিত। বরোচের দক্ষিণে অনেক বন্দর ছিল এবং বঙ্গোপসাগর হইয়া অনেক বড় বড় নৌকা সুমাত্রা এবং মালয় দ্বীপে যাতায়াত করিত। এই পুস্তক পাঠে সহজেই ধারণা করা যায় যে নিয়ার্কাস যদিও সিন্ধুনদীতে নৌকা দেখেন নাই কিন্তু সেই সময় গঙ্গাবক্ষে অনেক তরী বাণিজ্য ব্যপদেশে নিযুক্ত থাকিত। দাক্ষিণাত্যেও তখন অনেকে যাতায়াত করিতেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। জাভা-দ্বীপের ইতিহাস পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে কলিঙ্গ হইতে অনেক হিন্দু তথায় যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং এইক্ষণেও তথায় অনেক সুন্দর সুন্দর হিন্দু মন্দির দেখা যায়।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান আমাদের দেশে আইসেন। জাভাদ্বীপের সহিত ভারতবর্ষের যে যথেষ্ট সম্পর্ক ছিল সেকথা তিনিও উল্লেখ করিয়াছেন। পর্য্যটক হুয়েন সাং পাঠেও আমরা জানিতে পারি যে ভারতবাসীরা তখন বাণিজ্যাদি কার্য্যে বিশেষরূপে লিপ্ত ছিলেন।

মিসর এবং সিরিয়া দেশের কথা আমরা পূর্ব্বে কিছু উল্লেখ করিয়াছি। রোমক সম্রাট অরিলিয়াসের সিরিয়া বিজয় হইতেই সিরিয়া ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক একরূপ লোপ পায়। কিন্তু মিসরের সহিত বাণিজ্যবন্ধন ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছিল। বস্তুতঃ, আলেকজান্দারের সময় হইতে মিশরের সহিত যে বাণিজ্য সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল টলেমীদিগের সময়ে তাহা আরও ঘনিষ্টতর হইয়া উঠে। খৃষ্ট জন্মের ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রোমক সম্রাট অগষ্টাস মিসর বিজয় করিলে এই বাণিজ্য কার্য্য রোমকদিগের হস্তেই পতিত হয়। পূর্ব্বাঞ্চলের দ্রব্যাদি রোমকগণ এতদিন অসুবিধার সহিত ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু এইক্ষণে মিশর লাভ করিয়া জাহাজাদি নির্ম্মাণ দ্বারা নির্ব্বিবাদে এইস্থলে তাঁহারা বাণিজ্য চালাইতে লাগিলেন। দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যকারীগণের সাহসও বাড়িতে লাগিল। তাঁহারা পূর্ব্বতন বক্র পথ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশ বাবেলমণ্ডবের কূল হইতে সমুদ্র দিয়া বরাবর মালাবার ও গুজরাটে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। হিপালাস নামক একজন পোতবাহক সাময়িক বায়ুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বতন পথ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রমধ্য দিয়া যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ইহাতে পূর্ব্বের তুলনায় অর্দ্ধেক সময় সংক্ষেপ হইয়া গেল।

এই সময় হইতে পশ্চিম রোমের পতন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সহিত পশ্চিম প্রদেশের অবাধে বাণিজ্য চলিয়াছিল। প্রতি বৎসর একশত বিশখানি জাহাজ মিসরের অন্তর্গত মায়স হর্ম্মস বন্দর হইতে মালাবারকূলে যাতায়াত

এবং বোরেস বন্দরে আসিত এবং তথা হইতে লঙ্কাদ্বীপে যাইত। লঙ্কা তখন একটী প্রধান বন্দর ছিল। তখন এই স্থানে বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা এবং কর্ণাট হইতে ব্যবসায়ীগণ স্ব স্ব প্রদেশান্তর্গত সূক্ষ্ম এবং অন্যান্য মূল্যবান বস্ত্রাদি আনয়ন করিত এবং এইস্থানে যথেষ্ট ক্রয় বিক্রয় চলিত। রোমকগণ রৌপ্য এবং স্বর্ণের বিনিময়ে এতদ্দেশীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া উপরোক্ত একশত বিশখানি জাহাজ পণ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ করিয়া দেশে ফিরিতেন। ডিসেম্বর কি জানুয়ারী মাসে লঙ্কা হইতে এই নৌ-বাহিনী রেশম, মসলিন, মসলা, গন্ধদ্রব্য এবং ভারতীয় মূল্যবান মণিমুক্তা লইয়া মিসরে ফিরিত। এই বাণিজ্যের ফলস্বরূপ দাক্ষিণাত্যে এখনও যথেষ্ট পরিমাণ রোমক-মুদ্রা [illegible] যায়। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন যে, ১৮৫১ সনে মালাবার উপকূ[illegible] [illegible]ানোর নামক স্থানে প্রভূত রোমক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল এবং তদ্দেশীয় প্রচলিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা এখনো মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়।* প্লিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে "Amidst the rude ignorance which characterised the middle ages in Europe, the commerce with India served to soften and instruct those nations who participated in it."

৩২৪ খৃষ্টাব্দে রোমের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে স্থানান্তরিত এবং সঙ্গে সঙ্গে "পশ্চিম রাজত্বে"র পতন আরম্ভ হইলে লোহিতসাগর এবং মিসর পথে ভারত-বাণিজ্যও একরূপ রুদ্ধ হইয়া গেল। আলেকজান্ড্রিয়ার সওদাগরগণের বিলাসিতা-স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়াই ইহার একটা প্রধান কারণ। ঠিক এই সময়েই আরবদিগের মধ্যে বাণিজ্যলিপ্সা বলবৎ হইয়া পড়ে। আরবদেশীয়েরা পূর্ব্ব হইতেই নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। এই সময়ে তাঁহারা হজরৎ মহম্মদ প্রচারিত মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অপরকে এই ধর্ম্মাবলম্বী করিবার জন্য অন্যান্য দেশ-গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহারই ফলে ভারতবর্ষের সহিত তাঁহারা বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন, কেননা ইহাতে ধর্ম্ম অর্থ উভয় দিকেই লাভ। এই জন্য ইহারা বৎসর বৎসর সুসজ্জিত অনেকগুলি জাহাজ কেবলমাত্র ভারতবর্ষের সহিতই বাণিজ্যার্থ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মালাবারের হিন্দুরাজাকে নানা প্রলোভনে বশীভূত করিয়া তাঁহারা উহার উপকূলে বাস করিতে স্থান পাইলেন। জনরব এই যে জামোরিন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। যাহা হউক, আরবদিগের বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইতে লাগিল। মিসরবাসিগণ সুবিধা মত দরে ভারতীয় দ্রব্যাদি পাইতে লাগিলেন বলিয়া নিজেরা বাণিজ্য বিরত হইলেন। পারসিকেরা প্রথমতঃ বাণিজ্যাদি ব্যাপারে বীতরাগ ছিলেন কিন্তু ভারতীয় বণিকদিগের প্রমুখাৎ পারস্যোপসাগর হইতে মালাবার ও লঙ্কায় যাইবার

* মিঃ স্মিথ ঐ মুদ্রাপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া মন্তব্যস্বরূপ লিখিয়াছেন যে "It is certain that the Pandya state during the early centuries of the Christian era shared along with the Chera Kingdom of Malabar a very lucrative trade with the Roman Empire."

প্রশস্ত পথ অবগত হইয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যে ব্রতী হইলেন। বৎসর বৎসর তাঁহারা তরী সজ্জিত করিয়া মালাবারের ভিন্ন ভিন্ন বন্দরে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই বাহিনী নয় কি দশ সপ্তাহে তাহাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া নিজেদের দেশজাত দ্রব্য অথবা অর্থ বিনিময়ে ভারতীয় দ্রব্য সম্ভারসহ দেশে প্রত্যাগমন করিত। নৌকা সকল ইউফ্রেটিস নদী তীর হইতে আসিরিয়া এবং মেসোপটোমিয়ায় যাতায়াত করিত এবং সেই জন্য কনষ্টাণ্টিনোপলের অধিবাসিগণ বিনা পরিশ্রমে ভারতীয় দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপে বিপদসঙ্কুল বাণিজ্য প্রবৃত্তি তাঁহাদের লুপ্ত হইল।

এই সমস্ত কারণে সপ্তম শতাব্দীতে পারসিক এবং আরবিকগণই ভারতীয় বাণিজ্য অনেকটা একচেটিয়া করিয়া তুলিলেন; বিশেষতঃ পারসিকেরা রেশমের ব্যবসায় সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা চীনের রেশম লঙ্কায় খরিদ করিয়া দেশে চালান দিতে লাগিলেন। এই সময় পারসিকদিগের কনষ্টাণ্টিনোপলের সম্রাটদিগের সহিত যুদ্ধ ঘটাতে, তাতারদেশের মধ্য দিয়া গ্রীসে যে চীনের রেশম যাইত তাহাও তাঁহারা আটক রাখিয়া এই সমস্ত দ্রব্যাদির মূল্য ইচ্ছামত ধার্য্য করিতে লাগিলেন। সম্রাট জষ্টিনিয়ান নানাবিধ উপায়ে ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে এক অসম্ভাবিত উপায়ে তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল। দুই জন যতি (monks) প্রচার কার্য্যে চীনে এবং ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়া গুটিপোকা (Silk worm) রক্ষণ এবং কি উপায়ে রেশম প্রস্তুত হয় তাহা জানিতে পারেন। ইঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জষ্টিনিয়ানকে এই বৃত্তান্ত অবগত করিলে পর সম্রাট তাঁহাদিগকে পুনরায় চীনে প্রেরণ করেন। কয়েক বৎসর চীনে থাকিয়া তাঁহারা রেশম প্রস্তুত প্রণালী উত্তমরূপে শিখিয়া, ফিরিবার সময় গুটিপোকার ডিম কতকগুলি একটী শূন্য গর্ভ বেতের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত করিয়া আনেন। এই সমস্ত ডিম তা দিয়া ফুটান' হইল, এবং পোকাগণ তুঁতগাছের কচিপাতা দ্বারা পালিত হইতে লাগিল। ইহাদের পর্য্যবেক্ষণ কল্পে রীতিমত প্রহরী নিযুক্ত হইল এবং আশাজনক সুফল লাভ করায় সম্রাট, পিলোপনিসাস এবং আর কয়েকটী গ্রীসীয় দ্বীপে রেশম প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত করিলেন। এইরূপে গ্রীসে, চীনের রেশমের চালান বন্ধ হওয়াতে পূর্ব্ব দেশের সহিত রোমের বাণিজ্য সম্পর্ক অনেক পরিমাণে কম হইয়া গেল তত্রাপি হিন্দুস্থানের দ্রব্যসম্ভার মিসর এবং তথা হইতে ইতালি এবং গ্রীসে পৌঁছিতে লাগিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দীর যুদ্ধ বিগ্রহে ক্রমে ক্রমে ইহাও লোপ পাইয়া আসিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মহম্মদের প্রচলিত ধর্ম্ম আরববাসীদিগকে এক নূতন জীবনে সঞ্জীবিত করে। মহম্মদের মৃত্যুর পর ওমর অনেক মুসলমান সৈন্যসহ পারস্য বিজয় এবং তথায় ইসলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া খলিপা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই

কারণে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হয়। বাণিজ্যের প্রতি লোকের তাহাতে বিশেষ দৃষ্টি পড়ে ও বণিকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য খলিফাগণ বসোরায় বন্দর স্থাপিত করেন। তাঁহাদের উদ্যোগ এবং যত্নে পারসিক বাণিজ্য ক্রমেই উন্নতির মার্গে উঠিতে থাকে। ভারতবর্ষীয় পণ্য বিক্রয়ে বিশেষ লাভ দেখিয়া পারসিকেরা সিরিয়াতেও এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে খালিফ্ আমরণ মিসর ও সিরিয়া জয় করিলে পর আলেক-জান্দ্রিয়ার বণিকগণ, বাইজানসিয়ান রাজত্বের সহিত বাণিজ্য করিতে নিষিদ্ধ হয় এবং গ্রীক ও মুসলমানদিগের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ হওয়াতে গ্রীস ও ইতালির লোক ভারতীয় পণ্য ব্যবহারে কিছু দিনের জন্য সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়া পড়ে।

যে কয়েকজন ধর্ম্মযাজক চীন হইতে গুটি-পোকা লইয়া কনষ্টান্টিনোপলে গিয়াছিলেন তাঁহারা জানিতেন যে খোরাশান দেশস্থিত অক্সাস নদী তীরে আমল ও আর্কেনজী (বর্ত্তমান আর্কেনজল) বন্দরে চীন ও ভারতীয় সকল প্রকার পণ্যই পাওয়া যায়। কনষ্টান্টি-নোপলের কয়েকজন বণিক তাঁহাদের কর্ম্ম-চারিগণকে এই স্থলে প্রেরণ করেন। তাঁহারা অক্সাস হইয়া কাস্পিয়ান সমুদ্র পথে সাইরাস নদীতীরস্থ বন্দরে পৌঁছিয়া পরে দ্রব্যাদি স্থল-পথে ফ্যাসিসে লইয়া যাইতেন। পুনরায় ফ্যাসিস হইতে নৌকায় করিয়া নদীমুখস্থ নগরে নগরে দ্রব্য বিক্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণসাগর হইয়া তাঁহারা কনষ্টান্টিনোপল পৌঁছিতেন। ইহাতে অসুবিধা ও বিপদ যথেষ্টই ছিল কিন্তু তত্রাপি বণিকগণ লাভের আশায় বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। দুই বৎসর এই ভাবেই ভারতীয় পণ্য ইউরোপে পৌঁছিত।

মুসলমানগণ এই সময়ে প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিতে ছিলেন। আফ্রিকার উত্তরাংশ ও স্পেনের অধিকাংশ তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছিল। মালাবারে তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বঙ্গ, পেগু, শ্যাম এমন কি চীনদেশে পর্য্যন্ত বাণিজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। কাইরো নগরে যখন বন্দর হইল, তখন শক্রতাসূত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী ইতালি ও গ্রীস ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য সকল প্রদেশই এই বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য গ্রীস ও ইতালিবাসীরা ইহা আদৌ পছন্দ করিতেন না। তাঁহার দেশের মধ্য দিয়া যে যৎসামান্য পণ্যদ্রব্য তথায় পৌঁছিত তাহাতে তাঁহাদের লিপ্সা ক্রমেই বলবৎ হইতে লাগিল।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ভিনিস নগরীও বাণিজ্য ব্যাপারে বিশেষরূপে অগ্রসর হইয়াছিল। ৪৫২ খৃষ্টাব্দ হইতেই ভিনিস, আলেকজান্দ্রিয়া ও কনষ্টান্টিনোপলের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক সংস্থাপিত করিয়াছিল এবং ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে ভিনিস, চীন ও ভারত হইতে রেশম এবং ৮০২ খৃষ্টাব্দে মসলা, ঔষধ এবং পশম আমদানী করিতে লাগিল। বলাবাহুল্য এই বাণিজ্যে অত্যন্ত লাভ হইত। ধর্ম্মযুদ্ধের অব-সানের কিছু দিন পরে মুসলমান ও খৃষ্টান-দিগের মধ্যে পুনরায় সদ্ভাব প্রতিষ্টিত হইলে পর, আবার মিশর দিয়া ভারত পণ্যের চলাচল হইল এবং ফ্রান্স, ফ্লান্ডার্স এবং ইংলণ্ডের সক-লের উপরেই আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল।

ভিনিসের পূর্ব্বেই জেনোয়ানগরী এই বাণিজ্যে ব্রতী হইয়াছিল, কিন্তু জেনোয়া যাহাতে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে লিপ্ত না হইতে পারে তজ্জন্য ভিনিস চেষ্টার ক্রটি করে নাই। উভয়ের এইরূপ বিবাদের সময় মেডিসিদের তত্ত্বাবধানে ফ্লরেন্স পূর্ব্বাঞ্চলের সহিত বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করিতে লাগিল। সেলিম ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে সিরিয়া ও মিসর জয় করিলে কৃষ্ণসাগরের পথে জেনোইসদিগের গতায়াত বন্ধ হইয়া যায় এবং ভিনিসিয়ানরাই এই বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাইপ্রাস ভিনিসিয়ানদিগের হস্তে পড়িলে সাইপ্রাসই বাণিজ্য-প্রধান স্থানে পরিণত হয়।

এই সময় তুর্কীদিগেব অত্যাচারে ইউ-রোপের অনেক রাজত্ব জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে এবং স্থলপথে ভারতবর্ষের বাণিজ্যাদি অসুবিধাজনক হওয়াতে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষে পৌছান যায় কিনা ইহাই সকলের চিন্তার বিষয় দাঁড়াইল। পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পর্ত্তুগীজগণ এই পথ আবিষ্কার করিয়া বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিলেন।

এইক্ষণে পণ্যাদি বিক্রয়ার্থ স্থলপথে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া বাকট্রিয়ায় নীত হইত। বক্ষে কিছু দিন ক্রয় বিক্রয় করিয়া পরে যাত্রীরা ব্যাবিলোন পৌছিতেন। এই স্থলে ভারতীয় পণ্য-দ্রব্যের যথেষ্ট আদর ছিল। কাস্পিয়ান সাগরের তীর হইতে জাহাজ যোগে এবং পরে স্থলপথে কৃষ্ণসাগর হইয়া পণ্যাদি ভূমধ্য-সাগরের বন্দর সমূহে প্রেরিত হইত। বাবিলন হইতে পালমারায়, পরে লেভান্ত পৌছিয়া পণ্যদ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় চলিত। সাধারণতঃ, এই সমুদায় স্থলেই আরব ও ভারতীয় পণ্যসমূহের পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় পণ্য বিনিময় করা হইত। স্থলপথে দ্রব্যাদি উষ্ট্র বাহিত হইত। এই পথ অত্যন্ত কষ্টগম্য ও বহুব্যয়সাধ্য ছিল, সুতরাং জল পথের আবিষ্কার হইলে আর এ পথে সাধারণতঃ কেহ গমনাগমন করিত না। নাবিকেরা ভারত সমুদ্র দিয়া গ্রীষ্মকালে পশ্চিমাঞ্চলে গমন ও শীতকালে প্রত্যাগমন করিতেন।

ফিনিসিয়ানরা যখন এই লাভজনক বাণিজ্যে ব্রতী ছিলেন তখন লোহিতসাগরের নিকটবর্ত্তী আরবের উপকূলে কয়েকটী বন্দর হস্তগত হইবার পর তথা হইতে স্থলপথে তাঁহারা পণ্যদ্রব্য টায়ার নগরীতে প্রেরণ করিতেন। ইহাতেও কম অসুবিধা হইত না। পরে, ভূমধ্য সাগরের তীরবর্ত্তী রাইনকুলরার বন্দর তাঁহাদের হস্তগত হইলে তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে লোহিতসাগরের উপকূল, তথা হইতে স্থলপথে পুনরায় কিছুদূর, পরে আবার জাহাজে করিয়া টায়ারে পৌছিতেন। ইহাতে দ্রব্যাদি দুইবার করিয়া জাহাজে উঠাইতে হইলেও স্থলপথে যাতায়াত অপেক্ষা ইহাতে অনেক সুবিধা হইত। খৃষ্টের জন্মের ৩৩২ বৎসর পূর্ব্বে টায়ার ধ্বংস হইলে এবং আলেকজান্দার কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে এই নূতন পথে অষ্টাদশশত বৎসর পণ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়া হইত। আলেক-জান্দার স্বয়ং এই পথ অনুমোদন করেন কিন্তু তিনি তাঁহার সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত

করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই টলেমী মিশরের অধিপতি হইয়া অনেক অর্থব্যয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি আলোকগৃহ নির্ম্মাণ করেন। তদীয় পুত্র সুয়েজের মধ্য দিয়া খাল কাটিবার প্রয়াসে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া লোহিতসাগরের পশ্চিম কূলে বেরিনিস নামক একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষ হইতে কপটসে ও তথা হইতে এই নগরীতে দ্রব্যাদি আনিয়া পরে নীলনদী ও অন্য একটি খালদ্বারা উহা আলেকজান্দ্রিয়ায় নীত হইত। *

যতদিন মিসর স্বাধীন ছিল ততদিন এই পথেই ভারতবর্ষের মূল্যবান দ্রব্যাদি তথায় পৌঁছিত। বেরিনিস হইতে ইউরোপীয় ও আফ্রিকাজাত দ্রব্য আরব ও পারস্য উপসাগরের কূলে এবং সে স্থান হইতে সিন্ধুতীরে পৌঁছিত। কেবল সিন্ধুতীরেই এই কার্য্য সীমাবদ্ধ থাকিত না; সম্ভবতঃ সমুদ্রতীরবর্ত্তী সকল বন্দরেই তাহারা যাতায়াত করিত। এই লাভজনক ব্যবসায় এক-চেটিয়া রাখিবার জন্য মিসরের রাজা অনেক জাহাজ প্রস্তুত রাখিতেন এবং রণতরীর সাহায্যে জলদস্যু দমন করিয়া বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেন।

রোমকগণকর্ত্তৃক মিসর জয় হইলেও এই পথেই বাণিজ্য চলিত। আমরা পূর্ব্বেই হিপালাসের নামোল্লেখ করিয়াছি। প্লিনির Natural History পাঠে আমরা এ বিষয়ে অনেক বৃত্তান্ত জানিতে পারি। প্লিনি লিখিয়াছেন যে ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্য নীলনদ এবং একটী ক্ষুদ্র খাল দিয়া কপটসে লইয়া যাওয়া হইত। আলেকজান্দ্রিয়া হইতে কপটস ৩০৩ মাইল। তথা হইতে স্থলপথে লোহিতসাগরের উপকূলস্থ বেরিনিস ২৫৮ মাইল। জাহাজ গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগে বেরিনিস হইতে ছাড়িয়া বাবেলমণ্ডব প্রণালীর নিকট কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া পরে মালাবার উপকূলস্থ মসিরিস বন্দরে যাত্রা করিত। বন্দরে পৌঁছিতে মোট ৯৪ দিন লাগিত। ইহার মধ্যে কপটস পর্য্যন্ত আসিতে দ্বাদশ দিবস, বেরিনিস পৌঁছিতেও তদ্রূপ, লোহিতসাগর আসিতে ত্রিশদিন এবং ভারতমহাসাগরে পৌঁছিতে ৪০ দিন লাগিত। প্লিনি পাঠে আমরা ইহাও অবগত হই যে, যে সমস্ত বণিকগণ বঙ্গোপসাগরে, বা মালকায় বাণিজ্য করিতে যাইত তাহারা গোদাবরীনদীর কোন বন্দর হইতে যাত্রা করিত। যে সকল জাহাজ এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত তাহা আকারে বৃহৎ ছিল। গ্রীস ও আরবদেশীয় বণিকগণ ইহাদের colandrophonta এবং হিন্দিতে (coilan-di-pota) কয়লান্দিপোত নাম দিয়াছিল। নাবিকগণ গোদাবরী দিয়া কলিঙ্গ অন্তরীপ পরে সেস্থান হইতে দক্ষগুল হইয়া ত্রিবেণী দিয়া পাটনা পৌঁছিতেন।

পেরিপ্লাস পাঠে জানা যায় যে, সে সময়ে মসলিন এবং নানাপ্রকার ছিটের কাপড়, রেশমী সূত্র, বস্ত্র, নীল এবং অন্যান্যপ্রকার

* "Ptolemy thought it necessary to found a city on the western shore of the Red Sea, from whence the ships were to sail. He accordingly built one almost on the frontiers of Ethiopia and he gave it the name of his mother Berenice. The treasures of Arabia, India, Persia, and Ethiopia were landed and from thence they were carried on camels to Coptus where they were again shipped and brought down the Nile to Alexandia which transmitted them to all the west in exchange for merchandise afterwards exported to the east" Ancient History of Egypt.

রং, দারুচিনি, এবং অন্যান্য মসলা, চিনি, হীরকাদি নানাপ্রকার প্রস্তরাদি ও মুক্তা, ইস্পাত, ঔষধ, পণ্যদ্রব্য এবং কখন কখন ক্রীতদাসদাসীও ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হইত। ১৮৭৯ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সোসাইটী অব আর্টস সংবাদপত্রে প্রথিতনামা সার জন বার্ডউড লিখিয়াছেন যে—

The History of Modern Europe and emphatically of England has been the quest of the aromatic gum resins and balsams and condiments and spices of India and the Indian Arcipelago." Abbe Renaudt নামক সুপরিচিত লেখক ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Anciennes Relations des Indes et de la chino নামক গ্রন্থে নবম ও দশম শতাব্দীর দুই জন আরব বণিকের ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতীয় চা, মাটীর বাসন (Porcelain) আরক ও চাউলের উল্লেখ করিয়াছেন।

সিসিলির ইদ্রিসি পোর্সলেন, করোমণ্ডল উপকূলস্থ সূক্ষ্ম সূতার বস্ত্র, মালাবারের লঙ্কা ও এলাচি, সুমাত্রার কর্পূর, এবং হায়দ্রাবাদের নেবুর উল্লেখ করিয়াছেন।

টুডেলা নিবাসী বেনজামিন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ভ্রমণ ব্যপদেশে ভারতবর্ষে আসিয়া এখানকার রেশম, সূতার কাপড়, শনের সূত্র, রাই, নানাপ্রকার ডাল এবং মসলা রপ্তানীর কথা বলিয়াছেন। টানজিয়ার্সের ইবনবটুটা, ভারতবর্ষীয় মুসব্বর, কর্পূর, চন্দনকাষ্ঠ রপ্তানির কথা ও ভিনিসদেশীয় মারিনো সানুটো লবঙ্গ, জায়ফল, জৈত্রী মণিমুক্তা ও মসলা, জেনোয়া নিবাসী হিয়েরোণী মো ভি সাণ্টো মুক্তা, দারুচিনি, মূল্যবান প্রস্তরাদি এবং চন্দনকাষ্ঠের রপ্তানীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

বোলন নগরবাসী Ludovico de Varthema নামক অপর একজন ভ্রমণকারী ১৫০০ খৃষ্টাব্দে এতদ্দেশে আসিয়া গোলকন্দার কথা লিখিয়াছেন,—"অন্যান্য দেশের ৩০০ জাহাজ ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থে আইসে। পারস্য, তাতার, তুর্কিস্থান, সিরিয়া, বারবারি প্রভৃতি দেশে ভারতজাত রেশম ও সূতার বস্ত্র রপ্তানি হয়।"

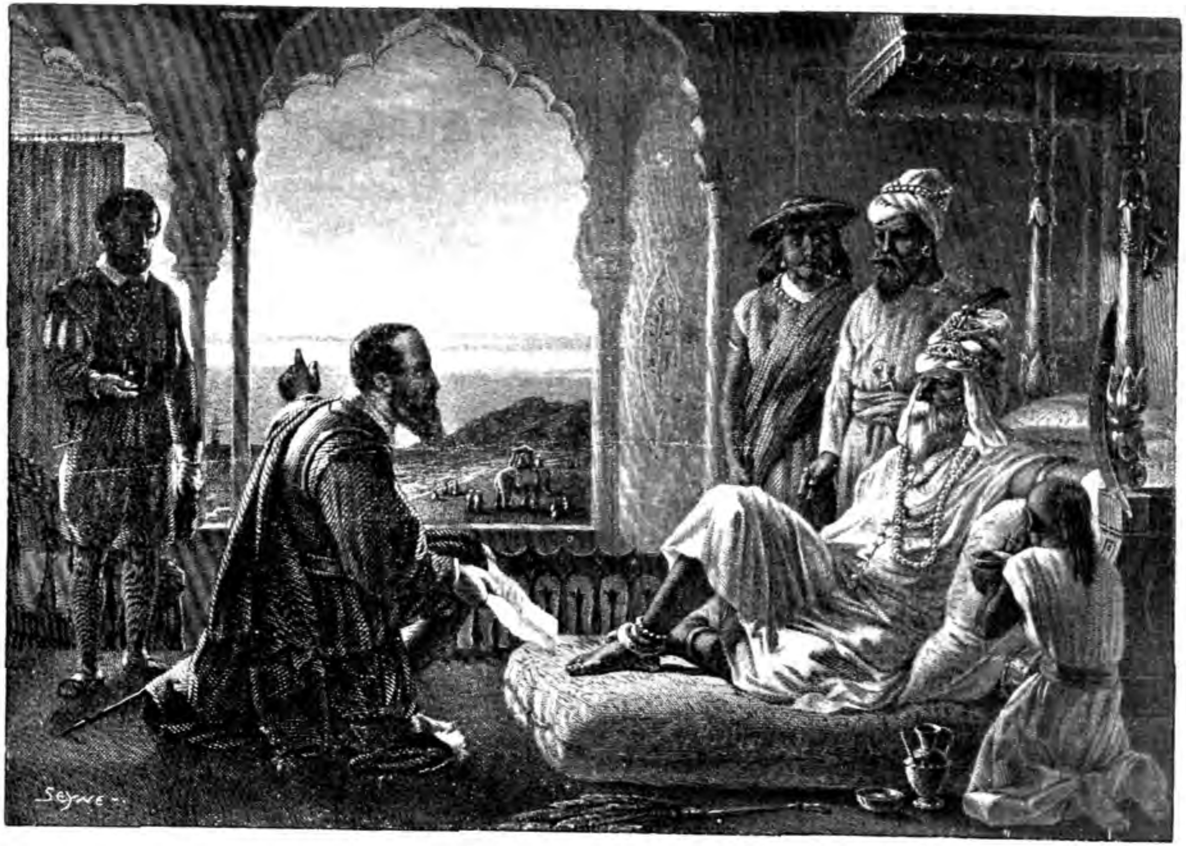
"এখানে (কালিকটে) মক্কা, বঙ্গ, টেনাসরিম, পিগু, করোমণ্ডল, লঙ্কা, পারস্য, আরব, সিরিয়া, তুর্কীস্থান, প্রভৃতি দেশ হইতে বণিকেরা বাণিজ্যার্থ আইসে।"

কালিকটের জামোরিন ভাস্কো ডিগামার মারফৎ পর্ত্তুগালের রাজাকে যে পত্র লিখেন তাহা হইতেও আমরা জানিতে পারি যে দারুচিনি, লঙ্কা, এবং মূল্যবান প্রস্তরাদি ভারতবাসীরা অন্যান্য দেশের স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির সহিত বিনিময় করিতেন।

"Vasco de Gama, a nobleman of your household, has visited my kingdom and has given me great pleasure. In my kingdom there is abundance of cinammon, cloaves, ginger, pepper and precious stones in great quantities. What I ask from thy country is gold, silver coral and scarlet."*

অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

* ভাস্কো ডি গামা ও কালিকটের জামোরিনের চিত্র খানি বিলাতের ব্লাকি এণ্ড সন্সের কপি রাইট এই প্রবন্ধে ইহা প্রকাশের সম্মতি পাইয়া আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ। লেখক



ভাস্কো-ডিগামা ও কালিকটের জামোরিন

Reproduced by kind permission of
Messrs. Blackie & Son, London.

জাপানে ভিক্ষুক।

জাপানে ভিক্ষুক নাই এরূপ বলিতে পারি না। কিন্তু কোন বৈদেশিক ব্যক্তি যদি তোকিও সহরে গিয়া একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া দুই চারি বৎসর তথায় অবস্থান করতঃ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তবে আমার মনে হয় তিনি বলিবেন জাপানে ভিক্ষুক নাই। বাস্তবিক সেখানে ভিক্ষুক এত অল্প যে একরূপ নাই বলিলেই হয়। স্থল বিশেষে কোন কোন জায়গায় দুই একটী দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু তাহাও গবর্ণমেণ্টের অপরিজ্ঞাত। আমি জাপানে পৌছিবার সপ্তাহ অতীত না হইতেই তোকিও সহরে একদিন ট্রামে উঠিতে রাস্তার উপর একটী পাঁচ পয়সার নিকেল মুদ্রা এবং এক পয়সা মূল্যের একটী তাম্রমুদ্রা দেখিতে পাইলাম। একটু পূর্ব্বে বৃষ্টিপাত হইয়াছিল; মুদ্রা দুটী কর্দ্দমে প্রায় চাপা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। কোন ভিক্ষুককে দিবার উদ্দেশ্যে আমি মুদ্রা দুটী কুড়াইয়া লইলাম। এক মাসের মধ্যে তোকিওর ন্যায় সুবিস্তৃত সহরেও কোন ভিক্ষুকের সাক্ষাৎ পাইলাম না। অথচ কোন দরিদ্র ব্যক্তিকেও দিতে সাহসী হইলাম না। যেহেতু যে ভিক্ষুক নয় সে অপরের মুদ্রা লইবে কেন! অন্ধগুলিও রাস্তায় বাঁশী বাজাইয়া ফিরিতেছে। যদি কাহারও শরীরে তেল কিম্বা কোনরূপ ঔষধ মালিশ করিতে হয়, গা, হাত পা টিপিয়া দিতে হয়, উহারা সেই কাজ করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে; অনর্থক পরদ্বারস্থ হয় না। আমি কয়েকদিবস পরে হঠাৎ একদিন একজন আতুরকে দেখিতে পাইয়া পয়সা কয়েকটী প্রদান করিলাম।

মফস্বল হইতে কোন ভিক্ষুকবেশধারীকে সহরের দিকে আসিতে দেখিলেই পুলীশ উহাকে ঢুকিতে দেয় না। গ্রামেও দেখিয়াছি —ভিক্ষুক নাই। একদিন একটি নাপিত আমার চুল কাটিবার সময় বলিতেছিল— "মহাশয় আমার মনে হয় ভারত প্রাচীনকাল হইতে সভ্য, কাজেই সেখানে ভিক্ষুক নাই; যেহেতু আমাদের দেশে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুকশ্রেণীর তিরোধান দেখিতে পাইতেছি।" আমি অন্য কথা সে কথায় চাপা দিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু ধূর্ত্ত নাপিত ছাড়িবে কেন? অগত্যা বলিলাম "দেশ হাজার সভ্য হইলেও কিছু না কিছু ভিক্ষুক সব দেশেই আছে।" উহাকে একভাবে বুঝাইলাম সত্য, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের ভিক্ষা-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, বৈরাগিণী, ফকির, ফকিরণী, কন্যাদায়গ্রস্ত ভিক্ষুক, মাতৃপিতৃদায়গ্রস্ত ভিক্ষুক, বার্ষিকীপ্রাপ্ত ভিক্ষুক, জঠোরজ্বালাগ্রস্ত ভিক্ষুক প্রভৃতি কত রকম ভিক্ষুকের দৃশ্য মনে পড়িল। দুর্ভিক্ষ এবং ব্যাধিতে যে দেশের সর্ব্বসাধারণকে ভিক্ষুকশ্রেণীতে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছে, দুঃখদরিদ্রতা এবং হাহাকারপূর্ণ সেই জন্মভূমির করুণ দৃশ্যের কথাও মনে পড়িল। আর কলিকাতার দুটি বিশেষ ভিক্ষুকের কথাও মনে পড়িল। উহার একটী শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্লাট্‌ফরমের বাহিরে গভীর রাত্রিতে "আমি ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যা রাত্রিতে আমার জননীর কাল হইয়াছে,

সামান্য অর্থাভাবে সৎকার করিতে পারিতেছি না, রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে নিমতলার ঘাটে শব সৎকার না করিলে আমার চৌদ্দপুরুষ নরকগামী হইবে, আপনারা এ ব্রাহ্মণের উদ্ধার না করিলে আর কাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইব" ইত্যাদি বাক্যে ভিক্ষাবৃত্তি চালাইত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে শেষ রাত্রির গাড়ীতে যাঁহারা একাধিকবার যাতায়াত করিয়াছেন তাঁহারাই ইহা বেশ জানেন।

দ্বিতীয় ভিক্ষুক লালবাজারের পুলিশ আদালতের মোড়ে। ইনি পরিষ্কার ভদ্র-বেশধারী, ইহার অভাব অন্য রকম, ইনি বলিতেন "মহাশয় আমি ব্রাহ্মণ, ভদ্রলোক, আমি মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, ভিড়ের ভিতর আমার মণি-ব্যাগটি অপহৃত হইয়াছে, এখন অর্থাভাবে গ্রামে ফিরিতে পারিতেছি না, শ্যামবাজারে আমার এক আত্মীয় আছেন, তাঁহার নিকট হইতে রেলভাড়া লইয়া দেশে ফিরিবার মনন করিয়াছি, এখন কয়েকটা পয়সা পাইলে ট্রামে শ্যামবাজার আত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, তাই আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি।" ঠিক সেই ব্যক্তিকে আমি গড়ের মাঠের পথে তিন দিন ঐ ভাবে ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছি। সবদিনই ঠিক এক রকম বক্তৃতা। প্রথম দিবস আমি কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিলাম। তারপর দুই দিন তিরস্কার করিয়াই তাড়াইয়াছি।

ভিক্ষায় মানের হ্রাস হয়। বাস্তবিক জাপানীরা ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকে। একদিন এক জাপানী কোন ইউরোপীয় প্রবাসীর বাড়ীতে ভিক্ষার্থী হইয়া গমন করে। তথায় গৃহস্বামীকে উপস্থিত না পাইয়া তাঁহার টেবিলের উপর একখানা কাগজে আপন অবস্থা বিশদভাবে বিবৃত করিয়া চলিয়া আইসে। বারান্তরে গিয়া প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ করিবে বলিয়া গৃহস্বামীকে উহা তাঁহার চাকরের নিকট রাখিতে উক্ত আবেদন পত্রেই অনুরোধ করে। বৈদেশিক গৃহস্বামী গৃহে ফিরিয়াই টেবিলের উপর ভাঙ্গা ইংরাজীতে লিখিত আবেদন-খানি দেখিতে পান। তিনি জাপান টাইম্‌স্ নামক পত্রিকায় বিষয়টী সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করেন। পরদিন তোকিওর প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে উহার প্রতিবাদ বাহির হয়। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠেন যদি ঘটনা সত্য হয় তবে ঐ প্রার্থীকে আমরা জাপান জাতির লোক বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; পবিত্র জাপানীরক্ত উহার ধমনীতে প্রবাহিত হয় না। এমন নীচমনা ব্যক্তি জাপানের ত্যজ্য সন্তান।

গত যুদ্ধের পর জাপানের উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশের ছেন্‌দাই, মোরিওকা এবং আওমোরি নামক তিনটি জেলায় দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। খৃষ্টান পাদরিগণ এবং জাপান গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত ব্যক্তিগণ লোকের দুরবস্থার কথা শুনিয়া তদ্দিকে বাহির হন। ছেন্‌দাই নামক জেলাতেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সব চেয়ে বেশী ছিল। কয়েকজন ইউ-রোপীয়ান এবং আমেরিকান সাহেব সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া গ্রামের কোন্ ব্যক্তির খাদ্যাভাব, তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভাব সম্পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও রিপোর্ট দিতে লাগিলেন—আমার বাড়ীতে কোন অভাবই নাই, তা ছাড়া গ্রামস্থ প্রত্যেকেরই যথেষ্ট অভাব, প্রত্যেককেই একরূপ অনশনে থাকিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় সকলে এত অভাবে থাকিয়াও নিজ নিজ অভাব গোপন করিতে প্রয়াস পাইলেন। সাহেবগুলি জাপানীদের এই স্বভাব দেখিয়া মুগ্ধ এবং অবাক হইলেন। পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন এরূপ আত্মসম্মান জ্ঞান আমাদের দেশে কয়জনের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়? আমাদের দেশে সাহায্য ভাণ্ডার খুলিলে যাহার অভাব আদৌ নাই বিস্তর এমন লোককেও সাহায্যপ্রার্থী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দেওয়ার জন্য আমরা জাপানীদিগকে নিষ্ঠুর বলিব কি? যাঁহারা জাপান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা একবাক্যে আমাদিগকেই নিষ্ঠুর বলিবেন, যেহেতু আমরা কত শত শত সুস্থকায় সবল যুবককেও ভিক্ষা-বৃত্তিতে প্রশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে একেবারে পশুর অধম করিয়া তুলিতেছি। তাহারা মানব সমাজের বহির্ভূত হইয়া বংশপরম্পরাক্রমে ভিক্ষাবৃত্তিই জীবনের প্রধান অবলম্বন মনে করিতেছে। তাহারা বলিয়া থাকে চাকুরী করিলে তাহাদের জাত এবং ইজ্জতের হানি হয়।

জাপানে নিঃসহায়, দীন দরিদ্র, কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি অপরের গলগ্রহ হইয়া জীবন ধারণ করিতে অপমান বোধ করে। আমরা আত্মীয় স্বজনের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা বোধ করি না। আর জাপানীরা এক পরিবার ভুক্ত থাকিয়া পরিবারের উপর নির্ভর করিতেও লজ্জা বোধ করে। সক্ষম অবস্থাতে স্বোপার্জ্জিত অর্থে পরিপুষ্ট না হইলে অনেকাংশে পশুপক্ষীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করা হয় না কি?

জাপানের উত্তরে হোকাইদো দ্বীপ। দ্বীপটি অনেকটা সাগালিয়েন দ্বীপের নিকট। তথাকার লোকের ভিতর জাপানের অন্যান্য প্রদেশবাসীর অপেক্ষা শিক্ষালোক অল্পতর বিস্তৃত হইয়াছে। সেই হোকাইদো দ্বীপের একটী ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধা আমাদের বাড়ীতে চাকরাণীর কায করিত একদিন তাহাকে গুরুতর পরিশ্রমে ক্লান্তা দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ওবাছান্ (মিসেস্ বৃদ্ধা) তোমার বয়স এখন ঢের বেশী হইয়াছে—পরিশ্রম করিবার শক্তি কমিয়া আসিয়াছে, তোমার আর কে আছে, বসিয়া খাইবার কি কোন উপায় নাই?" উত্তরে বৃদ্ধা বলিল "আমার নিজের খাইবার উপায় আছে; আমার ২০।২১ বৎসরের একটী মেয়ে তোকিও মেয়েদের স্কুলে পড়িতেছে, আর এক বৎসরেই ঐ স্কুলের শিক্ষা সমাপন করিয়া বাহির হইতে পারে। আমার কর্ত্তব্য মেয়েটীকে লেখাপড়া শিখাইয়া সৎপাত্রে বিবাহ দেওয়া। আমি এখনও এত দুর্ব্বল নহি যে কোন ভদ্রলোকের বাড়ী সাধারণ রকম কাযকর্ম্ম করিয়া মেয়েটীর পড়ার খরচের সাহায্য না করিতে পারি।

একটী অনার্য্য প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর বৃদ্ধার কথা শুনিয়া অবাক হইলাম। মনে মনে ভারতের শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকের সহিত এই বৃদ্ধার তুলনা করিলাম। শিক্ষার সহিতই আত্মসম্মান জ্ঞান আসিয়া পড়ে। এই সকল কারণেই জাপান এত উন্নত এবং বৈদেশিক

জাতির নিকট এতদূর সম্মানিত। এই জন্যই আজ বঙ্গদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে অনেকটা উন্নত। আজ বাঙ্গালীর ভিতর—আত্মসম্মানের জ্ঞান অনেকটা আসিয়া পড়িয়াছে। যে রাজপুত জাতি আত্মসম্মান রক্ষার জন্য জীবনকে তৃণবৎ মনে করিত আজ তাহারাও শিক্ষাভাবে বাঙ্গালীদের চেয়ে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। এই রাজপুতানার সাধারণ শ্রেণীর লোকের আচার ব্যবহার দেখিলে মনে হয় না যে ইহাদের ভিতর কখনও আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল। রাস্তার বাহির হইলে ভিক্ষুকের অবধি নাই। কুলি-মজুর এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ ভদ্রবেশে কাহাকে দেখিলেই অমনি রাস্তার উপর তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনায় দ্বিধা বোধ করে না।

যদি জাপানে ভিক্ষা প্রদানের বিধিব্যবস্থা না থাকে তবে হস্তপদবিহীন, চলচ্ছক্তি রহিত অন্ধ, আতুর প্রভৃতির উপায় কি? এ প্রশ্ন অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সাধারণে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের জন্য স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আশ্রম তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে, সেই সকল আশ্রমে অনেক রকম ছোট খাট জিনিস প্রস্তুতের কারখানাও আছে। ঐ সকল লোককে যথাসম্ভব কাযে নিয়োজিত রাখা হইয়াছে। যাহার হাত আছে পা নাই তাহাকে এমন কাযে নিয়োগ করা হয় যাহাতে শুধু হাতের সাহায্যই আবশ্যক করে, আবার এমন অনেক কায আছে যাহাতে হাতের দরকার হয় না শুধু পদ দ্বারাই সম্পন্ন হয়; তেমন কাযে হস্তপদবিহীন লোককে নিয়োগ করা হয়। হস্তপদবিহীন ব্যক্তিকেও উহারা কাযে লাগাইয়া থাকে। ঘানিতে ঘোড়া জুড়িয়া দিয়াছে, পাথর কিম্বা অন্য কোন ভারী জিনিস দিয়া চাপা দেওয়ার পরিবর্ত্তে তৎস্থলে হস্তপদবিহীন ব্যক্তিকে রাখা হয়, ঐ ব্যক্তির চাপে ভারী পাথরের কায হয় এবং ঐ ব্যক্তি মুখে শব্দ করিয়া ঘোড়াকে তাড়া দিয়া থাকে। অন্ধের কায পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কচিৎ দুই একটী আতুরকে রাস্তায় ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছি।

মফস্বলবাসী গীতবাদ্যে নিপুণা এক ধরণের ইতরশ্রেণীর মেয়েরা একরূপ বাদ্য যন্ত্রের সাহায্যে দ্বারে দ্বারে গান গাহিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে, কিন্তু উহাদিগকেও সাধারণে সাহায্য করে না। যাহারা ঐ গীতবাদ্য পছন্দ করে তাহারাই কেবল উহাদিগকে দুই একটী পয়সা দিয়া থাকে।

প্রাচীনকাল হইতে জাপানে পুরোহিত এবং ভিক্ষু সম্প্রদায় ভিক্ষালব্ধ অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু অধুনা তাহাও লোপ পাইতে বসিয়াছে। পুরোহিত এবং ধর্ম্মযাজক এখন অন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে লজ্জাবোধ করেন না। জাপানীরা ভিক্ষাবৃত্তিকেই সব চেয়ে ঘৃণিত বলিয়া মনে করে যেহেতু ভিক্ষুকের দ্বারা জগতে লাভজনক কোন কাযই হয় না বরং তাহার জন্য পৃথিবীর সঞ্চিত আয়ের ধ্বংস হয় মাত্র।

জাপানে মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময় লণ্ঠন হস্তে দুই দুই জন পুরোহিত শ্রেণীর লোককে এক সঙ্গে দ্বারে দ্বারে ধর্ম্মকাহিনী গাহিয়া দুই এক পয়সা উপার্জ্জন করিতে দেখিয়াছি। উহারা অনেকটা আমাদের দেশীয় মুস্কিল আসানের ফকিরের মত।

শ্রীযদুনাথ সরকার।



যমুনা পুলিনে

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

'রেণু' রচয়িত্রী।

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

বাঙলা মাসিক পত্রিকাগুলির একটি কোণ আলো করিয়া, বহুদিন হইতে রেণু-রচয়িত্রীর স্বাক্ষরে ছোট ছোট কবিতা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। বোধ হয়, এতদিনে তাঁহার নাম ও রচনা বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকা-গণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছে। সাময়িক সাহিত্যে কবিতা, বিশেষতঃ ছোট কবিতা এরূপ সমাদৃত হওয়া অল্প কবিরই ভাগ্যে ঘটে। কবিতাগুলির নিম্নে নিম্নে তাঁহার নামের স্বাক্ষর না থাকিলেও, লেখিকাকে চিনিতে কষ্ট হয় না।

'রেণু'র কবিতাগুলির বিশেষত্ব, তাহার ক্ষুদ্রত্ব! কবিতাগুলি, সুন্দরীর অশ্রুবিন্দুর মত করুণ; বালকের হাসিবিম্বের মত মধুর; বিধবার আশীর্ব্বাদ-ভরা দৃষ্টির মত, স্নিগ্ধ। ছোট হইলেও, তাই সেগুলি সহজে হৃদয় স্পর্শ করিয়া যায়। সেই সহজ সুরের ঝঙ্কারের মত, ভোরের অসমাপ্ত স্বপ্নের মত, কবিতাগুলির মধুর রেশ হৃদয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে। যেন একটু অসমাপ্তি যেন-একটু সুদূর অতৃপ্তি, যেন-একটু নিষ্ফল ব্যাকুলতা কবিতাগুলির "জান"!

'রেণু' পরস্পর বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-সমষ্টি হইলেও, সুন্দর মালিকার মত, একটী সূক্ষ্ম সূত্রের দ্বারা সুনিপুন-ভাবে গ্রথিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রচ্ছন্ন একটি কথা হাজার সুরের বিচিত্র ছন্দ-লীলার অন্তরাল দিয়া হিল্লোলিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম শরতে জল-স্থল আকাশে, লতাপাতায়, মুকুলে পুষ্পপল্লবে, নবোদ্ভিন্ন শস্যশীর্ষে, বর্ষা-ধৌত দূর্ব্বাক্ষেত্রে, যেমন একই বৃহৎ আনন্দের সুর হাজার রাগিণীতে ধ্বনিত হইতে থাকে,—গীত গন্ধ বর্ণ, শোভায় যেমন এক-ই পুলক তরঙ্গ নানান্ ছন্দে ছড়াইয়া পড়ে, রেণুর ছোট ছোট কবিতাগুলির মধ্যে তেমনি যেন একটী কথারই সুর বাজিয়া উঠিয়াছে! বিশেষত্ব ও নৈপুণ্য এই,—কোথাও লঘুচপলতা নাই —কোথাও সঙ্কোচ কোথাও স্খলন বা অসংযম নাই।

পুতসংযম এবং তপস্যার ভাব সমস্ত গান গুলিতে কেমন-একটী মহিমা, অনাড়ম্বর ঐশ্বর্য্য, কোমল মাধুর্য্য আনিয়া দিয়াছে—অথচ লেখিকার কল্পনা দূরতম অন্তরীক্ষের প্রতি একেবারে উধাও হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। কবির কল্পনা শেলী অপেক্ষা ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের মত, জগতে সম্বন্ধ বর্জ্জন করে নাই। ধুলা-মাটির যা-কিছু, দুদিনের যা-কিছু, সাধারণ ও প্রতিদিনের যা-কিছু কবি সে গুলিকে এমনি একটি দিব্য আনন্দের বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন যে, সেগুলির মধ্যে, স্বর্গের আভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে! হাসি, অশ্রু, ব্যাকুলতা, বিরহ-ব্যথা, প্রেমের বেদন,—অতি পুরাতন এই কটি ইষ্টক প্রস্তরে, কবি চির-সুন্দর মন্দির গাঁথিয়া তাঁহার দেবতাকে তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া পাশের যাত্রিগণ তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত নিভৃত হৃদয়-দেবতার বন্দনা গানের অস্পষ্ট-

মধুর ঝঙ্কার শ্রবণে পুলকিত হইয়া যেন তাঁহারি কণ্ঠের সহিত সুর মিলাইয়া গাহিতে ব্যাকুল হইয়া উঠে!

'রেণু' একখানি—In Memoriam বলিলে কবির প্রতি অবিচার করা হয় কিনা জানিনা, তবে নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে নিশ্চয়ই দুখানির মধ্যে একটি সুমধুর সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে! দুখানিরই উদ্দেশ্য এক-ই। যে ব্যথার অসহ্য তীব্রতায় হৃদয়-বীণার তন্ত্রীগুলি প্রায় ছিঁড়িয়া যায়, যে ব্যথায় পরিদৃশ্যমান বাহিরের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, —অথচ রুদ্ধ অন্তরের দ্বার আপনা আপনি খুলিয়া যায়, রেণু সেই ব্যথারই গান। যে ব্যথায় দৃশ্য ও অদৃশ্য এক হইয়া যায়, স্বর্গকে মর্ত্তের কাছাকাছি আনিয়া দেয়, 'রেণু' সেই দিব্য ব্যথার, অমর শোকের গান!

হইতে পারে In Memoriam বিদেশী মহাকবির স্বর্গীয় বন্ধুর সূক্ষ্ম কারু-খচিত সমাধি স্তম্ভ, আর 'রেণু' একটি দুর্ব্বলা বাঙ্গালী নারীর কম্পিত হস্ত-রচিত ক্ষুদ্র দেবমন্দির! বিলাপ-দুখানিরই প্রাণ; এ বিলাপ পার্থিব বিচ্ছেদ-ব্যথার নামান্তর মাত্র নহে; এ বিলাপ অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে দেবতার প্রতি আত্মসমর্পণ হেতু ব্যাকুলতা; বিপুল নিখিলের তোরণদ্বার রুদ্ধ করিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়-প্রকোষ্ঠে দেবতার জন্য ভক্তের বিরামহীন বন্দনা।

মোটের উপর অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়, রেণু বঙ্গভাষায় একখানি উচ্চশ্রেণীর কবিতাগ্রন্থ। বিচ্ছিন্নভাবে না দেখিয়া সমগ্রভাবে পাঠ করিলে গ্রন্থখানির মাধুর্য্য ও মূল্য সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

লেখিকার স্বপ্নজীবনী নিম্নে প্রদত্ত হইল। লেখিকা মাতৃকুল হইতে যে কবিত্ব শক্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'বনলতা' রচয়িত্রী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী লেখিকার জননী। বাল্যকালে কৃষ্ণনগর বালিকা বিদ্যালয় হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া বৃত্তিলাভ করেন এবং দশ বৎসর বয়সে ১৮৮২ সালে বেথুন স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ১৮৮৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৯০ সালে এফ,এ ও ১৮৯২ সালে বি, এ, পাশ করিয়া, বিশেষ পারদর্শিতার জন্য রৌপ্যপদক, পুরস্কার পান।

ঐ বৎসরেই তিনি সংসারে প্রবেশ করেন, ১৮৯২ সালে আষাঢ় মাসে স্বর্গীয় তারা দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। লেখিকার স্বল্পস্থায়ী দাম্পত্য জীবন যে অতি সুখময় হইয়াছিল তাহা রেণুর পাঠক বা পাঠিকাকে না বলিলেও চলে। বিবাহের পর স্বামীর সহিত শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরে গমন করেন। তারাদাস বাবু রায়পুরের প্রধান উকিল ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা, বদান্যতা ও সহৃদয়তায় রায়পুরবাসিগণ মুগ্ধ ছিল। তিনি কৃষ্ণনগরের এক সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এবং বাল্যকাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তারাদাস বাবু দানশীল। বৃত্তির টাকাগুলি তিনি সহপাঠিগণের প্রীতিভোজে ও গ্রন্থক্রয় করিয়া ব্যয় করিতেন। উপার্জ্জনক্ষম হইয়াও তাঁহার সে স্বভাব পরিবর্ত্তন হয় নাই।

১৮৯৪ সালে প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁহার একমাত্র

পুত্র তারাকুমারের জননীত্ব লাভ করেন। হায়, তাঁহার ভাগ্য সূর্য্য তখন মধ্যাকাশ ছাড়িয়া ক্রমে পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িতেছিল। পরবৎসর, ১৮৯৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে, তাঁহার স্বামীর লোকান্তর ঘটে। ইহারি কিছুকাল পরে রেণুর কবিতাগুলি লিখিত। 'রেণুর' পাঠক পাঠিকা কবির জীবনী এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট। "কাব্যে যেমন পড়া যায় কবি তেমন নয় গো" —একথা সামাজিকের নিকট মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু সাহিত্যিকের নিকট নয়। সাহিত্যিক কবির রচনা মধ্যে তাঁহার অন্তরের পরিচয় খুঁজিয়া লইতে



রেণু-রচয়িত্রী শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী ও তাঁহার স্বামী।

পারেন। অবশ্য কবির লৌকিক জীবনচরিত কবির সহিত পাঠককে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত করিয়া দেয়। অমুক কবি অধিক মাত্রায় তামাক খাইতেন, কি অমুক কবি, মাছ ধরিতে ভাল বাসিতেন জানিয়া বিশেষ কিছু লাভ নাই—কিন্তু যে ঘটনার ছায়া কবির রচনায় প্রচ্ছন্ন আছে—যে ঘটনা কবির বীণায় নূতন সুর জুড়িয়া দিয়াছে সেইটুকু জানিলেই যথেষ্ট।

আর একটী ঘটনা—শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর লৌকিক জীবনের শেষ আশার দীপটী নিভাইয়া দিয়াছে। বিধবা নারীর একমাত্র অব-

লম্বন, তাঁহার সংসারের প্রধান বন্ধন, প্রিয় পুত্রটী ১৮৯৬ সালেই অকালে সংসার ত্যাগ করিয়া যায়। এ অবস্থায় তাঁহার লৌকিক জীবন অতিশয় নৈরাশ্যপূর্ণ হইত যদি না তিনি "মৃত্যুঞ্জয়" প্রেমের দ্বারা সমস্ত দুঃখ ও শোককে পরাস্ত করিতেন। কবি তাঁহার সমস্ত জীবনের বিষের সাগর মন্থন করিয়া আমাদের সম্মুখে অমৃতোপহার পাঠাইয়াছেন। আজ আমরা তাঁহাকে কি আর সান্ত্বনার বচন শুনাইব। এ সময়ে টেনিসনের দুছত্র যেমন কবির সান্ত্বনাদায়ক, তেমনি আমাদেরো মর্ম্মকথাটী ব্যক্ত করে;

"It is better to have loved and lost
Than never to have loved at all!

রসের ধর্ম্ম।

আমাদের ধর্ম্মসাধনার দুটো দিক আছে একটা শক্তির দিক্, একটা রসের দিক্। পৃথিবী যেমন জলে স্থলে বিভক্ত এও ঠিক তেম্নি।

শক্তির দিক্ হচ্চে বলিষ্ঠ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস জ্ঞানের সামগ্রী নয়। ঈশ্বর আছেন এইটুকু-মাত্র বিশ্বাস করাকে বিশ্বাস বলিনে। আমি যার কথা বলচি এই বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটি অবস্থা; এ একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে ধ্রুব হয়ে অবস্থিতি করে — আপনাকে সে কোনো অবস্থায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় মনে করে না।

এই বিশ্বাস জিনিষটি পৃথিবীর মত দৃঢ়। এ একটি নিশ্চিত আধার। এর মধ্যে মস্ত একটি জোর আছে।

যার মধ্যে এই বিশ্বাসের বল নেই, অর্থাৎ যার চিত্তে এই ধ্রুব স্থিতিতত্ত্বটির অভাব আছে সে ব্যক্তি সংসারে ক্ষণে ক্ষণে যা-কিছুকে হাতে পায় তাকে অত্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টায় আঁকড়ে ধরে। সে যেন অতল জলে পড়েছে—কোথাও সে পায়ের কাছে মাটি পায় না; এইজন্যে, যে সব জিনিষ সংসারের জোয়ারে-ভাঁটায় ভেসে আসে ভেসে চলে যায়, তাদেরই তাড়াতাড়ি দুই মুঠো দিয়ে চেপে ধরাকেই সে পরিত্রাণ বলে মনে করে। তার মধ্যে যা কিছু হারায়, যা কিছু তার মুঠো ছেড়ে চলে যায় তার ক্ষতিকে এম্নি সে একান্ত ক্ষতি বলে মনে করে যে কোথাও সে সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। কথায় কথায় কেবলি তার মনে হয় সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। বাধাবিঘ্ন কেবলি তার মনে নৈরাশ্য ঘনীভূত করে তোলে। সেই সমস্ত বিঘ্নকে পেরিয়ে সে কোথাও একটা চরম সফলতার নিঃসংশয় মূর্ত্তি দেখ্‌তে পায় না। যে লোক ডুব জলে সাঁতার দেয়, যার কোথাও দাঁড়াবার উপায় নেই, সামান্য হাঁড়ি কলসি কলার ভেলা তার পরমধন—তার ভয় ভাবনা উদ্বেগের সীমা নেই। আর, যে ব্যক্তির পায়ের নীচে সুদৃঢ় মাটি আছে তারও হাঁড়ি কল্‌সির প্রয়োজন আছে, কিন্তু হাঁড়িকলসি তার জীবনের অবলম্বন নয়—এগুলো যদি কেউ কেড়ে নেয় তাহলে তার যতই অভাব অসুবিধা হোক্ না, সে ডুবে মরবে না।

এইজন্যে দৃঢ়বিশ্বাসী লোকের কাজকর্ম্মে জোর আছে, কিন্তু উদ্বেগ নেই। সে মনের

মধ্যে নিশ্চয় অনুভব করে তার একটা দাঁড়াবার জায়গা আছে, পৌঁছবার স্থান আছে। প্রত্যক্ষ ফল সে না দেখ্‌তে পেলেও সে মনে মনে জানে ফল থেকে সে বঞ্চিত হয় নি—বিরুদ্ধ ফল পেলেও সেই বিরুদ্ধতাকে সে একান্ত করে দেখে না, তার ভিতর থেকেও একটি সার্থকতার প্রত্যয় মনে থাকে। একটি অত্যন্ত বড় জায়গায় চিত্তের দৃঢ়নির্ভরতা, এই জায়গাটিকে ধ্রুবসত্য বলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা, এই হচ্চে সেই বিশ্বাস যে মাটির উপরে আমাদের ধর্ম্মসাধনা প্রতিষ্ঠিত।

এই বিশ্বাসটির মূলে একটি উপলব্ধি আছে। সেটি হচ্চে এই যে, ঈশ্বর সত্য।

কথাটি শুন্‌তে সহজ, এবং শোনবামাত্রই অনেকে হয় ত বলে উঠ্‌বেন যে, ঈশ্বর সত্য এ কথা ত আমরা অস্বীকার করিনে।

পদে পদেই অস্বীকার করি। ঈশ্বর সত্য নন এইভাবেই প্রতিদিন আমরা সংসারের কাজ করে থাকি। ঈশ্বর সত্য এই উপলব্ধিটির উপরে আমরা ভর দিতে পারিনে। আমাদের মন সেই পর্য্যন্ত পৌঁছে সেখানে গিয়ে স্থিতি করতে পারে না।

আমার যাই ঘটুক্ না কেন, যিনি চরম সত্য পরম সত্য তিনি আছেন, এবং তাঁর মধ্যেই আমি আছি, এই ভরসাটুকু সকল অবস্থাতেই যার মনের মধ্যে লেগেই আছে, সে ব্যক্তি যেমন ভাবে জীবনের কাজ করে আমরা কি তেমন ভাবে করে থাকি?—আছেন, আছেন, তিনি আছেন, তিনি আমার হয়েই আছেন—সকল দেশে সকল কালেই তিনি আছেন এবং তিনি আমারই আছেন—জীবনে যত উলটপালটই হোক্ এই সত্যটি থেকে কেউ আমাকে কিছুমাত্র বঞ্চিত করতে পারবে না এমন জোর এমন ভরসা যার আছে সেই হচ্চে বিশ্বাসী—তিনি আছেন এই সত্যের উপরেই সে বিশ্রাম করে এবং তিনি আছেন এই সত্যের উপরেই সে কাজ করে।

কিন্তু ঈশ্বর যে কেবল সত্যরূপে সকলকে দৃঢ় করে ধারণ করে রেখেছেন, সকলকে আশ্রয় দিয়েছেন এই কথাটিই সম্পূর্ণ কথা নয়।

এই জীবধাত্রী পৃথিবী খুব শক্ত বটে—এর ভিত্তি অনেক পাথরের স্তর দিয়ে গড়া। এই কঠিন দৃঢ়তা না থাক্‌লে এর উপরে আমরা এমন নিঃসংশয়ে ভর দিতে পারতুম না। কিন্তু এই কাঠিন্যই যদি পৃথিবীর চরমরূপ হত তাহলে ত এ একটি প্রস্তরময় ভয়ঙ্কর মরুভূমি হয়ে থাক্‌ত।

এর সমস্ত কাঠিন্যের উপরে একটি রসের বিকাশ আছে—সেইটেই এর চরম পরিণতি। সেটি কোমল, সেটি সুন্দর, সেটি বিচিত্র। সেইখানেই নৃত্য, সেইখানেই গান, সেইখানেই সাজসজ্জা। পৃথিবীর সার্থকরূপটি এইখানেই প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থাৎ নিত্যস্থিতির উপরে একটি নিত্যগতির লীলা না থাক্‌লে তার সম্পূর্ণতা নেই। পৃথিবীর ধাতু পাথরের অচল ভিত্তির সর্ব্বোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের প্রবাহ, যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্য্যের প্রবাহ—তার চলা-ফেরা আসাযাওয়া মেলামেশার আর অন্ত নেই।

রস জিনিষটি সচল;—সে কঠিন নয় বলে, নম্র বলে, সর্ব্বত্র তার একটি সঞ্চার আছে; এইজন্যেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে

সম্বল, তাঁহার সংসারের প্রধান বন্ধন, প্রিয় পুত্রটী ১৮৯৬ সালেই অকালে সংসার ত্যাগ করিয়া যায়। এ অবস্থায় তাঁহার লৌকিক জীবন অতিশয় নৈরাশ্যপূর্ণ হইত যদি না তিনি "মৃত্যুঞ্জয়" প্রেমের দ্বারা সমস্ত দুঃখ ও শোককে পরাস্ত করিতেন। কবি তাঁহার সমস্ত জীবনের বিষের সাগর মন্থন করিয়া আমাদের সম্মুখে অমৃতোপহার পাঠাইয়াছেন। আজ আমরা তাঁহাকে কি আর সান্ত্বনার বচন শুনাইব। এ সময়ে টেনিসনের দুছত্র যেমন কবির সান্ত্বনাদায়ক, তেমনি আমাদেরো মর্ম্মকথাটী ব্যক্ত করে;

"It is better to have loved and lost
Than never to have loved at all।

রসের ধর্ম্ম।

আমাদের ধর্ম্মসাধনার দুটো দিক আছে একটা শক্তির দিক্, একটা রসের দিক্। পৃথিবী যেমন জলে স্থলে বিভক্ত এও ঠিক তেম্‌নি।

শক্তির দিক্ হচ্চে বলিষ্ঠ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস জ্ঞানের সামগ্রী নয়। ঈশ্বর আছেন এইটুকু-মাত্র বিশ্বাস করাকে বিশ্বাস বলিনে। আমি যার কথা বলচি এই বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটি অবস্থা; এ একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে ধ্রুব হয়ে অবস্থিতি করে— আপনাকে সে কোনো অবস্থায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় মনে করে না।

এই বিশ্বাস জিনিষটি পৃথিবীর মত দৃঢ়। এ একটি নিশ্চিত আধার। এর মধ্যে মস্ত একটি জোর আছে।

যার মধ্যে এই বিশ্বাসের বল নেই, অর্থাৎ যার চিত্তে এই ধ্রুব স্থিতিতত্ত্বটির অভাব আছে সে ব্যক্তি সংসারে ক্ষণে ক্ষণে যা-কিছুকে হাতে পায় তাকে অত্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টায় আঁকড়ে ধরে। সে যেন অতল জলে পড়েছে—কোথাও সে পায়ের কাছে মাটি পায় না; এইজন্যে, যে সব জিনিষ সংসারের জোয়ারে-ভাঁটায় ভেসে আসে ভেসে চলে যায়, তাদেরই তাড়াতাড়ি দুই মুঠো দিয়ে চেপে ধরাকেই সে পরিত্রাণ বলে মনে করে। তার মধ্যে যা কিছু হারায়, যা কিছু তার মুঠো ছেড়ে চলে যায় তার ক্ষতিকে এম্‌নি সে একান্ত ক্ষতি বলে মনে করে যে কোথাও সে সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। কথায় কথায় কেবলি তার মনে হয় সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। বাধাবিঘ্ন কেবলি তার মনে নৈরাশ্য ঘনীভূত করে তোলে। সেই সমস্ত বিঘ্নকে পেরিয়ে সে কোথাও একটা চরম সফলতার নিঃসংশয় মূর্ত্তি দেখ্‌তে পায় না। যে লোক ডুব জলে সাঁতার দেয়, যার কোথাও দাঁড়াবার উপায় নেই, সামান্য হাঁড়ি কলসি কলার ভেলা তার পরমধন—তার ভয় ভাবনা উদ্বেগের সীমা নেই। আর, যে ব্যক্তির পায়ের নীচে সুদৃঢ় মাটি আছে তারও হাঁড়ি কলসির প্রয়োজন আছে, কিন্তু হাঁড়িকলসি তার জীবনের অবলম্বন নয়—এগুলো যদি কেউ কেড়ে নেয় তাহলে তার যতই অভাব অসুবিধা হোক্ না, সে ডুবে মরবে না।

এইজন্যে দৃঢ়বিশ্বাসী লোকের কাজকর্ম্মে জোর আছে, কিন্তু উদ্বেগ নেই। সে মনের

মধ্যে নিশ্চয় অনুভব করে তার একটা দাঁড়াবার জায়গা আছে, পৌঁছবার স্থান আছে। প্রত্যক্ষ ফল সে না দেখ্‌তে পেলেও সে মনে মনে জানে ফল থেকে সে বঞ্চিত হয় নি—বিরুদ্ধ ফল পেলেও সেই বিরুদ্ধতাকে সে একান্ত করে দেখে না, তার ভিতর থেকেও একটি সার্থকতার প্রত্যয় মনে থাকে। একটি অত্যন্ত বড় জায়গায় চিত্তের দৃঢ়নির্ভরতা, এই জায়গাটিকে ধ্রুবসত্য বলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা, এই হচ্চে সেই বিশ্বাস যে মাটির উপরে আমাদের ধর্ম্মসাধনা প্রতিষ্ঠিত।

এই বিশ্বাসটির মূলে একটি উপলব্ধি আছে। সেটি হচ্চে এই যে, ঈশ্বর সত্য।

কথাটি শুনতে সহজ, এবং শোনবামাত্রই অনেকে হয় ত বলে উঠ্‌বেন যে, ঈশ্বর সত্য এ কথা ত আমরা অস্বীকার করিনে।

পদে পদেই অস্বীকার করি। ঈশ্বর সত্য নন এইভাবেই প্রতিদিন আমরা সংসারের কাজ করে থাকি। ঈশ্বর সত্য এই উপলব্ধিটির উপরে আমরা ভর দিতে পারিনে। আমাদের মন সেই পর্য্যন্ত পৌঁছে সেখানে গিয়ে স্থিতি করতে পারে না।

আমার যাই ঘটুক্ না কেন, যিনি চরম সত্য পরম সত্য তিনি আছেন, এবং তাঁর মধ্যেই আমি আছি, এই ভরসাটুকু সকল অবস্থাতেই যার মনের মধ্যে লেগেই আছে, সে ব্যক্তি যেমন ভাবে জীবনের কাজ করে আমরা কি তেমন ভাবে করে থাকি?—আছেন, আছেন, তিনি আছেন, তিনি আমার হয়েই আছেন—সকল দেশে সকল কালেই তিনি আছেন এবং তিনি আমারই আছেন—জীবনের দৃঢ় [illegible] হোক্ এই সত্যটি থেকে কেউ আমাকে কিছুমাত্র বঞ্চিত করতে পারবে না এমন জোর এমন ভরসা যার আছে সেই হচ্চে বিশ্বাসী—তিনি আছেন এই সত্যের উপরেই সে বিশ্রাম করে এবং তিনি আছেন এই সত্যের উপরেই সে কাজ করে।

কিন্তু ঈশ্বর যে কেবল সত্যরূপে সকলকে দৃঢ় করে ধারণ করে রেখেছেন, সকলকে আশ্রয় দিয়েছেন এই কথাটিই সম্পূর্ণ কথা নয়।

এই জীবধাত্রী পৃথিবী খুব শক্ত বটে—এর ভিত্তি অনেক পাথরের স্তর দিয়ে গড়া। এই কঠিন দৃঢ়তা না থাকলে এর উপরে আমরা এমন নিঃসংশয়ে ভর দিতে পারতুম না। কিন্তু এই কাঠিন্যই যদি পৃথিবীর চরমরূপ হত তাহলে ত এ একটি প্রস্তরময় ভয়ঙ্কর মরুভূমি হয়ে থাকত।

এর সমস্ত কাঠিন্যের উপরে একটি রসের বিকাশ আছে—সেইটেই এর চরম পরিণতি। সেটি কোমল, সেটি সুন্দর, সেটি বিচিত্র। সেইখানেই নৃত্য, সেইখানেই গান, সেইখানেই সাজসজ্জা। পৃথিবীর সার্থকরূপটি এইখানেই প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থাৎ নিত্যস্থিতির উপরে একটি নিত্যগতির লীলা না থাকলে তার সম্পূর্ণতা নেই। পৃথিবীর ধাতু পাথরের অচল ভিত্তির সর্ব্বোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের প্রবাহ, যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্য্যের প্রবাহ—তার চলা-ফেরা আসাযাওয়া মেলামেশার আর অন্ত নেই।

রস জিনিষটি সচল;—সে কঠিন নয় বলে, নম্র বলে, সর্ব্বত্র তার একটি সঞ্চার আছে; এইজন্যেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে

উঠে জগৎকে পুলকিত করে তুলচে—এইজন্যেই কেবলি সে আপনার অপূর্ব্বতা প্রকাশ করচে, এইজন্যেই তার নবীনতার অন্ত নেই।

এই রসটি যেখানে শুকিয়ে যায় সেখানে আবার সেই নিশ্চল কঠিনতা বেরিয়ে পড়ে, সেখানে প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, জরা ও মৃত্যুর যে আড়ষ্টতা তাই উৎকট হয়ে ওঠে।

আমাদের ধর্ম্মসাধনার মধ্যেও এই রসময় গতিতত্ত্বটি না রাখ্‌লে তার সম্পূর্ণতা নেই, এমন কি, তার যেটি চরম সার্থকতা সেইটিই নষ্ট হয়।

অনেক সময় ধর্ম্মসাধনায় দেখা যায় কঠিনতাই প্রবল হয়ে ওঠে—তার অবিচলিত দৃঢ়তা নিষ্ঠুর শুষ্কভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে। সে আপনার সীমার মধ্যে অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে বসে থাকে; সে অন্যকে আঘাত করে; তার মধ্যে কোনো প্রকার নড়াচড়া নেই এইটে নিয়েই সে গৌরব বোধ করে; নিজের স্থানটি ছেড়ে চলে না বলে কেবল সে একটা দিক দিয়েই সমস্ত জগৎকে দেখে, এবং যারা অন্যদিকে আছে তারা কিছুই দেখ্‌চে না এবং সমস্তই ভুল দেখ্‌চে বলে কল্পনা করে। নিজের সঙ্গে অন্যের কোনোপ্রকার অনৈক্যকে এই কাঠিন্য ক্ষমা করতে জানে না; সবাইকে নিজের অচল পাথরের চারিভিতের মধ্যে জোর করে টেনে আন্‌তে চায়। এই কাঠিন্য মাধুর্য্যকে দুর্ব্বলতা এবং বৈচিত্র্যকে মায়ার ইন্দ্রজাল বলে অবজ্ঞা করে, এবং সমস্তকে সবলে একাকার করে দেওয়াকেই সমন্বয় সাধন বলে মনে করে।

কিন্তু কাঠিন্য ধর্ম্মসাধনার অন্তরালদেশে থাকে। তার কাজ, ধারণ করা; প্রকাশ করা নয়। অস্থিপঞ্জর মানবদেহের চরম পরিচয় নয়—সরস কোমল মাংসের দ্বারাই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়। সে যে পিণ্ডাকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে না, সে যে আঘাত সহ্য করেও ভেঙে যায় না, সে যে আপনার মর্ম্মস্থানগুলিকে সকলপ্রকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করে, তার ভিতরকার কারণ হচ্চে তার অস্থিকঙ্কাল। কিন্তু আপনার এই কঠোর শক্তিকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখে এবং প্রকাশ করে আপনার রসময়, প্রাণময়, ভাবময়, গতিভঙ্গীময় কোমল অথচ সতেজ সৌন্দর্য্যকে।

ধর্ম্মসাধনারও চরম পরিচয়, যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিষটি রসের জিনিষ। তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ও তার মধ্যে নিত্যচলনশীল প্রাণের লীলা। শুষ্কতায় অনম্রতায় তার সৌন্দর্য্যকে লোপ করে, তার সচলতাকে রোধ করে, তার বেদনাবোধকে অসাড় করে দেয়। ধর্ম্মসাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্য্যের নিত্যবিকাশ।

নম্রতা নইলে এই জিনিষটিকে পাওয়া যায় না। কিন্তু নম্রতা মানে শিক্ষিত বিনয় নয়। অর্থাৎ কঠিন লোহাকে পুড়িয়ে পিটিয়ে তাকে ইস্পাতরূপে যে খরধার নমনীয়তা দেওয়া যায় এ সে জিনিষ নয়। সরস সজীব তরুশাখার যে নম্রতা—যে নম্রতায় মধ্যে ফুল ফুটে ওঠে, দক্ষিণের বাতাস নৃত্যের আন্দোলন বিস্তার করে, শ্রাবণের ধারা সঙ্গীতে মুখরিত হয়, এবং সূর্য্যের কিরণ অদ্ভুত সেতারের সুরগুলির মত উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে; চারিদিকের বিশ্বের

নানা ছন্দ যে নম্রতার মধ্যে আপনার স্পন্দনকে বিচিত্র করে তোলে—যে নম্রতা সহজভাবে সকলের সঙ্গে আপনার যোগ স্বীকার করে, সায় দেয়, সাড়া দেয়, আঘাতকে সঙ্গীতে পরিণত করে এবং স্বাতন্ত্র্যকে সৌন্দর্য্যের দ্বারা সকলের আপন করে তোলে।

এক কথায় বল্‌তে গেলে এই নম্রতাটি রসের নম্রতা—শিক্ষার নম্রতা নয়। এই নম্রতা শুষ্ক সংযমের বোঝায় নত নয়, সরস প্রাচুর্য্যের দ্বারাই নত; প্রেমের ভক্তিতে আনন্দে পরিপূর্ণতায় নত।

কঠোরতা যেমন স্বভাবতই আপনাকে স্বতন্ত্র রাখে রস তেমনি স্বভাবতই অন্যের দিকে যায়। আনন্দ সহজেই নিজেকে দান করে—আনন্দের ধর্ম্মই হচ্চে সে আপনাকে অন্যের মধ্যে প্রসারিত করতে চায়। কিন্তু উদ্ধত হয়ে থাকলে কিছুতেই অন্যের সঙ্গে মিল হয় না—অন্যকে চাইতে গেলেই নিজেকে নত করতে হয়—এমন কি, যে রাজা যথার্থ রাজা, প্রজার কাছে তাকে নম্র হতেই হবে। রসের ঐশ্বর্য্যে যে লোক ধনী, নম্রতাই তার প্রাচুর্য্যের লক্ষণ।

বিশ্বজগতের মধ্যে জগদীশ্বর কোন্‌খানে আমাদের কাছে নত? যেখানে তিনি সুন্দর; যেখানে রসোবৈ সঃ; সেখানে আনন্দকে ভাগ না করে তাঁর চলে না; সেখানে নিজের নিয়মের জোরের উপরে কড়া হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারেন না, সেখানে সকলের মাঝখানে নেমে এসে সকলকে তাঁর ডাক দিতে হয়; সেই ডাকের মধ্যে কত করুণা, কত বেদনা, কত কোমলতা! স্নেহের আনন্দ-ভারে দুর্ব্বল ক্ষুদ্র শিশুর কাছে পিতামাতা যেমন নত হয়ে পড়েন, জগতের ঈশ্বর তেমনি করেই আমাদের দিকে নত হয়ে পড়েছেন। এইটেই হচ্চে আমাদের কাছে সকলের চেয়ে বড় কথা;—তাঁর নিয়ম অটল, তাঁর শক্তি অসীম, তাঁর ঐশ্বর্য্য অনন্ত এ সব কথা আমাদের কাছে ওর চেয়ে ছোট; তিনি নত হয়ে সুন্দর হয়ে ভাবে ভঙ্গীতে হাসিতে গানে রসে গন্ধে রূপে আমাদের সকলের কাছে আপনাকে দান করতে এসেছেন এবং আপনার মধ্যে আমাদের সকলকে নিতে এসেছেন এইটেই হচ্চে আমাদের পক্ষে চরম কথা—তাঁর সকলের চেয়ে পরম পরিচয় হচ্চে এইখানেই।

জগতে ঈশ্বরের এই যে দুইটি পরিচয়—একটি অটল নিয়মে, আর একটি সুনম্র সৌন্দর্য্যে—এর মধ্যে নিয়মটি আছে গুপ্ত আর সৌন্দর্য্যটি আছে তাকে ঢেকে। নিয়মটি এমন প্রচ্ছন্ন যে, সে যে আছে তা আবিষ্কার করতে মানুষের অনেকদিন লেগেছিল কিন্তু সৌন্দর্য্য চিরদিন আপনাকে ধরা দিয়েছে। সৌন্দর্য্য, মিল্‌বে বলেই, ধরা দেবে বলেই সুন্দর। এই সৌন্দর্য্যের মধ্যেই রসের মধ্যেই মিলনের তত্ত্বটি রয়েছে।

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্যই বড় হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এই জন্যে কৃচ্ছ্র-সাধনকে যখন কোন ধর্ম্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে, যখন সে আচারবিচারকেই মুখ্য স্থান দেয় তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে; তখন তার নীরস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিল্‌তে বাধা দেয়, সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে' আবদ্ধ করে' রাখে; সর্ব্বদাই

ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ত্রুটিতে অপরাধ ঘটে—এই জন্যেই সবাইকে সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়। শুধু তাই নয়, নিয়মপালনের একটা অহঙ্কার মানুষকে শক্ত করে তোলে, নিয়মপালনের একটা লোভ তাকে পেয়ে বসে এবং এই সকল নিয়মকে ধ্রুব ধর্ম্ম বলে জানা তার সংস্কার হয়ে যায় বলেই যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখ্‌তে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা অবজ্ঞা জন্মে।

য়িহুদি এই জন্যে আপনার ধর্ম্মনিয়মের জালের মধ্যে আপনাকে আপাদমস্তক বন্দী করে রেখেছে; ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করা এবং সমস্ত মানুষের সঙ্গে মেলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজও ধর্ম্মের দ্বারা নিজেকে পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গেই পৃথক্ করে রেখেছে। নিজের মধ্যেও তার বিভাগের অন্ত নেই। বস্তুত নিজেকে সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যেই সে নিয়মের বেড়া নির্ম্মাণ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষীয়কে সকলের সঙ্গে অবাধে মিলিয়ে দিচ্ছিল বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত নিয়মসংযম প্রধানত তারই প্রতিকারের প্রবল চেষ্টা। সেই চেষ্টাটি আজ পর্য্যন্ত রয়ে গেছে। সে কেবলি দূর করচে, কেবলি ভাগ করচে, নিজেকে কেবলি সঙ্কীর্ণ বদ্ধ করে আড়াল করে রাখবার উদ্যোগ করচে। হিন্দুর ধর্ম্ম যেখানে, সেখানে বাহিরের লোকের পক্ষে সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ এবং ঘরের লোকের পক্ষে কেবলি বেড়া এবং প্রাচীর।

অন্য দেশে অন্য জাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে কোনো চেষ্টা নেই তা বল্‌তে পারিনে। কারণ, স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজনকে অস্বীকার করা কোনোমতেই চলে না। কিন্তু অন্যত্র এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক। অর্থাৎ এই চেষ্টাটা সেখানে নিজের নীচের তলায় বাস করে।

মিলনের বৃত্তিটি স্বাতন্ত্র্য চেষ্টার উপরের জিনিষ। ক্রীতদাস রাজাকে খুন করে সিংহাসনে চড়ে বস্‌লে যেমন হয় স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা তেমনি মিলনধর্ম্মকে একেবারে অভিভূত করে দিয়ে তার উপরে যদি আপনার স্থান দখল করে বসে তাহলে সেই রকমের অন্যায় ঘটে। এই জন্যেই পারিবারিক বা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে স্বাতন্ত্র্যের দিকে টেনে রাখ্‌তে থাক্‌লেও ধর্ম্মবুদ্ধি তার উপরে দাঁড়িয়ে তাকে বিশ্বের দিকে বিশ্বমানবের দিকে নিয়ত আহ্বান করে।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে সেই খানেই ছিদ্র হয়েছে এবং সেই ছিদ্র পথেই এ দেশের শনি প্রবেশ করেছে। যে ধর্ম্ম মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায় সেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়েই আমরা মানুষকে পৃথক্ করেছি। আমরা বলেছি মানুষের স্পর্শে, তার সঙ্গে একাসনে আহারে, তার আহরিত অন্নজল গ্রহণে মানুষ ধর্ম্মে পতিত হয়। বন্ধনকে ছেদন করাই যার কাজ তাকে দিয়েই আমরা বন্ধনকে পাকা করে নিয়েছি—তা হলে আজ আমাদের উদ্ধার করবে কে?

আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, উদ্ধার করবার ভার আজ আমরা তারই হাতে দিতে চেষ্টা করচি যে জিনিষটা ধর্ম্মের চেয়ে নীচেকার। আমরা

স্বাজাত্যবুদ্ধির উপর বরাত দিয়েছি, ভারত-বর্ষের অন্তর্গত মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেবার জন্যে। আমরা বল্‌চি, তা না হ'লে আমরা বড় হব না, বলিষ্ঠ হব না, আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধি হবে না।

আমরা ধর্ম্মকে এমন জায়গায় এনে ফেলেছি যে আমাদের জাতীয় স্বার্থবুদ্ধি প্রয়োজন বুদ্ধিও তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। এমন দশা হয়েছে যে, ধর্ম্মে আমাদের উদ্ধার নেই, স্বাজাত্যের দ্বারা আমাদের উদ্ধার পেতে হবে! এমন হয়েছে যে ধর্ম্ম আমাদের পৃথক থাকতে বল্‌চে, স্বাজাত্য আমাদের এক হবার জন্যে তাড়না করচে!

কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি যে মিলনের ঘটক নয় সে মিলনের উপর আমি ভরসা রাখ্‌তে পারিনে। ধর্ম্মমূলক মিলনতত্ত্বটিকে আমাদের দেশে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তবেই স্বভাবতই আমরা মিলনের দিকে যাব, কেবলি গণ্ডি আঁকবার এবং বেড়া তোল্‌বার প্রবৃত্তি থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাব। ধর্ম্মের সিংহদ্বার খোলা থাক্‌লে তবেই ছোট বড় সকল যজ্ঞের নিমন্ত্রণেই মানুষকে আমরা আহ্বান করতে পারব;—নতুবা কেবলমাত্র প্রয়োজনের বা স্বাজাত্যঅভিমানের খিড়কির দরজা'টুকু যদি খুলে রাখি তবে ধর্ম্মনিয়মের বাধা অতিক্রম করে সেই ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের এত প্রভেদ পার্থক্য এত বিরোধ-বিচ্ছেদ গল্‌তে পারবে না, মিল্‌তে পারবে না।

ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাসে এইটি বরাবর দেখা গেছে ধর্ম্ম যখন আপনার রসের মূর্ত্তি প্রকাশ করে তখনি সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মানুষকে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। খৃষ্ট যে প্রেমভক্তিরসের বন্যাকে মুক্ত করে দিলেন তা য়িহুদিধর্ম্মের কঠিন শাস্ত্র বন্ধনের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখ্‌তে পারলে না এবং সেই ধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত প্রবল জাতির স্বার্থের শৃঙ্খলকে শিথিল করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করচে, আজ পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভিমানের বাধা ভেদ করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণ শক্তি প্রয়োগ করচে।

বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে একটি কঠোর তত্ত্বকথা আছে কিন্তু সেই তত্ত্বকথায় মানুষকে এক করেনি; তার মৈত্রী তার করুণা এবং বুদ্ধ-দেবের বিশ্বব্যাপী হৃদয়প্রসারতাই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। নানক বল, রামানন্দ বল, কবীর বল, চৈতন্য বল সকলেই রসের আঘাতে বাঁধন ভেঙে দিয়ে সকল মানুষকে এক জায়গায় ডাক দিয়েছেন।

তাই বলছিলুম, ধর্ম্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় করে' কঠিন হয়ে ওঠে, তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ করে। ধর্ম্মে যখন রসের বর্ষা নেবে আসে তখন যে-সকল গহ্বর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল তারা ভক্তির স্রোতে প্রেমের বন্যায় ভরে ওঠে, এবং সেই পূর্ণতায় স্বাতন্ত্র্যের অচল সীমাগুলিই সচল হয়ে উঠে অগ্রসর হয়ে সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়, বিপরীত পারকে এক করে দেয় এবং দুর্লঙ্ঘ্য দূরকে আনন্দবেগে নিকট করে আনে। মানুষ যখনি সত্যভাবে গভীরভাবে মিলেছে তখন কোনো একটি বিপুল রসের আবির্ভাবেই

মিলেছে, প্রয়োজনে মেলেনি, তত্ত্বজ্ঞানে মেলেনি, আচারের শুষ্কশাসনে মেলেনি।

ধর্ম্মের যখন চরম লক্ষ্যই হচ্চে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনসাধন, তখন সাধককে এ কথা মনে রাখ্‌তে হবে যে, কেবল বিধিবদ্ধ পূজার্চ্চনা আচার অনুষ্ঠান শুচিতার দ্বারা তা হতেই পারে না। এমন কি, তাতে মনকে কঠোর করে ব্যাঘাত আনে এবং ধার্ম্মিকতার অহঙ্কার জাগ্রত হয়ে চিত্তকে সঙ্কীর্ণ করে দেয়। হৃদয়ে রস থাক্‌লে তবেই তাঁর সঙ্গে মিলন হয়, আর কিছুতেই হয় না।

কিন্তু এই কথাটি মনে রাখ্‌তে হবে, ভক্তিরসের প্রেমরসের মধ্যে যে দিকটি সম্ভোগের দিক্‌ কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুল্‌লে দুর্ব্বলতা এবং বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক্‌ আছে সেটি না থাক্‌লে রসের দ্বারা মনুষ্যত্ব দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্চে এই যে, প্রেম আনন্দে দুঃখকে স্বীকার করে নেয়। কেন না দুঃখের দ্বারা ত্যাগের দ্বারাই তার পূর্ণ সার্থকতা। ভাবাবেশের মধ্যে নয়, সেবার মধ্যে কর্ম্মের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয়। এই দুঃখের মধ্যে দিয়ে কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে, তপস্যার মধ্যে দিয়ে যে প্রেমের পরিপাক হয়েছে সেই প্রেমই বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই প্রেমই সর্ব্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে।

এই দুঃখ স্বীকারই প্রেমের মাথার মুকুট; এই তার গৌরব। ত্যাগের দ্বারাই সে আপনাকে লাভ করে; বেদনার দ্বারাই তার রসের মন্থন হয়; সাধ্বী সতীকে যেমন সংসারে কর্ম্ম মলিন করে না, তাকে আরো দীপ্তিমতী করে তোলে, সংসারে মঙ্গলকর্ম্ম যেমন তার সতীপ্রেমকে সার্থক করতে থাকে, তেমনি যে সাধকের চিত্ত ভক্তিতে ভরে উঠেছে কর্ত্তব্যের শাসন তাঁর পক্ষে শৃঙ্খল নয় সে তাঁর অলঙ্কার; দুঃখে তাঁর জীবন নত হয় না, দুঃখেই তাঁর ভক্তি গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। এই জন্যে মানবসমাজে কর্ম্মকাণ্ড যখন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে মনুষ্যত্বকে ভারাক্রান্ত করে তোলে তখন একদল বিদ্রোহী জ্ঞানের সহায়তায় কর্ম্মমাত্রেরই মূল উৎপাটন, এবং দুঃখমাত্রকে একান্তভাবে নিরস্ত করে দেবার অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যাঁরা ভক্তির দ্বারা পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছেন তাঁরা কিছুকেই অস্বীকার করবার প্রয়োজন বোধ করেন না—তাঁরা অনায়াসেই কর্ম্মকে শিরোধার্য্য এবং দুঃখকে বরণ করে নেন। নইলে যে তাঁদের ভক্তির মাহাত্ম্যই থাকে না, নইলে যে ভক্তিকে অপমান করা হয়; ভক্তি বাইরের সমস্ত অভাব ও আঘাতের দ্বারাই আপনার ভিতরকার পূর্ণতাকে আপনার কাছে সপ্রমাণ করতে চায়—দুঃখে নম্রতা ও কর্ম্মে আনন্দই তার ঐশ্বর্য্যের পরিচয়। কর্ম্মে মানুষকে জড়িত করে এবং দুঃখ তাকে পীড়া দেয়, রসের আবির্ভাবে মানুষের এই সমস্যাটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন কর্ম্ম এবং দুঃখের মধ্যেই মানুষ যথার্থ ভাবে আপনার মুক্তি উপলব্ধি করে। বসন্তের উত্তাপে পর্ব্বতশিখরের বরফ যখন রসে বিগলিত হয় তখন চলাতেই তার মুক্তি, নিশ্চলতাই তার বন্ধন; তখন অক্লান্ত আনন্দে দেশদেশান্তরকে উর্ব্বর করে সে চল্‌তে থাকে; তখন নুড়ি পাথরের দ্বারা সে যতই প্রতিহত

হয় ততই তার সঙ্গীত জাগ্রত এবং নৃত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

একটা বরফের পিণ্ড এবং ঝরনার মধ্যে তফাৎ কোন্ খানে? না, বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতিতত্ত্ব নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এই জন্যে বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায় তার ক্ষয় হতে থাকে—এই জন্য চলা ও আঘাত থেকে নিস্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু ঝরনার যে গতি সে তার নিজেরই গতি, সেই জন্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার সৌন্দর্য্য। এই জন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মানুষের মধ্যেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনি সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলি নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনই তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার বিচার, যত শাস্ত্র শাসন। তখনই মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ। তখনি তার ওঠা বসা খাওয়া পরা সকল দিকেই বাঁধাবাধি। তখনি সে সেই সকল নিরর্থক কর্ম্মকে স্বীকার করে যা তাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, যা তাকে অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে কেবলি একই জায়গায় ঘুরিয়ে মারে।

রসের আবির্ভাবে মানুষের জড়ত্ব ঘুচে যায়। সুতরাং তখন সচলতা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, তখন অগ্রগামী গতি শক্তির আনন্দেই সে কর্ম্ম করে, সর্ব্বজয়ী প্রাণশক্তির আনন্দেই সে দুঃখকে স্বীকার করে।

বস্তুত মানুষের প্রধান সমস্যা এ নয় যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে একেবারে নিবৃত্ত করতে পারে।

তার সমস্যাই হচ্চে এই যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে সহজেই স্বীকার করে নিতে পারে। দুঃখকে নিবৃত্ত করবার পথ যাঁরা দেখাতে চান তাঁরা অহংকেই সমস্ত অনর্থের হেতু বলে একেবারে তাকে বিলুপ্ত করতে বলেন; দুঃখকে স্বীকার করবার শক্তি যাঁরা দিতে চান তাঁরা অহংকে প্রেমের দ্বারা পরিপূর্ণ করে তাকে সার্থক করে তুল্‌তে বলেন। অর্থাৎ গাড়িথেকে ঘোড়াকে খুলে ফেলাই যে গাড়িকে খানায় পড়া থেকে রক্ষা করবার সুকৌশল তা নয়, ঘোড়ার উপরে সারথিকে স্থাপন করাই হচ্চে গাড়িকে বিপদ থেকে বাঁচানো এবং তাকে গম্যস্থানের অভিমুখে চালানোর যথোচিত উপায়। এই জন্যে মানুষের ধর্ম্মসাধনার মধ্যে যখন ভক্তির আবির্ভাব হয় তখনি সংসারে যেখানে যা কিছু সমস্ত বজায় থেকেও মানুষের সকল সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়—তখন কর্ম্মের মধ্যে সে আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে সে গৌরব অনুভব করে; তখন কর্ম্মই তাকে মুক্তি দেয় এবং দুঃখ তার ক্ষতির কারণ হয় না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বুলগেরিয়ার গোলাপী আতর প্রস্তুত প্রণালী।

প্রসিদ্ধ গ্রীকচিকিৎসক ডায়োসিওরাইডিশের (Dioscorides) বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় যে প্রাচীন কালে কেবলমাত্র maceration প্রণালী দ্বারাই অর্থাৎ তৈল কিম্বা চর্ব্বির মধ্যে পুষ্প ডুবাইয়া রাখিয়া গোলাপী আতর প্রস্তুত হইত, এবং কেবল মাত্র জলপাই তৈলই এই কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। অন্যান্য পুস্তক পাঠেও জানা যায় যে পূর্ব্বকালে চ্যাবণপ্রথায় গোলাপী আতর বাহির করা হইত না, এবং মধ্য যুগেও ইহার সম্যক প্রচলন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এই প্রণালী কয়েক শত বৎসর মাত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মোসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে গোলাপ ছিল কি না, কিম্বা গোলাপ জল ও আতর প্রস্তুত হইত কি না তাহা আমরা জানি না। এ সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিদগণের মতামত জানিতে স্বতঃই ঔৎসুক্য জন্মে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ তত্ত্ব আলোচনায় কোন পণ্ডিতকেই প্রবৃত্ত দেখি না। প্রাচীন আরব্য গ্রন্থকার ইবন খালদান তাঁহার মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে "মধ্য যুগে গোলাপের চাষ ভারতে ও চীনদেশে অত্যন্ত উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল, এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহার চাষ পারস্য দেশে এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে গোলাপ জল প্রস্তুত ঐরাজ্যের রাজস্বের একটী প্রধান উপকরণ হইয়া উঠে। তৎসময়ে ইহারা চ্যাবণ দ্বারা কেবলমাত্র গোলাপ জলই প্রস্তুত করিত, আতর বাহির করিতে জানিত না। গোলাপ জল হইতে উপরের ভাসমান তৈল সংগ্রহ করার বিষয় প্রথমে কাহার' মনে উদিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণযোগ্য কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। আমাদের কলেজ লাইব্রেরীর একখানা পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে—

"This idea occurred only to Princess Nour i-Djihan, who married the Emperor of Delhi Djahangir who died in 1627."

ইহা সত্য হইলে আমাদের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

ইহার পর হইতেই আরব্য দেশ, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশ সমূহ এই প্রণালী দ্বারা আতর প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে।

আধুনিক সময়ে সমস্ত সভ্যদেশে এসেন্স প্রস্তুতের জন্য যত গোলাপী আতর ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশই বুলগেরিয়া কিম্বা ফ্রান্স সরবরাহ করিয়া থাকে। এত আতর ইহারা কি প্রণালীতে প্রস্তুত করে তাহা আমাদের দেশের লোকের জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আশা করি এই প্রবন্ধ পাঠে তাহা কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইবে। ফ্রান্স অত্যন্ত উন্নত প্রণালীর চ্যাবক যন্ত্রাদির দ্বারা আতর প্রস্তুত করিতেছে, বুলগেরিয়ার এখনো সেই পূর্ব্বতন পুরাতন প্রণালীই অনুসৃত।

বুলগেরিয়া ১৯০৮ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে ইউরোপীয়ের একটী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। প্রিন্স ফার্দ্দিনান্দ 'জার' নাম লইয়া শাসন কর্ত্তার পদে বরিত হইয়াছেন। এই স্থানের আব হাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক, কারণ ইহা পাহাড়সঙ্কুল ভূমি। এই রাজ্যের পরিসর ৩৭৩২৬ স্কোয়ার মাইল

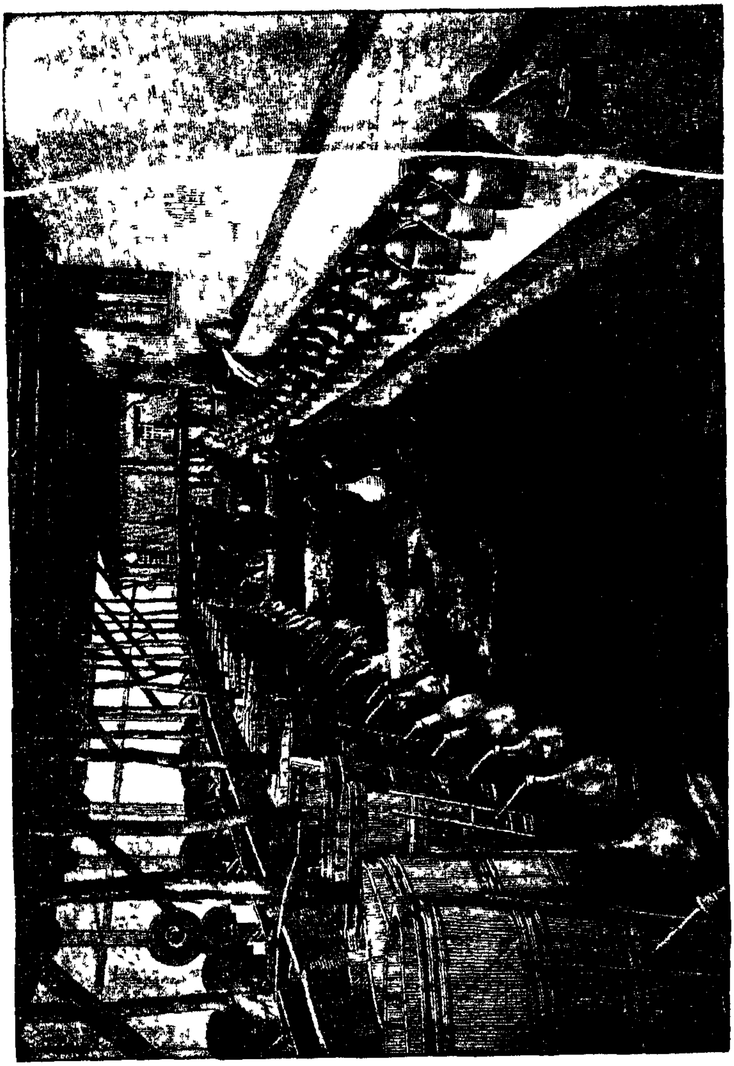
ও ইহা ৩,০৩৫৬২৩ লোকের আবাসভূমি। পূর্ব্বে সিরিয়া, উত্তরে রোমেনিয়া, পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর এবং দক্ষিণে তুরস্কদেশ অবস্থিত। এই রাজ্যের Joundya এবং Strema নামীয় উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী স্থানেই গোলাপের চাষ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, এই স্থান শীত প্রধান ও শুষ্ক, এই স্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানেও অনেকে এই ব্যবসা অবলম্বন করিতেছে।

বুলগেরিয়াতে আতর ও গোলাপজল প্রস্তুতের জন্য ডেমাস্ক গোলাপই (Rosa damascena) সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। এই গোলাপ প্রতি গুচ্ছে তিনটি কিম্বা চারটি এবং প্রতি ডালে ৭টা হইতে ১০টা করিয়া জন্মে, ইহা হইতে অধিক হইলে সেগুলি নিকৃষ্ট বিবেচনায় অতিরিক্ত ফুলগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। সকলেই জানেন গোলাপ ফুল অতি সহজেই ঝরিয়া পড়ে। এই জাতীয় গোলাপ এত সুকোমল যে প্রস্ফুটিত হইতে না হইতে ফুল নষ্ট হইয়া যায়, সামান্য তুষার পাতও এ ফুল সহিতে পারে না। পশ্চিম ফ্রান্সের ন্যায় এ দেশে গুচ্ছে গুচ্ছে গাছ সকল রোপিত হয় না, প্রতি সাত কিম্বা আট ফুট অন্তর অন্তর বৃক্ষ সকল সারি সারি রোপিত হয়। এই সমস্ত বৃক্ষ, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় এক প্রকারেরই হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ অক্টোবর মাসে গাছে সার প্রদান করে ও নূতন কলম প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে; এই সমস্ত কলমের বৃক্ষ অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করিলে ও প্রতি বৎসর ছাঁটিয়া সার প্রদান করিলে প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল উপযুক্ত ফুল প্রদান করিয়া থাকে। পঞ্চম বৎসরে ফুলের মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়।

বৎসরের প্রকৃতি অনুযায়ী ১৫ই মে হইতে ২০শে জুনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ আরম্ভ হয়। অতি প্রত্যূষে সাজি হস্তে পুষ্পচয়ক পুরুষ ও রমণীগণ বাগানের ছোট ছোট রাস্তা দিয়া যাইতে আরম্ভ করে, এবং অধিক রৌদ্র হইবার পূর্ব্বেই স্ফোটনোম্মুখ কলি ও অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত গোলাপ চয়ন করিয়া আনে; কারণ ইহা অপর দিনের জন্য রক্ষিত হইলে অধিক ফুটিয়া গন্ধ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই প্রকারে প্রত্যহ শত শত লোক গোলাপ সংগ্রহ করিতেছে; এত পুষ্প হইতে কেবলমাত্র কয়েক পাউণ্ড তৈল সোনার দরে বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। এক 'একার' জমীতে সাধারণতঃ ৩,৩০০ পাউণ্ড গোলাপ উৎপন্ন হয়; কিন্তু তাহা হইতে এক পাউণ্ডের অধিক গোলাপী আতর পাওয়া যায় না।

বুলগেরিয়াতে পুরাতন ধরণের তাম্র নির্ম্মিত বকযন্ত্র সকল ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহা পাঁচফুট উচ্চ ও তিন খণ্ডে বিভক্ত, কার্য্য কালে এগুলি একত্রে যোজিত হইলে আমাদের দেশের একটি সরু মুখ ডেকচির আকার ধারণ করে। নাড়ানাড়ির সুবিধার জন্যই এই যন্ত্র এইরূপ বিভক্ত অংশে প্রস্তুত। আমাদের দেশে উৎসবের সময় যেমন বড় বড় উনান প্রস্তুত হয় সেইরূপ উনানের উপর ডেকচিগুলি সারি সারি সজ্জিত হইয়া থাকে। বাষ্প জমাইয়া জল করিবার নল (Refrigerating) কতকগুলি কাষ্ঠ নির্ম্মিত টবের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়, এবং তাহা জলধারা দ্বারা ঠাণ্ডা করা হইয়া থাকে। টব

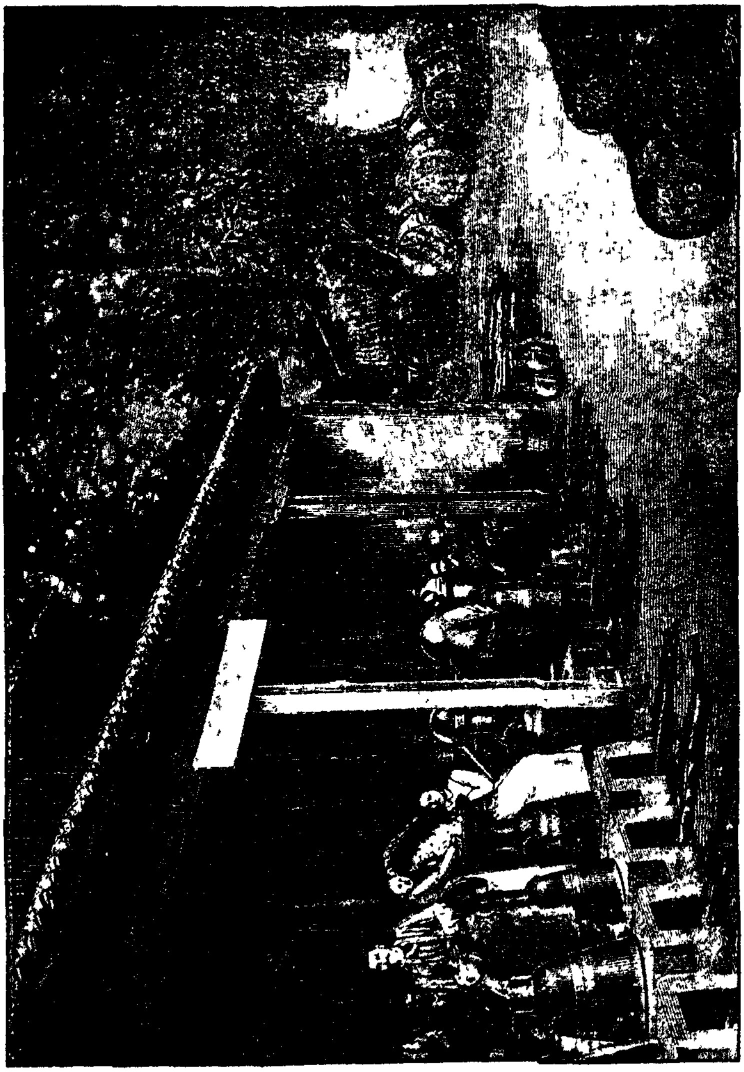
সকলের অপর পার্শ্বস্থ আধারের (flask) সঙ্গে ঐ নল সংযুক্ত থাকে এবং আধারে জমাট বাষ্প গৃহীত হইয়া থাকে। বকযন্ত্রের সমস্ত অংশ সংযোজিত হইলে, ভিতরে



রিফ্রিজারেটিং টব এবং আধার যাহার ভিতর বাষ্প সকল ঘনীভূত হইয়া সংগৃহীত হইয়া থাকে।

পুষ্প ও জল প্রদান করিয়া ইহাকে চুল্লীর উপর স্থাপন পূর্ব্বক উনানে অগ্নি প্রয়োগ করা হয়। জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে উত্তাপ কমাইয়া এক ঘণ্টা কিম্বা দেড় ঘণ্টার পর উত্তাপ সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রকার ক্রিয়ার ফলে ১২ সের আন্দাজ গোলাপ জল পাত্রে সংগৃহীত হয়। তৎপরে অবশিষ্ট জল হইতে সিদ্ধ

গোলাপ ছাঁকিয়া ফেলিয়া পুনরায় উহা টাটকা গোলাপে পূর্ণ করা হয়; এই প্রকারে গোলাপ জল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বদাই সদ্যোচয়িত টাটকা ফুল ব্যবহার করে।



উনানের উপর সজ্জিত বক যন্ত্রে ফুল প্রদান করা হইতেছে।

বাসিফুলে কখনও ভাল গোলাপজল প্রস্তুত হয় না।

গোলাপ জল হইতে আতর পাইবার জন্য ইহাকে পুনরায় চোয়ান হইয়া থাকে; দ্বিতীয় বার চ্যাবণে যে সকল প্রণালী অবলম্বিত হয় তাহার

পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এই স্থানে অসম্ভব। এককথায়, জলের উপর ভাসমান আতরটুকু নানা উপায়ে সংগৃহীত হয়। যাঁহারা গাজিপুরের গোলাপ কারখানা দেখিয়াছেন, এই বিষয়ে সম্ভবতঃ তাহাদের অনেকটা অভিজ্ঞতা থাকিতে পারে। বিশুদ্ধ গোলাপী আতর সামান্য পীতাভ। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে ষ্টিরোপটীন (Steoroptene) অর্থাৎ একপ্রকার গন্ধহীন শ্বেতবর্ণের স্ফটিক (crystalizable) হাইড্রোকার্ব্বাইড (hydrocabide) এবং এক প্রকার তরল পদার্থ geraniol এবং certonellol যাহার প্রধান উপাদান এতদুভয়ের সংমিশ্রণে গোলাপী আতর প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন ইহার সহিত আরো দুই একটী পদার্থ মিশ্রিত আছে, যাহা এখনো জৈব রসায়নবিদগণ নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হন নাই।

বাজারে বিশুদ্ধ গোলাপী আতর এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য বলিলেই হয়। কারণ অতি সামান্য আতর প্রস্তুতের জন্য এত অধিক পুষ্প ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় যে তাহাতে ইহা একেবারে দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়ে।

পরিশেষে আমার এই নিবেদন, কোন ভদ্রলোক গাজিপুরের আতর প্রস্তুত সম্বন্ধে কোন বিবরণী 'ভারতী'তে প্রকাশ করিলে বিশেষ উপকৃত হইব। এই প্রবন্ধের শেষ অংশটুকু অর্থাৎ চ্যাবণ প্রণালীটুকু "লা নাটীর" নামক ফরাসী পত্রিকা হইতে 'ভারতী'র জন্য সংগৃহীত হইল।

শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ।

ধারা।

১

ওগো এমনি ধারাই হয়!
ফুলের যখন হয় প্রয়োজন
ফাগুন-হাওয়াই বয়!
তৃষ্ণা-করুণ বাজ্‌লে কেকা,
শূন্যে ফোটে জলের রেখা,
চুম্বনের পুলক জাগে, দ্যুলোক ভূলোকময়!

২

তোরা ওগো জানিস্ কি পরের
আপন হওয়ার সুখ?
(তোদের) উদাস আঁখি কারেও দেখি'
হয়নি কি উৎসুক?
নূতন প্রেমের নূতন সুখে
হাসি দেখা দ্যায় নি মুখে?
পূর্ণ চাঁদের আলোয় তোদের পূরেনি কি বুক!

৩

যদি কুসুম-শরে হৃদয় বেঁধে
তবে কেঁদ না,
সে যে ফুলের সুখ-পরশ মাঝে
মৃদু বেদনা!
সে যে দিনের দাহে কুঞ্জ-ছায়ে
স্বপ্ন আনে হিন্দোল্ বায়ে,
ঘুমের শেষে আলোর দেশে আধেক চেতনা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

চয়ন।

যবদ্বীপে।

বাতাবিয়া হইতে তোসারী।

(ফেলিসিয়ঁা শালের ফরাসী হইতে)

বাতাবিয়া*।

বুধবার ২৮ নভেম্বর ১৯০০।

বাতাবিয়া একটী বিরাট নগরী—কিংবা একটি বিশাল উদ্যান বলিলেও হয়। সর্ব্বত্রই গাছপালা; সকল বাড়ীরই চারিদিকে উপবন। তাই, বাড়ীর সংলগ্ন ভূমিগুলি অতীব বিস্তৃত; দূরত্বও খুব বেশী। নগরদর্শনে বাহির হইয়া, একপ্রকার লঘু-গঠনের গাড়ীতে বসিয়া, কয়েক ঘণ্টা ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইলাম। দেশী গাড়োয়ান। গাড়োয়ানের সহিত গাড়ীতে পিঠাপিঠি বসিতে হয়। এই গাড়ীর নাম 'সাডো'। চারিদিক হইতে, নগরের উপর দিয়া কতকগুলি খাল গিয়াছে—খালগুলা সিধাভাবে কাটা। আমরা যেন হল্যাণ্ডে আসিয়াছি। এ-গ্রীষ্মপ্রধান দেশের হল্যাণ্ড।

আজ প্রাতে, নগরের যে অঞ্চলগুলি দর্শন করিলাম, সেই সব অঞ্চল আমার স্মৃতিপটে একটা সুস্পষ্ট ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে:—খাল-সঙ্কুল বাতাবী-নগর। খালের ধারে ধারে বিপণি। খালের জল একটু পীতাভ। খালের ধারে বাণিজ্য-কুঠি ও ব্যাঙ্কের যে অঞ্চলটি,—সেই অঞ্চলেই অধিকাংশ য়ুরোপীয়ের বাস। Kœningsplein এই নামে একটা তরুহীন বিশাল ময়দান—তার চারিধারে সুন্দর-সুন্দর হোটেল।

রাস্তায়, দেশীলোকের জনতা। শ্যামবর্ণ, সুগঠিত-শরীর, মুখের অবয়বগুলা খুব পরিস্ফুট। স্ত্রীলোকদের গায়ে আঁটা "সারং" (পরিধান বস্ত্র); কোন কোন রমণীর গঠন এরূপ সুন্দর যে পাথরে-খোদা প্রতিমা বলিলেই হয়। নগরের সমস্ত লোক, খালের পীতাভ জলে সমস্ত দিনই স্নান করিতেছে:—শিশুরা, যুবকেরা, নবযুবতীরা, সকল বয়সের স্ত্রী পুরুষেরাই স্নান করিতেছে। আবার কতকগুলি রমণী কাপড় কাচিতেছে। আর্দ্র বস্ত্র গাত্রে আঁটিয়া ধরায় গঠনের সৌন্দর্য্য দিব্য প্রকাশ পাইতেছে:—এই সব স্নায়িকা ও বস্ত্রধৌতকারিণী রমণীমণ্ডলী—চিত্রবৎ সুশোভনা ও যারপর নাই চিত্তহারিণী।

রাস্তায় অনেক চীনে-লোকও আছে; তাদের মাথায় কোণালু টুপি। লাল কিংবা কালো রেশমি সূতা দিয়া বেণীকে আরও দীর্ঘ করা হইয়াছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ফেরিওয়ালা ক্ষুদ্র দোকানদার:—একটা বাঁশের আগায় তাদের পণ্যদ্রব্য ঝুলাইয়া

---

* এই বাতাবিয়া হইতে বাতাবী-লেবু ভারতবর্ষে প্রথম আনীত হয়।—অনুবাদক।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং কাঠের কর্ত্তাল-সমন্বিত একটা কাঠের যন্ত্র নাড়িয়া ক্রেতাদিগকে আহ্বান করিতেছে।—এইমাত্র একটা হোটেলের সম্মুখে একজন চীনের নিকট হইতে একটা নূতন সাদা পরিচ্ছদ ক্রয় করিলাম; একটু পরেই দেখিতে পাইলাম, উহার গায়ে একটা পুরাতন কালীর দাগ। নূতন বলিয়া চালাইবার জন্য চীনেলোকটা খড়িমাটির প্রলেপ দিয়া ঐ কালীর দাগ সযত্নে ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছে।

অপরাহ্নের শেষভাগে ও সায়াহ্নে, ওলন্দাজ পুরুষ ও ওলন্দাজ রমণীরা গৃহ হইতে বাহির হয়। খোলামাথায় রাস্তায় পদচারণা করে। অধিকাংশ যুবতীর নগ্ন বাহু, অর্দ্ধেক বুক খোলা। কেহ কেহ, নিজ গৃহের সম্মুখে, পাজামা পরিয়া, দেশী পরিচ্ছদ 'সারং' পরিয়া, খাটো রাত-কাপড় (Night-dress) পরিয়া, নগ্ন পায়ে চটিজুতা পরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। য়ুরোপীয় মুখশ্রী ও দেশীয় মুখশ্রীর অপূর্ব্ব মিশ্রণ দেখিয়া মেটে-ফিরিঙ্গিদিগকে বেশ চেনা যায়। কতকগুলি ইস্কুলের বালিকা এইখান দিয়া চলিয়া গেল:—ওলন্দাজ বালিকাদিগের কটা চুল, ও ফিরিঙ্গি বালিকাদিগের কালো চুল,—দুই বিপরীত রং-এর মধুর সম্মিলন।

হোটেল। ওলন্দাজ হোটেলটি এই অত্যুষ্ণ দেশেরই উপযোগী। খাবার ঘরের মাথার উপর ছাদ, কিন্তু চারিদিকে খোলা।—আমাদের ভোজন-শালায়, হল্যাণ্ডের তরুণ-বয়স্কা রাণীর অর্দ্ধকায়িক প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। নগ্নপদে দেশীয় ভৃত্যেরা পরিবেশন ও পরিচর্য্যা করিতেছে।—Kœnings-plein হইতে বৃহৎ খাল পর্য্যন্ত যে গলি গিয়াছে, সেই গলির বরাবর ভোজনশালাগুলি সন্নিবেশিত; ভোজনশালাগুলি খুব বড়, জান্‌লায় শাসি-দরজা নাই;—এই খোলা জান্‌লা দিয়া দিবারাত্রি হাওয়া চলিতেছে। খাটে মশারি আছে, একটা গদি তক্তার মত শক্ত, তার উপর একটা চাদর পাতা। একটা মাথার বালিস, আর দুই পায়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে একটা বালিস—পাছে দুই পায়ের ঘসাঘসিতে বেশি গরম হয়, এই জন্য এই বালিস্। স্নানের ঘরে একটা মস্ত জালা; একটা চতুষ্কোণ কাষ্ঠ-পাত্র দিয়া উহা হইতে ঠাণ্ডা জল উঠাইয়া গায়ে ঢালিতে হয়।

এখানকার একটা রান্না খুব নূতন ধরণের; ভারতীয় ইংরাজদের যেরূপ কারি-ভাত, সেই কারি-ভাত অপেক্ষাও ইহা বেশী বিমিশ্র; বিবিধ চাটনি-রসে সুসিক্ত ও খুব বেশি গরম-মশলা দেওয়া ভাত; সেই ভাতের সহিত নানা-প্রকার মাংস ও শাক শবজি মিশ্রিত;—তার মধ্যে গোমাংস আছে, মহিষ-মাংস আছে, মুর্গির মাংস আছে, মৎস্য আছে, ডিম্ব আছে, আম্‌লেটের টুক্‌রো আছে, সকল জাতীয় শাক্‌সবজি আছে, নারিকেলের গুঁড়া আছে—গরম দিনে যখন অগ্নিমান্দ্য হয়, তখন এই ব্যঞ্জনটা বাস্তবিকই খুব মুখরোচক।

বাতাবিয়ার ওলন্দাজেরা যে নিয়মে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, হোটেলেও প্রায় সেই একই নিয়ম দৃষ্ট হয়:—৬টা ৭টার মধ্যে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান, স্নান, সদুগ্ধ কাফি পান; কাজকর্ম্ম কিংবা পদচারণা; ৯টার সময় চা-এর সঙ্গে 'ঠাণ্ডা' প্রাতরাশ; বাড়ী বসিয়া

কাজকর্ম্ম করা কিংবা গাড়ী করিয়া বেড়ান; একটার সময় মধ্যাহ্ন ভোজন; ২টা হইতে ৪টা ৫টা পর্য্যন্ত দিবানিদ্রা; ৪টা ৫টার মধ্যে স্নান ও চা-পান; ৫টার পর কাজকর্ম্ম কিংবা বেড়ান, ৮টার সময় য়ুরোপীয় ধরণে সায়ংকৃত্য ভোজন।

আজ রাত্রে ফ্রান্সের কন্সল্ আমাকে 'হার্মনি'-ক্লবে লইয়া গিয়া, সকলের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। বাতাবিয়ার এই একমাত্র 'সিভিল' কর্ম্মচারীদিগের ক্লব। ইহা গৃহ-সজ্জায় সুসজ্জিত, ইহার বৈঠকখানা ঘর-গুলি বেশ ঠাণ্ডা, মার্বেল-পাথর বসান। ইহার পঠন-শালাটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এরূপ বিশ্বজাতীয় পাঠাগার আমি আর কোথাও দেখি নাই। ওলন্দাজদিগের কিরূপ অন্তর্জাতীয় জ্ঞানচর্চ্চা এইখানেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়; উহাদের মধ্যে অনেকেই ফরাসী ভাষায়, জর্ম্মান ভাষায়, ইংরাজি ভাষায় কথা কহে; এখানে, শুধু হল্যাণ্ডের নহে—ফ্রান্সের জর্ম্মানির, ইংলণ্ডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদপত্রাদি —সচিত্র সংবাদপত্র, সমালোচনপত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রান্সের Le Figars, Le Gil Blas, La Revue des Deux Mondes, La Revue de Paris, La Nouvelle Revue, Le Mercure de France, E'Illustration, le Theatre—এই সব। টেবিলের উপর, নব আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি, ফরাসি উপন্যাসের মধ্যে Pierre Vebe প্রণীত "Amour Amour." (ভালবাসা) আমি ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম।

এই পুস্তক পাঠ করিতে করিতে মনে হইল যেন আমি আমার স্বজাতীয় লোক-দিগের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিয়াছি; ক্ষণকালের জন্য এখানে আমার যে বৈদেশিক সংস্রব ঘটিয়াছে, এই সংস্রব এখন যেন আরও তীব্ররূপে অনুভব করিতে লাগিলাম। ক্লবের ওলন্দাজেরা চারিদিক হইতে আতাদেশীয় ভৃত্যদিগকে মালাই ভাষায় Spada! Spada! বলিয়া ডাকিতেছে—শুনিয়া আমার আশ্চর্য্য মনে হইতে লাগিল। আবার যখন আমার হোটেলে ফিরিয়া গিয়া গ্রীষ্মদেশ-সুলভ উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিলাম—খালের ধারে ধারে শ্যামবর্ণ মনুষ্য সকল বৃহৎ তরুতলে বসিয়া আছে—তখন আমি বিস্মিত হইলাম।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জীবনস্বামী। (এইটি চয়ন নহে)

শুভ্র বেশ করি শুভ্র মূর্ত্তি ধরি
শুভ্রালোকোপরি কে তুমি বিরাজ'।
দরশ মাগিয়ে রয়েছি জাগিয়ে
তোমারি লাগিয়ে হে হৃদয়-রাজ'।
নিবিড় আঁধারে একা বসি আমি,
তব নাম হৃদে জপেছিনু স্বামী,
নীরব সে বাণী, কেমনে না জানি,
মরম হে তব পরশিল আজ'।
জানিনু হৃদয়ে থাকিয়ে গোপনে,
শুনেছিলে মম মরম বেদনে,
(তাই) আঁধার জীবনে, ভাসায়ে কিরণে,
উদিলে হে আসি এ হৃদয় মাঝ'।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী।

লোকান্তরে জীব-প্রকৃতি।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অভিমত।

আমরা পৃথিবীর উপরে বাস করিয়া অপরাপর গ্রহের অধিবাসী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য চিরদিনই উৎসুক। মানব-সভ্যতার প্রথম অবস্থা হইতে আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন গ্রহের অধিবাসীগণের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফন্‌টেনেল্ (Fontenelle) নামে একজন সুচতুর লেখক জ্যোতিষশাস্ত্রে এক একটি গ্রহের যেরূপ বিশেষ গুণ বা দোষ বর্ণিত হইয়াছে, তিনিও সেই সকল গ্রহবাসীকে তদনুরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বুধগ্রহের অধিবাসিগণ উদ্ধত চঞ্চলপ্রকৃতি, শুক্রগ্রহের অধিবাসিগণ কোমল প্রেমপূর্ণ প্রকৃতি, মঙ্গলগ্রহের অধিবাসিগণ যুদ্ধপ্রবণ কলহলিপ্ত ইত্যাদি। ডাক্তার হোয়েওয়েল্ (Dr. Whewell) সাহেব এই সকল অধিবাসীর আকৃতি পর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

বস্তুতঃপক্ষে লোকান্তরের জীবপ্রকৃতি নির্ণয় করিবার উপযুক্ত কোনও বৈজ্ঞানিকপ্রমাণই নাই। অধিকন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস যে একমাত্র পৃথিবীই সাবয়ব জীবের বাসভূমি। আবার অনেকে বলেন এরূপ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই। তবে আমাদের এই পৃথিবীতে আমরা যেরূপ বিভিন্ন অবস্থায় জীবপুষ্টি দেখিতে পাই, তাহাতে এক চন্দ্রালোক ভিন্ন অন্যান্য গ্রহে তাহার অবস্থা ও প্রকৃতি অনুযায়ী জীব বাস করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

আমাদের এই সৌরজগতে দূরে নিকটে কত বিভিন্ন আকৃতির কত বিভিন্ন প্রকৃতির গ্রহ উপগ্রহই রহিয়াছে। বৃহস্পতি ও শনি যেরূপ দূরে এবং সম্ভবতঃ তাহারা একাল পর্য্যন্ত যেরূপ অত্যধিক উত্তাপময়, তাহাতে তথায় কোন প্রকার জীবের বাস সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আমরা যতটুকু জানি তাহাতে তাহাদের উপগ্রহগুলি জীবলোক হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা। বুধগ্রহ সূর্য্যের যেরূপ সন্নিকটে, তাহাতে তথায় বর্ত্তমান অবস্থায় কোনপ্রকার জীব বাস করে বলিয়াও মনে হয় না। কিন্তু শুক্র ও মঙ্গল এই দুই প্রতিবেশী গ্রহের কথা স্বতন্ত্র।

সময়ে সময়ে শুক্রগ্রহ অপরাপর গ্রহ অপেক্ষা দুই কোটি ষাট লক্ষ মাইল পৃথিবীর নিকটে আসে সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা ইহার সম্বন্ধে অতি অল্পই জানিতে পারিয়াছি। যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহা দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে আমাদের পৃথিবীর ও শুক্রগ্রহের অবস্থা অনেকটা একরূপ। ইহার আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প এবং ইহার গাত্রচিহ্ন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ইহা প্রত্যেক ২৩ ঘণ্টা ২১ মিনিটে একবার করিয়া আপনার মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া যায়। সুতরাং ইহার একদিন প্রায় আমাদের একদিনেরই সমান। জ্যোতিষীগণ অনেক দিন হইতেই বলিয়া আসিতেছেন যে শুক্রগ্রহ উচ্চপর্ব্বতে পরিপূর্ণ। কিছুদিন পূর্ব্বে ইতালি ও অন্যান্য স্থানের জ্যোতিষীগণ ইহার উপরে মহাদেশ ও মহাসাগরের স্পষ্ট চিহ্নও পরিদর্শন করিয়াছেন, এবং সময়ে সময়ে মঙ্গলের মেরুস্থানের ন্যায় ইহার দুইদিকে অত্যুজ্জ্বল দুইটি স্থানও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

শুক্রগ্রহ যখন সূর্য্যের নিকটে আসে, তখন ইহার চতুর্দ্দিক পৃথিবীর অপেক্ষা দ্বিগুণ ঘন বায়ুমণ্ডলে আবৃত দেখিতে পাওয়া যায় এবং আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্যে সেই বায়ুমণ্ডলে জলবাষ্পও দেখিতে পাওয়া যায়। যে অর্দ্ধভাগ সূর্য্যের বিপরীত দিকে অবস্থিত, তথায় আমাদের সূর্য্যহীন মেরু-প্রদেশের স্নিগ্ধ আলোকের ন্যায় এক প্রকার আলোক রশ্মিও দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেকদিন হইতেই শুক্রের উপগ্রহ থাকা না

থাকা সম্বন্ধে অনেকপ্রকার বিরুদ্ধ মত প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। জ্যোতিষীগণের মতে শুক্রের একটি বা ততোধিক উপগ্রহ থাকিলেও সেইটি বা সেইগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। অপর পক্ষে তাহার চন্দ্রের অভাব অনেকাংশে পৃথিবীর দ্বারাই দূর হয়। আমাদের এই অন্ধকার পৃথিবী যে আলোকোজ্জ্বল চন্দ্রের কার্য্য করে, একথা শুনিলে অনেকেই হয় ত বিস্মিত হইবেন। কিন্তু শুক্রের অধিবাসীগণ যদি চক্ষুবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহারা আমাদের পৃথিবীকে চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল দেখে সন্দেহ নাই। শুক্র যে সময়ে পৃথিবীর নিকটতম স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ইহার অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটিই আমরা দেখিতে পাই; কিন্তু পৃথিবীর আলোকিত দিকটি সম্পূর্ণভাবে শুক্রের দিকে ফিরিয়া থাকে বলিয়া সেখান হইতে ইহাকে একটা জ্যোতির্ম্ময় গোলাকার বস্তুর মত দেখায় সন্দেহ নাই।

সূর্য্য হইতে শুক্রের দূরত্ব পৃথিবী হইতে দূরত্বের তিন চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৬ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল; সুতরাং পৃথিবী অপেক্ষা শুক্র সূর্য্য হইতে প্রায় দ্বিগুণ আলোক ও উত্তাপ লাভ করে। কিন্তু আমরা যে, পৃথিবী অপেক্ষা দ্বিগুণ ঘন বায়ুমণ্ডলের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা দ্বারা বোধ হয় এই অতিরিক্ত উত্তাপ ও আলোক অনেকটা নষ্ট হইয়া পড়ে। অতএব জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনুমান শুক্রগ্রহ আমাদেরই এখানকার মত কোনপ্রকার জীবের বাসভূমি।

মঙ্গলগ্রহ শুক্রের অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহার ব্যাস ৪২০০ মাইল, ইহার আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা সাত গুণ কম। সূর্য্য হইতে ইহার দূরত্ব ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ মাইল হইতে ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ মাইলের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হয়। ৬৮৭ দিনে ইহা একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে এবং ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে একবার স্বকীয় মেরুদণ্ডে বিঘূর্ণিত হয়। মঙ্গলের ঋতুগুলি অনেকটা পৃথবীর মত বলিয়াই অনুমিত হয়। ১৮৭৭ সালে জ্যোতিষীগণ ইহার দুইটি চন্দ্র আবিষ্কার করেন, কিন্তু সে দুইটি এত ছোট যে তাহারা যে বিশেষ আলোক দান করিতে পারে এরূপ মনে হয় না।

ছোট একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাই মঙ্গলগাত্রের অনেকগুলি দাগ চোখে পড়ে। বড় যন্ত্রের দ্বারা সেগুলি বেশ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাভাবিক চক্ষে ইহাকে যেরূপ রক্তাক্ত দেখায়, যন্ত্রের দ্বারা দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। কিন্তু রক্তবর্ণের সঙ্গে একটু সবুজ ও বেগুণে বর্ণের আভাও দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটি মেরুর স্থলে দুইটি উজ্জ্বল ধবল চিহ্ন দেখা যায়। সূর্য্যের নৈকট্য ও দূরত্ব অনুসারে, এই উজ্জ্বলতারও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। আমাদের পৃথিবীর তুষারমণ্ডিত মেরুদেশের উজ্জ্বলতারও এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মঙ্গলে এক সময়ে যে সকল চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়, অপর সময়ে সেগুলি প্রায় দেখিতেই পাওয়া যায় না। উপরন্তু অপর কতকগুলি নূতন চিহ্ন দেখা যায়। এ সকল পরিবর্ত্তন সম্ভবতঃ মেঘাবৃত বায়ুমণ্ডলের ফলেই হয়।

১৮৬০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর যেরূপ নিকটে আসিয়াছিল সচরাচর তাহাকে আমাদের এত নিকটে পাওয়া যায় না। ১৮৯২ সালে ইহা একবার এইরূপ নিকটে আসিয়াছিল এবং ১৯২৪ সালে পুনরায় একবার আসিবে। এ বৎসর মঙ্গলগ্রহ পরিদর্শন করিবার জন্য সভ্যজগতের জ্যোতিষীগণ নানাবিধ আয়োজন করিয়াছিলেন। আমেরিকাই এ বিষয়ে অগ্রণী। একজন জ্যোতিষী বেলুনে চড়িয়া পাঁচ ছয় ক্রোশ উর্দ্ধে উঠিয়া আপনাকে এক য়্যালুমিনিয়াম ধাতুর বাক্সের মধ্যে বদ্ধ করিয়া বসিয়া ছিলেন। অনেক জ্যোতিষীর বিশ্বাস যে মঙ্গলবাসিগণ অনেকদিন হইতে পৃথিবীতে তাড়িৎ সংকেত প্রেরণ করিতেছেন। উক্ত জ্যোতিষী সেই সঙ্কেত তাঁহার তাড়িৎ-যন্ত্রে গ্রহণ করিবার জন্য আকাশে উঠিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। আর একজন জ্যোতিষী এক বিরাট আয়না লইয়া মঙ্গলবাসীকে সঙ্কেত করিবার জন্য বসিয়া ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় পৃথিবীর কোন জ্যোতিষীই এবার

কোন নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারেন নাই,—কখনও পারিবেন কি না তাহাও কল্পনা করা কঠিন।

অধ্যাপক রবার্টসের অভিমত।

প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী রবার্টস (A. M. Roberts) সাহেবের মতে মঙ্গলে জীব থাকিলেও পৃথিবী হইতে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা বা তাহাদের সহিত আলাপ করা অসম্ভব। তিনি বলেন, মঙ্গল যখন সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটে আসে তখনও ইহা সূর্য্য হইতে ১২ কোটি ২২ লক্ষ মাইল দূরে থাকে এবং যখন সে সূর্য্য হইতে দূরে যায় তখন প্রায় ১৫ কোটি ৪৬ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করে। এক্ষণে যদি আমরা সূর্য্য হইতে মঙ্গলের নিকটতম দূরত্ব এবং সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব বাদ দিই, তাহা হইলে দেখিতে পাই পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে ব্যবধান ৩ কোটি ৫০ লক্ষ মাইলেরও অধিক। দুই সহস্রগুণ বৃহত্তর দেখায় এরূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখিলেও আমরা মঙ্গলকে স্বাভাবিক চক্ষে ১৮ হাজার মাইল দূরের বস্তুর ন্যায় দেখিব। তদ্ভিন্ন মঙ্গলের চতুর্দ্দিক দুইশত মাইল গভীর ঘন বায়ুমণ্ডলে আবৃত। এরূপ স্থলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে সঙ্কেতের আদান প্রদান কি প্রকারে সম্ভব? ১৮ হাজার মাইল দূর হইতে স্বাভাবিক চক্ষে দেখিতে হইলে সঙ্কেত বস্তুটা কত বড় বিরাট হওয়া আবশ্যক! তা ছাড়া যাঁহারা মঙ্গলের সহিত সৌখ্যস্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব তাঁহারা এই সহজ সত্যটি বিস্মৃত হন যে, মঙ্গল যখন আমাদের নিকট সুস্পষ্ট, পৃথিবী তখন তাহার নিকট একেবারেই দৃষ্টির অগোচর। দিবালোকে আমরা যেমন মঙ্গলকে দেখিতে পাই না, মঙ্গলের পক্ষেও দিবাকালে পৃথিবীকে দেখা অসম্ভব। আমাদের যে সময়ে রাত্রি, মঙ্গল সে সময়ে সূর্য্যকিরণে নিমজ্জিত। সুতরাং গত সেপ্টেম্বরে যদি আমরা সমস্ত পৃথিবীটাকে আগুন লাগাইয়া জ্বালাইয়া দিতাম, তাহা হইলে, সে সংবাদও মঙ্গলে উপস্থিত হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকিত না।

সঙ্কেত প্রেরণের পক্ষে মঙ্গল পৃথিবী হইতে বহুদূরে হইলেও অধ্যাপক লাওয়েলের (Lowell) অশ্রান্ত আত্মোৎসর্গের ফলে আমরা ইহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছি। বস্তুত পক্ষে আমাদের এ সৌর জগতের মধ্যে অপরাপর গ্রহ অপেক্ষা মঙ্গলকেই আমরা অধিক করিয়া জানি। আমরা জানি ইহার দিবারাত্র প্রায় ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ঋতু সকল আমাদের পৃথিবীরই মত। ইহার বৎসর আমাদের প্রায় দ্বিগুণ বটে, কিন্তু তাহাতে জীব সম্ভাবনার কোনও বাধার কারণ নাই। পৃথিবীতে সহস্র দিনে বৎসর হইলেও মানুষ অতি সহজেই আপনাকে সেই দীর্ঘ বৎসরের উপযোগী করিয়া লইতে পারিত। তারপর মঙ্গলের মেরুস্থল তুষার মণ্ডিত, অন্তত আমরা তাহাকে এক্ষণে তুষার বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। এই তুষার দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে তথায় বাষ্প বর্ত্তমান এবং বায়ু ভিন্ন বাষ্প থাকাও সম্ভব নয়। ইহা যে কেবল আমাদের অনুমান তাহা নহে, আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্রের দ্বারা মঙ্গলের চতুর্দ্দিকে বাষ্পের অস্তিত্ব বার বার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মঙ্গলে আমাদিগেরই ন্যায় দিবারাত্রি, শীত গ্রীষ্ম, শিশির তুষার, মন্দ সমীরণ এবং শ্যামল উদ্ভিদ বর্ত্তমান। এ সকল দিক দিয়া দেখিলে আমরা উভয়েই এক প্রকৃতির, কিন্তু অপর দিক দিয়া দেখিলে পার্থক্যও বিষম।

একটা দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাউক। মঙ্গলের ব্যাস পৃথিবীর অর্দ্ধেকের অপেক্ষা কিছু অধিক অর্থাৎ ৪৩২০ মাইল এবং ইহার পরমাণুর ঘনত্বও পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক। অর্থাৎ তথায় ভূমধ্যাকর্ষণ শক্তি এখানকার প্রায় এক তৃতীয়াংশ। ভূমধ্যাকর্ষণ যত অল্প হয় বায়ুও তত লঘু হয়। সুতরাং তথাকার সাধারণ বায়ু আমাদের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের বায়ুর ন্যায় লঘু। ইহাও আমাদের অনুমান নয়। দূরবীক্ষণ ও আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্র দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল আমাদের অপেক্ষা প্রায় দশগুণ লঘু। এরূপ লঘু বায়ুতে জীবনধারণ সম্ভব কি না তাহা বলিবার সাহস

আমাদের নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে আমাদের ন্যায় জীবের তথায় জীবনধারণ অসম্ভব।

কিন্তু এই লঘুতার ফল কেবল এই একটিই নহে। তথায় আমাদের এখানকার অপেক্ষা প্রায় অর্দ্ধেক উত্তাপেই জল ফুটিয়া উঠে সত্য, কিন্তু এই লঘুতার ফলে তথাকার জলাশয় বা খালের জল বাষ্পে পরিণত হয় না বলিলেই হয়। সুতরাং দিবসের দুর্জ্জয় সূর্য্যতাপ ও রাত্রের দুঃসহ শৈত্য হইতে রক্ষা করিতে পারে এরূপ মেঘের তথায় সৃষ্টিই হয় না। আমরা সকল সময়েই যে মঙ্গলের গাত্ররেখাগুলি অবাধভাবে দেখিতে পাই, তাহার দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে তথায় মেঘের অস্তিত্ব নাই। তদ্ভিন্ন যে কৃষ্ণবর্ণ বিস্তৃত চিহ্নগুলিকে এক সময়ে জ্যোতিষীগণ সমুদ্র বলিয়া মনে করিতেন, এক্ষণে তাহা উদ্ভিদ চিহ্ন বলিয়াই জানা গিয়াছে। এ অবস্থায় তথায় জল থাকিলেও তাহা মেরুস্থল, খাল ও সংকীর্ণ নদীর মধ্যেই আবদ্ধ আছে।

অতএব মনুষ্যের পক্ষে মঙ্গলগ্রহ এক ভীষণ জলহীন, বায়ুহীন মেঘহীন মরুপ্রান্তর বলিলেও হয়। তা ছাড়া সমস্ত গ্রহটাই এত বৈচিত্র্যবিহীন যে আমাদের পক্ষে তথায় বাস করা অসম্ভব। চারিদিকই সমতল, কোথাও পর্ব্বতের চিহ্নমাত্রও নাই,—কেবলই বিস্তীর্ণ সমতল দেশ, মধ্যে মধ্যে এক একটি রেখার দ্বারা বিভক্ত। এই রেখাগুলিকে আমরা পৃথিবীতে বসিয়া জলপ্রণালী বলিয়া অনুমান করিতেছি মাত্র, সে দেশে থাকিলে এগুলিকে কোন্ নামে অভিহিত করিতাম সে কথা স্বতন্ত্র। তারপর, চঞ্চল স্বাস্থ্যকর সমুদ্র বলিয়া সেখানে কিছুই নাই; চিরপ্রবাহিনী স্রোতস্বিনী নাই; সৌন্দর্য্যময় সরোবর নাই। চতুর্দ্দিক মৃতের ন্যায় বৈচিত্র্যবিহীন, তিনকোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাইল দূরে বসিয়া ভাবিলেও হৃৎকম্প হয়।

এরূপ দেশে জীব থাকিলেও তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি, চিন্তা ও অবস্থা মনুষ্য হইতে এতই বিভিন্ন যে সম্ভব হইলেও তাহাদিগের সহিত ভাব বিনিময় করিতে পরস্পরকে আরও শত শত শতাব্দী অপেক্ষা করিতে হইবে বলিয়াই মনে হয়।

অধ্যাপক সার্ভিসের অভিমত।

এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। অধ্যাপক সারভিস্ (Serviss) বলেন যে মঙ্গলের কতকগুলি ভূমি বড়ই জটিল প্রণালীতে গঠিত এবং এগুলি সে দেশের মনুষ্যের বাসস্থান বলিয়াই মনে হয়। গ্রহের প্রকৃতি অনুসারে সম্ভবত মঙ্গলবাসী এই সকল সংকীর্ণ স্থানে সম্বদ্ধ হইয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই সকল স্থানের জীবসংখ্যা যৎপরোনাস্তি অধিক বলিয়াই বোধ হয়। অনেকে অনুমান করেন, মঙ্গলবাসীর দেহ অতি বিরাট এবং জীবনধারণের জন্য তাহারা অনন্তকাল পরস্পরের সহিত কঠোর সংগ্রামে নিযুক্ত, যে জয়ী হইতেছে সেই জীবন ধারণের অধিকারী হইতেছে, 'জোর যার মুলুক' তার। আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি যে এই সকল লোকবহুল সংকীর্ণভূমি বা নগরীর মধ্যে আত্মরক্ষার চেষ্টার অন্ত নাই, এবং বসন্তের প্রথম বাতাসে বহুদিনবাঞ্ছিত বারিধারা যখন সুদূর মেরুদেশ হইতে বহিতে আরম্ভ করে, তখন নানাপ্রকার প্রণালী দ্বারা তাহা আপন আপন ক্ষেত্রে ও গৃহে লইবার জন্য তথায় কি উন্মত্ত চেষ্টারই অভিনয় হয় এবং উদ্বৃত্ত জলকে সঞ্চিত রাখিবার জন্য কি আয়োজন ও চিন্তারই আবশ্যক হইয়া পড়ে। আবার শুষ্ক ভূমি সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, শুষ্ক ক্ষেত্র শস্যশ্যামল হইয়া উঠে এবং নবজীবনের অমৃতস্পর্শে সমগ্র জীবলোক চঞ্চল ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

আমাদের এই যাবতীয় অনুমান হয়ত সমস্তই ভুল। মঙ্গলবাসীর পক্ষে এ বর্ণনা পাঠ করিলে হয় ত হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিবে। আমরা তাহাদিগের সম্বন্ধে যতটুকু জানি আমাদিগের সম্বন্ধে তাহাদের তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক জানাও কিছুই আশ্চর্য্য নহে। বিধাতার এ বিপুল রাজ্যে কি সম্ভব আর কি অসম্ভব তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার অধিকার আমাদের মোটেই নাই। পৃথিবীর অবস্থার

অভিজ্ঞতা হইতে আমরা যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছি, বিধাতার অনন্ত বিধানে তাহা সম্ভব হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে।

শ্রীসুখময়

অধ্যাপক পার্সিভাল লোয়েল সম্প্রতি মঙ্গলগ্রহে আরও একটী খাল (Canal) দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস মঙ্গলে বসতি আছে।

কিন্তু মিউডনে মশিয়ো আণ্টোনার্ডি একটী ৩০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে অধ্যাপক লোয়েল যেগুলিকে খাল বলিতেছেন সেগুলি ছায়া মাত্র। ছায়াগুলি যে কিসের তাহা আণ্টোনার্ডি স্থির করিতে পারেন নাই। তাহার যে সকল প্রতিকৃতি লইয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তাহা স্পষ্ট সীমা নির্দ্দেশক রেখা নহে। ইয়ার্কিস (Yerkes) মানমন্দিরে কর্তৃপক্ষগণও আণ্টোনার্ডির সহিত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কালিফর্ণিয়ার অন্তর্গত উইলসন মানমন্দিরে একটী ৬০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ সহকারে অধ্যাপক হেল মঙ্গলের অনেকগুলি চিত্র লইয়াছেন। এই চিত্রের ছায়া ও আণ্টোনার্ডি গৃহীত চিত্রের ছায়া একই প্রকার। আমেরিকায় ১০০ শত ইঞ্চি মুখবিশিষ্ট একটী দূরবীক্ষণ প্রস্তুত হইতেছে। আশা করা যায় ইহাতে মঙ্গলের ছবি আরও পরিস্ফুট হইবে।

Journal of the British Astronomical Association নামক পত্রিকায় মণ্ডার (Maunder) সাহেব পৃথিবী এবং মঙ্গলের আকারাদির তুলনা করিয়াছেন।

	পৃথিবী	মঙ্গল
ব্যাসরেখা	৭৯২০ মাইল	৪২০০ মাইল
উপরিভাগ	১৯৭০০০০০০ বর্গ মাইল	৫৫৯০০০০০০ বর্গ মাইল
আয়তন	২৬০,০০০,০০০ কিউবিক মাইল	৩৯০,০০০,০০ কিউবিক মাইল

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পৃথিবী মঙ্গল অপেক্ষা শুধু যে আয়তনে বড় তাহা নয় স্বাস্থ্য হিসাবেও আমরা সুখে আছি। মঙ্গল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। মিঃ মণ্ডার এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে—রাত্রিকাল মঙ্গলে এত ঠাণ্ডা যে পৃথিবীর মধ্যে কোন স্থলই তত ঠাণ্ডা নয় এবং সেরূপ ঠাণ্ডায় সকল জলই জমিয়া যায়। দিনে আবার এত গরম যে জল বাষ্পে পরিণত হইতে দেরী লাগে না। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে আমাদের মত জীবের পক্ষে মঙ্গল বিশেষ লোভনীয় স্থান নহে।

শ্রীভট্ট।

চসারের পরিণয়। গল্প।

(ইংরাজি হইতে)

ইয়ুরোপে যেরূপ হোমার ইংলণ্ডে সেইরূপ চসারই আদি কবি। তাঁহার পূর্ব্বে যে সে দেশে কবিতা বা কবি ছিল না তাহা নহে, কিন্তু তিনিই সর্ব্ব প্রথম কবিতাকে কাব্যাকার প্রদান করিয়া তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকে গমন করেন। তিনি যে কেবল কবি ছিলেন তাহা নহে তাঁহার কালের তিনি একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা, বীর, রাজনীতিজ্ঞ, ও রাজসভাসদ ছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ও তাঁহার পরিবাবর্গের তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

ইংলণ্ডের আদি কবি চসারের কবিত্ব মাধুর্য্য ও কল্পনা প্রাচুর্য্য তাঁহার স্মৃতিটিকে আজিও অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এক সুন্দরী যুবতীকে ভাল বাসিতেন। যুবতী বহুকাল তাঁহার প্রেমকে উপেক্ষা করিয়া অবশেষে স্বীয় প্রভু রাজপুত্রের কৌশলে চসারের সহিত পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হন।

প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে হেমন্তের স্নিগ্ধশীতল প্রভাতে একদল উচ্চপদস্থ লোক

এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে ছিলেন। এই প্রান্তর এখন রিচ্‌মণ্ড্ পুষ্পোদ্যান নামে প্রসিদ্ধ। রাজপুত্র জন্ অফ্ গণ্ট্ তাঁহার রূপবতী পত্নী ডাচেস্ ব্লান্‌চেকে সঙ্গে লইয়া রিচ্‌মণ্ডের দুগ্ধশুভ্র মর্ম্মর প্রাসাদে ইংলণ্ডের প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি পিতা তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের নিকট যাইতে ছিলেন। তাঁহার সহচর অনুচর ভৃত্য ও সৈনিকে সেই সুদীর্ঘপথ পরিপূর্ণ। রাজপুত্র ও তাঁহার অনুচরবর্গের পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্য এতই অধিক যে তাহার নিকট হেমন্ত সূর্য্যের রক্তরাগে সুবর্ণরঞ্জিত পল্লব শোভাও পরাজিত হইয়াছিল। বসনভূষণের বাহুল্য-গৌরব সে যুগের ইংরাজগণের একটা বিশেষত্ব ছিল।

এই বেশভূষার বাহুল্যের মধ্যে কেবল এক ব্যক্তির বেশভূষা অতি সহজ ও সাধারণ। তাঁহার দেহখানি যৌবন তেজে দীপ্ত, নয়ন দুইটি একটা গভীর গাম্ভীর্য্য ময়; আকৃতিটি বেশ প্রফুল্ল মনোহর।

রাজপুত্রের সম্মুখ ও পশ্চাতের সশস্ত্র অশ্বারোহী প্রহরিগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া ধীর গতিতে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে ছিল, সেই অবকাশে এই দরিদ্র বেশধারী রাজানুচর রাজপুত্রকে ত্যাগ করিয়া সহসা অশ্বতাড়নায় ডাচেসের একটি সহচরীর নিকট আসিলেন। সুন্দরীর অশ্ব পদে আঘাত পাইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

"আপনি ও প্রকারে আমার অশ্ববল্গা ধরিলেন কিসের জন্য? আপনি কি মনে করেন আমি নিজে একটা দুষ্ট অশ্বকে শাসন করিতে পারি না?" কথাগুলি বলিতে বলিতে মহিলাটির গণ্ডদ্বয় ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিল।

চসার অপরাধীর ন্যায় কাতরদৃষ্টিতে উত্তর করিলেন—"তা নয় ফিলিপা, আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি বিপন্না হইয়াছ। এ অশ্বটি সত্যই খুব ভাল, কেন না ইহা আমাকে তোমার পার্শ্বে আনয়ন করিয়াছে, এবং আমাদের দুই জনকেই দলের ভিড়ের মধ্য হইতে দূরে আনিয়া ফেলিয়াছে।"

"সে কেবল অশ্ব ও আপনি উভয়েই নির্ব্বোধ বলিয়া।"

"ফিলিপা, তোমার কথাগুলি বড়ই নিষ্ঠুর।"

"সেটা কেবল আমি আপনার প্রতি দয়া প্রকাশ করতে চাই, সেই জন্য।"

"সে কিরূপ দয়া, সুন্দরি?"

"অর্থাৎ যাহাতে আপনি আমার নিষ্ফল অনুসরণে আপনার পৌরুষ আর বৃথা নষ্ট না করেন। আপনাকে এ কথা কি আমি পূর্ব্বে সহস্রবার বলি নাই?"

"হাঁ, কিন্তু আরও সহস্রবার বলিলেও আমি তোমার অনুসরণে নিবৃত্ত হইব না, তবুও আশা করিব জীবনে কোনও একদিন হয়ত তুমি সদয় হইয়া আমাকে মিষ্টভাষে সম্বোধন করিবে। তোমারই ঐ দুটি স্নিগ্ধ নয়ন লক্ষ্য করিয়া সেদিন যে কবিতা লিখিয়াছিলাম, তাহাতে কি আমার মনের এই কথারই আভাষ ছিল না?"

"দেখুন আপনার প্রেমোচ্ছাসের ছন্দ অতি মধুর হইলেও তাহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ, কারণ আমি আপনাকে ভালই বাসি না।"

"প্রিয়তমা ফিলিপা ও কথা বলিও না। আজ সাত বৎসর ধরিয়া আমি যে তোমাকে

কিরূপ প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেছি, তাহা ত তোমার অবিদিত নাই। পুষ্প যেমন সূর্য্যকিরণকে ভালবাসে, যোদ্ধা যেমন গৌরবকে ভালবাসে, ভক্ত যেমন তার আরাধ্য দেবতাকে ভালবাসে, আমিও যে এতদিন তোমাকে তেমনি ভালবাসিয়াছি ফিলিপা।"

"একের প্রেম যদি অপরের প্রাণে প্রেম-সঞ্চার করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে এতদিনে আমার তোমাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করা উচিত ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু কৈ আমি তোমাকে আজিও ত ভালবাসিতে পারিলাম না, বোধ হয় কখনও পারিব না; তোমার এই অনুসরণ আমাকে যন্ত্রণা দেয় মাত্র।"

কথাগুলি যেমন নিষ্ঠুর, তাহা প্রকাশের স্বরও তেমনি কঠোর। অপর কাহাকেও বলিলে, এইখানেই তাহার সকল আশা ভরসা চূর্ণ হইত। কিন্তু চসারের প্রেমময় হৃদয় অসীম অধ্যবসায়পূর্ণ। তাহার প্রাণ ব্যর্থতাকে স্বীকার করিতে বা আশাকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে কোনমতেই প্রস্তুত নহে।

চসার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিন্তু ফিলিপা, তুমি আর কাহাকেও ভালবাস না ত'?"

সুন্দরী প্রথমে একটু ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"তুমি কি আমার গুরু যে তোমার নিকট সে কথা প্রকাশ করিতে হইবে?" পরক্ষণেই যেন আপনার কঠোরতায় ঈষৎ অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন—"কলহে আবশ্যক নাই, আমাদের চিরদিনের সদ্ভাব যেন সমভাবেই থাকে। আমি আর কাহাকেও ভালবাসি না এবং ভবিষ্যতে বাসিবও না তাহা নিশ্চিৎ। বিধাতা আমাকে ভালবাসার শক্তি দিয়া সৃজন করেন নাই। আজ তবে এখন বিদায়; দেখিও রাজসভা মধ্যে যেন আমাকে আর বিরক্ত বা লজ্জিত করিও না।"

(২)

রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকেই চাঞ্চল্য ও কোলাহল। অর্থ, যশ, বা সম্মান লাভের জন্য সকলেই ব্যগ্র। সেই কোলাহলের মধ্যে জিয়ফ্রে চসার প্রাসাদ প্রাচীরে হেলিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন। নিকটে ও দূরে ভেরী নিনাদ উঠিতেছে, অদূরে কেহ উচ্চ হাস্য করিতেছে, কেহ আদেশ করিতেছে, কেহ বা অশ্ব লইয়া সবেগে অগ্রসর হইতেছে। চতুর্দ্দিকে সৈনিকগণ, যোদ্ধৃগণ ও মহিলাগণ যাতায়াত করিতেছে।

চসার ধ্যানরত প্রতিমামূর্ত্তির ন্যায় সেই প্রাসাদের এক নিভৃত পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আজ একটু শান্তি লাভের জন্যই তিনি এই জনহীন স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকের এই অশান্ত কোলাহল আজ তাঁহার অন্তরকে কোন মতেই বিক্ষিপ্ত করিতে পারিতেছে না। আজ ইংলণ্ডের প্রথম স্বভাব কবির সম্মুখে প্রকৃতি তাহার মনোহর সৌন্দর্য্যশোভা লইয়া অবতীর্ণা। মুগ্ধ কবির নয়ন সেই সৌন্দর্য্য রসপানে এতই আত্মহারা যে তাঁহার শ্রবণ পর্য্যন্ত আজ বধির।

এমন সময়ে পশ্চাতে একজন বলিয়া উঠিল—"তা হ'লে কবিবর, তোমার প্রেম-পীড়া এখনও তোমায় ছাড়ে নি?"

কবিবর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন বক্তা স্বয়ং রাজপুত্র।

"রাজপুত্র, আমি প্রেমের দাস সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া আমার কোনও পীড়া নাই।"

"কিন্তু তবুও তুমি দেখ্ছি নির্জ্জনতা ভালবাস এবং আমার বিশ্বাস তোমার মনটাও যে খুব প্রফুল্ল তা নয়।"

"না রাজপুত্র। যে ব্যক্তি একই নারীকে সাত বৎসর ধরিয়া ভালবাসিয়া তাহার নিষ্ঠুর অসম্মতি ভিন্ন আর কিছুই পায় নাই, কিন্তু তথাপি আজিও যে তাহাকে পাইবার আশা ত্যাগ করে নাই, তাহার মনে বিষণ্ণতা স্থান পাইবার আর কোন আশঙ্কাই নাই।"

"তা সত্য, অধিকাংশ পুরুষের প্রাণে এ অবস্থায় ভালবাসার পর্য্যন্ত স্থান পাওয়া কঠিন হইত।"

"কিন্তু আপনি বা আমি সেরূপ পুরুষ নহি।"

"আমি নহি সত্য, কিন্তু ডচেস্ ব্লান্‌চের ন্যায় আর দ্বিতীয় ললনা এ পৃথিবীতে কোথায়? আমার মনে হয় স্বর্গেও তার মত দেবী আছে কিনা সন্দেহ। এ পৃথিবীতে ত নাই-ই।

কবি নত হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মতি জানাইলেন।

"এবং চসার, তুমি তার জন্য যে প্রার্থনাটি লিখিয়া দিয়াছ, তাহার জন্য তিনি তোমাকে ধন্যবাদ জানাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তোমার ছন্দের সুরে তাঁহার প্রার্থনাটি পর্য্যন্ত মধুর হইয়া উঠে।"

কবি আরও নত হইয়া উত্তর করিলেন—"তাঁহার প্রশংসার ন্যায় মধুর এ সংসারে আর কিছুই নাই।"

"কেন, তোমার ফিলিপার হাসি?

"রাজপুত্র এ অধমের ভাগ্যে তাহার হাসিলাভ এ পর্য্যন্ত কখনও ঘটে নাই।"

"আর কাহারও ঘটে নাই বলিয়াও আমার বিশ্বাস। তুমি কি জান না, এতকাল তাহার কাছে থাকিয়াও কি তুমি বুঝিতে পার নাই, যে সেই কৃষ্ণকেশী, হরিণ-নয়না সুন্দরীটি একটু কলহপ্রিয়া?"

"রাজপুত্র, আমার প্রাণে সে কথা স্থান পায় না, কারণ আমি তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসি; যতদিন জীবিত থাকিব বাসিব। আমার আর অন্য পথ নাই।"

"এবং চিরদিন ছন্দোবন্দে তাহার প্রেমভিক্ষা করিতে থাকিবে। কিন্তু আমি তোমাকে অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিব। যে তোমার প্রেমকে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করে তাহার উদ্দেশে কবিতা লেখা যখন ফরাসী-দেশে বন্দী ছিলে তখনকার পক্ষে হয়ত উপযুক্ত ছিল, কিন্তু একজন স্বাধীন ব্যক্তির এরূপ ভিক্ষাবৃত্তি অসহ্য। তোমাকে আমার সহিত যাইতেই হইবে।"

চসারের প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার এ কথার অর্থ কি, রাজপুত্র?

"আমার কথার অর্থ এই যে, আমি তোমাকে রাজার নিকট হইতে ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিব। আমার ভ্রাতা লিওনেলের বিবাহস্থলে তোমাকে আমার অনুচর হইয়া যাইতে হইবে। ইতালীতে যাইয়া কত বড় বড় যোদ্ধা ও কবি দেখিতে পাইবে; শুনিতে পাই সেখানে নাকি ঐ দুইটি জিনিষই খুব সহজ প্রাপ্য।

(৩)

রাজপুত্র চসারকে লইয়া ইতালিযাত্রা

করিয়াছেন। ডাচেস্ ব্লান্‌চে সহচরিগণকে লইয়া উদ্যান ভবনে বাস করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে ইতালি হইতে রাজপুত্রের সংবাদ লইয়া পত্রবাহক ডচেসের নিকট উপস্থিত হয়। তৎসঙ্গে অন্যান্য দুইচারখানা ক্ষুদ্র পত্রও অন্য দুইচারিজনের নামে থাকে। চসার যতগুলি পত্র লিখিতেন তাহার অধিকাংশই তাঁহার চিরপ্রিয়া প্রেমহীনা ফিলিপার উদ্দেশেই লিখিত।

ক্রমে শীত যাইয়া বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিন ফুলগন্ধ আমোদিত, বিহঙ্গকুল-কূজনিত মধুর প্রভাতে ডাচেস্ কয়েকজন সহচরীকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানভ্রমণে বাহির হইলেন। কিছুদূর যাইয়া রমণীগণ এক কুঞ্জ বিতানের ছায়াতলে শ্যামল তৃণোপরি বহুমূল্য বস্ত্র বিছাইয়া উপবেশন করিলেন। ডাচেস্ মধ্যস্থলে, সহচরিগণ চতুর্দ্দিকে।

এমন সময়ে একজন আমোদপ্রিয়া সহচরী বলিয়া উঠিল—"আমি কুঞ্জের ধারে একটা জিনিষ কুড়াইয়া পাইয়াছি। জিনিষটা কাহার তা বলিতে পারি না, উপরের নামটা পড়িতে পারিতেছি না।" বলিয়া, অর্থপূর্ণ কটাক্ষে ডাচেসের হস্তে একখানি ক্ষুদ্র পত্র দিল। ফিলিপা ব্যস্ত হইয়া সেটি কাড়িয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইল। ডাচেস তাহাকে বিরত করিয়া বলিলেন—"ছি ফিলিপা, ওরকম অসভ্যতা করিতে নাই।" এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে পত্রখানি খুলিয়া দেখিলেন তাহাতে দুইটি ছত্র কবিতা লেখা রহিয়াছে—

দুখেরে এতই আমি করেছি আপন,
সুখ সদা আমা হতে করে পলায়ন।

এই দুই ছত্র পড়িয়াই ডাচেস্ বলিয়া উঠিলেন—"ফিলিপা, এ পত্র তোমার। কাব্যে প্রেম জানাইবার আমাদের কেহই নাই।"

ফিলিপা ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া পত্রখানি তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল, এবং মাথা নত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তাহার অশ্রু দেখিয়া কাহারই দয়া হইল না।

একজন জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা ভাই, কবিরা এত দুঃখী হয় কেন বল দেখি?"

অপর একজন উত্তর করিল—"এ আর বুঝ্‌তে পার না, বেচারারা এতই নির্ব্বোধ যে ফিলিপার মত নিষ্ঠুর স্ত্রীলোককে ভিন্ন ভালবাসতে জানে না।" পত্রখানি যে প্রথমে বাহির করিয়াছিল সে বলিয়া উঠিল—'আহা চসার যদি আমাকে বিবাহ করিত?

ডাচেস্ বলিলেন—"তার আর কি, রাজপুত্রের সঙ্গে ফিরে এলেই তাঁকে বল্‌ব এখন; অবশ্য যদি তার আগেই ইতালীতে কাহাকেও বিবাহ না করিয়া বসেন।"

ফিলিপা নিমেষ মধ্যেই চক্ষের জল মুছিয়া বেশ হাসিমুখ ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার এ ভাবান্তরে কেহ উপহাসক্ষান্ত হইল না। সেকালে স্ত্রীলোকেরা পরস্পরের প্রাণের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে জানিতেন না।

একজন বলিয়া উঠিল—"তা সে ইতালীতেই বিবাহ করুক আর এখানেই করুক, ফিলিপাকে যেন না করে। মুখ পোড়াবার ভয় যদি না থাকে তবেই সে আবার ফিলিপাকে পাবার জন্য ব্যস্ত হবে।"

ফিলিপা এক চপেটাঘাতে তাহার এ কথায় উত্তর দান করিত, কেবল ডাচেস্

হাত তুলিয়া নিবারণ করিলেন বলিয়াই সহচরীটি সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া গেল।

ডাচেস্ বলিয়া উঠিলেন—"এস ভাই, আমাদের আর ঝগড়া বা মারামারীতে কাজ নাই। চসার এখানে উপস্থিত থাকলে যা ক'রতেন আমরাও সেই রকম করি এস। ফিলিপার এতদিনে বিবাহ হওয়া উচিত ছিল। এস আজ আমরা ওর বিবাহটা শেষ করে ফেলি।"

(৪)

ডাচেসের উদ্যান-ভবন আজ আনন্দ-মুখরিত। নরনারী সকলেই আজ শোভন পরিচ্ছদে সুসজ্জিত। প্রাসাদপ্রাচীরের চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডায়মান। প্রতিবেশী প্রজাগণ ভয়ে ভয়ে উদ্যানের কিছুদূরে সমবেত।

ডাচেস্ ব্ল্যান্চে একটি মুক্ত বাতায়নপথ হইতে নত হইয়া তাঁহার অশ্বসজ্জিত করিবার আদেশ দিলেন। আজ সহচরী পরিবৃতা হইয়া তিনি স্বামীকে স্বাগত করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন। বাতায়ন পথ হইতে তাঁহার ক্ষীণ তনুটি বঙ্কিম ভঙ্গীতে যখন হেলিয়া পড়িল, তখন তাঁহাকে যেন প্রভাত কিরণের রশ্মিরেখার মত দেখাইতে লাগিল, তেমনি স্নিগ্ধ, সতেজ, সুন্দর, তেমনি আনন্দরাগে রঞ্জিত!

সকল সহচরী যখন সমবেত হইল ডাচেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফিলিপা কোথায়?"

ফিলিপা কোথায় কেহই জানে না। "তাকে রহস্য ক'রে প্রেমের দরবারে শাস্তিদান করব বলেছি, তাই দেখছি সে লুকিয়ে আছে। তাকে খুঁজে নিয়ে এসো।"

কিন্তু তাহারা ফিলিপাকে খুঁজিয়া পাইবে কোথায়? প্রথম ভেরীনিনাদে রাজপুত্রের আগমনবার্ত্তা যে মুহূর্ত্তে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তেই ফিলিপা গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গেল। ডাচেসের নিকট যাহা সামান্য পরিহাস বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহার অন্তরে তাহা মর্ম্মান্তিক আঘাতের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল। জোর করিয়া তাহার বিবাহ দেওয়া? আর সে বিবাহ কাহার সহিত? রাজপুত্রের অনুচরগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হীনপদস্থ এক ব্যক্তির সহিত! এ বিবাহ অত্যাচার ও অপমান! সে আজ সর্ব্বপ্রথম রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তাঁহার সম্মুখে সে আজ জানু পাতিয়া বসিয়া বিচার ও সাহায্য প্রার্থনা করিবে।

সুতরাং রাজপুত্রের দলবল যেই দৃষ্টিগোচর হইল, অমনি তাঁহার সম্মুখে দুই হাত বাড়াইয়া এক আলুলায়িতকেশ রমণী আসিয়া দাঁড়াইল।

ডাচেস্ তাঁহার জন্য ব্যাকুলচিত্তে অপেক্ষা করিবেন জানিয়া এবং নিজেও পত্নীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছেন বলিয়া, রাজপুত্রই সেই বাহিনীর সর্ব্বপ্রথমে ছিলেন। সম্মুখে চামুণ্ডারূপিণী রমণীকে দেখিয়া তিনি বিস্মিতচিত্তে অশ্বচালককে গতিরোধ করিতে আদেশ করিলেন।

ফিলিপা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁহার সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িল। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি? এ খেলা কিসের জন্য?"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া রমণী কহিল, "আমাকে

রক্ষা করুন প্রভু! আমি আপনার আশ্রয় চাই, বিচার চাই।"

"কার বিরুদ্ধে, কি সম্বন্ধে ?"

"আমার প্রভুপত্নী ডাচেসের বিরুদ্ধে! তিনি আমাকে একটা নীচ লোকের সহিত বলপূর্ব্বক বিবাহ দিবেন।"

রাজপুত্র তাহার দিকে ফিরিয়া একটু হাসিলেন। তিনি ডাচেস্‌কে চিনিতেন।

"তার আর ভাবনা কি ফিলিপা। যে তোমাকে বিবাহ করিবে আমি তাকে উচ্চপদ দিব।" তার পর হাসিভরা চোখে বলিলেন —"চসার যদি আজ আমাদের সঙ্গে থাকিত তাহা হইলে তোমাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে চসারের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে হইত নিশ্চয়।

রমণীর আরক্তিম মুখখানি শাদা হইয়া গেল। ভীতচিত্তে ফিলিপা জিজ্ঞাসা করিল—"চসার কি আপনার সহিত প্রত্যাগত হন নাই ?"

"সে কি? তুমি কি তবে তার অপমৃত্যুর কথা শোন নাই ?"

রমণীর কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট কাতরধ্বনি বাহির হইল। পরক্ষণেই জ্ঞানহারা হইয়া গেল।

যখন জ্ঞান হইল ফিলিপা দেখিল তাহাকে একটা দোলায় করিয়া বহিয়া লইয়া যাইতেছে ও পার্শ্বে একজন নরশির সুসজ্জিত পুরুষ তাহার অনুসরণ করিতেছে।

চক্ষু খুলিয়াই ব্যথিতা রমণী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। পরক্ষণেই দুর্ব্বল বাহুদুইটি প্রসারিত করিয়া আশ্বস্ত-চিত্তে বলিয়া উঠিল—"আ—আঃ প্রিয়তমে, তুমি তবে বেঁচে আছ! তোমার তবে কোন দুর্ঘটনা হয়নি ?"

চসার আকুল আবেগে নত হইবামাত্র, প্রেমহীনা ফিলিপার দুর্ব্বল দুইটি বাহু তাঁহার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া তাঁকে প্রাণপণে বক্ষোপরি বদ্ধ করিয়া ধরিল! উদ্বেলিত কবি-হৃদয় হইতে দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া আজ তাঁহার বহুদিনের মিলন বেদনাকে সার্থক করিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বিবিধ।

নূতন বেলুন। ফেব্রুয়ারি মাসে ইংলণ্ডের সৈন্যবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ একটি নূতন বেলুন বাতাসে "ভাসাইয়াছেন।" ইহাকে ইচ্ছামত চালনা করা যায় এবং এত গোপনে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে যে কারখানার লোক ব্যতীত অন্য কেহই ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না।

এই বেলুনটি লম্বায় ১৩০ ফুট এবং দেখিতে একটি চুরুটের ন্যায়। তবে লেজের দিকে দুইটি ক্ষুদ্রায়তন বেলুন (balloonets) আছে। বেলুনের খোলসটি রবারে নির্ম্মিত, নীচের নৌকাখানি ধাতুনির্ম্মিত। এঞ্জিনগুলি একশত অশ্বের বেগে (100 horse power) চলে এবং দুই পার্শ্বে আলুমিনিয়ম নির্ম্মিত দুইটি চাকা আছে। ইহারা অক্ষদণ্ডে সংযোজিত এবং ইচ্ছা অনুসারে ইহাদের উচুনীচু করা যায়। দুইটি হাল দ্বারা চালকের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কর্ণেল ক্যাপার, লেফটেনাণ্ট ওয়াটায়লো, মিঃ ম্যাকওয়েড, এবং মিঃ গ্রীণকে লইয়া বেলুন উড়িতে আরম্ভ করে। শেষোক্ত ব্যক্তিই বেলুনের এঞ্জিন নির্ম্মাতা।

ধীরে ধীরে ইচ্ছামত উঠিতে উঠিতে চালক বেলুনকে সহস্রফীট ঊর্দ্ধে উঠাইয়া অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে প্রায় পঞ্চদশ মাইল ভ্রমণ করিয়া ভূমি স্পর্শ

করিলেন। এ চারজন লোক ব্যতীত অনেকখানি Ballast (বেলুন স্থির রাখিবার জন্য বালুকা ইত্যাদির ভার) লওয়া হইয়াছিল। সুতরাং ইহাতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে ভারবহনেও বেলুন নিতান্ত অশক্ত নয়।

ইতিপূর্ব্বে সৈন্যবিভাগ হইতে আরও তিনটী এই জাতীয় বেলুন প্রস্তুত হইয়াছিল। এইটীর ঠিক পূর্ব্বে যে বেলুনটী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা হঠাৎ একটী দমকা বাতাসে স্ফটিক প্রাসাদে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। নূতন বেলুনটীর আয়তন অন্যগুলির অপেক্ষা বড়। উদজান গ্যাস রাখিবার পাত্রটী এবার রেশমনির্ম্মিত এবং গলিত রবর যথাস্থলে প্রয়োগ করিয়া আরও দৃঢ়তর করা হইয়াছে। পূর্ব্বের বেলুনটী মাত্র দুইজন লোককে বহন করিতে পারিত কিন্তু এটীর ভারবহনের শক্তি যথেষ্ট।



ম্যাডাম কুরি ও তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগৃহ।

ম্যাডাম কুরির নূতন আবিষ্কার—

র‍্যাডিয়াম আবিষ্কর্ত্রী ম্যাডাম কুরি পুনরায় সভ্যজগৎকে আর একটী নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন। আশ্চর্য্যান্বিত করিবার কথা বলিলাম বটে—কিন্তু অধুনা বৈজ্ঞানিকেরা যেরূপ দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে যদি তাঁহারা বলেন যে, কেরোসিনের শূন্যাধার গুলিকে তাঁহারা সুবর্ণ পাত্রে পরিণত করিবেন তাহাতেও লোকে আশ্চর্য্য হয় না। এই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাত্র ম্যাডাম কুরি ও তাঁহার স্বামী র‍্যাডিয়াম আবিষ্কার করিয়াছেন। আবার সেদিন তিনি র‍্যাডিয়াম হইতে 'পলোনিয়ম' নামক অতি সূক্ষ্মতম পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পলোনিয়ম র‍্যাডিয়াম অপেক্ষাও দুর্লভ এবং দুর্ম্মূল্য। ইহার সংস্পর্শে যে দ্রব্য আইসে তাহাই গলিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও দ্রবীভূত হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়াছেন, ইহার তুলনায় বালকের পক্ষে কুঠার দ্বারা একটী কেশকে দ্বিখণ্ড করাও সহজসাধ্য। তিনি পাঁচ টন Pitchlende এবং hydrochloric acid দ্বারা নানারূপ রাসায়নিক ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বলে এক মিলিগ্রামের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র পোলোনিয়ম সংগ্রহ করিয়াছেন। একটী বোতলের মধ্যে ইহা বিশেষ রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল কিন্তু তথাপি ইহার অর্দ্ধেক

দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে। ম্যাডাম কুরি এইক্ষণে ইহা পুনর্ব্বার বিশ্লেষণ করিয়া ইহার উপাদান নির্ণয় করিবেন। সম্ভবতঃ এক বৎসরের মধ্যেই তিনি এই কার্য্য সমাপন করিতে পারিবেন।

পিসানগরীর আনত প্রাসাদ।

পিসানগরীর আনত প্রাসাদের (Leaning Tower) কথা অনেকেই অবগত আছেন। অনেকেরই বিশ্বাস যে কোনরূপ ঘটনা চক্রে এই প্রাসাদ এক দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মিঃ গুডেয়ার সাহেব নানারূপ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ইহা আবহমান কাল এইরূপ অবস্থাতেই আছে এবং স্থপতিগণ সুকৌশলে এই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। অদ্য আমরা এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে আমাদের পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার দিব।

১১৭০ খৃষ্টাব্দে বোনানাস এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। ১৬ বৎসরে চারিতলা প্রস্তুত হয়। ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে বেনিনাটো পঞ্চমতলা, ১২৮৬ সনে উইলমস্তন ইন্স্‌ব্রাচ ষষ্ঠতলা এবং ১৩৫০ সনে টমাসো ডি পিসা ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করেন। প্রাসাদ নির্ম্মাণ কালে যতই ইহা উচ্চে উঠিতেছিল ততই ইহাকে লম্বের দিকে হেলাইয়া দেওয়া হইতেছিল।

গুডিয়ার সাহেব বলেন যে প্রাসাদের চক্রসিঁড়িটি (Spiral Staircase) যেদিকে প্রাসাদ হেলিয়া রহিয়াছে সেই দিকেই আযতনে বড় করা হইয়াছে এবং সুবিধানুসারে ও প্রয়োজন বুঝিয়া এই সিঁড়ি ছোট বড় করা হইয়াছে। প্রাসাদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যস্থলের প্রবেশদ্বার প্রস্থে ৩৮০ ফুট এবং উচ্চে ৭৯৪ ফুট। উত্তর দিকে, মধ্যস্থলের উচ্চতা ৭৬৩ ফুট পরে ক্রমে ক্রমে উপরে হেলান দিকে ৮১২ ও নিম্নে ৯১৭ ফুট; এই স্থলের ছাদ গড়ে ৮৬৪ ফুট উচ্চ। সিঁড়ির পরবর্ত্তী বাঁকে "টার্ণে" উহাকে কমাইয়া উত্তর দিকে ৭৮০ ফুট এবং হেলান দিকে পুনর্ব্বার ৮,৪৫ করা হইয়াছে। সিঁড়ি আবার যেমন ঘুরিয়া উত্তরে আসিয়াছে অমনি আবার তাহাকে কমাইয়া ৭,২৭ ফুট করা হইয়াছে। চারিতলার পরে আর সিঁড়ি নাই।

গুডেয়ার সাহেব বলেন যে চারিতলা পর্য্যন্ত সিঁড়ি করায় ইহারই নির্ম্মাণ কৌশলে এই হেলান প্রাসাদ স্থির রহিয়াছে। প্রথম তলার ছাদটীকেও নিজেদের প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যে আনতির দিকে নীচু করা হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে প্রাসাদটীর নির্ম্মাণ কৌশলেই ইহা আবহমান এই ভাবেই আছে। পঞ্চমতলা হইতে এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। কারণ স্বরূপ গুডেয়ার সাহেব বলেন যে পঞ্চমতলা নির্ম্মাণ নিযুক্ত মিস্ত্রীগণ এতদিনেও প্রাসাদের কোন পরিবর্ত্তন হইল না দেখিয়া আর কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিল না।

প্রাসাদ নির্ম্মাণের চারি শত বৎসর পরে কোন গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন যে ভিত্তি বসিয়া যাওয়াতে প্রাসাদ হেলিয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার বৃত্তান্ত স্বকপোল কল্পিত। যাহাতে এই প্রাসাদ চিরকালই এই ভাবে থাকিয়া পৃথিবীর সপ্তম 'আশ্চর্য্যের' এক আশ্চর্য্য হইতে পারে সেই প্রণালীতেই ইহা নির্ম্মিত।

জাপানে চৌর্য্যবৃত্তি। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সংবাদ পত্র La Revue পত্রে জাপানে কি প্রকারে বালকদিগকে চৌর্য্যবৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সে দেশে রীতিমত চৌর্য্য বিদ্যালয় আছে, এবং তথায় পাকা চোরগণ বালকবালিকাদিগকে বাল্যকাল হইতেই প্রত্যহ চৌর্য্যবৃত্তি শিক্ষা দেয়। তাহার পর কোন আমোদ প্রমোদের সময় তাহাদের চুরি করিতে পাঠায় এবং তাহারা নিরাপদে কার্য্য সমাধা করিলে তাহাদিগকে পুরস্কার দান করে। যাহারা নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সমাপন করিতে পারে না তাহাদের স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এইরূপে যাহারা চুরিবিদ্যায় পাকিয়া যায় তাহারা ক্রমে বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়। প্রত্যেক চোরের নিয়মমত কার্য্যের বিভাগ আছে। কেহ রাস্তায়, কেহ দোকানে, কেহ থিয়েটারে, কেহ রেলগাড়ীতে চুরী করে। পুলিস এই সকল স্কুলের বিষয় অবগত থাকিলেও, ইহাদের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ কোন অভিযোগ ধর্ম্মাধিকরণে আনয়ন করে না।

'বাবু ইংরাজি।' (ম্যাণ্ড্‌ ল্যাংসাহেব লিখিত)। 'বাবু ইংরাজি' বলিয়া আমরা অনেক

সম্বন্ধে অনেক উপহাস করিয়া থাকি। অপরের অসম্পূর্ণতার উপহাস করার প্রবৃত্তিটা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইতে পারে কিন্তু ইহাতে আমাদের জ্ঞানের ও সহানুভূতির অভাবই প্রকাশ পায়। বৈদেশিক যে কোন ভাষা, আমরা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে না পারি, সে ভাষায় দুই ছত্র লিখিতে গিয়া আমাদেরও 'বাবু' ভাষা' বাহির হইয়া পড়ে। এক সময়ে আমি এক প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিতকে আমার 'বাবু' ফরাসীতে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে জানাইলেন, যে আমার ফরাসী রচনা প্রশংসা যোগ্য হইলেও তিনি আমার ইংরাজী রচনারই পক্ষপাতী। ফরাসী ভাষায় আমি একটি আস্ত 'বাবু'। ভারতবাসী যখন আমাদের সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমাদের ভাষা শিখিতেছে, তখন তাহার ইংরাজি—কতকটা সংবাদ-পত্রের ও কতকটা কেতাবের খিচুড়ি হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতের ছাত্রদিগকে নিজের ইংরাজি লিখিতে বলিলে তাহারা পুঁথির গৎ আওড়াইতে থাকে বলিয়া অনেকে অভিযোগ করেন। ইংরাজ ছাত্রকে ইংরাজি গ্রীক বা লাটিনে অনুবাদ করিতে বলিলে তাহারাও কি এইরূপ চুরি করিবার চেষ্টা করে না? অনেক শিক্ষিত ল্যাটিন কবিও বেমালুম চুরি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। হোমারেও এই দোষ যথেষ্ট ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে এরূপ যে কোন পংক্তি তাঁহার মনে আসিত তাহা তাঁহার নিজের হউক বা পরের হউক তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা তাঁহার রচনায় ব্যবহার করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেন না।

এ দেশের বালকগণই যে কেবল মুখস্থ বিদ্যার উদ্গার করিতে পটু তাহা নহে। আমি আমার নিজের দেশীয় বাবুগণের মধ্যে, অর্থাৎ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এই মুখস্থ বিদ্যা উদ্গারের চেষ্টা দেখিয়া জ্বালাতন হইয়াছি।

ভাবিয়া দেখিলে—আমরা যখন ভারতের ছাত্রদের জন্য কোন প্রবন্ধ পুস্তক লিখিতে যাই অমনি মুখস্থ ভাষা আপনি আসিয়া পড়ে। হায় বাবু! তুমি মনুষ্য প্রকৃতির চিরসঙ্গী। এ পৃথিবীতে তুমি আমি সকলেই বাবু। টেনিসন্, ভার্জিল্ শিক্ষিত বাবু ছিলেন মাত্র।

বন্দী।

(ধারাবাহিক উপন্যাস। ভিক্টর হিউগো হইতে)

১

ফাঁসি!

আজ পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া, আমার এই একটি চিন্তা! সারা দিনরাত্রি নিঃসঙ্গ, একাকী, আমি মৃত্যুর হিম স্পর্শ অনুভব করিতেছি! রজ্জুতে, যেন, কে আমার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে!

কয়েক সপ্তাহমাত্র পূর্ব্বে, সাধারণ মানুষেরি মত আমি ছিলাম! প্রতি দিন, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মুহূর্ত্তেই, নিজের স্বাধীন মত, স্বাধীন কাজ! আমার তরুণ নির্ম্মল মস্তিষ্ক যেন একটা নেশায় বিভোর ছিল! কোন নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, বাধা নাই, বন্ধন নাই, এমনি একটা জীবনের কল্পনায় অধীর হইয়া উঠিতাম!

সুন্দরী কিশোরী, জয়-পরাজয়, আনন্দ ও আলোকমণ্ডিত রঙ্গালয়, সন্ধ্যার ছায়ায় তরুতলায় কিশোরীর বাহুবন্ধনে ধরা দিয়া স্বপ্নময় পরিক্রমণ—এমনি সুখের মধ্যে দিন কাটিত! চিন্তার গতি স্বাধীন, নিজেও স্বাধীন!

কিন্তু, আজ, আমি বন্দী! শৃঙ্খলাবদ্ধ, কারাগৃহবাসী বন্দী! মনের মধ্যেও এই কারাগহ্বরের ঘনীভূত অন্ধকার! একটা ভীষণ, নিষ্ঠুর হত্যার কলঙ্ক-কালিমায় গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন! আজ আর কোন চিন্তা নাই, শুধু একটি কথা অহর্নিশি মনে জাগিতেছে—ফাঁসির রজ্জুতে, আমার প্রাণদণ্ড!

অশরীরী ছায়ার মত চিন্তাটুকু আমাকে

ঘেরিয়া আছে! কোন কথা ভাবিবার আর অবসর নাই! তার কথা ভুলিতে চেষ্টা করি, কিন্তু, হায়, বৃথা! তার শীতল স্পর্শ হইতে একদণ্ডও পরিত্রাণ নাই!

আমার সমস্ত কাজের উপর তার রক্ত-আঁখিদুটা স্পষ্ট যেন দেখা যায়! চারিধারে যেন কে বিষাদের গান গায়, আর, মাঝে মাঝে, কার তীব্র হাসি! কারাগৃহের জানালার ধারে, ও কার আঁখি! সে, মৃত্যুর! ভূতের মত সে আমার চারি পাশে ঘুরিতেছে! হাতে তার রজ্জু! আঃ, আমি কি পাগল হইব!

সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—কে যেন আমার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইল! এ কি স্বপ্ন! কারাগৃহের কঠিন প্রস্তরে, আলোকের ক্ষীণ রেখায়, প্রহরীর নীরব ভীষণ মূর্ত্তিতে, জানালার ধারে—সর্ব্বত্র যেন কে ঘুরিতেছে! মুখে তার একই কথা—ফাঁসি! ফাঁসি!

২

অগষ্ট মাস! নির্ম্মল, স্নিগ্ধ, সুন্দর প্রভাত! আজ তিন দিন আমার বিচার আরম্ভ হইয়াছে! এ তিন দিনে আমার অসাধারণত্বের সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অলস লোকগুলা—কাজের জন্য যারা একদণ্ডও বাড়ী ছাড়িতে চাহিত না,—আজ, আমাকে দেখিবার জন্য, আদালতের প্রাঙ্গণে আসিয়া, দল বাঁধিয়া বসিয়া আছে! মৃতদেহের চারিপাশে, শকুনির দল যেমন অধীর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, তেমনি আজ আমারি জন্য ইহারা এত অধীর, চঞ্চল! প্রহরীগুলার বীরদাপ, লোকগুলার নিরীহ মূর্ত্তি—আমার যেন অসহ্য বোধ হইতেছিল!

প্রথম দুই রাত্রি, চোখে নিদ্রা ছিল না। প্রাণের মধ্যে কি এক ব্যাকুল আর্ত্তনাদ! কি এক সুগভীর আশঙ্কা! তৃতীয় রাত্রে, ক্লান্ত চোখে নিদ্রার মোহস্পর্শ প্রথম অনুভব করিলাম—আবেশময়ী, ব্যথাহারিণী নিদ্রা! প্রহরীর আহ্বানে নিদ্রা ভাঙিল! তার ভারী জুতা, চাবির গোচ্ছা, অর্গলমোচন—এ সকলের শব্দেও নিদ্রা ভাঙে নাই, সে আসিয়া ঠেলা দিয়া ডাকিল, "ওঠ!"

আমি চোখ মেলিয়া চাহিলাম! চারিধারে, কারাগৃহের কঠিন প্রস্তর! ছাদের নীচে, বায়ুপথের মধ্য দিয়া একটু আকাশ দেখিলাম! সূর্য্যের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে! এই সূর্য্যের আলোটুকু আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি!

আমি কহিলাম, "বেশ দিনটি!"

প্রহরীটা চুপ করিয়া রহিল—আমার কথায় জবাব দেওয়া, সে প্রয়োজন মনে করিল না—তার পর কি ভাবিয়া সে কহিল, "এমনি ত মনে হয়!"

পাষাণের মত, আমি নিশ্চল! জ্ঞানও ছিল না! আমি সেই বায়ুপথের দিকে চাহিয়াছিলাম! আবার কহিলাম, "বাঃ, বেশ দিনটি!"

লোকটা কহিল, "হাঁ! বাহিরে তোমার জন্য সকলে অপেক্ষা করিতেছে!"

এই কথাটুকু! মাকড়সার জালের মত, এই কথাটুকু আমাকে আবার পুরাণো চিন্তার জালে জড়াইয়া ফেলিল! নিমেষে, যেন আমি দেখিলাম—সেই নির্ম্মম, হৃদয়হীন, রক্তপিপাসু বিচারগৃহ—সেই জজের গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখ—নিরীহ সাক্ষীর দল, পুতুলের মত চিত্রকরা যেন তাদের চোখ—সতর্ক, সপ্রতিভ প্রহরী ও চাপরাশির দল—কালো গাউন-মণ্ডিত উকিলের গর্ব্বিত, উদ্ধত মূর্ত্তি

—আর, এই সব অলস ও কাপুরুষ দর্শকের সারি!

আমার সারা দেহে যেন আগুন জ্বলিতেছিল! গা কাঁপিতেছিল! পা টলিতেছিল! প্রহরী আমাকে ধরিয়া কাঠগড়ায় পুরিয়া দিল। বাহিরের বাতাসে, যেন অনেকখানি শ্রান্তি, অনেকখানি দুশ্চিন্তা কাটিয়া গিয়াছিল। মাথার উপর বিস্তৃত নীল আকাশ—রৌদ্রের উষ্ণ মধুর স্পর্শ, চারিধারে পাখীর কোলাহল, গাছের ছায়া—এ পৃথিবী এত সুন্দর ত কখনো দেখি নাই!

তার পর, আবার বিচারগৃহের এই বদ্ধ বায়ু! জীবনের পর মৃত্যুও বুঝি এমনি ভীষণ! আমাকে দেখিয়া চারিধারে যেন একটা কোলাহল পড়িয়া গেল! চুপি-চুপি কথা, কাগজ-পত্র উল্টানো, চলা-ফেরা,—সকলের একটা সুবিকট মিশ্র রাগিণী যেন জাগিয়া উঠিল! এতক্ষণ অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিয়া সকলে কষ্ট পাইতেছিল, আমি আসিতে যেন লোকগুলা আরাম পাইয়া বাঁচিল। কি নির্লজ্জ হৃদয়হীনতা! একজন ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিতে যাইতেছে, আর, এই অলস পশুর দল তাহা দেখিয়া আমোদ করিতে আসিয়াছে!

চারিধার শান্ত, নিস্তব্ধ! ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন শান্ত হয়, তেমনি! এখনি ঝড় বহিবে! ভীষণ ঝড়—আমার অস্থিগুলাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, আমার শিরাগুলাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া, আমার প্রাণটাকে সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ করিয়া, তবে এ ঝড় থামিবে! আজ আমার অপরাধের দণ্ড-বিধান হইবে! দণ্ড! হায়, কে কার দণ্ড দিবে! কে কার অপরাধের বিচার করিবে! আমি নিস্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমার হৃৎপিণ্ড তালে তালে নাচিতেছিল! কি এক গভীর বিরাট স্পন্দন! তার ধ্বক্-ধ্বক্ শব্দটা বন্দুকের শব্দের মতই ভীষণ মনে হইতেছিল!

তখন আমার মনে ভয় ছিল না! ঘরের জানালাগুলা খোলা ছিল। আমি তাহারি মধ্য দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিলাম। আকাশের গায় কতকগুলা ছোট পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছিল, বাহির হইতে একটা মিশ্র কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছিল, আর শান্ত মৃদু বায়ু, মাতার কল্যাণহস্তের মত, আমার শ্রান্ত ললাটে শান্তি বহিয়া আনিতেছিল। জজের নিদ্রাকাতর নয়নের প্রতিও দৃষ্টি পড়িতেছিল! আমি ভাবিলাম, কেন, এ অভিনয়!

বাহিরে দোকানীর দল হাসিতেছিল, গল্প করিতেছিল! তাহারা, আমাকে ভুলিয়া, আজ হাসি-গল্প লইয়া রহিয়াছে! কি নির্ব্বোধ, মূর্খ, এই দোকানীর দল!

চারিধারে এত আনন্দ, এত শোভা! তাহার মধ্যে মৃত্যুর কথা ভাবা নিষ্ঠুরতা—পাপ! এই স্নিগ্ধ বায়ু, এই প্রসন্ন দীপ্ত সূর্য্যকিরণ, ইহার মধ্যে মৃত্যু-চিন্তা, নিতান্ত অসঙ্গত, অশোভন! সূর্য্যরশ্মির মত আশার আলোকচ্ছটা মাঝে মাঝে নিরাশতিমির হৃদয়টাতে আলো দিতেছিল—আহা, যদি আজ মুক্তি পাই!

আমার উকিল বলিলেন, "আশা আছে!"

আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম, "ভালো কথা!"

উকিল বলিলেন, "একটা জিনিষ—হঠাৎ কাজটা হইয়া গিয়াছে, এমনি আমি প্রমাণ করিয়াছি- ফাঁসি ত হইবেই না; তবে আজন্ম বন্দী—দেখা যাক্ !"

আমি কহিলাম, "কারাগৃহে, আজন্ম বন্দী! তার চেয়ে মৃত্যু ভালো!"

হাঁ, মৃত্যুও ভালো! আমি বাহিরের দিকে চাহিলাম! গাছের ডালে বসিয়া একটা পাখী ফলে ঠোকর মারিতেছিল! কি স্বচ্ছ, লঘু, উহার আনন্দটুকু! আঃ, আমি যদি আজ ঐ পাখীটার মত স্বাধীন হইতাম!

তখন জজের রায় পড়া হইতেছিল—আমি সেদিকে লক্ষ্য করি নাই! জীবন বা মৃত্যু, দুইটীর কথাই তখন ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সহসা শুনিলাম, আমার ফাঁসি! মাথায় বিন্ বিন্ করিয়া ঘাম হইল! চোখের সম্মুখে একটা কিসের পর্দ্দা পড়িয়া গেল—আমি কাঠগড়ায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইলাম! জজের মনে, বুঝি, দয়া হইল। তিনি কহিলেন, "তোমার কিছু বলিবার আছে?"

বলিবার অনেক কথাই ছিল। কিন্তু কথা বাহির হইতেছিল না। জিবটা জড়াইয়া গিয়াছিল! দুই হাতের মধ্যে আমি মুখ ঢাকিলাম। লোকগুলা কোলাহল করিতে করিতে বিচার-গৃহ পরিত্যাগ করিতেছিল—তাদের পায়ের শব্দ আমি শুনিতেছিলাম! এতক্ষণে তাহারা বাঁচিয়াছে! কাজকর্ম্ম, বিলাস-বিশ্রাম সব ত্যাগ করিয়া বেচারারা সারাক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত, আজ তাদের ছুটি দিয়াছি! ধন্য, আমি!

অনেকক্ষণ পরে আমার স্বর ফুটিল। আমি কহিলাম, "হুজুর, একটু দয়া করুন—মৃত্যুটা যেন শীঘ্র হয়, আর আমার বলিবার কিছু নাই!"

সমস্ত জগতের উপর আমার অভিমান হইয়াছিল! কিন্তু, জগতের ত তাহাতে এতটুকু ক্ষতি নাই! সে চিরদিনকার মতই হাসিবে-খেলিবে! আমি যে আজ তার ক্রোড়চ্যুত হইয়া চলিলাম, এ অভাব কি কখনো সে অনুভব করিবে! হায়, এমন সুন্দর পৃথিবী, এত সে নির্ম্মম! কারো জন্য এতটুকু মায়া নাই, স্নেহ নাই,যেন নিস্পন্দ, কঠিন জড়পিণ্ডটা পড়িয়া রহিয়াছে! এই জগতে কোনমতে টিঁকিয়া থাকার নামই জীবন! ইহার চেয়ে মৃত্যু কি এতই কঠোর!

প্রহরীরা আমাকে বাহিরে লইয়া আসিল! তখনো বাহিরে উৎসুক দর্শকের দল আমাকে দেখিবার জন্য পাগল! এই সব হৃদয়হীন পশুগুলার শিরে বাজ পড়ে না? হা ভগবান! প্রেত, পশুর দল, সব!

বাহিরে আসিয়া বুঝিলাম, কি এ পরিবর্ত্তন! যখন বিচার-গৃহে আসিয়াছিলাম, তখন সকলেরি মত আমি জীবন্ত ছিলাম—এ জগতেরি একজন! আর এখন, এ যেন আমার মৃতদেহটা ভৌতিকবলে চলিয়াছে! আমি, যেন, এখন, আর এ জগতের নহি! এই পাখীর গান, সূর্য্যের কিরণ—ইহারা আজ আমার জন্য নহে! এই নদীর জল, নীল আকাশ, আর সকলের জন্য তেমনি ঠিক আছে কেবল আমিই ইহাদের মধ্য হইতে ভ্রষ্ট, চ্যুত তারার মত খসিয়া পড়িয়াছি! ঐ ছোট ছোট ফুলগুলি, ঐ গাছের ছায়াটুকু—আজ আমার জন্য আর কিছু নয়! এ সবে আমার আজ কোন অধিকারও নাই!

প্রকাণ্ড, কালো রঙের বন্ধ গাড়ী, বাহিরে, আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমি গাড়ীতে উঠিতেছি, এমন সময় শুনিলাম অদূরে কে বলিতেছে, "লোকটার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল!" আমি তার দিকে চাহিয়া দেখিলাম! একটা ব্যর্থ আক্রোশে অন্তরখানা জ্বলিয়া উঠিল!

গাড়ী চলিল! গাড়ীর মধ্যে, ছোট একটু ফাঁকের ভিতর দিয়া পথের পানে চাহিয়াছিলাম,—পথে ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছিল। পথিকের দল দাঁড়াইয়া হাসি-গল্প করিতেছিল। আমি ভাবিলাম, আজো জগতের হাসিখেলায় একটু বিরাম পড়িবে না! এতটুকু সহানুভূতি নাই! এত হাসি, এত আনন্দ, কিসের জন্য! [ক্রমশঃ]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সোমা ডি করস্।

(ডাক্তার রসের বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত)

হাঙ্গারীর অন্তর্গত ট্রান্সিলভানিয়া প্রদেশান্তর্গত করস্ গ্রামে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল সোমা ডি করস (Csoma de Koros) জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে নাগি ইনিয়েড (Nagy Enyed) নামক কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া ১৮০৯ সনে গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তথায়, প্রাচ্য ভাষা ও এতদ্দেশীয় ইতিহাস পাঠেই তিনি অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। পিতৃমাতৃহীন সোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই সংসারে একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। ভ্রাতার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল এবং সোমা যাহাতে পূর্ব্বদেশীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইউরোপের বিদ্বজ্জনকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, এই অভিলাষে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি সোমার প্রাচ্য দেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। বুখারেষ্ট হইতে যাত্রা করিয়া কোন সময় রেলপথে, কোন সময়ে জলযানে এবং কখন কখনও পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া সফিয়া, এনস, রোডস, আলেকজান্দ্রিয়া, সাইপ্রাস, লাটেকিয়া, আলেপো, বাগদাদ, তিহারণ, বোখারা, বন্ধ ও কাবুল হইয়া ১৮২২ সনের ১১ই মার্চ্চ তারিখে সোমা লাহোরে পৌঁছেন।

লাহোর হইতে সোমা ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তারিখে মিঃ মুর ক্রফটের সহিত লে যাত্রা করেন। এই স্থানে আসিয়া কয়েকখানি তিব্বতীয় পুস্তক দেখিয়া তাঁহার তিব্বত দর্শনে অভিলাষ জন্মে। তিনি ১৮২২—২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরে থাকিয়া তিব্বতীয় ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। ক্রফট সাহেব এই সংবাদে সাতিশয় প্রীত হইয়া আর্থিক সাহায্য এবং কতকগুলি সুপারিশ পত্র সংগ্রহ করিয়া দেন। কয়েকজন লামার অনুগ্রহে তিনি তিব্বতীয় ব্যাকরণ শিখিতে আরম্ভ করিলেন। সোমা যখন জনস্করে অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন তত্রত্য অনেক লামার নিকট ৩২০ খানি তিব্বতীয় পুস্তক দেখিতে পান। ঐ পুস্তকগুলিতে তিব্বতীয় ধর্ম্মবিষয়ক সকল বৃত্তান্তই লিপিবদ্ধ ছিল। সোমা এই ৩২০ খানি পুস্তক অনুবাদ এবং ভবিষ্যতে তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে এক অভিধান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। জনস্করের লামা তাঁহার অনুরোধে প্রায় এক সহস্র শব্দ নির্ব্বাচিত করিয়া দেন এবং ক্রমে ক্রমে সোমা তিব্বতীয় সকল শব্দই এই অভিধানের অন্তর্গত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই অভিধান এতদিন বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে ছিল। প্রায় এক শতাব্দী অন্তে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবং ডাঃ ডেনিসন রস সাহেব ইহার প্রকাশের ভার লইয়াছেন। উপযুক্ত পাত্রেই কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে।

সোমা তিব্বতে ভ্রমণপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সেই স্থানেই ছিলেন। ডাক্তার জেরার্ড সাহেবের সহিত ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তথায় সোমার দেখা হয়। ডাক্তার, সোমার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "আমি কানুমগ্রামে ক্ষুদ্রকুটীরে সোমাকে দেখিতে পাই। তাঁহার চতুর্দ্দিকে পুস্তক রাশি এবং তাঁহার পরিশ্রম এবং উদ্যমের ফলে তিনি যে পুস্তক সকল রচনা করিতেছিলেন তাহা বিশেষ আনন্দ সহকারে আমাকে দেখাইতে লাগিলেন। যে অবস্থায় তিনি কার্য্য করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য। এ স্থানে শীতের প্রভাব অত্যন্ত বেশী; এবং গতশীতে আপাদ মস্তক পশমী বস্ত্রে আবৃত হইয়া দিবারাত্র তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। সামান্য আহারের উপর নির্ভর করিয়া, কোনপ্রকার বিশ্রাম বা আরাম উপভোগ না করিয়া তিনি এই দারুণ শীতে তাঁহার ডেস্ক (Desk) সম্মুখে রাখিয়া কালাতিপাত করিয়াছেন। কানুম অপেক্ষা ইংরালাতে শীতের প্রকোপ আরও অধিক। সোমা এইখানে সামান্য একটি কক্ষে তাঁহার শিক্ষক লামা ও একটি ভৃত্যকে লইয়া একবৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। ঘরের বাহিরে যাইবার সাধ্য ছিল না কেন না সমস্তই ঘন তুষারাবৃত। এই দারুণ শীতে তিনি একটি বড় কোট গায়ে দিয়া প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন। ভূমিশয্যায় শয়ন এবং সামান্য ওভারকোটেই শীত নিবারণ করিতেন। শীত এত বিষম যে পুস্তকের পাতা উন্টাইতে হাত ওভারকোটের পকেট হইতে বাহির করাও দুঃসাধ্য হইত। কর্কট সংক্রান্তিতেও এখানে বরফ পড়ে—ইহা হইতেই এখানে শীতের প্রকোপ হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই অবস্থায় সোমা তিব্বতীয় ত্রিশ সহস্র শব্দ তাঁহার অভিধানের জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন।"

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সোমা কলিকাতায় আসিয়া ৫ই মে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সুইণ্টন সাহেবের নিকট তাঁহার হস্তলিপি প্রদান করেন। ৩১ হইতে ৩৫ সন পর্য্যন্ত চারি বৎসর কাল সোমা কলিকাতায় ছিলেন। তৎপরে তিনি পুনর্ব্বার ভ্রমণে বাহির হইয়া ১৮৩৬ সনে মালদহ যান। এ বৎসর মার্চ্চ মাসে জলপাইগুড়ী হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি স্থলে কিছুদিন থাকিয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গভাষা শিক্ষা ও সংস্কৃতে পারদর্শী হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৮৩৭ হইতে ৪২ সন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় তিনি খৃষ্টধর্ম্মসংক্রান্ত কয়েকখানি পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

কলিকাতায় তিনি কি অবস্থায় ছিলেন সে সম্বন্ধে পাভি সাহেব Revue des Deux Mondes নামক পত্রিকায় নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত দিয়াছেন। "কলিকাতায় অনেক সময় তাঁহার সহিত আমার দেখা হইত। ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় তিনি এক প্রকার মৌনাবলম্বীই ছিলেন। তাঁহার থাকিবার ঘর দেখিলে উহা সন্ন্যাসীর কক্ষ বলিয়াই ভ্রম হইত। কচিৎ ভ্রমণার্থ বারান্দায় আসা ছাড়া তিনি তাঁহার কক্ষ কখনও পরিত্যাগ করিতেন না। তাঁহার ন্যায় প্রবীণ বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি কেবলমাত্র একবিষয়েই লেখেন ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।" মিঃ স্কুফট লিখিয়াছেন—সোমা তাঁহার তিব্বতীয় পুস্তকাদির মধ্যে রাত্রিদিবা নিমজ্জিত থাকিতেন। সন্ধ্যায় কদাচিৎ তিনি শারীরিক পরিশ্রম করিতেন এবং পরে নিজগৃহে তালাবদ্ধ হইয়া থাকিতেন। সেইজন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে হইলে ভৃত্যবর্গকে ডাকিয়া তালা খুলাইতে হইত।

৫৮ বৎসর বয়সের সময় তিনি তাঁহার শেষ যাত্রায় বহির্গত হইয়া ২৪শে মার্চ্চ দার্জ্জিলিং পৌঁছেন। ৬ই এপ্রিল জ্বর হইয়া ১২ই মৃত্যুমুখে পতিত হন। চার বাক্স পুস্তক, কিছু কাগজ, এক প্রস্থ পোষাক এবং রন্ধনের পাত্র ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহার ছিল না। সামান্য ভাত ও চায়ের উপর তিনি নির্ভর করিতেন। চিরদিনই পুস্তক চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া সামান্য এক মাদুর পাতিয়া নিদ্রা যাইতেন। মদ্যপান ধূমপান বা অন্য কোনরূপ উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না।

অভিধান ব্যতীত সোমা তিব্বতীয় ব্যাকরণ এবং আরও অন্যান্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কঞ্জুর Kangur বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমরা সোমা প্রণীত ব্যাকরণের শব্দশিক্ষা হইতে একটী গল্প পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

কোন গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিতেন। গৃহস্থের গাভী তিনি প্রাতঃকালে মাঠে লইয়া যাইতেন সন্ধ্যাকালে ফিরাইয়া আনিতেন। একদিন কোন গৃহস্থের গাভী ফিরাইয়া আনিয়া ব্রাহ্মণ দেখিলেন, গৃহস্থ সন্ধ্যাভোজনে নিযুক্ত। ব্রাহ্মণ গরুটী গৃহস্থের বাটীর সীমানার মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। বন্ধনমুক্ত গাভীটি সীমানা পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। গৃহস্থ সন্ধ্যাভোজন সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট গাভী চাওয়াতে ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন যে তিনি উহা তাঁহার বাটীর সীমানার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছেন। গৃহস্থ বলিল, আমার দ্রব্য আমাকে প্রত্যার্পণ কর নচেৎ রাজার নিকট বিচারার্থে যাইতে হইবে। ব্রাহ্মণ এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে উভয়েই রাজধানী অভিমুখে চলিলেন।

পথিমধ্যে উঁহারা দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি তাহার অশ্বিনীকে ধরিতে পারিতেছে না। সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অশ্বিনীর গতিরোধার্থে চীৎকার করিয়া অনুরোধ করিলে ব্রাহ্মণ লোষ্ট্র দ্বারা অশ্বিনীর এক পদে আঘাত করিলেন। আঘাত করিবামাত্র অশ্বিনী পতিতা হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অশ্বিনীস্বামী তখন ব্রাহ্মণকে তাহার অশ্বিনী প্রত্যর্পণে আদেশ করিলে ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন যে, তাহার অনুরোধেই, তিনি অশ্বিনীর গতি প্রতিরোধ করিতে গিয়াছিলেন সুতরাং অশ্বিনীর মৃত্যুর জন্য তিনি আদৌ দায়ী নহেন। অশ্বিনী-স্বামী ছাড়িবার পাত্র নয়; সে রাজার নিকট বিচার প্রার্থী হইবে বলিয়া ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থের সঙ্গ লইল।

তিনজনে কিছুদূর যাইতে যাইতে ব্রাহ্মণ ইহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় এক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবামাত্র এক তন্তুবায়ের উপরে পতিত হইলেন। তাহাতে তন্তুবায়ের মৃত্যু হইল। তখন তন্তুবায়পত্নী ব্রাহ্মণকে তাহার স্বামী প্রত্যর্পণের কথা বলায় ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, মৃত ব্যক্তি কখনও পুনর্জ্জীবন পায় না এবং তন্তুবায়ের অপঘাত মৃত্যুর জন্য তিনি কোনরূপে দায়ী নহেন। তন্তুবায় পত্নী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অন্য সকলের সহিত রাজদ্বারে চলিল।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা এক নদী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, এক কাঠুরিয়া মুখে কুঠার লইয়া নদী পার হইতেছে। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নদীর গভীরতা জিজ্ঞাসা করায় কাঠুরিয়া "জল বেশী নয়" এই উত্তর করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কুঠারও নদী গর্ভজাত হইল। অনেক পরিশ্রমেও কাঠুরিয়া তাহার কুঠার উদ্ধারে সক্ষম না হইয়া ব্রাহ্মণকে তাহার কুঠার দিতে বলিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন যে কাঠুরিয়ার নিজের অসাবধানতার জন্যই সে কুঠার হারাইয়াছে সুতরাং তজ্জন্য তিনি দায়ী নহেন। বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থিরীকৃত হইল যে রাজাই এ বিষয়ে মীমাংসা করিবেন।

রাজ সমীপে উপনীত হইয়া প্রথমে গৃহস্থ নিজ আবেদন ব্যক্ত করিল। রাজা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,"ব্রাহ্মণ গরু লইয়া ছিলেন কিনা, প্রত্যর্পণ করিবার সময় গৃহস্থ দেখিয়াছে কিনা।" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—গরুও তিনি লইয়াছিলেন এবং প্রত্যর্পণের সময় গৃহস্থও তাহা দেখিয়াছিল। ইহা শুনিয়া রাজা আদেশ করিলেন যে, চক্ষু থাকিতেও যখন গৃহস্থ দেখে নাই তখন তাহার চক্ষু—এবং জিহ্বা থাকিতেও যখন ব্রাহ্মণ গৃহস্থকে কিছু বলেন নাই তখন ব্রাহ্মণের জিহ্বাও উৎপাটিত হউক। গৃহস্থ এ আদেশে নিজ আর্জ্জি উঠাইয়া লইল। ব্রাহ্মণ নিষ্কৃতি পাইলেন।

অশ্বিনী-স্বামী নিজ দুঃখকাহিনী বর্ণনা করিলে রাজা দণ্ড স্বরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, সে জিহ্বা দ্বারা ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ হস্ত দ্বারা লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহার জিহ্বা ও ব্রাহ্মণের হস্ত এই উভয়ই ছেদিত হউক। অশ্বিনীস্বামী জিহ্বা হারাইবার ভয়ে নিজ মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইল—ব্রাহ্মণেরও হস্ত থাকিয়া গেল। •

এবার তন্তুবায় পত্নীর পালা। রাজা কহিলেন, তন্তুবায় পত্নী ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিলেই সে তাহার স্বামী পাইবে। তন্তুবায় পত্নী ইহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় এবারও ব্রাহ্মণের কোন সাজা হইল না।

পরিশেষে কাঠুরিয়ার কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—তাহার পক্ষে কুঠার হস্তে না লইয়া দন্তে বহন এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে সে সময় তাহ'.ক কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এই উভয়ই অনুচিত হইয়াছে সুতরাং তাহার দন্ত উৎপাটিত ও ব্রাহ্ম.ণর জিহ্বা কর্ত্তিত হউক। কাঠুরিয়া একে কুঠারের শোক সম্বরণ করিতে পারে নাই; তদুপরি দন্ত উৎপাটিত হইবার ভয়ে তাহার আর্জ্জি উঠাইয়া লইল। ব্রাহ্মণও নিষ্কৃতি পাইয়া গেল।

অপর জগতের কথা। (ইংরাজি হইতে

সে অপর জগতের কথা। সেখানকার সঙ্গে এখানকার কিছুই মেলে না। সে জগৎ এখান থেকে অনেক দূর;—অনন্ত আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডলীর মাঝখানে কোনো এক জায়গায় তাহার স্থান।

সেখানকার এক পুরুষ ও এক রমণীর কথা বলিব। তাহারা দুইজনে সর্ব্বদা একত্রে মিলিয়া থাকিত;—দুজনের মধ্যে কোথাও বিচ্ছেদ ছিল না!

সেখানে এক প্রকাণ্ড বন; তাহাতে ঘন ঘন গাছের সারি!—এক গাছ অপর গাছের সহিত গায়ে গায়ে ঠেকিয়া আছে, মধ্যে এতটুকু ব্যবধান নাই। বনের যা-কিছু-সকলই এক অপরের সহিত নিবিড়ভাবে মিলিয়া আছে। কোথাও বিচ্ছেদ নাই;—পাতায় পাতায়, ডালে ডালে, ফলে ফলে, ফুলে ফুলে ঠাসা। আকাশের বাতাস, আকাশের জল এবং সেখানকার যে চন্দ্রসূর্য্য তার রশ্মি পর্য্যন্ত সেই গহন বনের বনস্পতি আর তরু-লতাদের সুদৃঢ় মিলন ভাঙিয়া প্রবেশের পথ পায় না।

সেই বনের মাঝে এক মন্দির। সে যে কতকালের তার ঠিক নাই! সে মন্দিরে কেহ থাকিত না, রাত্রে সেখানে দেবতারা আসিতেন। শুনা যায়, সেই সময়ে—সেই ঘোর রাত্রে অন্ধকার বনের মধ্যে জনপ্রাণী সঙ্গে না লইয়া একেলা কেহ যদি মন্দির সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং মর্ম্মর সোপানে নতজানু হইয়া দেবতার আরাধনা করে ও দেবতার উদ্দেশে বুক চিরিয়া রক্ত দেয় তাহা হইলে দেবতার কাছে সে যে প্রার্থনাই জানায় তাহা গ্রাহ্য হয়!

পুরুষ ও রমণী বহুবার এই মন্দিরে গিয়াছে, বহুবার দেবতার কাছে দুজনে দুজনার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছে কিন্তু দুই জনের মধ্যে কেহ কখন একা সেখানে যায় না। এক পূর্ণিমার রাত্রে পুরুষটিকে সঙ্গে না লইয়া রমণী একেলা মন্দির উদ্দেশে ঘরের বাহির হইয়া গেল! বনের বাহির তখন জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে, জলস্থল আকাশ, শুভ্রতায় ভরিয়া গিয়াছে;—আকাশে নীলিমা নাই, সমুদ্রেও নীলিমা নাই! সব আলোময়, কেবল বনের ভিতর ঘোর অন্ধকার—সেখানে জ্যোৎস্না নাই! আলো নাই!

রমণী সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে পথ চলিয়া মন্দির-সোপানে আসিয়া বসিল। ভক্তিভরে দেবতার নাম জপ করিতে লাগিল,

কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন সে একখণ্ড পাথর লইয়া মর্ম্মস্থলে আঘাত করিল;—ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু রক্ত বুক বাহিয়া মন্দির সোপানে পড়িল। অমনি শব্দ উঠিল—"কি চাও?"

রমণী বলিল—"এক পুরুষ আছেন, তিনি আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয়, তাঁকে আপনি বর দিন।"

—"কি বর চাও?"

—"তা তো জানিনা প্রভু! যাতে তাঁর সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয় সেই বর দিন।"

—"তথাস্তু!"

বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা আজ সফল হইল। রমণী তখনই উঠিয়া দাঁড়াইল। বর লাভ করিয়া আনন্দে তাহার শরীর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষটিকে সেই সংবাদ দিবার জন্য সে অধীর হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে না চলিয়া মনের উৎকণ্ঠায় দৌড়িতে লাগিল। স্থির বন দ্রুতপাদক্ষেপে কাঁপিয়া উঠিল, স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শুষ্কপত্র হইতে কান্নার মত মর্ম্মর ধ্বনি উঠিল। অন্ধকারের মধ্যে সেই শব্দ শুনিয়া রমণীর প্রাণ চকিত ও ভীত হইয়া উঠিতে লাগিল!

শীঘ্রই সে বনের বাহির হইয়া আসিল। সে স্থান অন্ধকার নয়, সেখানে তখন বসন্তের বাতাস বহিতেছে, পুষ্পগন্ধে দিক ভরিয়া আছে; দূরে সমুদ্রতীরের বালুকা জ্যোৎস্না-আলোকে আকাশের নক্ষত্রের মত জ্বলিতেছে! সমুদ্রতরঙ্গ চন্দ্রালোকে নাচিতেছে! আকাশে, বাতাসে, জলে স্থলে আনন্দ রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে।

রমণী সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। অদূরে একখানি তরণী সমুদ্রের বুকে দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, কোথাও আটক নাই, বাধা নাই; সমুদ্র-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে! রমণী ভাবিল—"এমন্ রাতে এমন্ সময় দেশ ছাড়িয়া কে যায়? কে ঐ তরণীর দাঁড় ধরিয়া দাঁড়াইয়া?" অস্পষ্ট আলোকে তাহাকে চেনা যাইতেছিল না, তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখাও যাইতেছিল না, কিন্তু রমণী অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিল সে কে! সে মূর্ত্তি যে তাহার হৃদয়পটে আঁকা—সে যে চিরপরিচিত! তরী ক্রমেই দূর হইতে দূরে যাইতে লাগিল, ক্রমেই সব অস্পষ্ট হইয়া আসিল। এমন সময় সে কি দেখিল?—এ কি? এক পরমাসুন্দরী বালিকা—তরণীর হাল ধরিয়া বসিয়া আছে;—তাহার সুন্দর কচিমুখে জ্যোৎস্নার শুভ্র আলো!

রমণীর প্রাণ উতলা হইয়া উঠিল। সে পাগলিনীর মতো ছুটিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে গেল—নৌকা আটক করিবে! কিন্তু সমুখে সমুদ্রতরঙ্গ যে দুর্গপ্রাচীরের মতো ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে! তাহা ভেদ করিয়া যাওয়া অসাধ্য। তবে সে কি করিবে? নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সমুদ্রের দিকে আকুলভাবে বাহুদুটি প্রসারিত করিয়া শুধু বলিতে লাগিল—এস ফিরে এস, বঁধু, ফিরে এস!

রমণী জলে নামিয়া পড়িয়াছে, তরঙ্গ-প্রাচীর ভেদ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য যুঝিতেছে এমন সময় তাহার কানের পাশে কে যেন বলিল—"এ কি করছিস্?"

বালিকা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বলিল—"আমি যে এইমাত্র তাঁর জন্যে বুকের রক্ত দিয়ে দেবতার কাছ থেকে বর ভিক্ষা করে এনেচি!"

কানের পাশে আবার কে বলিল—"বেশ তো! বর তো সে পেয়েছে!"

—"কী বর পেয়েছেন?"

—"তার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল;—তোর সহিত তার অনন্ত বিচ্ছেদ!"

রমণী স্তম্ভিত হইয়া গেল!

তরণী তখন অগাধ সমুদ্রের মধ্যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেছে!

আবার শব্দ উঠিল—"কেমন্, তুই তো সুখী?"

রমণী ধীরে ধীরে কহিল—"হাঁ, সুখী!"

চারিদিক তখন স্তব্ধ হইয়া গেল, আকাশে বাতাসে করুণ রাগিণী বাজিয়া উঠিল। রমণীর চরণ ঘেরিয়া সমুদ্রের চঞ্চল জল ছল্ ছল্ করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

পোষ্যপুত্র। (ধারাবাহিক উপন্যাস)

(গত ১৩১৬ সালের বৈশাখ হইতে আরম্ভ)

(২৩)

শান্তির বিবাহের মাসখানেক পরে স্ত্রীকে তাহার বাপের বাড়ি পাঠাইয়া যোগেন্দ্র মাদুরায় ফিরিয়া আসিল। এখানে আসিয়া সংবাদ লইয়া জানিল মিঃ রায়ও ফিরিয়াছেন। তিনি এবার আসিয়া অবধি বড় একটা কাজকর্ম্ম দেখেন না, একজন ম্যানেজার রাখা হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে তাহাকে বুঝাইয়া শিখাইয়া দিতে অফিসে যাইতে হয় তা ভিন্ন বাকি সময়টা নিজের সেই নির্জ্জন বাসাটিতেই থাকেন।

যোগেন্দ্রের চার্জ্জ লইতে তখনো একদিন দেরি ছিল। সে তৎক্ষণাৎ জুতা ও উড়ানি পরিয়া বাহির হইয়া গেল। সম্মুখেই মালীটা ফুলগাছগুলায় ঝারি করিয়া জল দিতেছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "সাহেব বাড়ি আছেন?" উত্তর পাইল বাবু ঘরেই আছেন।" যোগেন্দ্র সম্মুখের হলে কাহাকেও না দেখিয়া একেবারে গৃহস্বামীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। সে ঘরে প্রথম সন্ধ্যাতেই একটা অনুজ্জ্বল প্রদীপ জ্বালাইয়া মেঝের উপর আসন পাড়িয়া বসিয়া নীরদকুমার সম্মুখে এক কাঠের ছোট চৌকির উপর খেরো বাঁধান এক পুঁথি খুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছিল, যোগেন্দ্রের সশব্দ প্রবেশও জানিতে পারিল না।

যোগেন্দ্র একবার ঘরখানার চারিদিকে আশ্চর্য্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, সে ঘরখানা প্রতিমাবর্জ্জিত চণ্ডিমণ্ডপের মতন খাঁ খাঁ করিতেছে। পরে গৃহস্বামীর নিকটে গিয়া বলিয়া উঠিল "জিনিপত্রগুলো সব গেল কোথায়? আলোটার এমন দশাই বা কেন?"

সম্বোধিত ব্যক্তি একটু বিস্ময়ের সহিত মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি দশা?"

"চরম দশা আর কি, ল্যাম্পটা বুঝি চাকররা ভেঙ্গে ফেলেছে? বেটাদের জ্বালায় কিছু তো টিকতে পারে না। তা যাহোক

এলে কবে?" নীরদ উত্তর করিল "মিথ্যে চাকরদের গাল দিচ্চো কেন, তারা ল্যাম্পটা, ভাঙ্গেনি; রাজার দেশের আমদানি তাই তাকে খাতির করে তুলে রেখেছি। কি জানি কোন দিন কি ত্রুটি পেয়ে চটে ওঠে। তুমি এলে কবে?"

"আমি আজ এসেছি। বাঃ আমার প্রশ্নটার উত্তরই দেওয়া হলো না! কোথায় যাওয়া হয়েছিল বলো তো?"

নীরদ পুনশ্চ আলোর দিকে ঝুঁকিয়া পুঁথির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পাতাখানা উল্টাইয়া কহিল "রামনাদ।"

"কি জন্যে?" নীরদ হাসিল "পুলিষের মতন জুলুম আরম্ভ করলে যে! দোহাই দারোগা সাহেব! তোমার সোনার 'দোত' কলম হোক; গরীবকে আর অনর্থক পীড়ন করোনা। তুমি বিলক্ষণ জানো সেখানে কাজের জন্য আমায় মধ্যে মধ্যে যেতে হয়।"

যোগেন্দ্র এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া বিরক্তভাবে বলিল "একটা খাট বা কেদারা কিছুই নাই, বসা যায় কোথা!"

নীরদকুমার তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল "কেন মেজেতে ত বিছানা পাতা রয়েছে বসো না।"

যোগেন্দ্র বসিলনা, দাঁড়াইয়াই বলিল "এটা একেবারেই অনভ্যাস হয়ে পড়েছে। নীচু হওয়া পোষায় না; চলো অন্য ঘরে।"

নীরদকুমার জেদ করিয়া বলিল "দুদিন কেরাণিগিরি করে চির কালের অভ্যাস একেবারে জন্মের মতন ফুরিয়ে গেল, ওগো মশায়! বাঙ্গালির ছেলে বাঙ্গালা চালই ভাল। মা ধরিত্রীর কোলে বসে দেখ দেখি কতো আরাম পাও।"

"ইস্ একমাসে একেবারে সত্যানন্দ হয়ে উঠেছো যে' তুমি যা করবে তাই বাড়াবাড়ি।"

নীরদ না হাসিয়া গম্ভীর ভাবে তামাসাটা গায়ে লইয়া বলিল "আশীর্ব্বাদ করো তাই যেন হতে পারি।"

অগত্যাই যোগেন্দ্রকে তাহার বিপুল দেহভার ভূমিতেই ন্যস্ত করিতে হইল। আজ তাহার অনেকগুলো ঝগড়া জমা করা আছে তাহা লইয়া তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শ্লেষের শরবর্ষণে তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিতে সে দৃঢ়সংকল্প,—তাই আর অন্য তর্ক তুলিল না। নহিলে তর্ক করিতে সে কম মজবুৎ নহে। আসন গ্রহণ করিয়া বলিল "পিসে মশায়ের কাছে আমার মুখ দেখানো ভার হয়েছিল তুমি আমায় কি অপ্রতিভটাই না করলে! তোমার ব্যবহারে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি।" ইচ্ছা করিয়াই যোগেন্দ্র কথাগুলা যথাসাধ্য কড়া করিয়া বলিল। কিন্তু শ্রোতা তাহাতে উত্তেজিত হইল না, ঈষৎমাত্র চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করিল "আমার ব্যবহারে! কেন?"

"কেন? সেদিন তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কিরকম অভদ্রের মতন হঠাৎ চলে এলে! তার পর সহসা একেবারে নিরুদ্দেশ! যেন কোন দাগী আসামী পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে ফিরচে—এমনি ধরণটা। তাঁর পরিবার বর্গের সঙ্গে খুব আলাপ পরিচয় অথচ তাঁর সঙ্গে দেখাটি পর্য্যন্ত নয়, এর মানে কি?"

নীরদকুমার কোন উত্তর প্রদান করিল না! মুখটা একটু নীচু করিয়া নীরবে পুঁথির

খোলা পাতাখানা দেখিতে লাগিল। প্রদীপ ছায়ায় মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যোগেন্দ্র পুনশ্চ কহিল, "তাঁর কাছে আমি তোমার কতো সুখ্যাতিই করেছিলাম আর তুমি কি অদ্ভুত ভাবেই প্রকাশ হলে!

ধিক্কারের সঙ্গে হতাশার সুরটুকু অত্যন্ত করুণ হইয়া আসিল। নীরদ মাথা তুলিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল "আমিতো তোমার কাছে সার্টিফিকেট চাইনি, বাজে খরচটা কেনই বা করতে গিয়েছিলে? যাকে নিজেই ভাল করে চেননি অপরকে তার সম্বন্ধে কি বোঝাতে চাও?"

যোগেন্দ্র এ প্রতিবাদে হটিল না! তবে তাহার উত্তেজনার অবসাদ আসিয়া গিয়াছিল, মনের দুঃখ আর চাপিতে পারিতেছিলনা! সবিষাদে বলিয়া উঠিল "হায় হায় আমার কি প্ল্যানটাই মাটি করলে! আহা ভবিষ্যতের কি ছবিখানাই বসে বসে এঁকে ছিলুম।'

নীরদকুমার জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—"Trust no future however pleasant"

সে হাসিটা মোটেই স্বাভাবিক নয় তাহা বুঝিতে স্থূলবুদ্ধি যোগেন্দ্রেরও বেশি বিলম্ব হইল না। সে কোন এক অজ্ঞাত ব্যথায় বন্ধুকে ব্যথিত বুঝিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

নীরদ প্রফুল্লতা দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। যোগেন্দ্র স্ত্রী পুত্রকে রাখিয়া আসিয়াছে শুনিয়া বলিল "তবেই তোমার চাকরীটি গেছে, কদিন তুমি তিষ্ঠোবে?"

"ইস্ তা যেন পারিনা! ও পুঁথিখানা কিসের হে! মাণকপীরের গান, না মনসা পুরাণ?"

নীরদকুমার অনুজ্জ্বল প্রদীপটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া হাসিয়া পুঁথিখানা তুলিয়া ললাটে স্পর্শ করাইল তার পর সসম্ভ্রমে উত্তর করিল "বেদান্ত দর্শন।"

"সর্ব্বনাশ! তবেই আমায় সেরেছ!"

নীরদ ঈষৎ বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল "বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে সর্ব্বনাশের সঙ্গে যোগ কি দেখলে?"

"খুব কাছাকাছি। কেন ভাই তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি যে এমনি করেই তাড়াবে?"

"তাড়া যদি ইচ্ছা করে খাও, সেজন্যে আমি দায়ী নই, রজ্জুতে সর্প ভ্রম করে একেবারেই আঁৎকে উঠোনা। রসগোল্লাটাকে খোরাক করে না তুলে দুটি দুটি ভাত যদি পাতে নাও, তাহলে মুখটাও থাকে ভাল, স্বাস্থ্যের পক্ষেও সুবিধে হয়! রসালাপটা না হয় একটু কমই হোলো,—ও কি হে আমার মুখের দিকে অমন করে চেয়ে রইলে যে? আমায় কোনরকম ভয়ানক দেখাচ্চে নাকি?"

উথলিত বিস্ময় দমন না করিয়া স্তম্ভিত যোগেন্দ্র সবিষাদে বলিয়া উঠিল "এ কি শ্রী হয়ে গ্যাছে! চুলগুলোরই বা এমন দশা কেন, জটা বানাবে নাকি? "নীরদ সকৌতুকে হাসিয়া কহিল "না সে রকম মৎলব এখনও হয় নি। মিলিটারী ফ্যাসানে চুল না ছেঁটে চিরকেলে প্রথায়—"

যোগেন্দ্রের ক্রমেই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল, সে বাধা দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল "গোল্লায় যাক্ তোমার প্রথা! এ আবার তোমার কি নূতন ঢং? তোমার কি আবার সেই সত্যযুগ

আনবার চেষ্টা না কি? হঠাৎ এতো বড় দার্শনিক কি করে হলে?"

"চেষ্টা করা তো উচিত" বলিয়া তর্কটাকে পাকাইয়া না তুলিয়া নীরদ হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল "চলো একটু বাইরে গিয়ে বসা যাক। এ ঘরটা আজ তোমার ঠিক সইছে না।"

যাইতে যাইতে যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "বিছানাপত্র সব গেল কোথায়?" ভূমে একটা গালিচা পাড়া ছিল, তাহা দেখাইয়া নীরদ বলিল "ঐ যে।" প্রশ্ন হইল "ঐতে শোও?" মৃদু হাস্যের সহিত যোগেন্দ্র ঘাড় নাড়িল "হাঁ"।

অনেক রাত্রে যোগেন্দ্র বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। বিদায় অভিবাদন জানাইতে গেলে, নীরদ ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল 'আঃ ওসব কায়দাগুলো ছাড়ো'।

"বলো কি হে, ও যে তোমারি আদর্শ"।

"আবার আমিই প্রত্যাহার করছি"। যোগেন্দ্র যে বাড়ি হইতে আহার করিয়া আইসে নাই তাহা সে এখানের সমস্ত উলোট পালোটের মধ্যে পড়িয়া একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল নীরদও পূর্ব্বের মত নিজে হইতেই নিমন্ত্রণ করিল না, বরং সে বিদায় চাহিবামাত্রই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "রাত হয়ে গ্যাছে, এসো তবে।"

রাতও পূর্ব্বেও কতদিন হইয়াছে! যোগেন্দ্র বাড়ির টানে ছুটিতে চাহিলে তখন সেতো তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া দিত! আজ বন্ধুত্বের গর্ব্বে আহত হইয়া যোগেন্দ্র তাই দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল!

বাড়ি গিয়া খাবার চাহিতেই পাচক ব্রাহ্মণ কুণ্ঠিতভাবে জানাইল; পূর্ব্বে ম্যানেজার সাহেবের 'বাসায় গিয়া কখনো না খাইয়া ফিরেন নাই বলিয়া আজও সে রাঁধে নাই। যোগেন্দ্র চটিয়া উঠিয়া তাহাকে তিরস্কার করিল, তারপর খুব তাগিদ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র লুচি ভাজাইয়া লইয়া আহারে বসিল। পৃথিবীর মধ্যে এই প্রধান জিনিষটাকে সে মনের কোন লাভ লোকসানের অংশভাগী করিতে চাহে না, সেটা নিয়ম মতন পাওয়া চাই-ই।

পরদিন প্রত্যূষে স্নান করিয়া গরদের ধুতি চাদর পরিয়া শয়ন গৃহেরি একটি পাশে কম্বলের আসনে বসিয়া নীরদকুমার আহ্নিক সারিয়া শঙ্করভাষ্য লইয়া বসিয়া একটা জটিল সূত্রের মীমাংসা খুঁজিয়া হতাশ্বাস হইবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময় ভৃত্যের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে যোগেন্দ্র সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল "কি হে, যা বলেছি তাই! এরি মধ্যে আমার প্রবেশ নিষেধ?" নীরদ জটিল সমস্যা অমীমাংসাতেই পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বলিল "শোন যোগেন! সবারি একটা অন্তঃপুর বলে জিনিষ আছে তো? এসো ওঘরে যাই তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

"কেন এঘরে কি 'অহিন্দুদে'র স্থান নাই? ঘরটা শুদ্ধ অপবিত্র হয়ে যাবে?" নীরদ অপ্রতিভ হইল না, বরং হাসিয়া উত্তর করিল "মিথ্যা কি, তোমার পায়ে জুতা রয়েছে, তাছাড়া তোমার তো এখানে বসবারও সুবিধা নাই! 'যুবরাজ'কে তো উচ্চাসন দিতে হবে।"

দুজনে নীরদের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। সে ঘরে সে সোফা কেদারা কয়খানা আর নাই তাহার পরিবর্ত্তে সতরঞ্চ ও ছাপ-ওয়ালা জাজিম পাতা তক্তোপোষ বিরাজ করিতেছে। লিখিবার ছোট টেবিলটা একধারে দাঁড় করানো রহিয়াছে তাহার উপর পিত্তলের ফুলদানীটায় কতোদিনকার ফুলগুচ্ছটি শুখাইয়া গিয়াছে, বদলানো হয় নাই, টেবিল হারমোনিয়মটার কোনরকম সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না। যোগেন্দ্র চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া অবাক্ হইয়া বন্ধুর মুখের দিকে চাহিল। সে রুদ্ধ জানলাটা খুলিতে খুলিতে আপনিই বলিল "সেগুলো নিলেম করে দিয়েছি"।

"কারণ? সেগুলো তো কই ভাঙ্গেনি?"

"কারণ, সেগুলো 'আমার' পক্ষে অনাবশ্যক"। "যোগেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিল। "সেগুলো অনাবশ্যক আর যতো আবশ্যকীয় হলো তোমার এই জঘন্য তক্তাপোষ?"

"না এও খুব আবশ্যকীয় নয় তবে কি জানো এরা হলো পোষ্যের সামিল; তাঁরা হচ্চেন নিমন্ত্রিত। তাঁদের খাতির করতে করতে গরীবের প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে, এরা একপাশে পড়ে থাকে মাত্র মেরামতের খরচা লাগায় না। আর কি জানো,—যে ছিল সেই থাক। নূতনকে আবার ভাস্কর পণ্ডিতের মতন লুটিয়ে দিবার জন্য ডেকে এনে কি হবে? যোগেন্দ্রের তর্ক অনাবশ্যক হলেও শুন্‌তে পারি বিশ্বনাথের তর্ক তারলে সহ্য হবে না।"

যোগেন্দ্র অনাবশ্যক তর্ক তুলিল না। নীরদ তাহাকে নিজের বক্তব্য বলিতে লাগিল। রামনাদে একদিন সহসা একজন সাধুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। বরাবরই তাহার সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি একটু মনের টান ছিল, কিন্তু ইদানীং বিদেশী চালে চলিতে চলিতে সেটা ক্রমেই কমিয়া আসিয়াছিল, তাই পরমানন্দ স্বামীর সহিত প্রথম যে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয় তাহাতে সে হিন্দু শাস্ত্রকে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া প্রচারকগণের উপর ক্ষুদ্র তীব্র ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করে। তাহাতে সন্ন্যাসী স্মিতগম্ভীর মুখে অনুত্তেজিত কণ্ঠে এমন কতোকগুলি কথা বলিলেন যে একমুহূর্ত্তেই অবিশ্বাসীর মস্তক তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। নীরদ তখন ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিল না। সে তখন বিশ্বসংসারের সমস্ত সহজ পথ ছাড়িয়া এমন কোন একটা রাস্তা খুজিয়া বেড়াইতে-ছিল যাহা ধরিয়া গেলে এখানকার বাতাসটুকু পর্য্যন্ত আলোকটুকু পর্য্যন্ত তাহার কাছে না পৌছিতে পারে। অতীত বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যৎকে পৃথক করিয়া ফেলিবার জন্য সে তখন তাহাদের কাণ্ড পর্য্যন্ত মূল পর্য্যন্ত কাটিয়া তুলিতে একখানা তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সন্ধান করিতেছিল, সহসা এই সাক্ষাৎ তাহার নিকট ঈশ্বরের প্রেরণা বলিয়া বোধ হইল। সে নিজেকে একদিনেই সমর্পণ করিল। সে পথহারা পথ চাহে, তাহার কর্ম্মবন্ধন ছিন্নপ্রায়, তাহার কর্ম্ম চাই।

যোগেন্দ্র এই পর্য্যন্ত যথেষ্ট মনোযোগের সহিত শুনিয়া অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিল "তাই তিনি দয়া করে এই সহজ পথখানি দেখিয়ে দিলেন। বড্ড দয়া—বেটা ভণ্ড!" নীরদ গর্জ্জিয়া উঠিল "চুপ্ কাকে কি বল্‌তে আছে তা জানো। তাঁর সমালোচনা তুমি করোনা।" তেমন তীব্রদৃষ্টি যোগেন্দ্র সে চোখে পূর্ব্বে

কখনও দেখে নাই, সে লজ্জিত ও ঈষৎ ভীত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। নীরদ বলিতে লাগিল "তিনি একজন কর্ম্মযোগী। হিন্দুধর্ম্ম প্রচার, ও তাহার পরিপোষণ ইঁহার জীবনের মুখ্য কার্য্য। স্বদেশানুসারে সেই উন্নত হৃদয় পরিপূর্ণ। তিনি তাহাকে তাহার সাধ্যানুরূপ একটি সামান্ত কার্য্য লইতে বলিয়াছেন, এবং নিজেও সে তাঁহার একজন পণ্ডিত শিষ্যের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেছে। তিনি বলিয়াছেন এখন তাহাকে এই পথেই চলিতে হইবে, তারপর যথাসময়ে তিনি তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, সে ভার এখন হইতে তাঁহারি প্রতি অর্পিত রহিল। এখন সে আত্মচিন্তা ভুলিয়া কার্য্য করুক, জীবনে উদ্দেশু বোধ হোক! মনুষ্যের জীবন উদ্দেশুহীন হইতে পারে না, কর্ম্মময় জগতে কর্ম্ম ফুরাইবার নয়। যেখানে সহজ চক্ষে নিজের জন্ত কর্ম্ম নাই, সেখানে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলে উচ্চতর কর্ম্ম সৃজিত হইয়া রহিয়াছে।"

বলিতে বলিতে কল্পনার দ্বার খুলিয়া ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রের যে শান্ত পবিত্র অথচ উদ্যমপূর্ণ চিত্রখানা বক্তার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল তাহাতে তাহার কণ্ঠকে উৎসাহ-কম্পিত ও নেত্রে এক অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রদান করিল। নীরদ আবার বলিতে লাগিল "যোগেন্! বন্ধু বলিতে এখন একমাত্র তুমিই আমার বন্ধু। তুমি আমায় এ পথে চলিতে একটু সাহায্য করিও, প্রথমে যদি ঠিক মনের মতন নাও বোধহয় আমার প্রতি ভালবাসায় তাহাও সহ্য করিও, সিংহদ্বারের লৌহ কবাট দেখিয়া হতাশ্বাসে পিছন ফিরিও না।"

যোগেন্দ্র এই নূতন ভাবোন্মাদনার কোন তাৎপর্য্য না বুঝিয়া সবিস্ময়ে কে জানে কেমন যেন একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব পুলকের সহিত মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিয়া লইল। কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিয়া হৃদয়ের ভিতরকার অব্যক্ত ভাবটিকে ব্যক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল না। যোগেনও বুঝিয়াছিল এমন কতোকগুলি জিনিষ আছে যাহাকে ভাষাপ্রদান করিতে গেলে তাহাদের অবমাননা করিতে যাওয়া হয়।

চিত্র-ব্যাখ্যা।

শক্তিময়ীর স্বপ্ন। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি।

শক্তিময়ী, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত ফুলের মালা উপাখ্যানের নায়িকা।

বালিকা নিরুপমা ও শক্তিময়ী দুজনেই রাজকুমার গণেশদেবকে ভালবাসিত, বালক গণেশদেব কিন্তু শক্তিময়ীকেই পত্নীরূপে মনোনীত করিয়া একদিন খেলার সময় তাহাকে ফুলের মালা পরাইয়া দেন। বাস্তব জীবনে ঘটনাচক্র অন্তরূপ দাঁড়াইল,—নিরুপমা হইল রাজরাণী, আর পরিত্যক্তা শক্তিময়ী হইলেন, বঙ্গের মহামহীয়সী সুলতানা। ইহার পর গণেশদেব এক সময় বিদ্রোহাপরাধে সুলতান কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। সুলতানা তখন তাঁহার স্থলে নিজে বন্দী হইয়া তাহাকে মুক্তিপ্রদান করেন। কারাগারে শুইয়া তন্দ্রাবেশে শক্তি স্বপ্ন দেখিতেছেন—

তিনিও তাঁহার বাল্যসখা উভয়ে নৌকায় ভাসিয়া চলিয়াছেন,—রাজকুমার শক্তিকে ফুলমালা পরাইয়া বাঁশরীতে গাহিতেছেন—

আমি কি চাহি—
সে আমার আমি তার
আমার কি নাহি?

সকলই বাল্যকালের মত, সুন্দর জ্যোৎস্না, ফুলের গন্ধ, দক্ষিণা বাতাস, কোকিল পাপিয়ার মধুর সঙ্গীত, আর তাহার মধ্যে রাজকুমারের বাঁশরীর প্রাণমনোহারী আনন্দ স্বন।

এই আনন্দ রজনীতে তাঁহারা দুইটি প্রাণী এক আত্মা হইয়া সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বন্ধন, দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অসীম আনন্দ রাজ্যে ভাসিয়া চলিয়াছেন।

এই ভাব স্বপ্নচিত্রে চিত্রকর সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

যমুনা পুলিনে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। এই চিত্রের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

"শুনিয়া শ্যামের বাঁশী, মন হইল উদাসী"

আমাদের দেশের প্রচলিত এই গানটিকেই কবি তাঁহার চিত্রে মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লেডি মিণ্টোর বিদায় সম্মান। লর্ড মিণ্টোর পাঁচ বৎসরকাল পূর্ণ হইয়া গেল—তিনি সস্ত্রীক আমাদের দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। লর্ড মিণ্টোর রাজত্বকালে দেশে নানারূপ অপ্রীতিকর ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটিয়াছে তথাপি তিনি যে অন্তর হইতে দেশের কল্যাণ কামনা করিয়াছেন ইহা



লেডি মিণ্টো।

কেহই অস্বীকার করিবেন না। লেডি মিণ্টোও নানা কার্য্যে আমাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। আজকাল ইঙ্গ মহিলা-গণের ভারতমহিলাগণের সহিত সখ্যস্থাপনের

একটা প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। মিশ মেরি কার্পেণ্টারই প্রথম এই উদ্দেশ্যে National Indian Association নামক একটি সমিতি স্থাপন করেন। কলিকাতায় ইহার যে মহিলা শাখাসমিতি আছে লেডি মিণ্টো তাহার একজন মেম্বর ছিলেন। এবং আমাদের দেশের লাটপত্নীগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এদেশের মহিলাদিগকে তাঁহার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাদৃত করিছেন। নিমন্ত্রিতাগণ তাঁহার সৌজন্যপূর্ণ সরল আতিথ্যে প্রকৃতই মুগ্ধ হইতেন। ২২শে মার্চ্চ মঙ্গলবার এখানকার ইংরাজ এবং বঙ্গ মহিলাগণ কৃতজ্ঞতানিদর্শন স্বরূপ লেডি মিণ্টোকে বিদায়ের পূর্ব্বে একটী প্রীতি উপহার প্রদান করিয়াছেন। উক্ত অপরাহ্নে আমাদের ছোটলাট পত্নী লেডি বেকারের সহিত প্রায় আড়াই শত শিক্ষিতা ও উচ্চ পদস্থা মহিলা লেডিমিণ্টোর প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সকল জাতি ও সকল শ্রেণীর মহিলাই ছিলেন। লেডি বেকার তাঁহাদের ও অপরাপর অনুপস্থিত মহিলাগণের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া উপহার প্রদান করেন। উপহারটি একটি হীরক খচিত পদ্মাকৃতি ব্রোচ। প্রদান কালে লেডি বেকার বলেন—

"আপনি ভারতত্যাগের পূর্ব্বে কলিকাতার ও বঙ্গের মহিলাগণ আপনার নিকট তাঁহাদের অন্তরের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য একান্ত উৎসুক। ভারতে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীলোকের চিকিৎসার জন্য আপনি যে নিঃস্বার্থ চেষ্টা করিয়াছেন এবং বঙ্গের মহিলাগণের সহিত আপনি যেরূপ আলাপ ও ব্যবহার করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা সকলেই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আজিকার এই ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।" উত্তরে লেডি মিণ্টো বলেন—আমাদের শীঘ্রই ভারতত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া আমরা দুঃখিত। কারণ আমি এদেশ ও দেশবাসীকে অন্তরের সহিত ভালবাসি। আমার প্রত্যেক মঙ্গল কর্ম্মে আমি আপনাদের নিকট যে সহানুভূতি ও সহায়তা লাভ করিয়াছি তাহারই ফলে আমার সকল কর্ম্ম সফল হইয়াছে। আপনাদের এই সুন্দর বহুমূল্য প্রীতি উপহারের জন্য আমি আপনাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদের বন্ধুত্ব ও প্রীতির এই নিদর্শনটি আমি চিরদিন সযত্নে রক্ষা করিব। পদ্মাকৃতি অলঙ্কার সর্ব্বদা আমার এই প্রিয় ও পরিচিত দেশটিকে স্মরণ করাইয়া দিবে। আশা করি আপনারা বিস্মৃত হইবেন না যে আমি আপনাদের মধ্যে আর কালাতিপাত না করিলেও, ভারতের মঙ্গল ব্যাপারে আমার আগ্রহ অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং আপনাদের সুখ সমৃদ্ধির জন্য আমি সর্ব্বদাই অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিব।" আশা করি আমাদের নূতন লাটপত্নী লেডি মিণ্টোর ন্যায় দেশের রমণীগণের হৃদয় অধিকারে সমর্থ হইবেন। সঃ

বঙ্গবিভাগ ও তজ্জন্য ব্যয়।

গবর্ণমেণ্টকে বঙ্গবিভাগের জন্য কিরূপ ব্যয় করিতে হইতেছে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রশ্নের ফলে তাহার একটি তালিকা সাধারণে জানিতে পারিয়াছেন। আমরা সেই তালিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

বঙ্গদেশের আয় ও ব্যয়। ভারতগবর্ণমেণ্টের সাহায্যসহ—	আয়	ব্যয়
১৯০৬ ৭	৫০৩,৫৭০,৮২	৫২২,৩৪৪,৩৭
১৯০৭-৮	৪২১,৫১৭,২৪	৫৪৪,০৮৭,১৮
১৯০৮-৯	৫৫৯,০৩,০০৬	৫৭২,৩৩৩,৭৭
১৯০৯-১০	৫৭৭,৪৩০,০০	৫৪৮,৪৯০,০০

পূর্ব্ববঙ্গের আয় ও ব্যয়। ভারতগবর্ণমেণ্টের সাহায্যসহ—	আয়	ব্যয়
১৯০৬-৭	২৩৩,৮৮০,০০	২৩৫,৮৮১'৪০
১৯০৭-৮	১৪৪,১৯০,৭৮	২৭০,১৫৭,৬০
১৯০৮-৯	২৭২,৮৮৪,৯১	২৯৫,৪৬১,৭৮
১৯০৯-১০	৩০২,৮৭০,০০	২৯৭,৩৮০,০০

বঙ্গবিভাগের পূর্ব্বে অখণ্ড বঙ্গের আয় পাঁচকোটী অষ্টাদশ লক্ষ ছিল এবং ব্যয় পাঁচকোটী একত্রিশ লক্ষ ছিল। এইক্ষণে বিভাগ হওয়াতে আয় সমানই আছে কিন্তু ব্যয় দ্বিগুণেরও বেশী হইয়াছে।

ভারতগবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে নিম্নলিখিত ভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

	১৯০৬	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯
শিল্পশিক্ষা বাবত	৩৫,০০০্	৩৫,০০০্	৩৫০০০্	৩৫০০০্
ইউরোপীয়দের শিক্ষা	৬৫,০০০্	৬৫,০০০্	৬৫,০০০্	৬৫০০০্
পুলিস	৪০০,০০০্	৮০০,০০০্	১২০০,০০০্	১৪,৫০,০০০্
বিশ্ববিদ্যালয়	১৬০,০০০্	১৬০,০০০্	১৬০,০০০্	১৬০,০০০্
দুর্ভিক্ষ ফণ্ড		২৬০,০০০্	২৬০,০০০্	২৬০,০০০্
স্বাস্থ্য বিভাগ			৪৫০,০০০্	৪৫০,০০০্
আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য ব্যয়			১৬৯৫,০০০্	৩০৪২,০০০্

নিম্নে ভারতগবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববঙ্গ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে যে সাহায্য করিয়াছেন তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

	১৯০৬	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯
কলেজ বাবত	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	৭০,০০০
ইউরোপীয়দের শিক্ষা	৫০০০	৫০০০	৫০০০	৫০০০
পুলিস বিভাগ		২৫০,০০০	৩৭৫,০০০	৫২৫,০০০
আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য ব্যয়			১৬১৮১৯৩	৩৬৯০,০০০

মরীচিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বীজ-রোপণ।

চৈত্র মাসের শেষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ফুলিগাঁয়ের ভবকান্ত এবার এফ, এ পরীক্ষা দিয়াছে। আশপাশের গ্রামের আরো কয়েকটি ছাত্রের এখনো কালেজ বন্ধ হয় নাই, তাই, তাহাদের অনুরোধে, ভবকান্ত এ কয়টা দিন মেসের বাসায় রহিয়া গিয়াছে।

ভবকান্তের এখনো বিবাহ হয় নাই, তাই দেশে ফিরিবার দিকে চাড়ও ততটা ছিল না। এবং কালেজ যাওয়া, পড়াশুনা প্রভৃতির মধ্যে ব্যস্ত থাকার দরুণ, কলিকাতা সহরের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়-স্থাপনে, যে সুবিধা এতদিন ঘটিয়া উঠে নাই, এখন তার সুব্যবস্থা করিবে বলিয়া সে সঙ্কল্প করিল।

সকালে পরেশনাথের বাগান, দুপরে কোনদিন চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম, খিদিরপুরের ডক, কোনদিন বা শিবপুর, মনুমেণ্ট, হাইকোর্ট, সন্ধ্যায় ইডেনগার্ডেন, রাত্রে থিয়েটার—ভবকান্তকে কলিকাতায় ধরিয়া রাখিবার পক্ষে, ইহারাই ত পর্য্যাপ্ত! তাহার উপর আবার ছিল, "সংহন্ত্রী" সাপ্তাহিক পত্রিকার পুস্তকবিভাগ হইতে প্রকাশিত এক টাকায় পঞ্চান্নখানি উপন্যাস! এমন বিস্তীর্ণ আয়োজন ফেলিয়া, যে এই অসহ্য গ্রীষ্মে পাড়াগাঁয়, জঙ্গল পরিবেষ্টিত, পানাপুকুরের পাড়ে অবস্থিত জীর্ণ বাটীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, সে ত নিতান্তই হতভাগ্য!

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। মেসের ছাদে, ভাঙা চেয়ারে বসিয়া ভবকান্ত একাগ্রচিত্তে "পিশাচিনী পারুলকামিনী" পড়িতেছিল। ঘন জঙ্গলে, দস্যু-পরিবৃত ইন্দ্রধ্বজ সিংহের উদ্ধারে ছদ্মবেশিনী, রাজকন্যা অনঙ্গমঞ্জরী একাকিনী আসিয়া, তরবারি-চালনায়, পঞ্চাশজন ভীমবল দস্যুকে চকিতে নিহত করেন, তাহারি লোমহর্ষণ বিবরণী পড়িতে-পড়িতে তার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল! তার পর অনঙ্গমঞ্জরী ও ইন্দ্রধ্বজ সিংহ উভয়েই যখন জানিতে পারিলেন, তাঁহারা পরস্পরকে কত কাল হইতে কি অসহ্যভাবেই ভালোবাসিয়া আসিতেছেন, তখন বেচারা ভবকান্তের হৃদয়তন্ত্রীতে একটা কোমল সুর বাজিয়া উঠিল। আর, ঠিক এই সময় সন্ধ্যার অন্ধকার চারিধার ছাইয়া ফেলিল। বইয়ের অক্ষর ভাল লক্ষ্য হয় না। ভবকান্ত বহি বন্ধ করিয়া আকাশের দিকে চাহিল।

পাশে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল বীরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে তাঁর পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে শানাই বাজিতেছিল। একে বসন্তকাল, মৃদুস্নিগ্ধ বায়ু বহিতেছে, তায় সদ্য উপন্যাস উদ্‌ভ্রান্ত তরুণ পাঠকের উন্মুখ হৃদয়, তাহার উপর শানাইয়ের মিষ্ট রাগিণী! ভবকান্ত অধীর চিত্তে আসিয়া ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইল।

বীরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর ছাদে, সবুজ, বাসন্তী প্রভৃতি নানা রঙের কাপড়-পরা ফুটফুটে মেয়েগুলি ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল।

ভবকান্ত উদাস দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, জগতে সুখ যদি কোথাও থাকে ত, ঐ বীরেন্দ্রবাবুর বাড়ীর ছাদেই তাহা আছে! আর, এই বীরেন্দ্রবাবুর সহিত যাহাদিগের সম্পর্ক আছে, এ জগতে তাহাদেরি জীবন-ধারণ শুধু সার্থক! এই ছোট মেয়েগুলি অসঙ্কোচে যাহাদের সহিত আলাপ-পরিহাস করে, যাহাদিগকে দেখিলে আনন্দে-অভিমানে মাতিয়া উঠে, ধন্য, শুধু তাহারাই! হায়, সে তাহাদিগের কেহই নহে! তাহার অসুখ হইলে বীরেন্দ্রবাবুর বাটীর দাসদাসীরাও তাহার সন্ধান লইবে না, তাহার সুখে বীরেন্দ্র বাবুর দরোয়ান অবধি এতটুকু আনন্দ জানা-ইতে আসিবে না, ছেলেমেয়েগুলি ত নহেই! সে যদি আজ মুলিগাঁয়ের ভবকান্ত না হইয়া, বীরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর এই ছেলেমেয়েদের গাড়ী টানিবার ভৃত্য হইত, তাহা হইলেও আজ তাহার কত সুখ ছিল! ভবকান্ত ধীরে ধীরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কত কথাই ভাবিতে লাগিল। এই হাস্যময়ী, সজ্জিতা, সুবেশা, চম্পকবরণী ছোট মেয়েগুলির পাশে দাঁড়াইতে পারে, সমগ্র মুলিগাঁ খুঁজিলে, এমন একটি মেয়েও মেলে কি না সন্দেহ! নুরজাহান, বুঝি, শৈশবে ঠিক এমনি ছিল! ইহার মধ্যে, কেহ যদি বেচারা ভবকান্তের হৃদয়ভাগিনী হয়—! বাতাসে, ভবকান্তের দীর্ঘনিশ্বাস ভাসিয়া গেল!

সে রাত্রে বিছানায় শয়ন করিয়া, একটা কথা কেবলি ভবকান্তের মনে হইতেছিল—এত বয়স হইতে চলিল, তবু ত সে কোন-দিন কাহারো প্রেমে পড়ে নাই! তার অদৃষ্ট নিতান্তই অপ্রসন্ন! তার বন্ধু যোগেশ্বর প্রেমে পড়িয়াছিল,সত্যরও দুইবার লভ্ হইয়া-ছিল, আর সে এমন কি দোষ করিয়াছে যে, প্রেমের নিরাশ যাতনাটুকু ভোগ করিবার অবকাশও তাহাকে দাও নাই, ভগবান!

আজ সে ভাবিতেছিল, প্রেমে পড়িবার পক্ষে যোগ্যা পাত্রীই বা তার মিলে কোথায়! ঐ বীরেন্দ্র বাবুর বাড়ী—আহা, তা যদি সম্ভব হইত! তাহা হইলে, জগতে তার আর কোন অভাবই থাকিত না! ভবকান্ত না হইয়া, সে যদি আজ কোন উপন্যাসের নায়ক হইত, তাহা হইলে ত দুঃখই ছিল না। দস্যু-হস্তে নিগৃহীত হইতে কি সে পশ্চাৎপদ, যদি অনঙ্গমঞ্জরীর মত, তার উদ্ধার-কর্ত্রী মিলিবার সম্ভাবনা থাকে!

শেষ রাত্রে, ঘুম ভাঙিলে, ভবকান্ত স্থির করিল, কলিকাতায় কাহারো সহিত তাহার তেমন আলাপ নাই, দেশে ফিরিয়া প্রেমে পড়িবার জন্য সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে। লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষসিংহেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অঙ্কুরোদ্গম।

মুলিগাঁয়ের বাটির বাহিরের রোয়াকে ভবকান্ত বসিয়াছিল। সম্মুখের বাগানে, পাড়ার বালিকারা ফুল তুলিতেছিল। ইহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা শৈবলিনী দেখিতে-শুনিতে মন্দ নহে! নামটিও শৈবলিনী! প্রেমের পক্ষে উপযুক্তা পাত্রী বটে! তবে তাহার শাণিত রসনা দেশে এমন প্রসিদ্ধি বিস্তার করিয়া-ছিল যে, ভবিষ্যতে সে কলহ-বিস্তারে অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিবে বলিয়া সকলের স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। আর শুধুই কি রসনা! কিল-চড় প্রভৃতি প্রহার-বর্ষণেও সে আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় দিত। এক কথায়, ছোট গ্রামখানিতে, সে বর্গীর হাঙ্গামার তুল্যই ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। পাড়ার ছেলেমেয়েরা তাহাকে, সম্রাজ্ঞীর আসনে, বরণ করিয়া সশঙ্কচিত্তে তাহার আজ্ঞা-পালনে, সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব থাকিত। তার খর বচনের আশঙ্কায়, কলিকাতা-প্রত্যাগত ভবকান্ত একদিনো প্রেমাভিব্যক্তির সাহস পায় নাই। আজ, তাহাকে দেখিয়া, ক্ষোভে, বেচারা ভবকান্তের অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়া-ছিল! হায়, প্রতাপ! হায়, শৈবলিনী, শৈ—!

সহসা ভবকান্তের চোখের সম্মুখে একটা ছোটখাট যুদ্ধ হইয়া গেল। বুড়ী, ওরফে সুরমার বয়স আট বৎসর বেশ! শান্ত, ধীর মেয়েটি! সে বেচারী তার মামার বাড়ীতেই প্রায় থাকিত, কাজেই, শৈবলিনীকে তেমন চিনিত না! আজ ফুল তুলিতে আসিয়া ভালো দুটি চাঁপাফুল সে মালীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল। শৈবলিনী দেখিতে পাইয়া তাহাতে সম্রাজ্ঞীর ন্যায্য দাবী বসাইলেও, সুরমা ছাড়িল না। প্রতিপত্তি-রক্ষার জন্য, অগত্যা, শৈবলিনী সুরমার গণ্ডদেশে প্রচণ্ড চপেটাঘাত বর্ষণ করিয়া, তার সাজির ফুলগুলি রাজকোষে বাজেয়াপ্ত করিয়া, স্থান ত্যাগ করিল। অনুগত অক্ষৌহিণীর মত, মেয়ের দল, "মাগো, কি একগুঁয়ে মেয়ে" বলিয়া সগৌরবে শৈবলিনীর অনুসরণ করিল। সুরমা মাটিতে পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বেচারীর ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

ভবকান্ত তাড়াতাড়ি সুরমাকে তুলিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া আসিল। লজেঞ্জেস ও চুরোটের ছবি দিয়া,ডিক্সনারীর ছবি দেখাইয়া, নানা উপায়ে, সে সুরমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিল।

ইহার পর হইতে, সুরমা ও ভবকান্তকে প্রায় একত্রে বেড়াইতে দেখা যাইত। ভবকান্ত ছবি দেখাইয়া, গল্প বলিয়া, অনভিজ্ঞা সরলা বালিকাটির হৃদয়-হরণে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিল। উপন্যাসের নায়কের মত, সে সুরমার জন্য, গাছ হইতে ফুল-ফল পাড়িয়া দিত, সন্ধ্যার সময় রোয়াকে বসিয়া আকাশের তারাও গণিত! এই সময়, লুকাইয়া ভবকান্ত কবিতা লিখিতেও আরম্ভ করিয়াছিল, বাড়ীর লোকে অবশ্য তাহা জানিতে পাবে নাই। এক একবার সে ভাবিত, সুরমা নিতান্ত বালিকা, আবার মনে হইত, প্রতাপ ও শৈবলিনী, যখন আম্রকাননে খেলা করিত, তখন তাহাদিগেরি বা এমন কি বয়স হইয়াছিল!

সেদিন দুপুরবেলায় ভবকান্ত কাগজের নৌকা তৈয়ারী করিতেছিল। সুরমা নিকটে বসিয়াছিল। ভবকান্ত ডাকিল, "সুর!"

"কেন, ভবদা?"

"তুমি আমাকে ভালবাস?"

"বাসি।"

"খুব, ভালবাস?"

"খুব!"

তার পর ভবকান্ত আবো কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কথাটা বাধিয়া গেল! লজ্জায় তার মুখ লাল হইয়া উঠিল। ভবকান্ত আবার ডাকিল, "সুর!"

"কেন?"

"তুমি সাঁতার কাটিতে জান?" কিছুদিন পূর্ব্বে, সে 'চন্দ্রশেখর' পড়িয়াছিল। তাই, বোধ হয় সাঁতারের কথা, তার মনে পড়িতেছিল!

সুরমা কহিল, "না!"

"সাঁতারটা শিখো—শেখা ভালো!"

"মা যে বকে, ভবদা, পুকুরে নাইতে গেলে—"

"বটে!"

ভবকান্ত কহিল,"সুর, তুমি—"কথাটা শেষ হইল না! কে যেন তার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। চাপা গলায় আবার সে ডাকিল, "সুর!"

"না, ভবদা, অমন করে কথা কয়ো না ভাই, আমার বড় ভয় পায়, জানো ত, 'ঠিক দুক্কুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা!"

কিন্তু ভবকান্ত আজ মরিয়া হইয়াছিল। আজ সে হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া জানাইতে চাহে, সুরমাকে সে কত ভালবাসে! তাহার জন্য, যদি প্রাণ দিতে হয়, তাহাতেও সে আজ প্রস্তুত। মিথ্যা লজ্জা করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ হারাইবে, এত বড় মূর্খ ও কাপুরুষ, সে কখনো নয়!

ভবকান্ত কহিল, "সুর, আমাকে বিয়ে করবে?"

"যাঃ—"

"না, সুর, বল, বল, বিয়ে করবে—তা হলে, আমি তোমাকে অনেক ছবি দেব—কলকেতা থেকে আসবার সময় কত নূতন

পুতুল, রঙীন জলছবি কিনিয়া আনিব—কত জিনিষ দেব, বল, লজ্জা কি? বল, আমাকে তুমি বিয়ে করবে?"

মৃদু হাসিয়া, সুরমা কহিল, "ওমা, দাদার সঙ্গে বুঝি আবার বিয়ে হয়!"

ভবকান্ত ভাবিল, নিরাশ হইলে চলিবে না। সে কহিল, "এস সুর—এখন সকলে ঘুমোচ্ছে, তোমাকে পুকুর থেকে পদ্মফুল তুলে দিইগে!"

"আর, তোমার কাপড় ভিজুলে বকুনি খাবে যে!"

আমি আলাদা কাপড় নিয়ে যাব—কেউ জানতে পারবে, কেন?" "না, ভাই, আমি যাব না! মা জানতে পারলে বকবে!"

"কেউ জানবে না—এসোনা, তুমি পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখো, আমি কেমন ডুব সাঁতার দোব!"

"আমার, ভাই, ডুব সাঁতার কাটা দেখতে বড় ভালো লাগে।"

উভয়ে দীঘির ধারে গেল! ভবকান্ত জলে সাঁতার কাটিতে নামিল। সুরমা উপরে দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় তীব্রকণ্ঠে সুরমার পিসিমার চীৎকার ধ্বনি শুনা গেল! পিসিমা বলিলেন, "পোড়ারমুখো মেয়ে এখানে ছুটে বেড়াচ্ছ! হাবলীদের বাড়ী নেমন্তন্ন আছে, না? সকলে খুঁজে খুঁজে সারা—মেয়ে এখানে পুকুর ধারে রোদ পোহাচ্ছেন! পুরুষ মানুষের সঙ্গে বেড়ানো কি, লা? বাড়ী যা! চুল বাঁধতে হবে না!"

সুরমা কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "এ্যাঁ, ভবদা যে বললে, পদ্মফুল তুলে দেবে।"

পিসিমা কহিলেন, "ভব, বাবা, পদ্মফুল নিয়ে খেলা করে না, ছিঃ! তুলে আমাকে দিয়ে এস কাল পুজো করে বাঁচবো,—কেমন বাবা?"

"বেশ ত, পিসিমা।"

পিসিমা সুরমাকে লইয়া রঙ্গস্থল ত্যাগ করিলে, ভবকান্ত ক্লিষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিণতি।

সেদিন সুরমা আসিয়া যখন ভবকান্তকে ডাকিল, তখন ভবকান্ত সবেমাত্র "ঝঞ্ঝাময়ী" উপন্যাস শেষ করিয়াছে। বাঙলা উপন্যাস সবগুলিই প্রায় ভবকান্ত পড়িয়া ফেলিয়াছে। তবে ঝঞ্ঝাময়ী'র মত মর্ম্মস্পর্শী উপন্যাস বাঙলা ভাষায় আর আছে কিনা, সন্দেহ! ৭৭২ খানি পৃষ্ঠা! তাহার পাত্রপাত্রীগুলা ভবকান্তকে বিচিত্র স্বপ্নমোহে বিভোর করিয়া তুলিয়াছিল! সুরমাকে দেখিয়া ভবকান্ত কহিল, "সুর, হালদার্ণীর বাগানে, আজ যদি সন্ধ্যার সময় যাও ত, তোমাকে কাঁচামিঠা আঁব পাড়িয়া দিই।"

কাঁচামিঠা আম্রের প্রতি সুরমার বিশেষ লোভ থাকিলেও, সন্ধ্যাবেলার গাছপালার নিকট যাইতে তার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

ভবকান্ত কহিল, "যাবে না, সুর?"

কাঁচামিঠা আম্রের লোভ ছাড়াও ত সহজ নহে। শেষ মুহূর্ত্ত অবধি চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি! সুরমা কহিল, "যাব।"

"বেশ, মনে থাকে যেন! পুকুরের সিঁড়ির উপর আমি থাকব—তোমার কোন ভয় নেই! উঃ, কি বড় বড় আঁবই হয়েছে!"

"এখন, কেন, আনবে চল না, ভবদা?"

"এখন ওখানে লোক আছে। তারা গাছ জমা নিয়েছে। পাড়তে দেবে কেন?"

"তা বটে!" সুরমার জিবে জল আসিয়াছিল। সেই বড় বড় কাঁচামিঠা আঁবগুলি—আহা, এমন ভালো জিনিষ কি আর আছে! ভবদা তাকে বড় ভালবাসে ত। বড় লক্ষ্মী ছেলে! সে যে আঁব খাইতে ভালবাসে, ভবদা কেমন করিয়া তাহা জানিল!

"তা হলে মনে থাকে যেন সুর—নিশ্চয় এসো—আর কেউ যেন না জানতে পারে, দেখো!"

কাঁচামিঠা আম্রের প্রতি ভবকান্তের যে বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ ছিল, তাহা নহে! তুচ্ছ দুটা ফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হইবে, সে কাল আর তাহার নাই! প্রেমের মহিমায় সে আজ সাধারণ মানুষের অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে।

আপনার স্বার্থ বলি দিতে, আজ সে এতটুকু কাতর নয়! সুরমার জন্য দুটা আঁব পাড়িয়া দেওয়া—সে ত সামান্য ব্যাপার! তার জন্য, সে আজ প্রাণ দিতে পাবে! কিন্তু সুরমা কি তার গভীর হৃদয়ের অগাধ অসীম ভালবাসার প্রতিদান দিবে! নাই দিক্—তবু ভালোবাসিয়াই ভবকান্তের সুখ। আহা, পরীক্ষার অন্তরালে, তাহার জন্য, এমন স্বর্গের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত ছিল, সে-ত কখনো স্বপ্নেও তাহা ভাবে নাই!

কিন্তু এই আম্রচুরি ব্যাপারটা একেবারে স্বার্থশূন্য ছিল না। সরলা নারী—হউক বালিকা—তার সহিত আজ সে একটু ছলনা করিয়াছে! রণে প্রেমে সে ছলনাটুকু অবশ্য ক্ষমার্হ!

আম্রের লোভ দেখাইয়া সুরমাকে সে বাগানে লইয়া যাইতে চায়। উপন্যাসে সে পড়িয়াছিল, সরোবরের মর্ম্মর সোপানে বসিয়া প্রেমিক-প্রেমিকারা হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করে! চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিশীথ, মাথার উপর তারকা-খচিত, অনন্ত,নীল আকাশ, পদতলে সরোবরের কালো জল! আহা, সেইত প্রেমাভিব্যক্তির পক্ষে, উপযুক্ত কাল, উপযুক্ত স্থান। সুরমা নিতান্ত বালিকা—পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা বালিকামাত্র—নহিলে, তাহার জন্য, সুরমা একছড়া মালাও কোনদিন গাঁথিয়া দেয় নাই। যাই হোক, আজ সে নিজে চুপি চুপি বেল ও বকুল ফুল দিয়া দুই ছড়া মালা গাঁথিয়াছে! পাছে শুখাইয়া যায়, এই ভয়ে, ডেস্কের মধ্যে এক বাটি জলেসে দুটি ভিজাইয়া রাখিয়াছে! সেই মালার একগাছি সে আজ সুরমার কণ্ঠে পরাইয়া দিবে—আর সুরমাও অপর গাছি তাহার কণ্ঠে পরাইয়া দিবে। নিকটেও পুষ্করিণী ছিল, গ্রামের নরনারী সন্ধ্যার সময় সেখানে বিরল হইলেও সে সকল পুষ্করিণীতে তালগাছের মূলই সোপানের স্থান অধিকার করিয়াছিল—নায়কনায়িকার বসিবার মত উপযুক্ত স্থান ছিল না!

হালদার্গির বাগান লোকালয়ের একটু দূরে! পুষ্করিণীর সোপান মর্ম্মর-রচিত না হইলেও, তথায় জীর্ণ ইষ্টক খণ্ডে বসিবার স্থান সংগ্রহ করিয়া লওয়া যাইত।

সন্ধ্যার পর, কাগজের মধ্যে, মালা দুইটি জড়াইয়া,ভবকান্ত হালদার্গির বাগানে উপস্থিত হইল। সোপানের জীর্ণ ইষ্টকস্তূপে বসিয়া সে অধীর আবেগে নায়িকার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। অন্ধকার গাঢ় হইয়া নামিল। জন প্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। স্তব্ধ বিজনতায়, ঝিল্লীর গভীর ধ্বনিতে ভবকান্তের প্রাণটা শিহরিয়া উঠিতেছিল। আকাশে চাঁদ ছিল না! আজ যে, কৃষ্ণ পক্ষের ত্রয়োদশী, অতিরিক্ত অধীরতায়, সেদিকে লক্ষ্য করিবার, ভবকান্তের অবসরই মিলে নাই। চাঁদ উঠিবে না জানিলে, সে কখনই এ দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইত না! কাঁচা-মিঠা আম্র পাড়িবার ত তার একটুও ইচ্ছা বা সাহস ছিল না—কেমন করিয়া সে এই আম-কাঁঠালের ঝোপ পার হইয়া, চাঁপাগাছের তলা ঘুরিয়া, বাগান ছাড়িয়া গৃহে যাইবে, ইহা ভাবিয়া, সে আকুল হইয়া উঠিল।

পুষ্করিণীর অপর পারে, গাছের ঝোপে, জোনাকি জ্বলিতেছিল, ভবকান্তের মনে হইল, ওগুলা ভূতের চোখ জ্বলিতেছে! তালগাছের পাতাগুলার মধ্যে বায়ু সোঁ সোঁ শব্দে গর্জ্জিতেছিল, ভবকান্ত ভাবিল, এ ভূতেরই নিশ্বাসের শব্দ! কি বিড়ম্বনা! তার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল! আর, মনে হইতেছিল কি পাপীয়সী, বিশ্বাসঘাতিনী, এই সুরমা! অধীর প্রতীক্ষায়, এই অন্ধকারে, বাগানের মধ্যে, ভূতপ্রেতের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া, সে বসিয়া—ভয়ে তার বুক দুর দুর করিতেছে, জিহ্বা শুকাইয়া আসিয়াছে—আর, সেই পিশাচিনী সুরমা, নিশ্চিন্ত চিত্তে, হয়ত তার পিসিমার কাছে আবদার ধরিয়া গল্প শুনিতেছে! সে যদি কোন রাজপুত্র হইত ত, এখনি ঘোড়ায় চড়িয়া

সেখানে উপস্থিত হইত, এবং তরবারির আঘাতে তার এ গভীর পাপের চূড়ান্ত শাস্তির বিধান করিত! কিন্তু হায়, সে রাজপুত্র নহে, তার ঘোড়া নাই, তরবারি নাই, অধিকন্তু সদ্য পরীক্ষার ফল বাহির হইবার আশঙ্কায় সে নিতান্ত নিরীহ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর, জবরদস্ত প্রেমের এই বিকট অত্যাচার! সে কাঁদিয়া ফেলিল! এ বিশ্বাস ভঙ্গের কি শাস্তি নাই!

সহসা পত্রমর্ম্মর শুনিয়া সে ফিরিয়া চাহিল! তার গা ছম্-ছম্ করিয়া উঠিল। কে আসে না! সুরমা কি? আহা, সুরমা তবে সত্যই তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু এ'ত সুরমার পায়ের শব্দ নয়। এ যে ক্ষিপ্রগতিতে কে ছুটিয়া আসে। ভবকান্ত ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। শৈশবে সে শুনিয়াছিল, হালদারদের বাগানে, দুপর রাত্রে ভুতের লড়াই হয়! সে ভাবিল, হায়, প্রেমের জন্য ভূতের হাতে, অবশেষে প্রাণটা দিতে হইল। তবু একবার শেষ চেষ্টা—সে যে ভয় পাইয়াছে, ভূতকে সে কথা জানানো হইবে না। মুখে সাহস দেখাইতে হইবে। অমন করিয়া কত লোক ভূতের হাতে বাঁচিয়া গিয়াছে! কিন্তু আর ভাবিবার অবসর নাই! ভূত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

সে সাহসে ভর করিয়া সিঁড়ির রোয়াকে উঠিল! ভূত যে তাহারি পাশে আসিয়া পড়িয়াছে! সর্ব্বনাশ! সে প্রাণপণে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া কহিল "কে।" কথাটা কাঁপিয়া ভাঙিয়া গেল! দূরে প্রতিধ্বনি উঠিল, "কে।"

এমন সময় সম্মুখেই নিশ্বাসের শব্দ, ফোঁস!' ভবকান্ত টাল সামলাইতে না পারিয়া, 'মাগো' বলিয়া, উলটিয়া পাঁকের মধ্যে পড়িয়া গেল!

* * *

উড়িয়া মালী ভিজা কাপড় পরা, কাদা মাখা ভবকান্তকে তার গৃহে পৌঁছাইয়া সংবাদ দিল, বাবু বাগানে আঁব চুরি করিতে গিয়াছিল। তার গরুটা দড়ি ছিঁড়িয়া সেদিকে আসে। বাবু ভয় পাইয়া গাছ হইতে বুঝি পাঁকে পড়িয়াছিল। ছোকরা বাবুদিগের জ্বালায় সে মুনিবের কাছে প্রহার খাইয়া মরে।

সে দিন অপরাহ্ণে ভবকান্তের অজ্ঞাতে, তার পরীক্ষায় ফেল হওয়ার সংবাদ আসিয়া সকলকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার উপর, আবার, লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটা সন্ধ্যা-বেলায়, ছোটলোকের মত, আম চুরি করিতে গিয়াছিল শুনিয়া ভবকান্তের পিতা সমস্ত বিরক্তি ও অপমানের জ্বালা পুত্রের পৃষ্ঠে বর্ষণ করিলেন।

পরদিন হইতে ভবকান্ত সুরমাকে নিকটে ঘেঁসিতে দেয় নাই। নারীজাতির উপর তার আন্তরিক বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। নারীর প্রেমটা যে কিছুই নহে, তাহা যে বিরাট স্বার্থসংশ্লিষ্ট, ইহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিল। ইহার পর হইতে সে আরো বুঝিয়াছিল, প্রেমটা জগতে দুষ্প্রাপ্য মরীচিকা মাত্র, আর ওগুলা উপন্যাসগুলা নিতান্তই গাঁজাখুরি! ভবকান্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, জীবনে কখনো আর সে বাঙলা উপন্যাস পড়িবে না! এবং এ প্রতিজ্ঞা আজ পর্যান্ত যে, সে ভীষ্মের মত অবিচলিতভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহা আমরা হলপ্ করিয়া বলিতে পারি।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

মনীষা।—(মিশ্র কাব্য) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।৵০। গ্রন্থখানি ইংরাজ কবি টেনিসনের "দি প্রিন্সেস্" নামক মিশ্রকাব্যের অনুবাদ। সম্প্রতি এখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অনুবাদ হইলেও, মৌলিক গ্রন্থ অপেক্ষা, এরূপ গ্রন্থ রচনা দুরূহ। বিদেশীয় কবির, বিশেষতঃ টেনিসনের অনুবাদ কিরূপ দুঃসাধ্য, তাহা সাহিত্যসেবীমাত্রেই অবগত আছেন। আমরা এ কঠিন সাধনায় প্রবৃত্ত গ্রন্থকারকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছি। গ্রন্থকার অবশ্য বিদেশী উপমাদির স্থলে দেশীয় উপমার বহুল ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহার মৌলিক ভ্রান্তি বড়ই ক্ষতিকর হইয়াছে। তিনি শান্তাকে বঙ্গীয় সমাজের যে শ্রেণী হইতে আহরণ করিয়াছেন, সে নির্ব্বাচনটী সুসঙ্গত হয় নাই, মনে হয়। বঙ্গীয় সমাজ এখনো পুরুষ নারীকে ঠিক পাশ্চাত্য প্রেমিকের চক্ষে দর্শন করে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রণয়-ব্যাপারেও যে প্রভেদ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইটুকু ক্ষুদ্র ত্রুটি, কলঙ্কের মত, রহিয়া গিয়াছে। রচনা স্থলবিশেষে, দুর্ব্বল ও উৎকট হইলেও, মোটের উপর সুন্দর হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষা, ভাবকে ছাড়াইয়া সুন্দর সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছে। এবং সাধারণতঃ গ্রন্থখানি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। আশা করি শক্তিশালী লেখক ভবিষ্যতে অনুবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া বিদেশী গ্রন্থের ছায়া অবলম্বন করিয়া মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিবেন।

দশচক্র। (কৌতুক-নাট্য) শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি,এ, প্রণীত। ৬৫, হরীশ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা। কবিবর রবীন্দ্রনাথের "মুক্তির উপায়" শীর্ষক গল্প অবলম্বনে 'দশচক্র' রচিত হইয়াছে। কৌতুকনাট্য রচনায়, লেখকের অনবধানতায় অনেক সময় সুরুচির মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না দেখা যায়। সৌরীন্দ্র বাবুর গ্রন্থের বিশেষ মূল্য এই যে, ইহাতে সর্ব্বত্র সংযত ভাব, সুরুচি ও সরলতা রক্ষিত হইয়াছে। কোথাও কষ্টকল্পনা বা অস্বাভাবিকতার সাহায্যে কৌতুক বা হাস্যরসের সৃষ্টি করিবার প্রয়াস নাই। সাদাসিধা কথার এমন সুন্দর প্রয়োগ করিয়াছেন যে, তাহাতে আপনা আপনিই রসের সৃষ্টি হইয়াছে। নাটকীয় শিল্প-চাতুর্য্যের প্রাণ,—সহজ ও সরল ভাব। যতদূর স্বাভাবিকতা বজায় রাখা যায়, লেখকের ততই কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। সৌরীন্দ্রবাবু এ বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার রচনার প্রধান গুণ প্রচ্ছন্ন আঘাত। সমাজকে শাসন করিতে হইলে, উপরে ঘা দিলে তাহার চৈতন্য সম্পাদন দূরে থাক, আরো সে উদ্ধত হইয়া উঠে। এমন সুদক্ষভাবে তাহার মর্ম্মে আঘাত দিতে হয় যে সহজেই তার চেতনা হয়। গানগুলি বেশ সুখপাঠ্য ও কবিত্বরসে সুমধুর—সেগুলি রঙ্গমঞ্চে কিরূপ জমিয়াছে, তাহা দেখিবার অবসর আমাদের ঘটে নাই। একটী বিষয়ে কেবল আমাদের মতভেদ আছে। সৌরীন্দ্র বাবু নূতন লেখক, এখন তাঁহাকে বহুদিন সমালোচকের আদালতে হাজির হইতে হইবে। এখনি এত অধৈর্য্য তাঁহার শোভা পায় না। গ্রন্থের "পূর্ব্বকথায়" তিনি সমালোচকবর্গের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন! যদি সমালোচক আপন কর্ত্তব্য-পালনে অক্ষম হয় তবে তাঁহার প্রতি কৃপার উদ্রেক হওয়া উচিত। তাঁহাকে আক্রমণ করিতে যাওয়া কখনই শোভন নহে। সমালোচক সাময়িক, লেখক চিরদিনের।

শ্রীগঃ

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



ইউ, রায় কর্ত্তৃক ব্লক]　　দীক্ষা　　[কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী।

৩৪শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ [২য় সংখ্যা।

কণারক।

ভুবনেশ্বরে, যাহার গঠন, জগন্নাথে তাহা পুষ্ট এবং কণারকে তাহা পরিণত। ভুবনেশ্বর দেখিলে মনে হয়, সৌন্দর্য্যঘন নিখিল স্বর্গ যেন এই পুণ্যভূমিতে নামিয়া আসিয়া মানুষকে আপনার বক্ষে টানিয়া লইয়াছে। জগন্নাথে সৌন্দর্য্য বড় নাই, কিন্তু তাহার সুবিশাল আয়তনে এবং অখণ্ড গাম্ভীর্য্যে, দর্শককে স্তব্ধ করিয়া দেয়। শুনিয়াছি, কণারকের অর্ক-মন্দির এই দ্বিবিধ ভাবেরই প্রসাদ বিতরণ করিত। সৌন্দর্য্যে তাহা অদ্বিতীয় এবং বিশালতায় তাহা অভাবনীয় ছিল। কণারকের বিশালতা এখন কালগর্ভে, সৌন্দর্য্যও প্রায়-বিগত।

পুরী হইতে কণারকের অর্ক-মন্দিরের ব্যবধান আঠারো মাইল। মধ্যে বালু আর বালু আর বালু! সহর নাই, গ্রাম নাই, মুক্তজনতা নাই, খাদ্য নাই, দেবতা নাই! লুব্ধ তীর্থযাত্রীর ভক্তির ভাণ্ডার জগন্নাথেই শেষ হইয়া যায়।*

কণারকের শিল্পিগণ কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য-দর্শিতার যতটা পরিচয় দিয়াছিল,—শিল্পি-সুলভ অভিজ্ঞতার, ততটা দিতে পারে নাই। অর্কমন্দির এমন স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, যে সাগরের ধবল হাস্যমুখর উর্ম্মিমালা তাহার চরণে উচ্ছ্বসিত হইয়া গড়াইয়া পড়িত। শিথিল বালুকাভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া, একটা মেঘভেদী মন্দির সাগরের আসুরিক উপদ্রব কতকাল অটলভাবে সহ্য করিবে? ইহাই অর্কমন্দিরের পতনের প্রধান কারণ।

আর একটি এমন ব্যাপার ঘটিয়া গেল, যাহাতে কণারকের উপরে ধ্বংসের ভীমকর অনধিককাল মধ্যেই প্রসারিত হইল। সম্মুখে, সাগরগর্ভে কতকগুলি গুপ্তশৈল অনেক তরণীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। অর্ক-মন্দির শিখরে, এক খণ্ড চুম্বক-পাথর ছিল। বিপন্ন জাহাজের কুসংস্কার-অন্ধ মুসলমান নাবিকেরা স্থির করিল, ঐ পাথরের আকর্ষণেই এখানে জাহাজ ডুবিয়া যায়। নাবিকেরা বলপূর্ব্বক মন্দির শীর্ষ হইতে চুম্বক পাথরখানি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। তখন হইতে, দেবায়তনের আরতি রাগিনী আর বিশ্বছন্দের সহিত সুর গাঁথিয়া দিত না। তখন কোথায় গেল পূজার ঘটা, শ্লোকের ছটা, পুষ্পের ডালি, নৈবেদ্যের থালি, অগুরুচন্দনকলাপ এবং জপগাহনার আলাপ! কারণ? যবনের স্পর্শে দেবমহিমা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে! হা দেবতা! মানবের হস্তে এত অল্পে তুমি অপবিত্র হও!

উড়িষ্যার দ্বাদশ বর্ষের রাজস্বে, কণারকের

* শুনিতেছি, পুরী হইতে কণারক যাইবার জন্য রেলপথ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। যদি হয়, তাহা হইলে অনেকেই এই অতীব গৌরবের শেষ-চিহ্ন দর্শন করিবার সুযোগ পাইবেন।

মন্দিরচূড়া নীল আকাশের অনেকখানি পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। এখন, মন্দিরের উৎকৃষ্টভাগ কালের কবলে আত্মসমর্পণ করিয়াছে,—মাত্র জগমোহনটি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। সেই স্বল্পাবশিষ্টের মধ্যে, আজও যাহা দেখা যায় তাহা অপূর্ব্বসুন্দর। কিন্তু তাহার আশাও আর বেশী দিন করিও না।

জগমোহনের ভিতরে যাইবার উপায় নাই। দ্বার পথ হইতে, স্খলিত প্রস্তর-স্তূপাকীর্ণ কক্ষতল দর্শন করিয়া, অতি সাহসীও তাহার ভিতরে প্রবেশ করাকে, বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া বিবেচনা করেন না। জগমোহনের উপরিভাগ অযত্নসুলভ শৈবাল-চিত্রে শ্যামায়মান। কারুকার্য্য, যা' কিছু দেখা যায়, তা' বাহিরে। মোহনের পিছনে প্রধান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পর্ব্বতাকারে পড়িয়া আছে।

কণারকের জগমোহনটী প্রথম দৃষ্টিতে অবিকল ভুবনেশ্বরের মত বোধ হয়। এবং সে সাদৃশ্য, এমন পরম্পরানুসারী,—যে দৃষ্টি-বিভ্রম অনিবার্য্য। কিন্তু কণারকের ভিত্তি-গাত্রস্থ কারুকার্য্য দেখিলে, সহজেই সে ভ্রম, টুটিয়া যায়। মন্দিরের অনেক অংশ লুব্ধ মহারাষ্ট্রীয়েরা ঘর বাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য পুরীতে লইয়া গিয়াছে। অরুণস্তম্ভটীও, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দোলমঞ্চসারি নামক পথের মধ্যে স্থাপিত আছে। তাহার মসৃণতা, তাহার নির্ম্মাণ প্রণালী এবং তাহার সুডৌল সৌন্দর্য্য, যিনি দেখিয়াছেন,—তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। স্তম্ভটীর মধ্যভাগে কোনরূপ কারুকার্য্য নাই,—নীচেও যে কারুকার্য্য আছে, তাহা অল্পের মধ্যে বেশ। কিন্তু অরুণ-স্তম্ভের কথা এখন থাক।

কণারক সম্বন্ধে, পুরুষোত্তম তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

"কোনার্কস্যোদধস্তীরং ভক্তি মুক্তি ফলপ্রদম্।
স্নাত্বৈব সাগরে সূর্য্যায়র্ঘং দত্বা প্রণম্য চ॥"

এইরূপ, নানা তন্ত্রে, নানাশাস্ত্রে কণারকের পাপতারিণী শক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রমতানুসারে, দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণতনয় শাম্ব, সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া, শাপমুক্ত হইয়া, এই স্থানে সূর্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শাম্ব এখানে একটি মন্দির স্থাপনা করিয়াছিলেন। এবং শাকদ্বীপ হইতে অভিজ্ঞ পুরোহিত আনাইয়াছিলেন। শাম্বের উপাখ্যান পরে বলিব। অবশ্য, এখন, যে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তাহা শাম্বপ্রতিষ্ঠিত নয়।

কণারকের মহিমা সম্বন্ধে, অপর এক সংহিতায় দেখা যায়:—

"মৈত্রেয়াখ্যং বনং বিপ্রা মৈত্রেয় তপসার্জ্জিতম্।
যত্র গত্বা নরঃ শীঘ্রং মহারোগাদ্বিমুচ্যতে॥
তত্র যে স্নাতুমিচ্ছন্তি বীতরাগা বিকল্মষাঃ।
তেষাং মনোরথ ফলং পূরয়েদ্দিবসাধিপঃ॥
মৈত্রেয়াখ্যে বনে রম্যে যে ত্যজন্তি কলেবরম্।
পাপানি সংপরিত্যজ্য জ্যোতির্ল্লোকং
ব্রজন্তি তে॥" প্রভৃতি।

কপিল সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—উৎকলখণ্ডে চারিটী তীর্থভূমি আছে। শঙ্খক্ষেত্র, চক্রক্ষেত্র, গদাক্ষেত্র এবং পদ্মক্ষেত্র। ভগবান বিষ্ণু গয়াসুর-নিধন করিয়া, উৎকলে তাঁহার শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ফেলিয়া যান। যেখানে যেখানে তিনি যাহা ফেলিয়া গিয়াছেন, সেই সেই স্থান সেই নামের এক একটী তীর্থ-ভূমিতে পরিণত হয়। শঙ্খতীর্থ বা জগন্নাথক্ষেত্র, চক্রতীর্থ বা ভুবনেশ্বরক্ষেত্র, গদাতীর্থ বা পার্ব্বতীক্ষেত্র (যাজপুর)

এবং পদ্মতীর্থ বা অর্কক্ষেত্র। কথিত আছে, এখানে আসিয়া সমুদ্রস্নান করিলে, সর্ব্বপাপ দূরে যায়। অর্কবটের নিম্নে উপাসনা করিলে বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য লাভ করা যায়। রথযাত্রা দেখিলে, সশরীরতপন দর্শনের ফললাভ হয়। শাম্ব ছিলেন, দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। যেমন তাঁহার সুগঠিতাবয়ব, তেমনি তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশ্রী। শাম্ব ছেলেটি আমাদের প্রথমভাগের গোপালের মত "বড় সুবোধ ছেলে" ছিলেন না। কেবল দুষ্টামি আর কৌতুক। অমন যে মহাঋষি নারদ, যাঁহাকে স্বয়ং কৃষ্ণ পর্য্যন্ত ভক্তি করিতেন,—শাম্ব তাঁহাকে ভয় করা দূরে থাক্—তাঁহার শ্বেতশ্মশ্রুর অরণ্য দেখিয়াও টলিতেন না। তাঁহার দুষ্টামির জন্য, নারদ ত চটিয়া-ই লাল! অবশেষে, শাম্বকে একেবারে জব্দ করিয়া দিবার জন্য, নারদ এক ভয়ানক উপায় অবলম্বন করিলেন।

কৃষ্ণের কাছে গিয়া তিনি বলিলেন "আপনার অত শত মহিষী আর শাম্ব—আর অমন সুন্দর যুবা। বুঝিলেন কি না—"

কথাটা না বুঝিবার মত নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"তাও কি হয় ঠাকুর। শাম্ব আমার ছেলে।" নারদ বলিলেন, "কিন্তু আপনার মহিষীরা তার বিমাতা।'

শ্রীকৃষ্ণ কথাটা উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু আমাদের প্রবাদ-প্রসিদ্ধ চিরপরিচিত 'ঢেঁকি ঠাকুরটি' কথাটা ভুলিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরা জলক্রীড়া করিতেছেন। নারদ আসিয়া শাম্বকে বলিলেন,"শাম্ব, তোমাকে তোমার বাবা ডাকিতেছেন।" বলিয়া, জলক্রীড়ার স্থানে তাঁহাকে যাইতে কহিলেন।

শাম্ব কোনরূপ সন্দেহ করিলেন না। তিনি অগ্রসর হইলেন।

প্রচুর হাস্যোৎসবের মধ্যে তখন যাদবরমণিগণের জলক্রীড়া হইতেছিল। হয় ত, কোনও সুন্দরী নীলজলের উপরে রাঙা পদ্মের মত সাঁতার দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিলেন,—কোন তরুণী পুলকাধীরা হইয়া কর-কাঁকন-কলাপের মৃদু শিঞ্জিতের সহিত জলরাশি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, পতনশীল সলিলে বিম্বিত সূর্য্যের কম্পমানকিরণ জ্বলিয়া উঠিতেছিল এবং কোন রূপসী পেলবআস্যে কোমলতম হাস্য বিকশিত করিয়া সলিল-ভঙ্গের সঙ্গে লাস্যলীলায় বিভোরা,—তালে তালে বক্ষের রত্ন-হার দুলিয়া, সূর্য্যরাগে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। যাদব রমণীরা তখন মদ্যপানে উন্মত্তা। প্রমোদোৎসবে কটি'র বসন খসিয়া পড়িয়াছিল—সেইপথে নারদ-রচিত ষড়যন্ত্রভ্রান্ত শাম্ব আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে রূপের জ্যোতিতে সূর্য্যও বুঝি ম্লান হইয়া গেলেন। কামিনীরা জলক্রীড়া ভুলিয়া, শাম্বের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অভিশাপ দিলেন—তিনি ত নারদ-ঘটিত ব্যাপার জানিতেন না—বলিলেন—"পাপিষ্ঠ! তুই কুষ্ঠগ্রস্ত হ।"

অভিশাপ প্রকট রোগের চিহ্ন দেহে লইয়া, শাম্ব, চন্দ্রভাগা তীরে অর্কদেবের আরাধনায় বসিলেন। হে জগজ্জ্যোতি! হে বিশ্ব-নয়ন! হে সর্ব্বপাপতারণ! তোমার প্রদ্যোতে আমাকে উদ্ধার কর দেব! আমাকে মুক্তি দাও। তপনদেব প্রসন্ন হইলেন। শাম্ব রোগমুক্ত হইলেন।

সূর্য্যের এই মহিমার উপরেই কণারকের প্রতিষ্ঠা। কথিত আছে, কণারকের মন্দিরস্থ অর্কমূরত সুর-কারু বিশ্বকর্ম্মা-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। যদিও, কণারকের সে মহিমা আজ বিগত, তথাপি, এখনো প্রতি মাঘমাসে এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে, এখানে এক উৎসব হয়। বৎসরের মধ্যে, সেই একদিনে—অদ্যাপি অর্কের অপার করুণাকাহিনী লক্ষজনকণ্ঠে গগনে পবনে বিঘোষিত হইয়া উঠে। চন্দ্রভাগার জনবিরল দুকূল আবার ক্ষণেকের তরে মুক্তজনতার বিপুলপুলকোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়া যায়। তাহার পর, আবার শ্মশানের গাম্ভীর্য্য! হায় কণারক!

এইবারে, মন্দিরের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

ষ্টার্লিংসাহেবের মতে, এই মন্দির ১২৪১

খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়।* কণারকের কাল-নিরূপণে গোলমাল আছে। অনেকে অনেক প্রকার বলিয়াছেন। অন্যের মতে, ইহা ৭৩০ বৎসরের পুরাতন। ঐ কথা সম্রাট আকবরের যুগে।† এখনকার কালহিসাব করিলে, ইহার নির্ম্মাণকাল অনেকদিনকার হইয়া পড়ে। পণ্ডিত ফারগুসান্ ঐ মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"ইহা এত পুরাতন নয়। কণারক মন্দিরের আদর্শ দেখিয়া বলা যায়, ইহা নবম খৃঃ অব্দের শেষভাগে নির্ম্মিত।‡

আবার হাণ্টারসাহেব কহেন, জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের ৫০ বৎসর পরে, কর্ণারকের মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহার নির্ম্মাণকাল ১২৩৭ ও ১২৮২ খৃঃ অব্দের মধ্যভাগে।§ অপর এক জনের মতে, এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কাল, ১২৪১ খৃঃ অব্দ হইতে ১২৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিশ বৎসর।¶ বাঙালী-গৌরব রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ঐ সম্বন্ধে অনেক আলো-চনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু ঠিক হয় নাই।

কেহ কেহ বলেন ইহার নির্ম্মাণকাল ১২০০ শকে। (Temple Annals) ঐ পুস্তকে লিখিত আছে লাঙ্গুল্য নরসিংহ দেব ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। (ইহাকে "tailed king Narsing Deb" বলা হয়।) নরসিংহ দেব, অর্কক্ষেত্রে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দির-নির্ম্মাণবিষয়ক উক্তিগুলি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল, ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন :

"The lord of the earth, the tailed King Narasingha, erected a temple for the ray-garbanded God n the Sak year twelve hundred."

পুরুষোত্তম চন্দ্রিকায় উক্ত হইয়াছে। রাজা নরসিংহের রাজত্বকাল ১১৫৯ হইতে ১২০৪ শক। কিন্তু মন্দিরনির্ম্মাণকালসম্বন্ধে চন্দ্রিকা নীরব।

দেখা যাইতেছে, ষ্টার্লিং ও হাণ্টারসাহে-বের মত, প্রায় একরূপ, যা' দু'এক বছরের এদিক ওদিক। আবার "List of Ancient Monuments of Bengal"এর মতও এই মতেরই কাছ দিয়া যায়। ফারগুসান সাহের অনেক পিছাইয়া গিয়াছেন এবং আইন-ই-আকবরী লেখক আবুল ফজল আরো পিছনে। Temple-Annals একেবারে আগাইয়া গিয়াছে। কোন মতটী যে সত্য, তাহা ঠিক করিয়া বলা বড় কঠিন। তবে ইহার নির্ম্মাণকাল,—১২৫০ খৃঃ অব্দের পরেই আরম্ভ হইয়াছিল বলিলে—অযুক্তি পূর্ণ হইবে না। ফারগুসান সাহেব, যে নির্ম্মাণপদ্ধতি ও আদর্শ দেখিয়া, কালনিরূপণের কথা বলিয়াছেন,—তাহাতে নির্ভর করা কঠিন। হিন্দুস্থাপত্য, একান্ত রক্ষণশীল। বিশেষতঃ উৎকল-স্থাপত্য। উড়িষ্যায় সহস্র সহস্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাদের কাহারো কাহারো নির্ম্মাণব্যবধান দু'তিন শতাব্দী। কিন্তু আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিবে, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে নির্ম্মাণপদ্ধতি অতি

* Asiatic Researches. Vol. xv.p. 327.

† আইন-ই আকবরিকার।

‡ History of Indian and Eastern Architecture.

§ Statistical Account of Bengal.

¶ List of Ancient Monuments of Bengal. (1895)

অল্পই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই ক্রমাতি-সূচি আঁধারগর্ভ মন্দির, সেই এক আদর্শানুকারিণী মূর্ত্তি! অত যে সিংহমূর্ত্তি,—যে যাহাকে সিংহ না বলিয়া ড্রাগণ বলিলেই ঠিক হয়—সবগুলি এক ছাঁচে ঢালা। এই সেদিনও, পুরীতে কোন মন্দিরের দ্বারদেশে আমরা দুটি সদ্যনির্ম্মিত সিংহমূর্ত্তি দেখিলাম—তাহাও অবিকল সেই মান্ধাতার আমোলের সিংহমূর্ত্তির মত। শিল্পী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে, যাহাতে এক চুল এদিক ওদিক না হয়। এখন বল, এমন দেশে তুমি ভিন্ন আদর্শের সন্ধান কোথায় পাইবে? যদি মন্দিরের প্রস্তর পরীক্ষাপূর্ব্বক তুমি তাহা প্রাচীন বা আধুনিক, স্থির করিতে চেষ্টা করো, তাহা হইলে, বরং কৃতকার্য্য হইবে। এবং যদি আদর্শ ও প্রাচীনত্বের দিক দিয়াই ধরা হয়, তাহা হইলে, তুমি বলিতে বাধ্য যে, কণারকের মন্দির,জগন্নাথের দেবায়তনের পরে, নিশ্চয় নির্ম্মিত হইয়াছে। কারণ শিল্প যত পরিণত হয়, তাহা ততই উৎকর্ষের দিকে যায়। কণারকে ইহার পরিচয় দীপ্যমান। ভুবনেশ্বর বা জগন্নাথ, কি উচ্চতায়, কি গঠনকৌশলে এবং কি সূক্ষ্ম শিল্পে—কণারকের সমকক্ষ নয়। পরন্তু, ফারগুসন সাহেব ত নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যে উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরের মত কণারকের ভিতরটা অন্ধকারে ঢাকা নয়। আমরা বলি কণারক যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক,—ইহাই তাহার প্রধান প্রমাণ। ভুবনেশ্বরের অভ্যন্তর ভাগে ভীষণ অন্ধকার—পরিষ্কার দিবা-কালেও সেখানে নজর চলে না—প্রতিপদেই হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইতে হয়। জগন্নাথের মন্দিরেও অন্ধকারের অভাব নাই,—কিন্তু ভুবনেশ্বরের মত নয়। জগন্নাথের মন্দির ও আধুনিক। আর কণারকের মন্দির নিশ্চয়ই আরো আধুনিক, কারণ তথায় আলোক-সমাগমের উপায় আছে। শিল্পীরা পূর্ব্বাভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিল, যে আলোকের উপায় না করিলে, মন্দির অগম্য হইয়া উঠে। ভুবনেশ্বর ও জগন্নাথের মন্দিরের দুরবস্থাই এই সাবধানতার কারণ। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, বলিতে হয়, ভুবনেশ্বর এবং জগন্নাথের মন্দিরের অপেক্ষা কণারক নিশ্চয়ই আধুনিক।

বহুকাল পূর্ব্বে, আবুলফজল অর্ক-মন্দির দেখিতে আসেন। তিনি ইহার সৌন্দর্য্য-দর্শনে যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তৎরচিত সূর্য্য মন্দিরের কাহিনীই তাহার প্রমাণ। কিন্তু আবুল ফজলও মন্দিরের সমগ্র সৌন্দর্য্য দর্শন করেন নাই। কণারকের তখন ভগ্ন-দশা। তিনি যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, কণারকের সর্ব্বোচ্চ চূড়া, জলদ-ভেদী ছিল। যদিও, এই বর্ণনায়, কল্পনার অভাব নাই, তথাপি ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, কণারক এত উচ্চচূড়সম্পন্ন ছিল, যে মেঘস্পর্শী না বলিলে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিবে না। আবুল ফজল অর্ক-মন্দিরের একটা মোটামুটি বর্ণনাও, আপনার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার একাংশ এইরূপ।—

কণারক মন্দিরের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর আছে। প্রাচীর, উচ্চতায় একশত পঞ্চাশ হাত এবং প্রস্থে উনিশ হাত। প্রবেশ করিবার পথে একটি অষ্টকৌণিক স্তম্ভ আছে, তাহা কৃষ্ণ প্রস্তর রচিত। (ইহাই অরুণ স্তম্ভ, এখন পুরীতে আছে) নয়টী সিঁড়ি অতিক্রম করিলেই একটা মুক্তভূমিতে গিয়া পড়া যায়। সেখানে প্রস্তর

গঠিত একটি বৃহৎ খিলান আছে,—তাহা সূর্য্যনক্ষত্র-খচিত। খিলানের চারিদিকে বহুভঙ্গিমাবিশিষ্ট বহু খোদিত মূর্ত্তি। মন্দিরের নিকটেও দেবালয়ের অভাব নাই। তাহারা গণনায় অষ্টবিংশ সংখ্যক।"

আগেই বলা হইয়াছে, লাঙ্গুলা রাজা নরসিংহ দেব এই মন্দিরে স্থাপয়িতা। তাঁহার অমাত্য শিবাই সউতুরার তত্ত্বাবধানে ইহা নির্ম্মিত হয়। উড়িষ্যায়, বহুশতাব্দীর পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে যে অযুতমন্দিরমালা, একের পর একে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কণারক তাহার মধ্যে সর্ব্ববিষয়েরই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। উৎকল শিল্পের পরম বিকাশ কণারকে। ভুবনেশ্বর মন্দিরগাত্রে যে চিত্রবহুলশিল্প, সূক্ষ্মতায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং জগন্নাথ দেবায়তনের বিশালতায় যে শিল্প সকলকে বিস্ময়মূক করিয়া তুলিয়াছিল, কণারকে সেই শিল্পই মেঘস্পর্শী মন্দির শিখর হইতে তাহার ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে সুব-কারুর কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিয়া, শৈল-পটে আপনার অস্তিমবিকাশ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ভুবনেশ্বরে যাহার গঠন, কণারকে তাহার পতন।

উৎকলের অন্যান্য মন্দির, দ্বিভাগে বিভক্ত, কিন্তু ইহার তিনটি ভাগ। প্রথম দু'ভাগে দুটী করিয়া কর্ণিক এবং তৃতীয় ভাগে পাঁচটী। কেশরীরাজবংশসুলভ নবগ্রহ, এখানেও দেখা যায়। উড়িষ্যার প্রায় সকল দেবায়তনেই সপ্তফণফণী থাকে, এখানেও তাহার অভাব নাই। ইহার গৃহতল চওড়ায় চল্লিশ ফিট। দেওয়াল সরলভাবে উপরে উঠিয়াছে। তাহারো মাপ চল্লিশ ফুট। তাহার পর, আরো বিশ ফুট স্থান লইয়া, যে অংশ,—তাহার ভিতরে ভিতরে ব্রাকেট আছে। তাহার পর ছাদ। অর্থাৎ, ভূমিতল হইতে জগমোহনের ছাদের উচ্চতা ৬০ ফিট। নিম্নাংশটি ৪০ ফিট উচ্চে স্থাপিত। পাঠকগণের যেন মনে থাকে আমরা মন্দিরের যে কথা বলিলাম ও বলিব,—তাহা সমগ্র অর্কমন্দিরের নয়,—মাত্র তাহার ধ্বংসাতিরিক্ত জগমোহনের,—যাহা অদ্যাপি বিদ্যমান।

জগমোহনটী চতুষ্কোণ—চতুর্দ্দিকেই ৬৬ ফিট দীর্ঘ।* চারিদিকেই একটী করিয়া দরজা। ভিতরের চাইতে বাহির দিকটা ভাল আছে বটে, কিন্তু দরজাগুলির চারিপাশ অপেক্ষাকৃত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রধান ও বৃহৎ ভোগমণ্ডপটি কিছুদিন আগেও ছিল,—কিন্তু সম্প্রতি তাহা মাটীর ভিতরে বসিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদ্বারের কারিকরিও উল্লেখযোগ্য সুন্দর। দরজার বাহির দিক, সর্প, বানর ও মনুষ্যমূর্ত্তি এবং আনত শাখাপল্লব প্রভৃতির খোদনচিত্রে পূর্ণ। ছাদটী পিরামিডের মত। তাহার উপরটা, ১২ ফিট পরিমিত স্থান ঢালু ভাবে নামিয়া আসিয়াছে। চাঁদনির বাহিরে,—উত্তরদিকে একযোড়া সুবৃহৎ অশ্ব ও হস্তিমূর্ত্তি আছে। আর একদিকে একটি সিংহ ও হস্তিমূর্ত্তি।

কণারকে, হিন্দুস্থাপত্যের আর একটী পরিবর্ত্তন দেখা যায়। অনেককেই অনুযোগ করিতে শুনি, হিন্দুরা 'আনাটমী' দক্ষ ছিলেন না বলিয়া, তাঁহারা অপ্রাকৃতিকতা হইতে মুক্ত হইয়া, স্বভাবকে অনুসরণ করিতে পারিতেন

* Antiquities of Orissa.

না। হিন্দুদের অপ্রাকৃতিকতার কারণ যে, তাঁহাদের শারীরিকবিজ্ঞান অনভিজ্ঞতার পরিচয় নয়, আমি ভিন্ন নিবন্ধে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি।* এই যে অপ্রাকৃতিকতা,—আশ্চর্য্যের বিষয় কণারকে তাহার পরিচয় দুর্লভ। এখনকার মূর্ত্তিগুলি অনেকাংশে অবিকল স্বভাবানুকারিণী। সেগুলি দেখিলে বেশ বোঝা যায়, উৎকল শিল্পী শারীর-বিজ্ঞানাভিজ্ঞ ছিলেন। কেবলমাত্র সিংহগুলি,—সিংহের মত দেখিতে নয়। কিন্তু আমরা আগেই বলিয়াছি, হিন্দু শিল্পীরা নিশ্চয়ই সিংহগঠন করিতে যান নাই। পরন্তু সিংহ-প্রাকৃতিক ড্রাগন গঠনই তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল।

কণারকের মন্দির গাত্রের কারুকার্য্য এমন ঘনসান্নিবিষ্ট, যে হাণ্টার সাহেবও বলিয়াছেন :—

"Viewed from below, this lofty expanse of masonry looks as if one could not place a finger on an unsculptured inch."

—অর্থাৎ "দেখিলে, মনে হয় যেন ইহাতে কারুকার্য্য-শূন্য এমন এক ইঞ্চ পরিমিত স্থান নাই, যেখানে তুমি তোমার আঙ্গুল রাখিতে পার!"

কণারকের শিল্প যে-কি অদ্ভুত শক্তি পরিচায়ক, এই উক্তি হইতেই তাহা জানিতে পারিবে।

মন্দিরের একখানি সুন্দর ও বৃহৎ প্রস্তর, একজন সাহেব আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রস্তর-খণ্ডের বর্ণ হরিৎ ছিল। সাহেব, একখানি গরুর গাড়ীর উপরে, পাথরখানি চাপাইয়া দিয়াছিলেন। গাড়ীখানাকে প্রস্তর সমেত, অতি কষ্টে খানিকদূর আনা হইল। তাহার পরে, সশব্দে গো-শকট ভাঙ্গিয়া পড়িল। পাথর আর আনা হইল না। সেখানি, মাঠের ভিতরে পড়িয়া রহিল।

পূর্ব্বদ্বারপথের কারুকার্য্যখচিত একটি অংশ পড়িয়া যায়। তাহার মাপ ১৯ × ৪১/২ × ৩১/২। এবং সেটি ২৪ টোন ভারী। তাহাতে, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতুর মূর্ত্তি খোদিত আছে। ইহারই নাম নবগ্রহ শিলা। এই নবগ্রহ শিলাখানিকে কলিকাতায় আনিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছিল। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্ট তিনহাজার টাকা, এই প্রস্তরানয়নের ব্যয়-স্বরূপ প্রদান করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের উপরে, এই কাজের ভার দেওয়া হয়।† অখণ্ড প্রস্তরখানিকে আনা সুকঠিন দেখিয়া, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। তাহার খণ্ডিত অংশ হাতীর উপরে চাপানো হইল। কিন্তু তথাপি সেই গুরুভার প্রস্তরখানাকে অধিকদূর আনা গেল না। অসম্ভব বিবেচনায়, এই কার্য্য অবশেষে স্থগিত হয়। তাই হাণ্টার সাহেব বলেন,

"Bishop Heber's criticism that the Indians built like Titans and finished like jewellers."

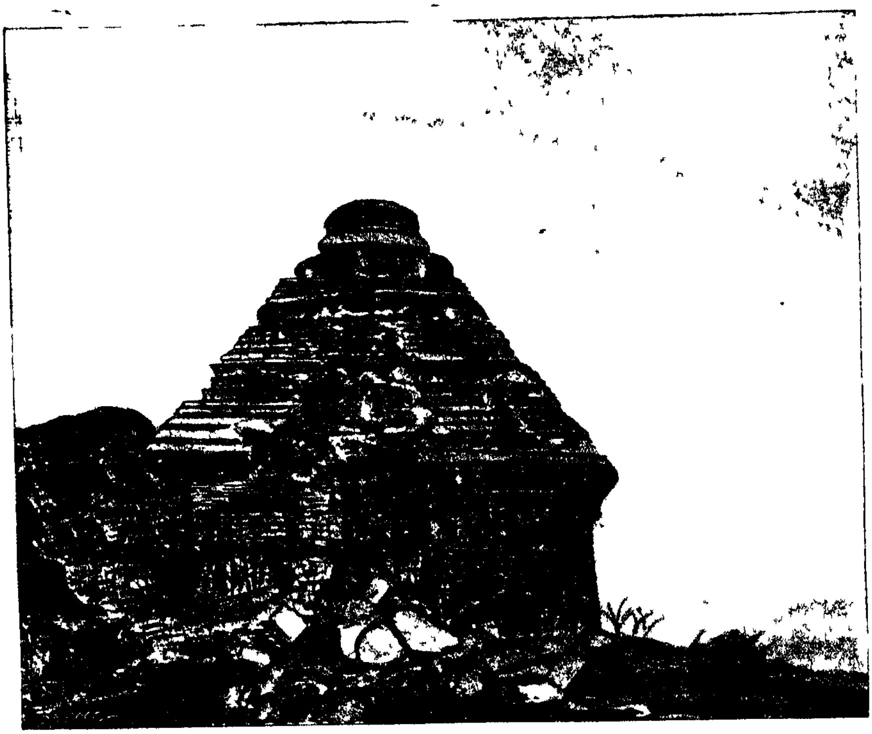
প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় লেখক বলেন্দ্র নাথ ঠাকুর, এই নবগ্রহ শিলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আর সেই অতুল শিল্প—নবগ্রহ; উজ্জ্বল কৃষ্ণ পাষাণখণ্ডে

* ১৩১৬ সালের শ্রাবণ ও আশ্বিন সংখ্যায় ভারতীতে মৎ-রচিত "ভারতীয় চিত্র-কথা" নামক প্রবন্ধ দেখ।
† Hunter's Orissa.

মুদ্রিত কয়টি বুদ্ধসদৃশ প্রশান্ত হাস্যবদন, হস্তে কাহারও জপমালা, কাহারও বা অর্দ্ধচন্দ্র, কাহারও বা পূর্ণ ঘট। এখন এই নবগ্রহ-মূর্ত্তি মন্দির হইতে প্রায় চারিশত হস্ত দূরে ইংরাজের লৌহরথোপরি শায়িত—কলিকাতায় আনিতে আনিতে আনা হয় নাই, পথিকেরা তাহার গায়ে সিন্দুর লেপন পূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যায়; কিন্তু এই নূতন লব্ধ ভক্তি এবং প্রীতি লাভ করিয়াও আর কিছুকাল পড়িয়া থাকিলে এই অক্ষুণ্ণ প্রাচীন কীর্ত্তি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।" বলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী। ৫৬৫ পৃষ্ঠা।

কণারকের মন্দির, সমগ্র ভারতের মধ্যে উচ্চতায় শ্রেষ্ঠ। ইহার কারুকার্য্য দেখিয়া মিষ্টার ষ্টার্লিং বলেন,

"The workmanship remains too as



কণারকের ভগ্নমন্দির

perfect as it has just come from the chisel of the sculptor owing to the extreme hardness and durability of the stone."

অর্থাৎ—"কণারকের কারুকার্য্য দেখিলে মনে হয়, যেন ইহা এইমাত্র শিল্পীর বাটালি মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে!"

মন্দিরের সূর্য্যমূর্ত্তিটিও এখন স্থানান্তরিত হইয়াছে। তাহা সপ্তম খৃঃ অব্দের আরম্ভ ভাগে এখান হইতে তুলিয়া, পুরীতে লইয়া যাওয়া হয়।*

আর একজন ইউরোপীয় কণারক দেখিয়া বলিয়াছেন :—

* List of Ancient Monuments of Bengal.

"So much so, indeed, that perhaps I do not exaggerate when I say that it is, for its size, the most richly ornamented building—externally at least—in the whole world."

"অত্যুক্তি হইবে না, যদি আমি বলি যে আকারানুসারে, এই কারুকার্য্যখচিত মন্দির,—অন্ততঃ বাহিরের অংশ হিসাবে, ভূমণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ " তাহার পর উনিই বলিতেছেন, "বাহিরের অংশ ধরিলে, এই মন্দিরটী ভারতীয় স্থাপত্যের একটী উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তবে উচ্চ ভারতে এমন অনেক মন্দির আছে যাহাদের অভ্যন্তরের সূক্ষ্মকার্য্য সুন্দরতর বটে।"*

কিন্তু, এত প্রশংসাও, কণারককে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না। উৎকলরাজশ্রীর সেই কৈবল্য-সোপান ধ্যানপূতঃ পরিকল্পনা, আর আজিকার এই স্মৃতির মশানে গৌরবের অন্তিম দীর্ঘশ্বাস! হা মানুষী শক্তি! কত ক্ষুদ্র তুমি! দ্বাদশবর্ষের রাজস্বে যাহা তুমি নীলকমলনিলীম আকাশের গায়ে কবির স্বপ্নের মত গড়িয়া তুলিলে, আজ কোথায় সেই স্বপ্ন, সেই শৈল-মুদ্রিত শিল্পকাব্য, সেই অসীমের সান্ত-বিকাশ! আজ দেবধানীর সেই গৈরিকঅঙ্গচ্ছদকম স্তব-গাহকগণের শিব-সুন্দরের অনন্ত-গাথা ও নির্ব্বাণ-কীর্ত্তনের সহিত অর্ক-মন্দিরের নিখিল গরিমাও, নির্ব্বাণ-মার্গে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। গৌরবের মরণ এমনি করিয়া হয়। কেহ দেখে না, কেহ শোনে না, কেহ যত্ন লয় না, ধীরে ধীরে অতি ধীরে, বেলান্তের তামসী যবনিকায় গোধূলির হিরণ্যদীপ্তিপ্রতিম কোথায় মিলাইয়া যায়! যেন, চিকুরের একটা চমক! ফুলের একটু সুরভি! মায়ার একটা ক্ষণিক লীলারহস্য!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

শিল্পে ভক্তিমন্ত্র।

নারিকেল ফলাম্বুবৎ শিল্পলক্ষ্মী কি উপায়ে কখন যে আমাদের পূর্ণতা দান করিবেন তাহা জানিবার উপায় নাই; তবে এটা জানি যে সেই পূর্ণতা লাভের জন্য সরস ভূমিকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া, বাহির হইতে যে ঝড় আসে তাহা হইতে সাবধান থাকিয়া এবং যে সুবৃষ্টি সূর্য্যালোক ও সুবাতাস আসে তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত না করিয়া গাছটার মত আমাদেরও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

'গজভুক্ত কপিত্থবৎ' শিল্পলক্ষ্মী আমাদের জীবনকে শূন্য করিয়া চলিয়া যাইবেন সেই দিন, যে দিন শিল্পবিষয়ে রক্ষণশীলতা আমরা হারাইব। বিংশ শতাব্দির শিক্ষাগর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া পিতৃপুরুষের অমৃত কুম্ভে সবুট পদাঘাত করিয়া গ্রীক মদ্যভাণ্ডটার দিকে যে মুহূর্ত্তে হাত বাড়াইব সে মুহূর্ত্তে মানবসমাজের পাগলাগারদে আমাদের স্থান দিতে কেহই ইতস্তত করিবে না। শিল্পবিষয়ে এই পাগলামির লক্ষণ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া আমাদের ভিতরে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আমাদের উপনীত করিয়াছে যে ভারত শিল্পটা কি

* Picturesque Illustrations of Ancient Architecture in Hindusthan. p.p. 27.

এমন প্রশ্নও আমরা আজ করিতেছি। চোখ যখন ঠিক দেখে তখন এটা কি, এ প্রশ্ন করে না। আদিম অসভ্য অবোধ শিশু এবং অন্ধের মুখেই শোনা যায় এটা কি, ওটা কি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যাঁহারা ভারত শিল্পের সৃষ্টি করিয়া গেছেন, যাঁহারা আনন্দসহকারে ভারতশিল্পের জয়ধ্বজা সমস্ত প্রাচ্য দেশে বহন করিয়া লইয়া গেছেন, কই তাঁহারা তো কোন দিন এমন প্রশ্ন করেন নাই যে ভারত শিল্পটা কি?

কি জানিয়া তবে ঘরের শিল্পলক্ষ্মীকে ভালবাসিতে চাহি, এটার যে কি ধিক্কার তাহা আমরা যতদিন না বুঝিব ততদিন শিল্প লোকের সিংহদ্বারের বাহিরেই আমাদের থাকিতে হইবে।

শ্রীক্ষেত্রের যাত্রী একদল বাসায় বসিয়া রহিল, একদল মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিল এবং দেবতাকে দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিল। বাসার লোকে প্রশ্ন করিতেছে -কি দেখিলে বল। উত্তর হইতেছে সে যে কি দেখিলাম কি বলিব!

শিল্প সম্বন্ধেও এই প্রশ্নোত্তর মানুষে মানুষে চিরদিন চলিতেছে কিন্তু সেই কি কি, আর আহা সে কি!

যাহারা দেখিল তাহারা বুঝাইয়া বলিতে পারিল না; আর না দেখিয়া, শুনিয়ামাত্র বুঝিতে যাহারা চাহিল তাহারা মাথা মুণ্ডু কি যে বুঝিল তাহা তাহারাই জানে।

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈবচান্য
আশ্চর্য্যবচ্চেন মন্য শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনম্
বেদনচৈব কশ্চিৎ॥"

এই মহদাশ্চর্য্যরূপ ব্যাখ্যা করিতে কাহারও সাধ্য হয় নাই, ব্যাখ্যা শুনিয়া বুঝিতে সাধ্যও কাহার হইবে না; যদি না সকল শিল্পের অধিষ্ঠাতা সেই বিশ্ব শিল্পী—যাঁহার আশ্চর্য্য বিধানে কত সুদৃঢ় বন্দর থাকিতেও শিল্প-লক্ষ্মীর সোনার তরী আজ আমাদেরই শ্মশান-ঘাটে ভিড়িতে চলিয়াছে—তিনিই আমাদের মনশ্চক্ষু খুলিয়া দেন।

কেমন করিয়া বুঝাই ভারতশিল্প কি, এটা যে খেলা নয়, স্বপ্ন নয়, মর্ম্মের ভিতরে যাহার জন্য টান পড়িতেছে, যাহাকে ধরিয়া থাকিতে প্রাণান্ত হইতেছে—সে যে দুঃস্বপ্ন নয়, হৃদয় ধনেরই জাগ্রত মূর্ত্তি কেমন করিয়া বুঝাই!

অমৃতের স্পর্শে জীবন পুলকিত হইতেছে মনোবীণায় মনোভিমত টান পড়িতেছে অনুভব করিতেছি কিন্তু সেটা যে ক্ষণিক মোহের করসঞ্চালন নয়, আমাদের হৃদয় তন্ত্রীর উপরে সুদীর্ঘকাল পরে শিল্পদেবতারই সহসা অঙ্গুলি তাড়ন তাহা যদি বা বুঝি, বুঝাইতে অক্ষম।

তাই আমি স্থির করিয়াছি কা, কা, কি, কি লইয়া থাকিলে কোন ফল নাই; ইচ্ছা হয় তোমরা তাহা লইয়া থাক, আমাকে অবসর দাও আমি যাহা দেখিয়া ভুলিয়াছি তাহা পাইয়া সুখী হই।

যাহারা তৃষাতুর নও তাহারা বসিয়া বসিয়া বিচার কর; যাহা চাহি তাহা ছায়া কি কায়া সত্য না মরীচিকা! কিন্তু পিপাসিত যাহারা তাহাদের সে বিচারের অবসর কোথা? মরীচিকা হউক আর সত্যই হউক রূপসাগরের দিকে আমাদের এই বলিয়াই ছুটিতে হইবে—

"বিশ্বজীবন বিমোহচ্ছবি কোসিদেব
যত্নদেষি মে পুরঃ
ত্বাং পিবামি হৃদয়েন নির্ভরং তিষ্ঠ তিষ্ঠ ..

যেমন হৃদয় দেবতাকে বলিতেছি 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' তেমনি যে বন্ধুরা ভারতশিল্প লইয়া বিচারে বসিয়া গেছেন তাঁহাদেরও বলিতেছি 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ'—তোমরা বিচার লইয়া থাক, আমি যাই—পথ ছাড়; গোলযোগ করিয়া ধূলা উড়াইয়া আমার পথ আঁধার করিও না। আর যাঁহারা চূণকাম ও তৈল সিন্দূর দিয়া ভারতশিল্পলক্ষ্মীকে সুঠাম পরিষ্কার সুভব্য ও সুসভ্য করিয়া তুলিতে চাহেন তাঁহাদেরও বলিতেছি 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ', আর রং চড়াইয়া কায নাই ও যেমন আছে থাক, ওই কালোরূপে ভারতশিল্প জগৎ আলো করিয়া আছেন তেল রং মাখাইয়া দেবতাকে আর বহুরূপী সাজাও কেন?

অমানিশার ন্যায় স্তব্ধ শান্ত এই ভারতশিল্প চোখে কালো ঠেকিতেছে কিন্তু হৃদয়দুয়ার খুলিয়া একবার ইহার গম্ভীরতা অনুভব কর, নির্নিমেষ বিস্ময়ের মত নিস্তরঙ্গ রসসমুদ্রে অসীম রহস্যের মাঝে স্থির পদ্মাসনা ভুবনেশ্বরীকে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।

কথায় বলে "তর্কে বহু দূর" ভারতশিল্পকে যতদিন আমরা তুলনায় সমালোচনা করিয়া তর্কের দ্বারা বুঝিতে চলিব ততদিন এই বিরাট শিল্পের বহিরঙ্গিণ অংশটাই তাহার সু এবং কু হইয়া আমাদের চোখে পড়িবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে শিল্প সৃষ্টি করিয়া গেছেন তাহা সেকালেও যেমন আমাদের ছিল, একালেও তেমনি নিতান্ত আমাদেরই উপযোগী একথা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিব না যতদিন না যাহা দান পাইয়াছি সেটাকে শ্রদ্ধা সহকারে লইতে শিখিব।

স্বল্পই হউক, অধিকই হউক, মহৎ হউক বা না হউক পূর্ব্বপুরুষের শিল্পসম্ভার অসঙ্কোচে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ আমাদের করিতেই হইবে এবং সেইটাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়। আর সেটাতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ধারের মাল আত্মসাৎ করিয়া নিজেকে ইউরোপীয় শিল্পীর সমকক্ষ বলিয়া যতই প্রচার করি না কেন তাহাতে দিন দিন নিজেকে হেয় তো করিবই উপরন্তু অসত্যবাদীর নরকের দিকেই অগ্রসর হইব।

শিল্পী বলিয়া আজও যে ভারতবাসীর খ্যাতি আছে সেটা কি আমাদের ওই ধারকরা মালের অধিকারিত্বের বলে না আবহমানকাল সে শিল্প এখনও ধরিয়া আছি তাহা। ফলে?

সামান্য স্বর্ণকার কুম্ভকার হইতে দেবতার দ্বারে বসিয়া যাহারা পট লিখিতেছে তাহারাই ভারতশিল্পকে যথার্থ আশ্রয় করিয়া আছে এবং তাহারাই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, পিতৃপুরুষের শিল্পকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়াছে তাহারা নয়; হরির নামে যাহাদের হরিভক্তি উড়িয়া যায় তাহারা নয়।

দেশের স্বর্ণকার এবং কুম্ভকারগণকে আমি অযথা বাড়াইতে চাহিতেছি এবং কালীঘাট ও জগন্নাথের পটুয়া সকলকে বিজাতীয় ধরণে শিক্ষিত পেণ্টারগণের উচ্চে স্থান দিতেছি বলিয়া অনেকে সচকিত হইয়া উঠিবেন, কিন্তু স্বধর্ম্মের উপরে অটল নির্ভর যদি আমাদের কাছে শ্লাঘনীয় হয় তবে স্বশিল্পে যাহারা এখনও নির্ভর করিতেছে তাহারাই বা আমাদের শ্রদ্ধা কেননা আকর্ষণ করিবে।

চন্দ্র সূর্য্যের আকার, আকাশের নীলিমা পৃথিবীর শ্যাম আভা আগেও যেমনটি আজিও তেমনিটি, কুম্ভকারের ঘট, স্বর্ণকারের অলঙ্কার, পটুয়ার পট আদ্যসভ্যতার প্রথম যুগেও যেমন আজিও ঠিক তেমনটি এটা যখন আমরা হৃদয়ঙ্গম করি তখন বিশ্বশিল্পের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথিয়া যাহারা পুরাকালের স্মৃতি, বিরাট প্রাচ্যসভ্যতার শিল্পনিদর্শন অপরিবর্ত্তিত আকারে এখনও আমাদের গৃহে গৃহে অম্লান মালিকার মত বিতরণ করিতেছে তাহাদের শ্রদ্ধা না করা অসম্ভব। চিরপুরাতন বিশ্ব-জগতের মত চিরপুরাতন আমাদের শিল্প চিরনবীনতার আধার।

যেরূপ ঘটে ঋষিকন্যারা জল আহরণ করিতেন, যেরূপ মৃৎপাত্রে সশিষ্য বুদ্ধদেব গৃহে গৃহে আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করিতেন, যেরূপ অলঙ্কার সতীর অঙ্গে শোভা পাইত, যেরূপ পট শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অশ্রুজলে সিক্ত লক্ষকোটী ভক্তের করস্পর্শে পবিত্র ঠিক সেইরূপ ঘটে পটে অলঙ্কারে গৃহপরিপূর্ণ দেখিলে কার না আনন্দ হয়!

এই কুম্ভকার শিল্প সারনাথের স্তূপ, বাঙ্গালার প্রাচীন মন্দির সকলকে বিচিত্র ইষ্টকে ভূষিত করিয়াছে, এই চিত্রশিল্প সমস্ত প্রাচ্যচিত্রের প্রাণস্বরূপ ছিল, এই স্বর্ণালঙ্কার ফিনিসিয়াতে আদর পাইত, গ্রীসের ঘরে ঘরে বিক্রেয় হইত! পটারি খুলিয়া আর্টস্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া, জুয়েলার সপ্ চালাইয়া শিল্পে নবস্রোত আনিবার ছলে এইগুলার উচ্ছেদ সাধনই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়াই কি স্থির করিতেছি!

কালের স্রোতে শিল্পে পরিবর্ত্তন ঘটিবেই কিন্তু সেই সঙ্গে পরিবর্জ্জনও ঘটিতে দিতে হইবে এমন কি কথা আছে? নবস্রোতকে আসিতে দিতে আপত্তি নাই কিন্তু সেটাকে শিল্পের যে অংশে অনুর্ব্বর বাঁধ বাঁধিয়া খাল কাটিয়া তাহার দিকে চালাইয়া দেওয়াই বুদ্ধিমানের কায, কিন্তু তাহা না করিয়া অবাধ গতিতে সেটাকে প্রাচীন কীর্ত্তি ও উর্ব্বর খণ্ড সকলের উপর প্রচণ্ডবেগে বহিতে দিয়া শিল্পে দ্বিতীয় প্রলয় প্লাবনের সৃষ্টি করিলে শিল্পবিষয়ে নিবুর্দ্ধিতার খ্যাতি চিরদিনের জন্য রাখিয়া যাইব যে!

জীর্ণ বাস্তুকে যে দৃঢ় করিয়া বর্ত্তমান রাখে সে কুলপাবন, যে দায়ে পড়িয়া বাস্তুকে রক্ষা করিতে অক্ষম হয় সে কৃপাপাত্র আর যে কুলাঙ্গার দুর্ব্বুদ্ধি কৃপণ স্ব-ইচ্ছায় নিজ ভিটা ধ্বংসের মুখে দেয় সে নরাধমের নরকেও যে স্থান নাই।

শিল্পবিষয়ে ঘোরতর ঔদাসিন্য যে আমাদের একদিন পশুরও অধম করিয়া আদিম অসভ্যদিগের সহিত একসূত্রে গাঁথিয়া দিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যে সাহেবী রুচি দেশের শিল্প হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে তাহাকে আমি ভয় করি না এবং তাহার দ্বারা দেশীয় শিল্পের সুগতি না হউক দুর্গতিরও তত সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু যে দুর্ব্বুদ্ধি স্বদেশে উৎপন্ন হইতেছে মাত্র এই দাবিতে বিলাতির নকলে এবং পাশ্চাত্য শিল্পের সস্তা ও কুৎসিত সংস্করণে আমাদের ঘর ভরিয়া দিয়া আমাদের শিল্পীকুলকে বুভুক্ষার তাড়নে কলের কুলিগিরি স্বীকার করাইতেছে, বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার কূট বাহির করিয়া লৌহযন্ত্রে আমাদের পেষণ

করিয়া কর্ম্মে আনন্দ ও জীবনের গৌরব হইতে আমাদের বঞ্চিত করিতেছে এবং শিল্পীর সিংহাসন হইতে আমাদের নামাইয়া কুলিবাজারে বাসা দিবার বন্দোবস্ত করিতেছে মৃত্যুকালীন সেই দুর্ব্বুদ্ধিকে আমি ভয় করি।

এই দুষ্টবুদ্ধি ভিতরে ভিতরে কি নিঃশব্দে ভারতশিল্পের ভিত্তিতল শিথিল করিয়া দিতেছে দেখাই। কলিকাতা সহরে দেশীয় লোকের দ্বারা চালিত অনেকগুলি লিথোগ্রাফারের দোকান আছে। ইহারা থিয়েটারের প্লাকাড হেয়ার অয়েল ইত্যাদির লেবেল্ ও নানা বাজারে কায লইয়া দিন গুজরান করিতেছিল। ঠিক বলিতে পারি না আজকাল এই ছাপাখানাগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি ভারতের একটি বিশেষ শিল্পের দিকে সুদৃষ্টিপাত করিয়া মন্দিরের দ্বারে দ্বারে লিথো কালিতে মুদ্রিত দেবদেবীর পট বিক্রয় সুরু করিয়া দিয়াছে, এই সকল পট হাতে-লেখা পটের সস্তা ও কুৎসিত অনুকরণ; কোন নূতনত্ব নাই; সস্তা এবং সস্তার তিন অবস্থাই সেগুলির একমাত্র গুণ।

আপনারা সকলই জানেন যে ছোট বড় সমস্ত তীর্থস্থানেই হাতে পট লিখিয়া ১০।১২ হইতে ১০০।১৫০ ঘর পটুয়া আবহমানকাল স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। যথাসম্ভব অল্পমূল্যে এই পটগুলি বিক্রয় করিবার জন্য দেবতার দ্বারে আসিয়া তাহারা বসিয়া থাকে, আজ কালের প্রতিযোগিতায় সেই দেবতার দ্বারে যাত্রিগণের ভক্তির দান হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা দিনের পর দিন শুষ্ক মুখে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। এই সকল নিরন্নের অভিশাপ কি আমাদের কোন দিন স্পর্শ করিবে না! ইহারা আমাদের ভারত চিত্রশিল্পের উৎকৃষ্ট আদর্শ দিতেছিল না সত্য কিন্তু পটপ্রস্তুত প্রণালী, বর্ণ ও রেখা-সন্নিবেশ প্রথায় তাহারা আবহমানকাল প্রাচীন শিল্পের সুনিয়মগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, আমাদের শিল্পচর্চ্চাকালে, পটুয়াগণের এই রক্ষণশীল বৃত্তি যে কতটা সুযোগের সামগ্রী তাহা বলিতে হইবে কি?

"আভোগং পূর্ণচন্দ্রস্য প্রতিপৎকলয়া যথা" ভারতশিল্পের পূর্ণমূর্ত্তি এই সকল কলামাত্রা-বিশিষ্ট শিল্প দিয়াই যে আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে!

এই সকল শিল্পী আজ যদি চিরদিনের পেসা ছাড়িয়া বি এ, এম্ এ, পাশ করিয়া সভ্য হইতে গিয়া অর্থ চাহিতে গিয়া ভারত শিল্পের পুনরুদ্ধারের পথ চিরদিনের মত বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তবে সে পাপ তাহাদের নয়; দুর্ব্বুদ্ধি আমাদেরই। কলের ধূম ভারতশিল্পের শেষ চন্দ্রকলাকে লুপ্ত করিয়া যেদিন এ দেশে অন্ধকারের সৃজন করিবে সেদিন নরকের অন্ধকার হইতে আমরা অধিক দূরে থাকিব না।

আসমুদ্র ভারতবর্ষের ত্রিশকোটী নর-নারীর দৃষ্টিই যে বিপন্ন ভারতশিল্পের দিকে আকৃষ্ট হইতে হইবে এমন প্রয়োজন দেখি না কিন্তু অন্তত তিনজনকেও সেটা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে এবং সেই তিনজনকেই ঝটিকার মুখে বুকের আড়াল দিয়া দীপশিখার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। শিল্পীগণ যাহাদের হাতে শিল্পসামগ্রী সৃষ্টি করিবার ভার, এবং ধনীগণ যাহাদের উপরে সেই

সৃষ্টি রক্ষা করিবার ভার, এবং বণিকগণ যাহাদের হাতে এই শিল্পের প্রচার কি সংহার করিবার ভার—এই তিনজনের কাহারও যদি রক্ষণশীল বৃত্তির অভাব ঘটে তবেই সর্ব্বনাশ।

যাহাদের হাতে ভারতশিল্প সৃষ্টি করিবার ভার তাহারা যদি গ্রীকশিল্প সৃষ্টি করিতে বসিয়া যায়, ভারতশিল্পকে রক্ষা করাই যাহাদের কায তাহারা যদি উপুড় হস্ত করিতে নারাজ হয়, আর যাহাদের হাতে মরণ বাঁচনের কাঠি তাহারা যদি মৃত্যু দণ্ডটাই উদ্যত রাখে তবে যে একটা সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড উপস্থিত হয় ইহাতে কি কোন সন্দেহ আছে! এই ত্রিমূর্ত্তি স্ব স্ব কার্য্যে বিমুখ হইলে প্রলয়ের বিলম্ব ঘটিবে না। শিল্পের বিপন্ন দশা সকল দেশে ঘটে এবং সকল দেশেই প্রতিকারের জন্য এই তিনজনই জাগ্রত থাকে। এই রক্ষণশীল বৃত্তি প্রহরীর কার্য্য করিয়া চলিলেই তবে মঙ্গল।

শিল্পবিষয়ে এই রক্ষণশীলতা আমরা যে হারাইয়াছি তাহার প্রমাণ পদে পদে পাইতেছি। আইন করিয়া এদেশের প্রাচীন কীর্ত্তি সকলকে রক্ষা করিতে হইল। ভারত শিল্পশালায় ভারতশিল্পেরই একাধিপত্য হওয়া প্রয়োজন কিনা এ কথা লইয়া তুমুল তর্ক চলিল ও এখনও চলিতেছে! বিংশ শতাব্দির ইতিহাসে আমাদের এই রুচি কলঙ্ক লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্কের মত একটা বিশেষ চিহ্ন রাখিয়া যাইবে যদি না শিল্পীর তুলিকা এই কলঙ্কের স্খলনকেই চিত্তরঞ্জন নবভাবে প্রকাশ করিয়া দেয়।

বিশ্বশিল্পী যিনি শ্মশানের পার্শ্বেই জীবনের স্রোত বহাইয়া সৃষ্টিকে স্থিতি এবং সংহারকে সংস্থান দিয়া থাকেন তাঁহার বিধানই সত্য বিধান এবং সকল বিষয়ে কল্যাণকর। আমাদের শাণিত বুদ্ধি খড়্গের মত ভারত শিল্পকে সংহার করিতেই উদ্যত রাখিব এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি অমৃতের তীর হইতে আমাদের দূরেই লইয়া যাইবে।

গ্রীক মূর্ত্তিগুলা যে সুন্দর তাহা বিশ্বাস করি এবং সেগুলা যে গ্রীক-শিল্পীরা প্রেম দিয়া ভক্তি দিয়া গড়িয়াছে তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মুখ হইতেই শুনি ও বিশ্বাস করি। Gods and goddesses the Greek carved because he loved them কিন্তু সেইগুলাকে দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কয়লার আঁচড় দিয়া বাঙালীর ছেলেরা কাপি করিলে যে এদেশে শিল্পের আবির্ভাব সম্ভব ঘটিবে এ কথা কোনদিন কখন বিশ্বাস করিব না। কোন্ প্রেমের আবেগে গ্রীক শিল্পীর হাতের বাটালি শ্বেতমর্ম্মরের কোন্ স্থানে কেমন বেগে আঘাত করিয়া রেখায় রেখায় সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে তাহা ৫০ কেন ৫০০ বৎসর চেষ্টা করিলেও আমরা দখল করিতে পারিব কিনা, জানিনা কিন্তু এটা স্থির জানি, যে শক্তিটা ভারতশিল্পের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আমাদের হৃদয়ে এখনও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; শ্রীচৈতন্যের প্রেমের সঙ্গীত এখনও হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিতেছে, বুদ্ধের করুণা বাণী এখনও হৃদয় দ্রব করিতেছে, আর্য্যগণের দেবলোক এখনও আমাদের কাছে অদৃশ্য হয় নাই। যে ভাবের বন্ধন প্রাচ্য শিল্পের সহিত সহস্র নাড়ির বন্ধনে আমাদের যুক্ত রাখিয়াছে

সেই যোগ-সূত্র ছিন্ন করিলে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত সর্ব্বনাশের দিকেই আমরা নিপাত লাভ করিব; গ্রীসের নন্দন কুঞ্জের দিকে এক পাও অগ্রসর হইব না।

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং" যাইবার সাধ্য আমাদের কোথায়? বৃন্দাবন আজ শ্রীহীন ঠেকিতেছে শুধু শ্রীপতির চরণ চিহ্ন চোখে পড়িতেছে না বলিয়া। সেটা সেদিন পড়িবে সেদিন;—

"যথৈবায়েঃ সমাযোগাৎ সর্ব্বমগ্নিময়ং ভবেৎ"

কুরূপ সুরূপ হইবে, সৌন্দর্য্যে সীমা পাইব না। দিবসের প্রায় অর্দ্ধ অংশ জীবনের প্রতিদিনের পাঁচ ঘণ্টাকাল বড় অল্প মূল্যবান নয়। সেই অমূল্য সময়টা আমাদের Art-School এর দুই শত দশের মধ্যে দুইশত দুই ছাত্র স-মাষ্টার কিসের ধ্যানে অতিবাহিত করিতেছে প্রহরের পর প্রহর বহুদিন আমি সেটা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। যে স্থান দিয়া তাহারা সর্ব্বদা যাতায়াত করে তাহারই আশে পাশে সম্মুখে পশ্চাতে প্রাচীন প্রাচ্য শিল্পের সুন্দরতম নিদর্শনগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত রাখিয়াছি অথচ একদিনের জন্য সে গুলির দিকে কেহ চাহিয়া দেখিল এমন ঘটনা ঘটিতে দেখিলাম না! যে সকল দেবমূর্ত্তি এক-দিন যাত্রীগণের নয়নানন্দ, ভক্তের হৃদয় মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহারা আজ সমাষ্টার ২০২ ছাত্রের কৃপাদৃষ্টির আশায় Art-School এর দ্বারে আসিয়া বসিলেন, যে সকল চিত্র, গালিচা, ধাতুপাত্র বা গৃহসজ্জার মূল্য-স্বরূপ দেশের রাজা বাদশাহেরা এক একটা মুলুকের খাজনা ধরিয়া দিয়াছেন এবং যাহার দুই চারিটা পাইলে জগতের যে কোন শিল্প-শালা ধন্য হইয়া যায়, সেইগুলা আজ এই বাঙালী ছাত্রগণের পাঠাগারের প্রাচীরতল সুবর্ণের জ্যোতি এবং বর্ণের ছটায় চিত্র বিচিত্র করিয়া তুলিল অথচ দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর তাহাদের কোন সম্মান এমন কি কটাক্ষপাত পর্য্যন্ত লাভ হইতে দেখিলাম না। কোন্ দুঃসাধ্য ব্যাধি আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে জীর্ণ করিয়া করিয়া হৃদয়তন্ত্রী এমন অসাড় করিয়া দিয়াছে যে আনন্দের স্পর্শে তাহাতে আর ঝঙ্কার উঠে না? এ রোগের ঔষধ কি? এই যে "মোহমোহ নিমীলিতা", "শ্বসন্নপি ন জীবতি" অবস্থা ইহার প্রতীকার কোনখানে?

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলিব "একান্তি দৃঢ়া ভক্তি";—পাশ্চাত্য শিল্পের মোহ আকর্ষণ যেটাকে প্রাণের টান বলিয়া ভ্রম করিতেছি সেটা নয়, স্বশিল্পের প্রতি সেই সুদৃঢ় আকর্ষণ যাহা আমাদের বলায়—

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ণশঙ্কর
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রী নৈবাত্মা যথা ভবান।"

তুমি যেমন তেমন আর কেহ নয়।

আমি সম্প্রতি আমার কয়েক ছাত্রকে অজন্তা গুহায় বৌদ্ধ শিল্প চর্চ্চা করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম। তাহারা নূতন কিছু শিখিবে এই আশায় উৎসাহের সহিত যাত্রা করিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া তাহারা বলিতেছে আমরা নূতন তো কিছু দেখিলাম না। সে সকল চিত্রাবলীর বর্ণবিন্যাস, রেখাপাত, হাবভাব সকলই তাহাদের চির-পরিচিতের মত বোধ হইল। এটা আমিও প্রত্যাশা করি নাই। বাংলা ভাষা পড়িতে ও বুঝিতে বাঙালীর যেমন কোন কষ্ট হয় না

তেমনি সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার চিত্রাক্ষর তাহার ভাব ও ভাষা নবীন বাঙালীর কেমন করিয়া সহজে বোধগম্য হয়! এটা কি মন্ত্রের কার্য্য। গোড়া হইতে অক্ষর পরিচয় না ঘটিলে ভারত শিল্পের দেব ভাষার মর্ম্ম গ্রহণ কোনকালেই সম্ভবপর হয় না, শুধু অক্ষর পরিচয় নয়, অর্থ গ্রহণ, ভাষা জ্ঞান, অলঙ্কার, ভাব প্রভৃতি লইয়া বিস্তর চর্চ্চার প্রয়োজন; এই সমস্তগুলা দখল করিয়া ছাত্রদের উপদেশ দিয়া যদি ভারতশিল্পের সহিত তাহাদের এই সহজ পরিচয় ঘটাইতে হইত তবে ছাত্রগণসহ হিমালয়ে গিয়া ষষ্ঠি সহস্র বৎসর পরমায়ুর জন্য তপস্যা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। কত শত বৎসর পূর্ব্বে এই সকল অজন্তা চিত্র লিখিত হইয়াছে তাহার পরে কত প্রলয় কত পরিবর্ত্তন কত বিরুদ্ধ মনোভাব ও শিক্ষা প্রাচীন ভারতের শিল্পীগণের সহিত বিংশ-শতাব্দীর এই কয়জন বাঙ্গালী চিত্রকরকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই, আবার এই চিত্রকরগণ কেমন? কেহ তিন বৎসর মাত্র ভারতশিল্প চর্চ্চা করিতেছে কেহ বা সাত আট মাসের অধিক নয়। ইহারা কেমন করিয়া বলে বৌদ্ধশিল্প আমাদের সম্পূর্ণ পরিচিত! গুরুর কাছে মিথ্যা বলিবে বা বৃথা অহঙ্কার করিবে এমন ছাত্রও ইহারা নয়! তবে এ ঘটনা কিরূপে সম্ভব? কোন্ মন্ত্রবলে ইহারা দেশকাল অতিক্রম করিয়া প্রাচীন প্রাচ্য শিল্পকে পরিচিতের মত বোধ করিতেছে? সে মন্ত্র খুঁজিতে আমায় দেশ বিদেশে যাইতে হয় নাই, এই মন্ত্রে আমারও যেমন, ছাত্রদেরও তেমন আর দেশের জনসাধারণেরও তেমনি অধিকার, যাহা আমাদের ঋষিগণেরই দান, চিরদিনের ধন

"নমস্তস্মৈ ভক্তয়ে অচিন্ত্য শক্তয়ে"

অচিন্ত্য শক্তি এই ভক্তিমন্ত্রের সাধন যতদিন আমাদের সম্পূর্ণ না হয় ততদিন ভারতশিল্প চর্চ্চা করিতে যাওয়া বৃথা। পাষাণে পতিত বীজ কবে অঙ্কুরিত হইয়াছে?

"যথা বীজং বিনা ক্ষেত্রং বপ্তাং ধারা শতৈরপি
তথা ভক্তিঃ বিনা কর্ম্ম ব্যর্থং যত্ন শতৈরপি'।

শ্রীকৃষ্ণ একবার কোন ভক্তকে বিষ্ণু মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্ত তাঁহার রামরূপের পক্ষপাতী সুতরাং প্রভু রামরূপ ধরিয়া তবে নিস্তার পাইলেন। তেমনি ভারতশিল্পের নবরূপ যদি আমরা দেখিতে চাহি তবে প্রথমেই আমাদের ভক্তি চাই। যেদিন আমরা শিল্পদেবতাকে ভক্তির জালে বাঁধিব সেদিন আমরা তাঁহাকে মনোমত রূপ ধরাইতে সক্ষম হইব। তখন আমরা জোর করিয়া বলিতে পারিব দেবতা তুমি আমাকে আমার মনোমত রূপে দর্শন দাও, তোমার প্রাচীন যুগের ও রূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ওই বর্ণকান্তি ভাব ভঙ্গি আমার মনে ধরে না, আমি তোমায় শ্যামসুন্দর না দেখিয়া নবসুন্দর দেখিতে চাহি। দেবতার উপরে এই জোর কেবল ভক্তিবলেই চলে। 'তর্কের দ্বারা বিচার বলে তাঁহাকে মনোমত রূপ ধরানো চলে না। তার্কিকের দম্ভে তিনি দৃক্‌পাতও করেন না, কিন্তু প্রেমিকের দাবি অন্যায় হইলেও তিনি সর্ব্বদা গ্রাহ্য করেন।

শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সাগর তীরে।

আমরা 'কুন্দ' ও 'কমলে'র দেশ ছাড়িয়া এখন 'কপালকুণ্ডলা'র দেশে আসিলাম। এখানে প্রতিপদে লতা গুল্ম অন্তরালে স্মিত-মুখী কুসুমের সন্ধান পাওয়া যায় না; তাহাদের স্থানে কণ্টকাকীর্ণ কেতকী। এখানে 'দখিণ-পবন' গুপ্ত বাসনার মত মৃদু আসে না, এখানকার বাতাস নির্মম, কাপালিকের মত ভীষণ! সাগর 'অজাগর গরজে সদা ফুলিছে'। ইহা মরণের মত ভীষণ অথচ প্রশান্ত। কত নদী, কত জনপদ ধুইয়া কত মৃত্যু বহিয়া আনিতেছে; কত-কালের ধ্বংস সাগরগর্ভে সঞ্চিত হইতেছে। আবার সাগর গর্ভেই কত সৃষ্টি হইতেছে, মৃত্যুর সহিতই জীবন সংযুক্ত, দুই বুঝি একই; সন্ধ্যা ত উষার মতই মনোরম!

সম্মুখে, এত অনন্ত অতল জলরাশি থাকিতেও গ্রাম্য বধূগণ জল লইতে আসে না; তীরে স্বল্প হৃদয়া কূপেই তাহাদের সকল অভাব মিটে! অসীম ছাড়িয়া সসীমের প্রতি মানবের অধিক আগ্রহ।

সন্ধ্যার অন্ধকারে সাগর দেখিয়া সেই অতীতের প্রলয় দৃশ্য আমার মনে পড়িল। তখন আমাদের শ্রীমতী ধরা এরূপ জলে স্থলে বিভক্ত হন নাই। তখন আকাশ ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন, পৃথিবী এক বিশাল লবণাক্ত জলে মগ্ন। চন্দ্রসূর্য্যের দেখা প্রায় পাওয়া যাইত না মধ্যে মধ্যে আকাশের বিদ্যুৎ ও পৃথিবী গর্ভস্থ অগ্নি সেই ভীষণ আঁধার আলোকিত করিত। বায়ু ভীম প্রভঞ্জন, আবার আকাশ হইতে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িত। তাহার উপর ভূ কম্পন! এমনি দুর্দ্দিনে জীবন প্রথম জন্ম লইল!—সে আজ কতকাল! তাহার পর কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া সেই জীবন মানুষ হইয়াছে। কিন্তু সে আর কতদূরে যাইবে—জীবন তরী কোথায় ভিড়িবে বলিয়া যাত্রা করিয়াছে—তাহা কে জানে? ইহাও কি নিরুদ্দেশ যাত্রা? ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন অতি প্রত্যূষে আবার সাগর-তীরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম পূর্ব্বদিগন্তে 'বধূর-নবলাজ-সম-রক্ত আভা ফুটিয়া উঠিতেছে। অপরিস্ফুট আলোকে আবৃত আর্দ্র-সাগরতট সে আলো প্রতিফলিত করিতেছে। সাগর জল শুভ্র ফেণ সমন্বিত নীলাভ হরিৎবর্ণ; সাগর-সম্ভূত জলবাষ্প তাহার উপর এক কুয়াসার আবরণ দিয়াছে; বায়ু ও সাগর সূর্য্যোদয়ে নির্লিপ্ত,—তাহারা আপন কলকথায় ব্যস্ত।

রক্তাভা ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া দিগন্ত গাঢ় রক্তিমবর্ণে উদ্ভাসিত করিল। লোহিতের ভিতর হইতে ক্রমশঃ পীতের আভা ফুটিয়া উঠিতেছে, রক্ত হইতে পীতের পরিণতি বড় সুন্দর বড় মনোহর ভাবে সম্পন্ন হইল। সাগর সেইরূপই কুয়াসা আবৃত নীলাম্বর। কেবল দিগন্তের ও তটের প্রতিফলিত আভা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আকাশে ধূমের মত মেঘসঞ্চার হইল। দিগন্ত এখন পীত, মেঘ এখন ধূসর, জল নীলমাখা হরিৎ, আর্দ্র বেলা আকাশের আলোক শতগুণ

প্রতিফলিত করিতেছে। পশ্চিম দিগন্ত এখনও শ্বেত-কুয়াসায় আবৃত, এখনও সুপ্ত। বিশ্লেষিত 'সূর্য্য লেখার' বর্ণগুলি এখন আকাশে ও বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

ধূসর মেঘ সরাইয়া সূর্য্য ধীর গম্ভীর মৃদুগতিতে জগতে প্রকাশ হইলেন। তখন সেই আদি জনক জননী সবিতা ও নীলসলিলাকে প্রণাম করিয়া ঘরে ফিরিলাম।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বি, এ।

পোষ্যপুত্র। পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

১৪

সেই ক্ষণিক স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নীরদকুমারই প্রথমে কথা কহিল। প্রফুল্লমুখে আগ্রহের সঙ্গে দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কথা প্রসঙ্গে শান্তির বিবাহের কথা আসিয়া পড়িল। যোগেন্দ্র বলিল "শান্তির স্বামী খুব সুন্দর হয়েছে, আর বিয়েতে সমারোহ যতোদূর হতে পারে তা হয়েছিল, গহনা এতো দিয়েছে যে পিশেমশাই দেখেই চটে গেছেন, তিনি বলেন ওগুলো অনর্থক অপব্যয় তা এ কথাটা আমিও মানি, তুমি এলো সংস্কার করছো ঐ জিনিষটার সংস্কার করতে পারো তবে বলি বাহাদুর।" বলিয়া স্তব্ধ নীরদের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল! নীরদ হাসিল না, সে স্তব্ধ হইয়াই বসিয়া রহিল। যোগেন উৎসাহের সহিত বলিয়া যাইতে লাগিল, "যাহোক হেম ছেলে মন্দ নয়, চালটা একটু বড়লোকের মতন অহঙ্কেরে; তাহোক শান্তি অসুখী হ'বেনা। বিশেষ শ্বশুরের যা ভালবাসা সে পেয়েছে! আহা শ্যামাকান্ত বেচারা বড় কষ্ট পেয়ে এতোদিনে একটু সুখী হলো! লক্ষ্মীছাড়া বিনোদটা কি আহাম্মুকি করলে, কার আর ক্ষতি হলো নিজেই এমন রাজ ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হলেন মাত্র। বাপ পর্য্যন্ত তার নাম মুখে আনেনা অন্যের কথা কি! তা নীরদ! এ সব দেখে অদৃষ্ট মানতে হয় ভাই। হেমের কপালটা কিন্তু খুব'—

গম্ভীর একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দে যোগেন্দ্র সজাগ হইয়া দেখিল নীরদকুমার দুই করতলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফেলিয়া একটা দারুণ যন্ত্রণাকে যেন সবলে হৃদয়ের মধ্যে চাপিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। যোগেন্দ্র তাহার পিঠে হাত দিয়া ডাকিল, তাহার মাথাটা নিজের কাঁধের উপর সযত্নে রাখিয়া ছোট ভাইটির মতন দুই হাতে কাছে টানিয়া ঈষৎ অনুযোগের সুরে কহিল "শরীরটাকে একেবারেই মাটি করে ফেলছ, একি ছেলেমানুষি!"

নীরদ ক্লান্তভাবে চোক মুছিয়া আবার একটা নিশ্বাস ফেলিল "আঃ যোগেন।" "বলোনা নীরদ, তোমার মনে একটা কি হয়েছে, আমায় কেন লুকুচ্চো ভাই।"

নীরদকুমার হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে বই কি। কিন্তু সেটা আমি আপাততঃ তোমায় কাছে প্রকাশ করছিনা। আসল কথা হচ্চে ভাই তোমাকেও এবার থেকে একটু সংযত হতে হ'চ্চে—"

"ওরে বাপরে তবেই আমি গেছি! আচ্ছা আগে চা' টা খেয়ে নিয়ে মাথাটা একটু

সাফ্ করে ফেলাযাক্; তার পর প্রিচাব মশাই তোমার বক্তৃতা শোনা যাবে।" নীরদ মাথা নাড়িয়া মৃদু হাসিল। "সে পাঠ উঠিয়ে দিয়েছি চা পাচ্চো না"। যোগেন্দ্র ইহা শুনিয়া এমনি চোখ বিস্তার করিয়া চাহিল যে, এমন অদ্ভুত কথা জীবনে সে যেন এই প্রথম শুনিল। 'বলোকিহে! তুমি যে আমায় একেবারে অবাক করে দিলে। চা খেলে কি সাধুত্বও ভাল জমবেনা না কি?"

"তা কেন? তবে ও জিনিষটার অভ্যাসটা 'অনাবশ্যক' বিদেশী।" যোগেন এবার আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না, চটিয়া বলিল "অত বাড়াবাড়ি করতে যেও না। অতোটা সহ্যও হবে না লোকেও ভণ্ড বলবে। স্বাস্থ্য হানি করেও চিরকেলে অভ্যাসগুলো গোঁড়ামির জন্যে ত্যাগ করবে?"

নীরদ সংযতভাবে উত্তর করিল "না বিদেশী বলে কোন ভাল অভ্যাস ছাড়তে আমি কোনদিন বল্‌বো না বরং কিছু কিছু ধরতে বল্‌তে চাই। এটা ঠিক ভাল অভ্যাস নয় অজীর্ণ রোগী বাঙ্গালীর পক্ষে 'চা-টা' ঠিক খাটেনা। ওটা ঔষধের মতন ব্যবহারের জন্য রাখলে বরং তারচেয়ে উপকারে লাগে। অনেকগুলো জিনিষ আছে যা আমরা অনুকরণপ্রিয় স্বভাবের বশেই চাই তার ফলাফলটা ভেবেও দেখি না! শীতপ্রধান দেশের লোকের সহিত একই ভাবে শরীরপালন করতে গেলে তাকে ঠিক পালন করা বলা যায় না।"

যুক্তিটা যদিও যোগেন্দ্রের ঠিক মনে লাগিল না তথাপি সে অভ্যাসানুযায়ী বন্ধুর গম্ভীর মতবাদের বিরুদ্ধে আর তর্ক করিল না।

সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণে কদলী-পত্রে নিরামিষ ভোজন মুখরোচক না হইলেও নিগূঢ় অভিমানে এমনি আগ্রহের সহিত সে সমুদয় চাটিয়া খাইল যে নীরদকে বিপন্নভাবে বলিতে হইল তাইতো যোগেনের যে ভাত কম পড়লো! আর যে নেই বল্‌ছে! তাইতো করা যায় কি?"

২৫

সেদিন যখন খুব ঘটা করিয়া মেঘ করিল, এবং দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল, তখনো পর্য্যন্ত শান্তি তাহার শয়নগৃহের দক্ষিণধারের জানালার নিকট লৌহ গবাক্ষে ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বৃষ্টির সহিত অল্প ঝড়ও ছিল, গাছগুলার উচ্চ মস্তক বাতাসে নুইয়া নুইয়া পড়িতেছিল, এবং প্রথমে মুক্তাবিন্দুর মতন বৃষ্টি বিন্দু তারপর জলের ঝাট, জানলার মধ্য দিয়া শান্তির গায়ে আসিয়া লাগিতেছিল।

বৃষ্টির একঘেয়ে পতনশব্দ শুনিতে শুনিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া অন্য একটা জানালার ধারে হেমেন্দ্রও বহুক্ষণ হইতে শান্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল। আজকাল সিদ্ধেশ্বরীই বাড়ীর একরকম সর্ব্বেসর্ব্বা। বাড়ীর সকলেই প্রায় তাঁহাকে মানিয়া চলে—এবং স্পষ্ট করিয়া নাহোক সকলকারই কথার ভঙ্গিতে হেমেন্দ্র ও শান্তির প্রতি অল্প বিস্তর তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়। হেমেন্দ্রের আচরণে কেহই তো বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না এখন সুযোগ ছাড়িবে কেন? হেমেন্দ্রও সে সমস্ত অপমানের শোধ তাহার পালক পিতার উপর তুলিতে ছাড়ে না তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু আজ আর সুধু দূরে দাঁড়াইয়া শরক্ষেপ চলিল না, সিদ্ধেশ্বরী ও তাঁহার বৈবাহিকদলের

একটা কঠোর রকম মন্তব্য তাহার উষ্ণ মস্তিষ্কের মধ্যে তীব্র দাহ দ্বিগুণিত করিয়া তুলিল। তৎক্ষণাৎ সে শ্যামাকান্তকে গিয়া বলিল 'ওই মাগী দুটোকে তাড়াবেন কিনা?' শ্যামাকান্ত শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন "সেকি?" "কোথাকার ছোটলোক মেয়েমানুষ দুটোকে বাড়িতে এনেছেন, ওরা যদি থাকে তাহলে আমরা থাক্‌বো না ব'লে দিচ্ছি"। "হেম, ও যে বিনুর বউ"—আমার পুত্রবধূ। তোমরা দুই ভাই যদি একত্র হতে সে আরো সুখের হতোনা?" হেমেন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল "ক্ষেপেছেন, ও বৃন্দাবনের বদমাইস গুণ্ডার দলের মাগী, সব ওর জাল, ওকে আত্মীয় বলে স্বীকার করলেও নিজেকে অপমান করা হয়! কোন কথা আমি শুন্‌তে চাই না, আপনি ওদের দুটোকে বিদায় কর্ব্বেন কিনা?"

শ্যামাকান্ত যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, "তারা!" "হেমেন্দ্র আবার সক্রোধে প্রশ্ন করিল "বিদায় কর্ব্বেন কিনা?" "অসঙ্গত কথা বলোনা, হেম—" "বিদায় কর্ব্বেন কিনা?" "কেমন করে তা করবো?" "তবে ওদেরি নিয়ে থাকুন, কিন্তু আমার আপনি যে সর্ব্বনাশ করেছেন তা আমি সইবো না, দেখি আইন আমায় ঠকায় কিনা!" শ্যামাকান্ত মর্ম্মাহত হইয়া কাতরকণ্ঠে বাধা দিলেন "অমন কথা বলিস্‌নি হেম, তোকে আমি ঠকাবো? আমার কে আছে!" কঠোর বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি হেমেন্দ্রের মুখে ফুটিয়া উঠিল! "আমি সব বুঝেছি"!

শান্তির ঘরে আসিয়া হেম দেখিল শান্তি একাই আছে, মনটা একটু প্রসন্ন হইল। শান্তি হঠাৎ স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া আসিল। জোর করিয়া প্রফুল্লতা দেখাইয়া কিছু একটা বলিয়া তাহাকে ভুলাইয়া দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল "গবর্মেণ্ট জ্যেঠামশাইকে নাকি রাজা উপাধি দিতে চেয়েছে?"

"হুঁ। কিন্তু রাজপুরীটা আপাততঃ ত্যাগ করে যেতে হচ্চে? তবে শোন ওই পাপিষ্ঠ স্ত্রীলোকের সঙ্গে একবাড়ীর বাতাস আমি গায়ে লাগতে দেবোনা, আমরা আজি এখান থেকে যাবো।" শান্তি সজোরে জানলার একটা গরাদে চাপিয়া ধরিল, হেমেন্দ্র চলিয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরে যখন হেমেন্দ্র শান্তির কাছে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি স্থির করলে শান্তি?" তখন আকস্মিক মৌনভঙ্গে শান্তি চমকিয়া উঠিল। ম্লান মুখ ফিরাইয়া সকরুণনেত্রে স্বামীর দিকে চাহিল। "আমায় এখান থেকে যেতে বলোনা, আমি এবাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবো না।"

"বাপের বাড়ী?" একমুহূর্ত্ত পরে সে হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়িল "বাবাতো বলেন নি! জ্যেঠামশাই—" "থামো আমায় রাগিও না, এই অপমান সহ্য করে এইখানে দাসী চাকরের মতন পড়ে থাকতে হবে? তোমার লজ্জা করে না? একটা আত্মসম্মান বোধ নাই?"

"জ্যেঠামশাইতো আমাদের ভালবাসেন, দিদিতো কিছু বলেনি। তাও যদি হয় সেও আমাদের সহ্য করতে চেষ্টা করা উচিত। তাঁরা যে গুরুলোক।" হেমেন্দ্র ভূমে পদাঘাত করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল "রেখে দাও তোমার লজিক। তুমি না যাও থাকো, আমি চল্লুম।

না তোমাকেও যেতে হবে তুমি আমার স্ত্রী আমার আদেশ পালনে তুমি সম্পূর্ণ বাধ্য। আমার হুকুম তোমার এখান থেকে সন্ধ্যার সময়েই যেতে হবে। প্রস্তুত হয়ে থেকো।”—“আজি, এখনি? আমায় একটু সময় দাও, জ্যেঠামশাইকে একবার? জ্যেঠামশাই তোমায় রক্ষা করতে পার্ব্বেন না, সে চেষ্টা করতে যেও না, মিথ্যা তাতে অনর্থ বাড়াবে, এ জেনে রেখো! এবাড়ির সঙ্গে আমাদের দেনাপাওনা মিটে গ্যাছে। না, আমি আর কিছু শুনতে চাইনা।”—শান্তিকে কথা কহিবার অবকাশ মাত্র না দিয়া সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যা না হইলেও মেঘান্ধকার ঘেরা বারান্দা ইহারি মধ্যে ঘনায়মান হইয়া আসিয়াছিল, খোলা জানলাটার ঠিক বাহিরে ছাদের নলের মধ্য দিয়া মোটা একটা স্ফটিক ধারার মতন বৃষ্টির জল পড়িতেছিল। ড্রেনের মধ্য দিয়া কলকল শব্দে সেই জল ছুটিয়া চলিয়াছে, বৃষ্টির আর শেষ নাই। হেমেন্দ্র সম্মুখেই এক অপরিচিতা রমণী মূর্ত্তি দেখিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, সে জানালার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহার ঘরের সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিল।

কিন্তু সম্মুখবর্ত্তিনী সে সুযোগ দিল না, অসঙ্কুচিতভাবে তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, ধীরস্বরে কহিল“ঠাকুরপো একটু দাঁড়াও একটা কথা আছে।” অচেনা স্ত্রীলোকের এই সঙ্কোচহীন ব্যবহার হেমেন্দ্রকে ঈষৎ বিস্মিত করিল। এই রমণীর বিদ্যুৎ তীক্ষ্ণ, অভেদ্য অথচ অচঞ্চলদৃষ্টি তাহার নিকট সম্পূর্ণ নূতন ন্‌তন ঠেকিল। যদিও আন্দাজে সে এই ঠাকুরপো সম্বোধন কারিণীকে চিনিয়াছিল তথাপি আকস্মিক একটা কৌতূহলপূর্ণ বিস্ময়ে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল “কে?” রমণী তাহার কৃষ্ণতারকোজ্জ্বল বিশালনেত্র নির্ভীকভাবে প্রশ্নকারীর মুখে স্থাপন করিয়া ধীর অথচ সদৃঢ়স্বরে উত্তর করিল “আমি অমু’র-মা, তোমার বড় ভাজ! শুনলেম তুমি আমার সঙ্গে একবাড়িতে থাকতে ইচ্ছা করোনা, সত্য কি? তা যদি হয় তবে তুমি যেওনা, বলো আমিই আমার সেই বনবাসে ফিরে যাই।” হেমেন্দ্রের ললাট হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত সমুদয় মুখখানা অপরাহ্নের পশ্চিমাকাশের মতন আরক্ত হইয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ শ্লেষপূর্ণ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সে বলিয়া উঠিল “আপনার এ অভিনয় খুব চমৎকার হচ্চে, কিন্তু আমার কাছে এসব কেন? নির্ব্বোধ শান্তিকে মুগ্ধ করে রেখেছেন সেই ভাল।”

হেমেন্দ্র চাহিয়া দেখিল না,—সেই মুহূর্ত্তে ঘন মেঘের মধ্য দিয়া অশনিভরা বিদ্যুৎ করালিনীর লোলজিহ্বা বিকম্পিত হইয়া উঠিল, শিবানীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মুখে তাহার ছায়াপাত হইল। সে আজ অনেক কথা ভাবিয়া অনেকখানি গড়িয়া লইয়া তবে হেমেন্দ্রের সম্মুখীন হইয়াছিল। শিবানীর পক্ষে সহসা একজন অজানা লোকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান যে কতোখানি কঠিন ব্যাপার তাহা বোধ হয় বলিবার আবশ্যক করেনা। কিন্তু প্রয়োজন হইলে নিজের দুর্ব্বলতাকে ঠেকাইয়া রাখাও তাহার পক্ষে তেমনি সহজ। সে দেখিল এমন করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া থাকিলে আর চলে না, যে অভিনয় চলিতেছে ইহার মধ্যে আসিয়া না দাঁড়াইলে শেষে হয়তো ইহা করুণ রসাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে।

নিঃসঙ্কোচে নিজের কর্ত্তব্যভার মাথায় তুলিয়া লইল। সে কেন পরের সুখে ব্যাঘাত দিতে আসে? কে সে? সে একজন অবমানিত অনাদৃতা, পরিত্যক্তাস্ত্রী; কেন সে পরের অধিকৃত সিংহাসন জোর করিয়া কাড়িয়া লইবে? কেন লোক মনে করিতেছে তাহাতেই সে একেবারে বর্ত্তাইয়া যাইবে! কিসের এ অধিকার? কে চায় এ অধিকার? সে ইহাকে ঘৃণা করে। কেন করে? এই ঐশ্বর্য্যের জ্বালা তাহার অপমানিত হৃদয়কে দ্বিগুণ নিপীড়িত করিতেছিল। সে দরিদ্র তাই তো এত অবহেলা! সে কেন তাঁহার যোগ্য হয় নাই? অথবা তিনি কেন দরিদ্র হইলেন না? যে সমস্ত বন্ধন তাহাদের দুই ভিন্নগামী হৃদয়কে এক হইতে দেয় নাই তাহাদের প্রতি তাহার একটা তীব্র বিদ্বেষ তাহার চিত্তকে দিনরাত খরধার ক্ষুরের মতন কাটিয়া কাটিয়া তুলিতেছিল, ইহাদের মধ্য হইতে তাহার সেই শান্তি কুটিরে পলায়ন করিতে পারিলে সে যেন বাঁচে। কিন্তু শান্তিকে ছাড়িতেও আর মন চায় না।

হেমেন্দ্রের কথায় কিন্তু শিবানী রাগ করিল না। সহিষ্ণুতার সহিত অপমানকে স্নেহোপহারের মতন নীরবে গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন মুখে কহিল "তুমি রাগ করোনা ঠাকুরপো! ঠিক তোমায় হয়ত আমি আমার সব কথা বুঝিয়ে বলতে পার্ব্বোনা, কিন্তু যেটা আসল কথা সেইটেই বল্‌ছি। বাস্তবিকই তো আমি তোমার অংশীদার হতে পারিনা। আমি কে? তবে অমু! আগে সে মানুষই হোক, তার কথা এখন ছেড়ে দাও। সত্য করে আমি বল্‌ছি এখানের একটি কুটিতেও আমার অধিকার নেই। এ সব শান্তির। তোমরা কিসের দুঃখে যেতে যাও? আমার জন্য?" শিবানী তীব্র বিষাদের উথলিত অশ্রু জোর করিয়া বক্ষে মথিত করিয়া ফেলিয়া দুঃখের হাসি হাসিল "আমার জন্য যাবে কেন? বরং আমারি কিছু ব্যবস্থা করে দাও, তোমাদের সংসারে দাসীর মতন যদি রাখো শান্তির জন্য বোধ হয় এখন তাও আমি পারি, কে জানে কেনই আমি তাকে এতো ভালবাসি।" আবেগের মুখে আত্মদমন করিতে না পারিয়া সহসা শিবানী নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেই লজ্জানুভব করিল। কিন্তু প্রকাশের যে একটি বিমল আনন্দ তাহাতে সেই মুহূর্ত্তে তাহার মনটা যেন কুয়াসার আবরণ কাটিয়া নির্ম্মল আকাশের মতন লঘু হইয়া আসিল। নিজেকে জয়ী বোধ করিয়া সে ঈষৎ গর্ব্বোৎফুল্ল মুখ ফিরাইয়া পরাজিতের দিকে তাকাইল। বিশ্ব রহস্যের একটি রহস্যদ্বার আজ যে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল, ইহার মধ্য হইতে কি আলো, কি আনন্দ সম্মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ লুকান নির্ঝর আজ যেন তপ্ত মরু বালুকাকে শীতল করিয়া দিল। কিন্তু শিবানীর সেই অনবনত হৃদয় আজ তাহার কৃতকর্ম্মের পুরাতন অভিশাপ দণ্ড ভোগ করিবার জন্যই এই অস্থানে নত হইয়াছিল। হেমেন্দ্র ক্রুব নিষ্ঠুর শ্লেষের সহিত তাহাকে আক্রমণ করিল "শান্তির প্রতি আপনার অশেষ দয়া কিন্তু সে দয়া সে ঘৃণা করে! তার জন্য আর নিজেকে উৎকণ্ঠিত করিবেন না; আপনাদের দয়ার মধ্য থেকে সে এখনি

চলে যাচ্ছে।" আচম্‌কা পিছন হইতে কেহ লাঠির দ্বারা আঘাত করিলে আহত যেমন বিস্ময়ে অস্ফুট গর্জ্জনে একমুহূর্ত্ত পরে আঘাত-কারীর পানে তীব্র রোষে ফিরিয়া দাঁড়ায় আঘাত প্রাপ্ত শিবানী তেমনি করিয়া হেমেন্দ্রের প্রতি ফিরিল, "মিথ্যাবাদী তার অপমান করোনা।"

হেমেন্দ্রের মুখখানাও ক্রোধে পাংশু হইয়া গেল, উচ্চকণ্ঠে তীব্র হাসি হাসিয়া সে বলিল "ঘরে এমন চমৎকার অ্যাক্‌ট্রেস থাকতে থিয়েটার কেন আনিয়ে ছিলুম। এমন সুন্দর অ্যাকটিং আমিতো আর কখনো দেখিনি! কদিন তো কপালকুণ্ডলা, তাজ্জবব্যাপারের অভিনয় দেখা গেল, আজ এটা কোন নাটকের অভিনয় হচ্চে বৌ-ঠাকৃরুণ!" শিবানীর সমস্ত শরীরের রক্ত অপমানের রুদ্ধ রোষে টগ বগ্‌ করিয়া উঠিল। সে আর একটি মাত্র কথা না বলিয়া অকস্মাৎ দ্রুতপদে পাশের একটা খোলা দ্বারের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

হেমেন্দ্রও আর সেখানে দাঁড়াইল না, সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। শিবানীকে যে দু-একটা কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিতে পারিয়াছে ইহা মনে করিয়াও হেমেন্দ্রের মনটা কতক ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। যাহার কথা মনে করিলেও হাড় মাস জ্বালা করিতে থাকে, তিনিই কিনা পাদরী মহাশয়ের মতন বক্তৃতা দিতে আসিলেন। রাগ ধরিলেও হাসি পায়! দেশে কি আর লোক ছিল না।

শিবানীর সেই পাণ্ডুমুখ ও আহত হৃদয়ের উদ্ধত রোষকটাক্ষ মনে করিয়া সে মনে মনে একটু শান্তি অনুভব করিল। যথার্থই সে তবে শান্তিকে ভালবাসে। শান্তি তাহাকে ঘৃণা করে শুনিয়া নহিলে সে এমন শেলাহতের মতন ছটফট করিয়া উঠিত না। হেমেন্দ্র নিজের প্রতি অত্যন্ত খুসী হইল। সে যে বুদ্ধি করিয়া ঠিক পথটি বাহির করিতে পারিয়াছে এবং এমন সব কথাগুলা যথাসময়ে আসিয়া তাহার ওষ্ঠাগ্রে যোগাইয়াছিল, তাহাতে নিজের আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাইয়া সে বিস্মিত হইল। আবার যখন সে সত্য সত্যই তাহাদের নিকট হইতে শান্তিকে কাড়িয়া লইয়া চলিয়া যাইবে তখনকার জন্য তাহাদের আঘাত কল্পনায় সে নিষ্ঠুর হাসি হাসিল। শ্যামাকান্ত চৌধুরী দেখুন একবার তিনিই শুধু গরীবের ছেলের সর্ব্বনাশ করিতে পারেন না, সেও তাঁহাকে ইহার শাস্তি দিতে জানে। সে এটুকু বুঝিত যে ছুঁচটি মানুষের কোন খানটিতে বিঁধাইলে তাহার মর্ম্মভেদ করে; যে শান্তির জন্য তিনি তাহাকে পোষ্যপুত্র লইয়া তাহাকে ভবাকাঙ্ক্ষী করিয়া তুলিয়াছেন, সেই শান্তিকেই সে তাঁহার নিকট হইতে টানিয়া লইয়া গিয়া বুঝাইয়া দিবে, যে শান্তিকে পাইতে হইলে তাহাকেও অনেকখানি খুসী রাখিবার প্রয়োজন আছে।

শিবানী যখন সেই অনুজ্জ্বল ছায়ালোকের মধ্যে সহসা বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎশিখার ন্যায় অত্যন্ত সহসা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলা নানা আকার ধারণ করিয়া আকাশময় ছুটাছুটি করিয়া আবার একটা ভারি রকম বৃষ্টি আসিবার উপক্রম করিতেছিল। সেই উপলক্ষ্যে আকাশের প্রহরীদল তুরি বাজাইয়া আলো

জ্বালাইয়া সোরগোল করিয়া বেড়াইতেছে, এবং অদূরবর্ত্তী পুষ্করিণীর ঘাটে ও উদ্যানের নালায় ভেকদলের সম্মিলিত ঐক্যতানে বৃষ্টির ক্ষীণস্বর ডুবিয়া যাইতেছে। প্রথমে কাহাকেও শিবানী সে ঘরে দেখিতে পাইল না। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চমকিত হইয়া খাটের নিকট আসিয়া দেখিল সেখানে বিছানার একপ্রান্তে অন্ধকারের ছায়ায় প্রায় মিশিয়া গিয়া শান্তি পড়িয়া আছে। শিবানী ধীরে ধীরে তাহার পাশে বসিয়া আস্তে আস্তে তাহার পিঠের উপর এলোথেলো চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে ডাকিল "শান্তি!"

শান্তি একবার মাত্র সচমকে মুখ তুলিয়া আবার তাহা বিছানার মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। শিবানী বলিল "শান্তি তুইও আমায় ছেড়ে যাবি? শান্তি ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল "দিদি, আমার কথা তোমরা ভুলে যেও।' বলিতে বলিতে কাঁদিয়া উঠিল। শিবানী কহিল 'কেন যাবি বোন? এ ঘরসংসারের তুই যে লক্ষ্মী, তুই কার হাতে তোর সংসার ফেলে যেতে চাস্? যাস্নি শান্তি, মার কথা ধরিস্নি। ঠাকুরপো যাই বলুন আমি একথা বিশ্বাস করতে পারবো না, বল্ শান্তি তুই আমার ওপোর রাগ করে যাচ্চিস্ নে?"

শান্তি নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

শিবানী ধীরস্বরে কহিল "শান্তি! আরতির সময় হয়ে এলো মন্দিরে যাবি নে? বাবা বোধহয় এতোক্ষণ আমাদের অপেক্ষায় সেখানে বসে আছেন। তোর রাজ-রাজেশ্বরীকে প্রণাম করতে যাবিনে?" শান্তির সূক্ষ্ম ওষ্ঠপ্রান্তে একফোঁটা বিষাদের হাসি অত্যন্ত ক্ষীণভাবে ফুটিয়া উঠিল "দিদি! রাজরাজেশ্বরী যে আর আমার পূজো নিতে চান্ না ভাই' আমি কি করবো? দিদি! আমায় যদি সত্যি চলে যেতে হয় তুমি আমার মতন করে মালা গেঁথে দিও, ফুল দিয়ে মন্দির সাজিও। তেমনিতর নৈবেদ্য করে ধূপদীপ জ্বেলে দিও, দেখো দেবতার যেন সেবার ব্যাঘাত হয় না।"

শিবানীর কঠিননেত্রে এবার জল আর চাপা থাকিল না, কাঁদিয়া বলিল 'সত্যি সত্যিই তুই যাবি? ঠাকুরপো জোর করে নিয়ে যাবে? তুই শুন্‌বি কেন?"

"আমি কি করবো দিদি? আমিতো যেতে চাইনি! কিন্তু যদি যেতেই হয় তুমি আমার হয়ে জ্যেঠামশায়ের সেবা"—বলিতে বলিতে সহসা তাহার কম্পিত কণ্ঠস্বর অস্ফুট হইয়া আসিয়া একেবারেই রুদ্ধ হইয়া পড়িল। পূর্ণিমার কূলে কূলে পরিপূর্ণ সমুদ্রতরঙ্গ হৃদয়মধ্যে আকুল আর্ত্তনাদ করিয়া আছড়াইয়া পড়িল। জ্যেঠামশায়কে সে যে মাতৃহীন করিয়া যাইতেছে, এ অকৃতজ্ঞতা তাঁহার প্রাণে যে বজ্রের মতন বাজিয়া উঠিয়াছে।

"শান্তি এসো গাড়ি এসেছে, আর দেরি করে কাজ নেই। বলিয়া হেমেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল "বৃষ্টিটা এইবেলা একটু কম আছে খিড়কি দোর দিয়ে এই সময় বেরিয়ে পড়া যাক্।" ঘরে সন্ধ্যার ও মেঘের উভয় অন্ধকারের কালিমা ক্রমেই নিবিড় হইয়া আসিতেছে, কেজানে কি ভাবিয়া দাসী মোক্ষদা এখনও আলো জ্বালাইয়া দিয়া যায় নাই! সেই অত্যল্পালোকে হেমেন্দ্র তাই শিবানীকে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু

শিবানী একথা শুনিয়াই শান্তির হাত দুখান দুইহাতে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল, বলিল "আমি তোমায় যেতে দোবনা শান্তি। বরং ওই গাড়ি করে চুপে চুপে আজ তোমরা আমায় বিদায় করে দাও, আমি তোমাদের সব অমঙ্গল মুছে নিয়ে যাই।" রুষ্টস্বরে হেমেন্দ্রও তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল "শান্তি, শান্তি উঠে এসো, আমি তোমার হুকুম করছি তুমি ঐ মায়াবিনী স্ত্রীলোককে স্পর্শ করোনা শীঘ্র এসো।" শান্তির চারিদিকে অন্ধকার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল "একবার জ্যেঠামশায়ের কাছে যেতে দাও। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি একটিবার আমায় যেতে দাও।" হেমেন্দ্র অবিচলিতভাবে কহিল, "এজন্মে আর সেটি হচ্ছেনা। অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য কর্‌বার অধিকার ও ক্ষমতা এখনও আমার কাছে। সেটুকু আমার প্রয়োগ করতে বাধ্য করে তুলোনা; উঠে এসো! তোমার জ্যেঠামশাই তোমার চেয়ে হাজারগুণ আদরের জিনিষ পেয়েছেন, তিনি আর তোমার জন্য ব্যস্ত ন'ন।"

তুমি এস।

ওগো তুমি এস, নবীন বরষে
নভোনীল হ'তে আপনা হরিয়া—নামিয়া এস।
নদী হ'যে কত চলিবে বহিয়া,
ইন্দ্রধনুর বরণ আঁকিয়া
গগনে গগনে উদ্দেশহীনা
ভ্রমিবে কত—ছায়ার মত?
এস এস ওগো তপন হইতে,—নামিয়া এস,
আলোকে পুলকে আমার আঁধার জীবনে হাস।

ওগো তুমি, নন্দন হইতে লুটিয়া গন্ধ
মন্দ সমীর বাহি'
এসগো আনন্দে পলকে ছুটিয়া
সুধাসরে অবগাহি'।
গ্রহ তারা হ'তে গীতি শিখি নিও,
অমিয় সলিলে ওষ্ঠ পুরিও,
র'চিও গতিটি বিচিত্র ছন্দে
হরষ ভরে—আমার তরে;
মুরতি ধরিয়া বাহিরে এসগো, -মানস বাহি',
স্বপনেতে নয় আজি যে তোমায়,—জীবনে চাহি।

জীবনে আমার বহিছে আজিকে,—পাগল ঝড়,
গরজে অশনি চিরিছে দামিনী,—বক্ষ-কুহর;
টুটিয়া পড়িছে ফুল-পল্লব,
চারিদিকে শুধু গর্জ্জন-রব,
বিদ্রোহী-সিন্ধু ফুলিয়া উঠিছে
ভীষণ রঙ্গে—সমীর সঙ্গে,
ওগো, তুমি আসি' সুধীরে শান্তির,—মন্ত্র পড়,
লুটাবে চরণে নীরব মরণে, —ভীষণ ঝড়।

জীবনে আমার আজো ফুটে নাই,—কত যে ফুল,
কত বা ফুটিয়া টুটিয়া গিয়াছে,—নাহিক কূল;
আলোক-পরশে ফুটাও কোরকে,
সাজাইয়া দাও তরু ঝাঁকে ঝাঁকে,
রোমাঞ্চ-পুলকে জিয়াইয়া তোল
গত খসে'-পড়া—জীবন-হারা;
ওগো তুমি আসি' তোলগো হাসা'য়ে,—শুকান ফুল,
সব মিলাইয়ে মালিকা রচিয়ে,—সাজাও চুল।

ওগো তুমি কোথা? নয়ন সুমুখে,—দাঁড়াও হাসি',
জীবনের কল-কল্লোলে উঠুক,—সঙ্গীত ভাসি';
বাঁধি' দাও বীণে ছিন্ন তন্ত্রীগুলি,
মূক রাগিণীতে ফুটাও গো বুলি,
শিথিল গ্রন্থি বেঁধে' তুল ওগো
বিপুল বন্ধে,—ভরা আনন্দে;
মন্ত্র পড়িয়া টানিয়া আনগো,—পল্লব রাশি,
শত বিচিত্রে গড়গো আমারে,—জীবনে আসি'।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

প্রাচ্য চিত্রকলা প্রদর্শনী।

এবারকার এই প্রাচ্য চিত্রকলাপ্রদর্শনী দেখিয়া আমার যা ভাল লাগিয়াছে তাই লিখিতেছি। চিত্রকলা সম্বন্ধে সনাতন যেটুকু আকর্ষণ ও উপলব্ধি সবাকারই মনে আছে তাছাড়া আমার আর কিছুই নাই। ফরাসী দেশে ও বিলাতে যে সকল চিত্রশালা (Art Gallary) দেখিয়াছি তাহা হইতে এই প্রাচ্য চিত্রকলার (Mental Arts) অনেক প্রভেদ বুঝা যায়। এই চিত্রে যা দেখা যায় যা বুঝা যায় তার অপেক্ষাও এক নূতন ভাব মনের অন্তরালে আসে। ইংরাজী ভাষায় এই কথাটি সহজে বুঝাইতে গেলে এই বলিতে হয়—যে এই প্রাচ্যকলার Suggestive beauty বা অন্তর্নিহিত ভাব অতি উচ্চ এবং ইহাই ভারতশিল্পের বিশেষত্ব। রংটি বা রেখাটি বা রেখা বর্ণের একত্র বিন্যাস ভাল হউক বা না হউক সেই রেখা ও রং যে ইন্দ্রিয়াতীত ভাবটুকু ব্যক্ত করে বা অস্পষ্টভাবে সূচনা করিয়া দেখায় সে গুলি বড়ই সুন্দর। ঠিক প্রকৃতির ছবির সহিত ছবি না মিলিলেও ইহার পরোক্ষে সূচিত ভাবটি অতি মধুর ও উচ্চ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেই টুকুই প্রাচ্য কলার বিশেষত্ব। কিন্তু তাহা ছাড়াও ভারতীয় এই চিত্র গুলির মধ্যে আরও একটি বিশিষ্টভাব আমি অনুভব করিলাম।

হিন্দুভাবমাত্রেরই মধ্যে কেমন যেন একটুকু সনাতন শান্তিপ্রিয়তা আছে। প্রতিদ্বন্দী দাবী করিলেই সে তার নিজ স্বত্ব বিনা কলহে তার হাতে দিয়া শান্তিময় স্থানে হটিয়া দাঁড়ায়। এই শান্তিপূর্ণ ভাব হইতেই হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুভাব বিশিষ্ট যত কিছু সামাজিক নিয়ম। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কল্পনার আতিশয্যে সেই ভাবটুকু তাদের কাছে আপনিই আসিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য সর্ব্বদা শান্তি স্থাপনা। এই সুন্দর সনাতন গুণের আতিশয্যেই আমাদের ঐহিক বীতরাগ (Indian Passimism,) নিবৃত্তি মার্গের অনুসন্ধান, প্রবৃত্তিমার্গ বর্জ্জন। ঐহিক সুখের জন্য চেষ্টার একান্ত অভাব ও আমাদের আধুনিক পতন ও দুরবস্থা। সেই ভাবটুকু এই সব নূতন প্রাচ্যকলাতেও (new school of Indian art) পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে অর্থাৎ এদেশের অন্তরের অন্তরতম অবস্থাটি ইহাতে ব্যক্ত করিয়াছে। আর সেই জন্যই ইহার এত মাধুর্য্য এত আদর ও এত গরিমা।

এখন বিবেচ্য কথা এই যে পুরাতন হইতে কিরূপে এই প্রাচ্যকলা নূতন ভাবে অভিব্যক্তি হইল? কি কি ঘটনা এই অভিব্যক্তির সহায়তা করিয়াছে? পুরাতন আর নূতনে তফাৎ কি? নূতন জিনিষই বেশী দিন থাকিলে পুরাতন হইয়া যায়। আবার নূতনের মসলাগুলি অধিকাংশই পুরাতন; কেবল নূতন রকমে সন্নিবিষ্ট। সেই রং সেই রেখা—কেবল বিন্যাস বিভিন্ন। তাই পুরাতন প্রাচ্যকলার (Old Indian art) সঙ্গে এই নূতন কলার (New Indian art) এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একটি আর একটির অভিব্যক্তি মাত্র। বাহিরের নবাগত শক্তির সঞ্চারেই এরূপ হইয়াছে। প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্যের মিলন মিশ্রণই এই মধুর নূতন ভাব

আনিয়াছে। সে সুধু চিত্রকলার সম্বন্ধে নহে। জীবনের যাবতীয় বিষয়েই তার স্পর্শের এমনি সুফল সহজেই ফলিতে পারে ও ফলিবে। কেবল সে শুভ দিন দেখিতে বাঁচা চাই। সেইটিই এখন কেবল সমস্যার বিষয় দাঁড়াইয়াছে।

চিত্রকলার অনেক উদ্দেশ্য। অনুকরণ স্পৃহা তার মধ্যে আদিম ও প্রধান। পুরাকালে একটি দ্রব্যের সাদৃশ্য লিখিয়াই সেই দ্রব্যটির কথা জানান হইত। ইহা হইতেই শেষে ভাষা-লিপির আবির্ভাব হইয়াছে। প্রাচীন মিসর দেশে ও আমেরিকাতে "পেরু" প্রভৃতি পুরাতন স্থানে এখনও এইরূপ লিখন প্রত্নতত্ত্বরূপে বিদ্যমান দেখা যায়। চিত্রকলার আর একটি উপকারিতা তাহা হইতে পুরাকালের আচার ব্যবহার রীতিনীতির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ পুরাতন চিত্র হইতেই মিশর প্রভৃতি দেশের প্রাক্কালের ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং আমাদের দেশেও মন্দিরে, প্রস্তর ফলকে ও পুরাণ চিত্রে এই সব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মনুষ্য সমাজের সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এখন চিত্রকলার প্রধান ভাব ও উদ্দেশ্য হইয়াছে—"To represent an ideal; to represent what we earnestly desire" যাহা দেখিতেছি ও আঁকিতেছি তাহা অপেক্ষাও আরও কিছু বুঝান,—অর্থাৎ প্রকৃত দ্রব্য হইতেও কল্পনা আরও উচ্চে উঠিতে পারে—এই ভাব দেখানই চিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ। সুতরাং এই কয় হিসাবে চিত্রগুলি বিচার্য্য।

১ সেই সময়কার রীতিনীতির পরিচয়।

২ উচ্চনীতি শিক্ষার উপযোগী।

৩ উচ্চ সৌন্দর্য্য কল্পনা শক্তির বিস্তার।

এই তিন হিসাবেই আমাদের প্রাচ্য আলেখ্য গুলি চিত্তহারী।

বালক রামলক্ষ্মণকে বশিষ্ঠমুনির ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষাদান, হরপার্ব্বতী-সংবাদ, চোখবাঁধা রাণী গান্ধারী, যশোদা ও গোপালের ছবি, কচ ও দেবযানী; ভারতমাতার ছবি; শক্তিময়ীর স্বপ্ন, উমার খ্যয়েমের কবায়ত, বিরহীযক্ষ, বিরহিনী যক্ষপত্নী, রুক্মিণীর প্রণয় কাহিনী; তাজ মহলের স্বপ্ন, আরব্যোপন্যাস কথন, মহাভারত লিখন, প্রভৃতি সমস্ত ছবিগুলিই কি সুন্দর। ইহার অনেকগুলিই পূর্ব্বে ভারতীতে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে সুতরাং এস্থলে তাহার বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তথাপি আমি এস্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ যশোদা ও গোপালের ছবিখানি পুনরুদ্ধৃত করিলাম।—এমন পবিত্র ও মধুর ভাব—আর কোন সম্বন্ধে দেখা যায় না। খৃষ্টধর্ম্মের ম্যাডোনা—বা খৃষ্টমাতার শিশু-ক্রোড়ে কল্পনাও বোধ হয়—ভারতের এই ভাবেরই অনুকরণ।—কি সুন্দর মাতৃমূর্ত্তি!

আর একখানি বড় ছবি চিত্রশালায় উচ্চে টাঙ্গান আছে—সেখানির বিষয় গঙ্গার আগমন। উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে পবিত্র স্রোতস্বিনীকে প্রথম বহিয়া আসিতে দেখিলে—দেব মানব সকলেরই কি আনন্দ হইয়াছিল সে ভাব চিত্রিত।

ইহাতে রং ও রেখার কিছুই অলৌকিক দেখিবে না; কেবল সূচিত ভাবই তাহার মহাপ্রাণ। পাশ্চাত্য চিত্র হইতে এই বিষয়েই তাহার মহা প্রভেদ। এই চিত্রে শরীর



যশোদা গোপাল

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম হইলেও অধিকাংশ বিষয়গুলির ভাবার্থ অতি মহান ও হৃদয়স্পর্শী।

দুই একখানি ছোট ছোট ছবি সব পাশে পাশে সাজান দেখিলাম। সে সবগুলি প্রণয় পত্র সম্বন্ধে। আশ্চর্য্য সবগুলি ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকর প্রণীত, অথচ ঠিক এক রকম ভাবেই আঁকা।

একখানিতে নিভৃতে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে পদ্মপাতায় ও চন্দনের কালীতে পত্র লিখিতেছেন। তাঁহার ভ্রাতার ইচ্ছা তিনি অপর একজনকে বিবাহ করেন।

আর একটি ছবিতে এক উচ্চ প্রাসাদের জানালা হইতে একটি সুবেশা রমণী একজন দূতের হাতে একখানি প্রণয় পত্র গোপনে পাঠাইতেছেন।

আর একটি ছবিতে একটি কপোত ঠোঁটে করিয়া একখানি প্রণয় পত্র লইয়া উড়িতে উড়িতে আসিতেছে। একটি গবাক্ষে একটি রমণী একান্ত আকুলতার সহিত তার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

একজন রামায়ণ প্রেমিক জাপানী হালকা হালকা তুলি বুলাইয়া ছয় খানি ছবিতে সাতকাণ্ড রামায়ণ লিখিয়াছেন তাহা কি চমৎকার। যে বিশিষ্ট ভাবের কথা আমি এদেশের চিত্রকলায় আছে মনে করি, সেই বিশিষ্টভাব এই বিদেশী অতি সুন্দর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। বিদেশী হইলেও তাঁর আন্তরিকতা একান্ত গভীর। তিনি এদেশী চিত্রকরদেরও এই বিষয়ে হারাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার স্বাভাবিক জাতীয় ক্ষমতা অর্থাৎ সুন্দরভাবে রেখা টানিবার ও রং ফলাইবার ক্ষমতাটুকু ত সেই চিত্রে আছেই তাহার উপর এ দেশের ভাবে ছবিখানি অতীব সুন্দর হইয়াছে। এ ছবিগুলি সব রেশমের কাপড়ের উপর আঁকা।

প্রথমখানি রামের বনগমনের ছবি। বল্কল পরিয়া শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ যাইতে প্রস্তুত, আর আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই রোরুদ্যমান। শ্রীরামচন্দ্রের নিজেরও এই বিষম মুহূর্ত্তে মুখখানি ম্লান। নিশ্চয়ই সে মলিনতা বনে যাইবার জন্য নহে, পিতামাতা ও পুরবাসীগণকে এমন শোকাতুর দেখিয়া।

দ্বিতীয় ছবিখানিতে তাঁহাদের অরণ্য বাসের ছবি চিত্রিত। গাছতলায় সীতাদেবী রামচন্দ্রের কোলে মাথা রাখিয়া ভূমিশয্যায় শয়ান। রামচন্দ্রের চোখ দুটি ঘুমাবেশে আলস্যমাখা। ভাই লক্ষ্মণ অদূরে থাকিয়া সারারাত্রি ধনুর্ব্বাণ লইয়া সীতাদেবীকে পাহারা দিতেছেন। তাঁহার সে সময়কার উপযোগী যে কিরূপ সুন্দর মূর্ত্তি চিত্রকর আঁকিয়াছেন সে না দেখিলে বুঝান যায় না! লক্ষ্মণের সকল অবস্থাতেই উদ্দীপ্ত ভাব; সেইভাবে অন্তরীক্ষে চাহিয়া চারিদিকে তিনি পদচালনা করিয়া সারারাত সীতাদেবীকে রক্ষা করিতেছেন।

তৃতীয় ছবিখানি সীতাহরণ সম্বন্ধে। ভীমাকৃতি রাবণ নিরাশ্রয়া সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়া আকাশপথে চলিয়াছেন। সীতাদেবী ভয়ে মুমূর্ষু। রাবণের কৃষ্ণদেহে তাহার ক্ষীণ কাঞ্চন তনুখানি যেন মেঘের মাঝে বিদ্যুতের মত দেখাইতেছে।

চতুর্থ ছবিখানি অপহৃতা সীতাদেবীর রাবণরাজার কারাগারে অশোক তলায়

অবস্থান ছবি। তিনি গাছতলায় ম্লান মুখে একা বসিয়া আছেন—আর দূরে দূরে দেবীরা পাহারা দিতেছেন।

পঞ্চম ছবিখানিতে সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা। দেবী করযোড়ে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন। মুখে প্রশান্ত ভাব। জাপানী চিত্রকর তাঁর পদদেশ ধূমে ঢাকিয়া দিয়া তাঁহার শরীরে অলৌকিক দেবীভাব আরোপণ করিয়াছেন।

শেষ ছবি খানি রাক্ষস নাশ করিয়া সীতা-দেবীকে পুনরুদ্ধার করিয়া রামের পুষ্পকরথে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন। এখানি যেন সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর।

উর্দ্ধমুখ অসীম জনতার চক্ষুকে পরিতৃপ্ত করিয়া জ্যোতির্ময় পুষ্পক রথখানি মেঘ ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ হানিয়া আকাশপথে আবির্ভূত হইয়াছে। নীচে ভরত রামের পাদুকা দুখানি মাথায় করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রামায়ণের সকল চিত্রেরই কি পবিত্র ভাব কি মধুর পবিত্র ইতিহাস। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে ভাবে মোহিত, তার কাছে এই ইতিহাসের ভাবুক চিত্রকর জাপানীর কথা কি।

এই প্রদর্শনীতে যে সকল প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র দেখিলাম সে গুলিও অতি সুন্দর। দেশের লোকে যে প্রকৃত চিত্র আঁকিতে অপটু এই চিত্রগুলি দেখিলে ইহা মিথ্যা অপবাদ বলিয়া সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। এই সব চিত্রগুলি সবই আলো ও ছায়া বিশিষ্ট সুন্দর রং ফলান প্রতিকৃতি। "চিলকা"হ্রদ; সূর্য্যোদয়; সূর্য্যাস্ত; চাঁদনীর রাত; ঘন বনের দৃশ্য; আলো ও ছায়ার খেলা; কাঞ্চনজঙ্ঘা; তুষার ধবলশিখর ইত্যাদি। এই চিত্র সকল দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল ইউরোপের বিভিন্ন চিত্রাগারে যে সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়াছি তাহার তুলনায় কোন অংশে ইহারা অসমকক্ষ নহে।

এইরূপ সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মত আমারও ঘরে দুইখানি অতি সুন্দর দৃশ্য আছে। একজন অজানা ভাবুক যুবকের লেখা। তিনি কোথাও কখনও চিত্রকলা সম্বন্ধে শিক্ষা পান নাই তাঁহারই নিজের লেখা কবিতারই ছবি। বিষয় "উষা তারা" ও "সন্ধ্যা তারা।" চিত্র দুটিতে উদীয়মান ও অস্তমান এই দুই অবস্থার পার্থক্য দেখান হইয়াছে। সন্ধ্যা তারাটি সন্ধ্যাগগনে ক্রমেই উজ্জ্বলতর হইতেছে, আর তার প্রতিবিম্ব মনের উপরও দীপ্তিমান। চারিদিকের অবস্থা এই সুসময়ের সহিত সুর মিলাইয়া আঁকা। সেখানকার দৃশ্যাবলী সবই উন্নতিশীল গাছপাতায় ভরা। নূতন ও পুরাতন সুগঠন হর্ম্ম্যের গবাক্ষ হইতে আলোর হাসি আসিতেছে। কিন্তু নিভমান উষার তারার সকলই ম্লান। সে দৃশ্যে গাছগুলি পাতাহীন ও দূরে চালা ঘরগুলি সব ভাঙ্গা ও পরিত্যক্ত। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে সন্ধ্যা তারাই আবার উষাতারা হয়।

সর্ব্ব শেষে শারীরিক ও মানসিক সকল কার্য্যের ভিত্তিস্বরূপ মনোবিজ্ঞান ও স্নায়ু-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আর দু একটি কথা না বলিলে চিত্রকলা সম্বন্ধে লেখা সম্পূর্ণ হয় না, কেন না সেই তত্ত্বগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব কথা। বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের আদান প্রদান স্নায়ুমণ্ডলের সাহায্যেই হইয়া

থাকে। জ্ঞান ও উপলব্ধির প্রধান যন্ত্র মস্তিষ্ক। সেই আশ্চর্য্য যন্ত্রটি কোষ ও তন্তু দ্বারা গঠিত। কোষ গুলিতেই শক্তি উদ্ভূত হয়—সেই গুলিই জ্ঞান ও কর্ম্ম করিবার শক্তির কেন্দ্র। সেই কেন্দ্র হইতে তন্তু বহিয়া সেই শক্তিগুলি বিভিন্ন স্থানে যাইয়া তথায় শক্তি সঞ্চার করে। তাই বাহ্য জগতের প্রতিঘাত শরীরের সেই তন্তু পথে মস্তিষ্কে নীত হইয়া বাহ্যবস্তুর জ্ঞান উদ্ভব করে, ও ইচ্ছা শক্তি সেইরূপ তন্তু পথে নাবিয়া আসিয়া মাংসপেশীকে চালনা করিয়া কাজ করায়। সৌন্দর্য্য জ্ঞান সম্বন্ধেও উক্তরূপ কোষ ও তন্তু আছে। নানা স্থান হইতে নানাতন্তু একদিকে একত্র হইয়া সেই কেন্দ্রে সৌন্দর্য্য জ্ঞানের বিকাশ করে। প্রতি তন্তু পথে আনীত এই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি একত্র হইয়া আরও স্পষ্ট ভাবে বিকসিত হয়। তাই তাহার শরীর মনের উপর এত শক্তি। তাই তাহার উদ্বেলিত হইয়া বাহ্য জগতে চিত্রকলার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার এত সনাতন প্রয়াস। এইরূপেই সকল কলাবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। অন্তরের উচ্ছ্বাসেই বিশ্বজগত এত ভাবে প্লাবিত। সে উচ্ছ্বাস অধিকাংশই মস্তকের পশ্চাদ্দিকের কেন্দ্র হইতে নিঃসরিত হয়।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোকের এই স্থানই বেশী পরিপুষ্ট, তাই তাহারা অতীতের স্মৃতি ও ভাবোচ্ছাস লইয়া এত বিভোর। মস্তিষ্কের সম্মুখস্থ কেন্দ্রের কাজ নূতন কার্য্য নূতন আলোচনা, নূতন পথে গমন। সে স্থানের পরিপুষ্টিতে মানুষকে নূতন পথে অগ্রসর করায়। শীত প্রধান দেশের লোকের স্বভাবত এই কেন্দ্রই প্রবল।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

সুচরিত্র।

১

তখন সবেমাত্র প্রোবেসনারি ডিবস্থ ভেদ করিয়া, সদ্য ডেপুটি ফুটিয়া, বাগান্দায় বদলি হইয়াছি।

সেদিন কাছারি হইতে ফিরিতেই রীতিমত বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আলো জ্বালাইয়া, ইজি চেয়ারে, পড়িয়া উপন্যাসের মধ্যে মগ্ন হইবার চেষ্টা দেখিতেছিলাম। কিছু ভাল লাগিতেছিল না। একে, আজন্ম কলিকাতায় বাস, তায় এই সঙ্গীহীন বিজন পল্লী, আবার তার উপর ঘনীভূত বর্ষা। 'প্রত্যাসন্নে নভসি', মেঘদূতের যক্ষের মত, আমার চিত্ত প্রিয়ার জন্য বেশী করিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। তখন আমার সবেমাত্র বিবাহ হইয়াছে। বিবাহিত জীবনে, এই প্রথম বর্ষা। রবিবাবুর কাব্যরসগ্রাহী আমার মনের অবস্থা, সুতরাং সহজেই অনুমেয়।

সহসা বাহিরে একটা কোলাহল শুনিয়া উঠিয়া আসিলাম। দেখি, আমার চাপরাসি-পুঙ্গব, উপস্থিত কার্য্য হাতে না থাকায় এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর সহিত গোলমাল বাধাইয়া দিয়াছে। বৃদ্ধাটি খঞ্জ। তার অপরাধ, সে এই বৃষ্টিতে, ভিজা-কাপড়ে, এক পা-কাদা শুদ্ধ

'ডিবটি-সাবে'র গাড়ীবারাণ্ডায় আসিয়া অসম্ভব দুঃসাহসিকতা ও আস্পর্দ্ধার পরিচয় দিয়াছে, এবং পুনঃ পুনঃ বলা-কহা সত্ত্বেও এ স্থান ত্যাগ করিতেছে না! 'প্রখর রবির তাপ' ও 'রবি-তপ্ত বালুর' কথা, আমার চট্ করিয়া মনে পড়িয়া গেল। চাপরাশিকে ভর্ৎসনা করিয়া বৃদ্ধাকে কহিলাম, "ওখানে বৃষ্টির ঝাট আস্‌ছে, তুমি উঠিয়া এই বারাণ্ডায় বস। বৃষ্টি থামিলে যেয়ো!"

বৃদ্ধা গদ্গদকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিল, "বেঁচে থাকো বাবা! বুড়ো মানুষ—তায় কদিন ধরে জ্বর হচ্চে! এই বৃষ্টিতে বড় কাঁপিয়ে দিলে। কাছে কোথাও একটু দাঁড়াবার জায়গা নাই বলে, এখানে একটু বসেছি, বাবা!"

একটা করুণ সহানুভূতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ডেপুটিগিরিতে তখনো পাকা হই নাই, পুঁথির কথাগুলা, সুতরাং, একেবারে ভুলি নাই। আমি কহিলাম, "জ্বর! তাহলে এই বর্ষায় বেরিয়ে ত ভালো করনি, বাপু, আমি একখানা কম্বল দিচ্ছি—সেইটে মুড়ি দিয়ে এইখানেই আজ পড়ে থাকো। কাল সকালে বাড়ী যেয়ো!"

বৃদ্ধার চোখে, বোধ হয়, জল আসিয়াছিল। রুদ্ধস্বরে, সে কহিল, "গরিবের প্রতি তোমার এত দয়া। ভগবান তোমার ভালো করবেন, বাবা! চিরদিন আমার এমন দুঃখ-দুর্দ্দশা ছিল না।"

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য! কারণ তার কণ্ঠস্বর সাধারন ভিখারিণীর মত নহে! বৃদ্ধাকে একখানি কম্বল ও শুষ্ক বস্ত্র আনাইয়া দিলাম।

ভোজন-শেষে, আবার বারাণ্ডায় আসিলাম। তখনো বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমি কহিলাম, "একটু দুধ খাবে?"

বৃদ্ধা কোন উত্তর দিল না। বেহারাকে দুধ আনিতে বলিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বাড়ী কি, এ দেশেই?"

"হাঁ, বাবা!"

তাহার পর, পরিচয়ে জানিলাম, সে ব্রাহ্মণকন্যা। তার পিতা গ্রামের পৌরোহিত্য করিয়া বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দেই দিন কাটাইয়া গিয়াছে। বাল্যে মাতৃহীনা হইলেও, পিতার স্নেহে, সে অভাব তাহাকে একদিনের জন্যও অনুভব করিতে হয় নাই। পিতারো বহুদিন মৃত্যু হইয়াছে। এখন আর সংসারে তার 'আপনার' বলিতে কেহ নাই। বৃদ্ধ ডাক্তার বামাচরণবাবু তাহাকে মাসে দুইটি করিয়া টাকা দেন, আর সে নিজের হাতে পৈতা তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করে! এখন যে এই দুরবস্থা, এ তাহারি গভীর পাপের শাস্তি! বৃদ্ধা কহিল, "আমার মা, বুঝি, এখানে নাই, বাবা?"

তখন নোলোক-পরা, হাসি-ভরা, কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ-ঝরা, সুন্দর একটি ছোট মুখের কথা, চকিতে আমার মনে পড়িয়া গেল! দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, আমি কহিলাম, "না, এ দেশে আমি এই নূতন এসেছি। তারা, আর মাসখানেক পরে সব, এখানে আসবে!"

২

সকালেও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি! বিরাম নাই! অস্থির করিয়া তুলিল! একে বিদেশ, কাছে এমন একটি লোক নাই, যাহার সহিত দুইদণ্ড কথা কহিয়া বাঁচি! তাহার উপর, প্রকৃতির এই নিরানন্দ ভাব! প্রাণের মধ্যে বিচ্ছেদের ঘন অন্ধকার, বাহিরের আলোকও রুদ্ধ! বৃষ্টি!

বৃষ্টি। বৃষ্টি। প্রাণ যেন বাহিব হইবাব উপক্রম করিতেছে।

বাবাণ্ডায় আসিয়া দেখি, বুড়ী কম্বল মুড়ি দিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোগেব চিহ্ন থাকিলেও তাব মুখ হইতে লাবণ্যেব শেষ বেখাটুকু এখানো ঝবিয়া যায় নাই। মেঘেব আড়াল হইতে সূর্য্যেব দুই একটা ক্ষীণরশ্মি ফুটিয়া উঠিলে, আকাশে যেমন একটি বিচিত্র বর্ণেব আভাস পাওয়া যায়, অনেকটা যেন, তেমনি।

চাপবাশি সকালেব 'ডাক' লইয়া আসিলে, আমি বামাচবণ ডাক্তাবেব সন্ধান লইলাম। বামাচবণবাবু এখানকাব প্রবীণ ডাক্তাব; হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কবেন, গবিবেব, নাকি, তিনি মা-বাপ।

আমি একটা চিঠি লিখিয়া চাপবাশিকে বামাচরণবাবুব উদ্দেশ্যে পাঠাইলাম।

৩

তিন চাবিদিন বোগযন্ত্রণা ভোগ কবিয়া একদিন শেষ রাত্রে বৃদ্ধা, নীববে, আমাবি গৃহে দেহত্যাগ কবিল। তাব মৃত্যুতে প্রাণে একটা আঘাত লাগিল। আহা, অনাথা নারী।

জানালার ধাবে বসিয়া আকাশেব দিকে চাহিয়াছিলাম। বেহাবা আসিয়া চা বাখিয়া গেল। আমি দেখিলাম। পানে রুচি বা প্রবৃত্তি ছিল না। আমাব মনে হইতেছিল, জগতেব দাবিদ্র্যেব কথা। এমনি অসহায়ভাবে, কত দবিদ্র বোগের যন্ত্রণা ভোগ কবিতেছে। ক্ষুধায় অন্ন নাই, বোগে ঔষধ নাই, তৃষ্ণায় জল নাই! কে তাহাদেব সন্ধান লয়! কে তাহাদেব দেখে। বিলাসী বাবুর হাভানা চুরুটেব সহিত কত পয়সা 'ছাই' হইয়া যাইতেছে, আব ইহাদিগেব একমুষ্টি অন্নসংগ্রহ কবিবারো সামর্থ্য নাই, সঙ্গতি নাই।

বামাচবণবাবু কহিলেন, "আহা, বেচারী এ জীবনে কম কষ্টটা সহ্য কবেছে!" বৃদ্ধা সম্বন্ধে বামাচবণবাবু অনেক কথাই বলিলেন। আকৃতিতে বার্দ্ধক্য ঘনীভূত হইলেও, তারাব বয়স চল্লিশ বৎসব অতিক্রম করে নাই। নানা দুঃখে কষ্টে তাহাব শবীব ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। আবো বিশেষ কবিয়া তিনি বলিলেন, এই দবিদ্রা, উপেক্ষিতা নাবীব হৃদয়-সম্পদেব বিশালতাব কথা।

তাবাব পিতা মধু ভট্টাচার্য্য ছিলেন, গ্রামেব পুবোহিত। তারাব বয়স যখন তিন বৎসব, তখন অশীতিবর্ষ কোন কুলীন চূড়া-মণিব হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া মধু ভট্টাচার্য্য আপনাব স্বর্গেব পথ সুপ্রশস্ত কবেন। বিবাহেব সময়, নানাবিধ জটিল ব্যাধিতে পাত্রেব জীবনী-শক্তি একেবারে হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। বিবাহেব ঠিক তিন দিন পবেই তারা বিধবা হয়।

বালিকাবয়স হইতেই, বৈধব্য ব্রতে পালিতা ব্রাহ্মণ কন্যা তারাব নিষ্ঠাব সীমা ছিল না।

তাবাব বয়স, তখন, সতেরো বৎসর! তাহাব দুর্ভাগ্যেব কথা গ্রাহ্য না কবিয়া, যৌবন আপন বিচিত্র তুলিকা-পাতে তারাব সাবা অবয়ব একটি উজ্জ্বল সুকুমাব শ্রীতে মণ্ডিত কবিয়া তুলিল। ঠিক যেন, একখানি ভাস্বর প্রতিমা!

এই সময়, গ্রামেব জমিদার যোগেন্দ্র চৌধুবীব তরুণ পুত্র নীবেন্দ্রনাথ, বি, এ পাশ কবিয়া, স্কুল-প্রতিষ্ঠা, জলাশয়-খনন, চতুষ্পাঠী-

সংস্কার প্রভৃতি সৎকার্য্যে গ্রামের লোকের আদর, শ্রদ্ধা ও সম্মান অধিকার করিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হিন্দুজাতির আশা-প্রদীপ হইয়া উঠিল।

তারার সহিত নীরেন্দ্রের কখনো সাক্ষাৎ বা আলাপ হইয়াছিল কি না, তাহার কথা জানা নাই। তবে, নীরেন্দ্রকে মধু ভট্টাচার্য্যের নিকট হিন্দুশাস্ত্রের গূঢ় ও গাঢ় তত্ত্বসমূহের আলোচনা করিতে অনেক সময়ই দেখা যাইত; তাহাতে কাহারো মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় না হইয়া, বরং আনন্দেরই সঞ্চার হইয়াছিল। অন্তরাল হইতে মুগ্ধচিত্তে শাস্ত্রালোচনা শুনিতে শুনিতে, তারা অনেকবার এই তরুণ শাস্ত্রজ্ঞের দৃষ্টি, মধু ভট্টাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া গৃহমধ্যে বিচরমান দেখিয়াছে! এবং গৃহমধ্যবর্ত্তিনীর দৃষ্টির সহিত সে দৃষ্টি মিলিলে, এই মেধাবী তরুণ সাধু নানারূপ অবান্তর ও অসঙ্গত তর্কে যে, লজ্জারক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, সেটুকুও তারা একাধিকবার লক্ষ্য করিয়াছিল!

সেদিন জমিদারবাটিতে দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে, গ্রামের স্ত্রী-পুরুষের সমাগম হইয়াছিল। ভোজনান্তে সকলে গৃহে ফিরিলে, মাষ্টার মহাশয় ও বামাচরণবাবু অনেক রাত্রি অবধি দাবা খেলিয়াছিলেন। রাত্রি অধিক হওয়ায়, বামাচরণবাবু, গৃহে না ফিরিয়া, আফিস ঘরেই নিদ্রার ব্যবস্থা করেন।

৪

বামাচরণবাবু বলিতে লাগিলেন, "ভালো নিদ্রা হইতেছিল না। তার কারণ, মশকের উৎপাতটা নিতান্তই অসহ্য বোধ হইতেছিল। দক্ষিণধারের লাইব্রেরীঘরে বায়ুর আধিক্যে, এ উৎপাত কমিবে ভাবিয়া, উপরে আসিলাম।

ঘরে প্রবেশ করিব, এমন সময়, দেখি, সম্মুখে নীরেন্দ্র। সে বাহিরে আসিতেছিল। সে কহিল, "কে?" তার কণ্ঠস্বরে কেমন একটা অস্বাভাবিক জড়তা ছিল, সে সময়, আমি তাহা অবশ্য তত স্পষ্ট লক্ষ্য করি নাই! আমি কহিলাম, "আমি।"

সে কহিল,"ডাক্তারবাবু! এ সময়, এখানে যে!" আমি কহিলাম, "নীচে, মশার উৎপাতে ঘুম হচ্ছিল না, তাই এ ঘরে হাওয়ায় শুতে এলাম; তা, তুমি এখনো শুতে যাওনি যে—পড়ছিলে, বুঝি!"

হঠাৎ একটা ঢোঁক গিলিয়া, সে কহিল, "এঁ্যা—হ্যাঁ,—ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদটা সম্প্রতি আনানো গেছে, তাই দেখছিলাম!"

আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খপরে প্রয়োজন ছিল না! প্রশংসিত নেত্রে তাহার পানে একবার চাহিয়া, জানালার ধারে আসিয়া বসিলাম। সহসা নীচে পথ হইতে একটা কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমি কহিলাম, "ও কি?" নীরেন্দ্র নিকটে আসিল। আমি বারাণ্ডায় আসিলাম! দিব্য জ্যোৎস্না রাত্রি! স্পষ্ট, সেই চন্দ্রালোকে আমি দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক পথের একধারে পড়িয়া;—এ কাতর স্বর, তাহারি! তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া যাইব, এমন সময় নীরেন্দ্র আমার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল, কহিল; "ডাক্তারবাবু, এ কথা কাকেও বলবেন না। আমার কোন দোষ নাই! কারো কোন দোষ নাই। দুজনেই আমরা নিষ্কলঙ্ক!" নীরেন্দ্র কাঁদিয়া

ফেলিল। আমি আশ্চর্য্য হইলাম, কহিলাম, "ব্যাপার কি, নীরু?"

নীরেন্দ্র কহিল, "আগে, নীচে চলুন, তার-পর সব বলব! কিন্তু দেখবেন, কেউ যেন না জানতে পারে!"

নামিয়া আসিলাম। দেখি, পথে পড়িয়া, তারা! তারার সংজ্ঞা ছিল না। অল্পে অল্পে জ্ঞান সঞ্চার হইলে, দুইজনে ধরিয়া তাহাকে লাইব্রেরী ঘরে আনিলাম। তারার পায়ের হাড় ভাঙিয়া গিয়াছিল।

সংজ্ঞা ফিরিলে, আমি ডাকিলাম, "তারা!"

তারা কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই!"

নীরেন্দ্র কহিল, "আমাকে ক্ষমা কর, তারা!"

কোনমতে তারাকে লইয়া অদূরে মধু ভট্টাচার্য্যের গৃহে ফিরিলাম! মধু ভট্টাচার্য্য জমিদার বাড়ী পূজা সারিয়া ভিন্ন গ্রামে বিবাহ দিতে গিয়াছিলেন। ভগবান যেন সুযোগ ঘটাইয়া দিলেন। হতভাগিনী বিধবা—তাহার বিপদে সাহায্য করিতে কেহ নাই, কিন্তু তার মাথায় বাজ ফেলিবার জন্য, লক্ষ লোক এখনি আজ উদ্যত হইয়া উঠিবে!

তারা তখনো কাঁদিতেছিল। সে কহিল, "আপনি বিশ্বাস করবেন, কি? সব কথা আপনাকে বলছি, শুনুন!"

তারা কহিল, কয়দিন ধরিয়া তাহার প্রাণে একটা চঞ্চলতা আসিয়াছিল! কি যেন একটা অভাব তার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল! পূজার্চ্চনা বা কাজকর্ম্ম, কিছুতে যেন সে শান্তি পাইতেছিল না! এই নীরেন্দ্র, যদি একবার তাহাকে একটু আদর করিয়া ডাকে, তাহার সহিত যদি, দুইটা কথা কহে, তাহা হইলেই যেন, তাহার নারী-জীবন সার্থক হয়, এমনি একটা-কিছু তারার মনে হইতেছিল!

নীরেন্দ্রেরও দোষ ছিল। সে কেন তারাকে অদৃশ্য বন্ধনে এমন করিয়া বাঁধিতে-ছিল? সে বিধবা—তারার দিকে এমন করিয়া করুণভাবে চাহিবার অধিকারই বা তাহাকে কে দিয়াছিল?

আহারাদির পর, সে রাত্রে তারা বাবুদের নীচেকার দালানেই বসিয়াছিল—প্রতিবেশিনীদ্বয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সহসা নীরেন্দ্র আসিয়া ডাকিল, "তারা, এস!" পাছে প্রতিবেশিনীরা দেখিয়া কিছু মনে করে এই ভয়ে, ভালোমন্দ কিছু না ভাবিয়া মন্ত্র-চালিতের মত একেবারে—পাপিনী সে স্বচ্ছন্দে তাহার অনুসরণ করিল! আর, কি দুর্বৃত্ত আচরণ ও স্পর্দ্ধা, এই নীরেন্দ্রের!

বাড়ীতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। শুধু সিঁড়ির পাশের ঘরে চাকরটা দ্বার ভেজাইয়া, সুর করিয়া, রামায়ণ পড়িতেছিল। তারা নীরেন্দ্রের সহিত লাইব্রেরীকক্ষে আসিল।

নীরেন্দ্র ডাকিল, "তারা!" কত কোমল, মিষ্ট, সে আহ্বান! তবু যেন, তাহাতে কি একটা বিকটতা!

তখন নিমেষে তারা বুঝিয়া ফেলিল, কি এ ব্যাপার! পূর্ণিমার এত আলো, তার চোখে কালো হইয়া গেল। তার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া যেন বিদ্যুতের একটা তীব্র শিখা বহিয়া গেল। তার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমাকে যেতে দিন, নীরুবাবু! আপনি কি সাহসে, কেন, আমাকে এখানে ডেকে আনলেন?"

নীরেন্দ্র কহিল,—তার স্বর কাঁপিয়া উঠিতেছিল,—নীরেন্দ্র কহিল, "এখনি যেও—শুধু একটিবার বল, তারা, আমাকে ভালো বাসবে?"

ভালবাসা। মূঢ়। পিশাচ। কি তার অর্থ। কি তার সার্থকতা! কি তার ফল।

তারা বলিল, "না। যেতে দিন, আমাকে।" সে স্বরে যেন বহ্নি ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। বাহিরে যাইবে, এমন সময় আমারি পদশব্দ শুনিয়া তারা হঠিয়া আসিল। নীরেন্দ্র কহিল, "দেখ দেখি, কি সর্ব্বনাশ! এখনি আমার সুনাম নষ্ট হবে—অকলঙ্ক চরিত্রে দাগ পড়বে। তোমারো তাই হবে। এখন, উপায়!"

উপায় নাই! কি হইবে। তারা মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া, পাশের বারাণ্ডা হইতে একেবারে নীচে লাফাইয়া পড়িয়াছে।

শেষ রাত্রে তারার সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে বাহিরে আসিয়া দেখি, নীরেন্দ্র দাঁড়াইয়া আছে! সে একেবারে আমার পায়ে ধরিয়া কহিল, "ডাক্তারবাবু, দেখবেন, যেন কেউ এ কথা না জানতে পারে। তা হলে, আর আমার মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না! আর, সমাজে বেচারী তারারো লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না!"

হায়, স্বার্থপর, কাপুরুষ, এমনিভাবেই তুমি অসহায়া নারীর সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছিলে।

আমি কহিলাম, 'কোন ভয় নাই, তোমার।"

নীরেন্দ্র চলিয়া গেল। মধু ভট্টাচার্য্য ফিরিলে, তাঁহাকে বুঝাইলাম, রাত্রে হঠাৎ রোয়াক হইতে পড়িয়া তারার পা ভাঙিয়া গিয়াছে!

ভাঙা পা, এ জীবনে, আর, তেমন করিয়া জোড়া লাগিল না।

এইটুকু ভিন্ন, তারার জীবনে, আর, এতটুকু গোপনতা, এতটুকু কলঙ্ক নাই! নিষ্ঠাবতী, করুণাময়ী নারী, সকলের সুখে-দুঃখে, আযৌবন সহানুভূতি দেখাইয়া আসিয়াছে! আজ সে নাই, তাই কথাটুকু আপনাকে বলিলাম।"

আমি কহিলাম, "আর, নীরেন্দ্রের সংবাদ কি?"

"সে, এখন, কলিকাতায় থাকে। তার সুচরিত্রে অবশ্য কোন দাগ পড়ে নাই। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই সে কলিকাতা চলিয়া যায়। খবরের কাগজে, তার নাম দেখেন না? সে যে, এই মলির বিকল্পের পর, কাউন্সিলের মেম্বর হইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এবং এ বিষয়ে সম্ভাবনাও নাকি তার বেশ আছে, শুনিতে পাই।"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

অভিসার।

এতটুকু ক্ষুদ্র প্রাণ, ক্ষুদ্র বক্ষে মোর,
চাহেনা থাকিতে বন্দী। সে যে গো বিভোর
নিখিলের প্রেমতীর্থে যাইতে একেলা,
বহি'শিরে হৃদয়ের শত লীলা খেলা।
যাঁর বলে ক্ষুদ্র প্রাণ করে অভিসার,
সে শক্তি প্রাণের নহে—শক্তি বিধাতার।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা। *

* গত চৈত্রে জিজ্ঞাসা নামক কবিতায় লেখকের পদবী ভুল লিখিত হইয়াছে। লেখক মাহাতি নহেন মহিন্তা।

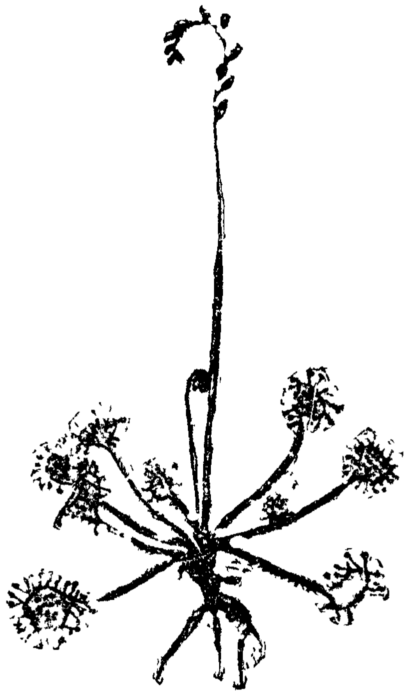
কীটভুক বা মাংসাশী উদ্ভিদ্।

প্রকৃতিদেবীর অনন্তরাজ্যে যে কত আশ্চর্য্য বস্তু আছে এবং নিয়ত কত আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইতেছে তাহার কে নির্ণয় করিতে পারে? আজ সমস্ত সভ্যজগৎ বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব আলোকে সমুদ্ভাসিত। বিজ্ঞানের সেই অপূর্ব্ব আলোকরশ্মিপাতে প্রকৃতিদেবীর অঞ্চলাবৃত অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া আজ আমাদের সমক্ষে দেদীপ্যমান। পাশ্চাত্যদেশের উদ্ভিজ্জবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের বিজ্ঞানচর্চ্চার ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসার ফলে উদ্ভিদ্জগতেও অনেক আশ্চর্য্য এবং অলৌকিক ঘটনার আবিষ্কার করিয়াছেন। আজ এই প্রবন্ধে উদ্ভিদ্জাতির মধ্যে মাংসাহারের প্রচলন বিষয়ক একটি আশ্চর্য্য ঘটনার আলোচনা করিব। যাঁহারা "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই নীতিবাক্য অনুসরণ করিয়া স্বচ্ছন্দবনজাত উদ্ভিদের দ্বারা উদরপূর্ত্তিকরতঃ সাত্ত্বিকাহারের আনন্দ উপভোগ করেন তাঁহারা বোধহয় এই প্রবন্ধ পাঠে একটু বিস্মিত ও বিচলিত হইবেন। তবে উদ্ভিদের মধ্যে মাংসাহারের প্রচলনহেতু সাত্ত্বিকাহারের ব্যাঘাত ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ সকল উদ্ভিদই মাংসাশী নহে এবং নিম্নবর্ণিত কীটভুক্ উদ্ভিদ্গুলি আজও মনুষ্যের খাদ্যশ্রেণীভুক্ত হয় নাই।

বোধহয় সকলেই অবগত আছেন যে যেমন জীবজন্তুর দেহপুষ্টিসাধনার্থ আহারের প্রয়োজন হয় তেমনি উদ্ভিদদেহপোষণের জন্যও উদ্ভিদসকলের খাদ্যের আবশ্যক হয়। উদ্ভিদজাতির মধ্যে যদিও রন্ধনের কোন সুব্যবস্থা নাই বা আহার্য্য প্রস্তুত করণানন্তর মুখগহ্বরে প্রেরণ করার কোন সুবন্দোবস্ত নাই তথাপি ইহারা খাদ্যোপকরণগুলি নানা উপায়ে সংগ্রহ করিয়া এবং সুপাচ্য অবস্থায় রূপান্তরিত করিয়া তদ্দ্বারা জীবনধারণ করে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায় যে কয়েকটী মৌলিক পদার্থের দ্বারা উদ্ভিদদেহ গঠিত হয় এবং উদ্ভিদদেহ পোষণের জন্যও এই কয়েকটী পদার্থ আবশ্যক। এই মৌলিক পদার্থগুলি সংখ্যায় ১১।১২টী হইবে; যথা—Carbon (অঙ্গারজান), Hydrogen (জলজান), Oxygen (অম্লজান), Nitrogen (যবক্ষারজান), Sulphur (গন্ধক), Phosphorus, Potassium, Calcium, Magnesium, Iron (লৌহ), Chlorine এবং Silicon। এই পদার্থগুলি উদ্ভিদ্ সকল স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে বায়ু বা মৃত্তিকা হইতে সংগ্রহ করে। এই পদার্থগুলি সতত মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে এবং উদ্ভিদ সকল যাহার যে পরিমাণে যে পদার্থ আবশ্যক তাহা দ্রব অবস্থায় জলের সহিত শিকড় দ্বারা মৃত্তিকা হইতে শোষণ করে। আবার বায়ু হইতেও অঙ্গারজান প্রচুর পরিমাণে ও সামান্য পরিমাণে জলজান, অম্লজান ও যবক্ষারজান গ্রহণ করে। সকল উদ্ভিদেরই আবার বায়ুস্থিত যবক্ষারজান (Nitrogen) সংগ্রহ করিবার শক্তি নাই। Leguminosæ শ্রেণীভুক্ত অড়হর, মটর, কলাই ইত্যাদি কয়েকটী উদ্ভিদের বায়ু হইতে যবক্ষারজান সংগ্রহ করার,

বিশেষ শক্তি আছে এবং তজ্জন্য বিশেষ উপায়ও আছে। এই জাতীয় উদ্ভিদ্ ব্যতীত অপর জাতীয় উদ্ভিদেরা শুদ্ধ মৃত্তিকা হইতে যবক্ষারজান সংগ্রহ করে। যবক্ষারজান উদ্ভিদের খাদ্যের একটী প্রধান অংশ এবং উদ্ভিদের ভূমিগৃহীত খাদ্যের মধ্যে ইহাকে শীর্ষস্থান দেওয়া যাইতে পারে। কীটভুক্ উদ্ভিদ্‌গুলি সাধারণতঃ জলাময় বা শৈবালাচ্ছাদিত জমীতে জন্মে এবং এরূপ মাটিতে পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ অভাব, যবক্ষারজান ত আদৌ মিলে না। উক্ত উদ্ভিদ্‌গুলি বায়ু হইতে কিছু কিছু খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ করে বটে কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি বায়ুস্থিত যবক্ষারজান ইহারা গ্রহণ করিতে পারে না। এই যবক্ষারজান সংগ্রহের জন্যই ইহাদিগকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয় এবং এই জন্যই ইহারা মাংসাহার করিয়া থাকে। মাংসাহারের অভাব ঘটিলে এই গাছগুলি শীঘ্রই নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি আক্রমণ করিবার ফাঁদ এক এক গাছে এক এক রকম, তবে সকল গাছেই রূপান্তরিত পত্রের দ্বারায় এই কার্য্য সম্পাদিত হয়।

Drosera (ড্রোসেরা বা নীহারিকা)*—কীটভুক্ উদ্ভিদের মধ্যে ইহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ ইহা পৃথিবীর অনেকস্থলেই পাওয়া যায়। এই গাছগুলি জলাভূমিতে বা শৈবালাচ্ছাদিত জমীতে জন্মে। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত হাজারিবাগের ঝিলের (artificial lake) ধারে এই উদ্ভিদ্ খুব দেখিতে পাওয়া যায়। গাছগুলি দেখিতে খুব ছোট প্রত্যেক



(১ম চিত্র) ড্রোসেরা।

গাছে ৫।৭টী পাতা থাকে। এই পাতার দ্বারায় কীট আক্রমণ ও ভক্ষণকার্য্য সংসাধিত হয়। ইহার শিকড় খুব ছোট এবং শিকড় দ্বারা জলশোষণ করে। পুষ্পিতাবস্থায় গাছের মধ্যভাগ হইতে একটী পুষ্পদণ্ড বহির্গত হয় এবং তাহাতে অনেক পুষ্প দেখা যায়।

প্রত্যেক পাতার উপরিভাগে সূক্ষ্ম সূত্রবৎ বা খুব সরু চুলের মত অসংখ্য শুঁয়া (tentacles) আছে। পাতার মধ্যভাগে যে সকল শুঁয়া

---

* আমাদের দেশে এই উদ্ভিদের কোন নামকরণ হয় নাই, এইজন্য পাশ্চাত্য নামের (Sundew) অবলম্বনে ইহাকে "নীহারিকা" আখ্যা দিলাম। এই Drosera জাতীয় অন্য একটি উদ্ভিদ্‌কে হিন্দিভাষায় "মুখ-জাল" বলে।

আছে তাহা খর্ব্বাকৃতি এবং একটু সবুজ রঙের এবং পাতার কিনারায় যেগুলি আছে সেগুলি ঈষৎ লম্বা ও একটু বেগুণে রঙের এবং এই শুঁয়াগুলি একটু বাহিরের দিকে হেলিয়া থাকে। প্রত্যেক শুঁয়ার (tentacle) শিরোভাগে একটী ডিম্বাকৃতি গ্রন্থি (gland) আছে। এই গ্রন্থি খুব সূক্ষ্ম, [illegible] ইঞ্চি লম্বা। এই গ্রন্থিগুলি হইতে এক প্রকার আটাযুক্ত তরল পদার্থ নির্গত হইয়া ইহাদিগকে সিক্ত ও বেষ্টিত করিয়া রাখে। এই তরল পদার্থবিন্দুবেষ্টিত গ্রন্থিগুলি ঠিক নীহার বিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং সূর্য্যরশ্মিপাতে উজ্জ্বল হইয়া চক্‌চক্ করে, এইজন্য ইহাকে পাশ্চাত্যভাষায় Sundew বলে।

এই গ্রন্থিগুলি খুব সহজেই উত্তেজিত হয় এবং অল্প উত্তেজনাতেই সাড়া দেয়। উপর্য্যুপরি ৩।৪ বার স্পর্শ করিলে বা কোন দ্রব্যের কণামাত্র কোন গ্রন্থির উপর স্থাপন করিলে ইহা উত্তেজিত হয় এবং উত্তেজনার ফলে সেই উত্তেজিত গ্রন্থিসংলগ্ন শুঁয়াটি নত হয় এবং তৎপ্রেরিত একটী শক্তিপ্রবাহ (motor impulse) অন্যান্য শুঁয়াগুলিতে পৌঁছাইয়া তাহারাও উত্তেজিত হইয়া উত্তেজক দ্রব্যের উপর নত হইয়া পড়ে। শুঁয়াগুলির সম্পূর্ণভাবে নত হইতে ১ঘণ্টা লাগে এবং স্থলবিশেষে ৪।৫ ঘণ্টাও লাগে। পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে যবক্ষারজানীয় (Nitrogenous) কোন দ্রব্যের দ্বারা উত্তেজিত হইলে শুঁয়াগুলি শীঘ্রই উত্তেজক দ্রব্যের উপর নত হইয়া পড়ে এবং ঐ নত অবস্থায় অনেকক্ষণ অবস্থান করে। কোন একটী গ্রন্থির উপর সামান্য একটু মাংসের কণা দিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐ গ্রন্থিসংলগ্ন শুঁয়াটী ১০ সেকেণ্ডের মধ্যে বক্র হইতে আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে নত হইয়া পড়ে। শুঁয়াগুলি একবার উত্তেজক দ্রব্যের উপর নত হইলে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপনান্তে পুনরুত্থান করে। শুঁয়াগুলিকে নত অবস্থায় ১ দিন, ২ দিন এবং স্থলবিশেষে ৭ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে দেখা যায়। এই সময়ের ন্যূনাধিক্য অনেকটা পাতার শক্তির ও বয়সের উপর এবং উত্তাপের (temperature) উপর নির্ভর করে।

এই গ্রন্থিগুলি এত সহজেই উত্তেজিত হয় (Sensitive) যে মহাত্মা ডারউইন একগাছি সরু কেশের সূক্ষ্মাগ্রভাগ হইতে দুইটী কণামাত্র লইয়া একটা পাতার দুইটী স্বতন্ত্র গ্রন্থির উপর স্থাপন করিয়া দেখিলেন যে এই গ্রন্থিসংলগ্ন শুঁয়া দুইটী ১ঘণ্টা ১০।মিনিটের মধ্যেই অনেকটা নত হইয়া পড়িল। এই কেশের একটী কণার ওজন [illegible] গ্রেণ এবং [illegible] ইঞ্চি লম্বা এবং অপর কণাটি [illegible] ইঞ্চি লম্বা ছিল। [illegible] ইঞ্চি লম্বা এবং [illegible] গ্রেণ ওজনের কোন দ্রব্যের কণা দ্বারাও গ্রন্থি উত্তেজিত হইতে পারে।

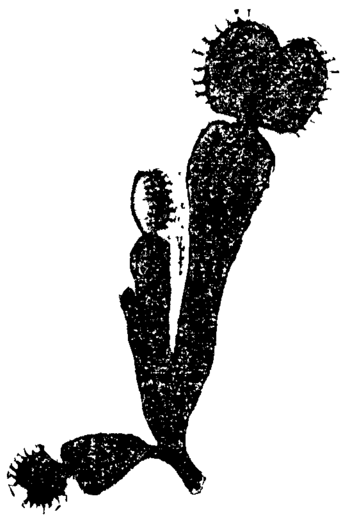
যে রসের দ্বারা গ্রন্থিগুলি সর্ব্বদা সিক্ত ও বেষ্টিত থাকে তাহা গ্রন্থি হইতেই নিঃসৃত হয়। এই রস খুব আটাযুক্ত এবং নাতিতরল। যখন গ্রন্থিগুলি কোন উত্তেজক দ্রব্যের দ্বারা উত্তেজিত হয় তখন উহা হইতে প্রভূত পরিমাণে এই রস নির্গত হইতে থাকে, এবং তখন এই রসে এক প্রকার acid বা অম্লরস দেখিতে পাওয়া যায়। এই অম্লরসের দ্বারা

পরিপাকক্রিয়া সংসাধিত হয়। যবক্ষারজাতীয় কোন দ্রব্যের দ্বারা গ্রন্থিগুলি উত্তেজিত হইলে এই রস খুব বেশী পরিমাণে নির্গত এবং অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। জীবজন্তুর পরিপাকক্রিয়া যে Gastric juice দ্বারা সাধিত হয় তাহাতে যেমন একটী acid (Hydrochloric acid) ও একটি ferment (Pepsin) আছে, তেমনি এই গ্রন্থি-নিঃসৃত রসেও একটী acid ও একটী ferment আছে এবং এতদ্বারা পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

শুঁয়াগুলি উত্তেজক দ্রব্যের উপর নত হইয়া কর্ত্তব্যকার্য্য সমাপনান্তে যখন পুনরুত্থান করে তখন গ্রন্থিগুলি শুষ্ক থাকে। ইহা হইতে রস নির্গত হয় না, ইহাতে প্রকারান্তরে গাছের উপকার সাধিত হয়। ভুক্তাবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বায়ু দ্বারা পরিস্কৃত হইয়া যায়, শুঁয়াগুলি সম্পূর্ণভাবে পূর্ব্বভাব ধারণ করিলে পুনরায় গ্রন্থি হইতে পূর্ব্ববৎ রস নির্গত হইতে থাকে।

এই পাতাগুলি দ্বারা কীট আক্রান্ত ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। গাছের কোনপ্রকার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়াই হউক বা আশ্রয়াশয়েই হউক যখন কোন ক্ষুদ্র কীট এই পাতার উপর বসে তখন সেই স্থানের গ্রন্থিনিঃসৃত আটাযুক্ত রসে আটকাইয়া যায়; এবং সেই গ্রন্থিগুলিও তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হইয়া অন্যান্য শুঁয়াগুলিতে একটী শক্তি প্রবাহ প্রেরণ করে। ফলে এই শুঁয়াগুলিও উত্তেজিত হইয়া ঐ কীটের উপর নত হইয়া পড়ে এবং গ্রন্থিগুলি হইতে প্রভূতপরিমাণে রস নির্গত হইতে থাকে। কীট এই রসসিক্ত হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। ডাক্তার নিৎকের (Dr Nitschke) মতে পত্রাসীন কীট ১৫ মিনিটের মধ্যেই রসে কণ্ঠনালী রোধ হইয়া প্রাণ হারায়। কখন কখন সমস্ত পাতাটি বক্র ভাবাপন্ন হইয়া একটী পেয়ালার (Cup) ন্যায় আকার ধারণ করে এবং এইরূপে একটি কৃত্রিম পাকাশয়ের সৃষ্টি হয়। গ্রন্থি হইতে রস খুব প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে এবং ইহাতে যে acid ও ferment আছে তদ্বারা পরিপাকক্রিয়া সাধিত হয়। কীট হইতে সারাংশটুকু এই গ্রন্থি দ্বারা শোষিত হইয়া উদ্ভিদ দেহের পুষ্টি সাধন করে।

Dionœa (ডাইওনিয়া)।—এই গাছও পাতার দ্বারা কীট আক্রমণ ও ভক্ষণ করে। এই পাতার বোঁটা প্রশস্ত এবং ইহার



(২য় চিত্র) ডাইওনিয়া।

মধ্যভাগস্থ শিরা দ্বারা পাতাটী দুই অংশে এইরূপভাবে বিভক্ত যে আবশ্যক হইলে একাংশ অপরার্দ্ধের উপর সহজেই নত হইতে পারে, এবং মধ্যস্থ শিরাটী কব্জার ন্যায় কাজ করে। পাতার পার্শ্ব হইতে অনেকগুলি সূঁচাল কাঁটা বাহির হইয়া থাকে। পাতার উপরিভাগ

অনেকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গ্রন্থিদ্বারা সমাবৃত। পাতার প্রত্যেক অর্দ্ধাংশে তিনটী শুঁয়া ত্রিকোণভাবে সংস্থিত। এই শুঁয়াগুলি সহজেই এবং শীঘ্রই উত্তেজিত হয়। কোন কীট এই পাতার উপর বসিয়া এই শুঁয়া স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ পাতার উভয় অংশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যায়। জাঁতিকলে ইঁদুর পড়িলে যেমন হয় সেইরূপে তাহা তৎক্ষণাৎ সজোরে বন্ধ হইয়া যায়। এইজন্য ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Venus' Fly-trap বলে। কীট এই পত্র মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পত্রের উভয় অংশের চাপে শীঘ্রই পিষ্ট হইয়া যায়। পত্রস্থ গ্রন্থিগুলি প্রথমে বেশ শুষ্ক থাকে কিন্তু শিকার মিলিলে এই গ্রন্থিগুলি হইতে প্রচুর পরিমাণে রস নির্গত হইতে থাকে. এবং তাহা দ্বারা এই কৃত্রিম পাকাশয়ে পরিপাকক্রিয়া সংসাধিত হয়।

Nepenthes বা কুম্ভমুখী গাছ।—



(৩য় চিত্র) কুম্ভমুখী।

এই উদ্ভিদে পত্র রূপান্তরিত হইয়া কুম্ভাকৃতি ধারণ করে। এই রূপান্তরিত পত্রের নিম্নভাগটী প্রশস্ত, তার পর লতাতন্তুর ন্যায় সরু হইয়া শিরোদেশে ঠিক কলসীর ন্যায় একটি পাত্র ধারণ করে। এই কুম্ভাকৃতি পাত্রের মুখে একটী আবরণ (lid) আছে এবং মুখটি সাধারণতঃ খোলা থাকে। এই পাত্রের আভ্যন্তরীণ গাত্রে অনেকগুলি সূক্ষ্ম গ্রন্থি আছে, তাহা হইতে নির্গত একপ্রকার জলীয় পদার্থে কুম্ভের প্রায় ১/৩ অংশ পূর্ণ থাকে। কলসীর আবরণে ও মুখে অনেকগুলি গ্রন্থি আছে, তাহা হইতে মধু ক্ষরিত হয়। কোন কীট মধুলোভে এই পাত্রে পড়িলেই সলিল-সমাধি প্রাপ্ত হয়। এই কুম্ভস্থ জলীয় পদার্থে যে acid ও ferment আছে তদ্বারা পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই উদ্ভিদ্গুলি "বিষকুম্ভ পয়োমুখ"। পাত্রের মুখে ও আবরণে মধুক্ষরিত হয় এবং তদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কোন কীট মধু আহরণে আসিলে পাত্রাভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থে নিপতিত হইয়া প্রাণ হারায়। এই "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" জাতীয় আরও নানা আকারের উদ্ভিদ্ আছে যথা Cephalotus, Sarracenia ইত্যাদি।



(৪র্থ চিত্র)

Sarracenia সারাসিনিয়ার পত্র রূপান্তরিত হইয়া ভিস্তির ন্যায় আকার ধারণ করে। এই ভিস্তির ন্যায় পাত্রের মুখ ও রঙ্গীণ আবরণ হইতে মধু ক্ষরিত হয়। এই মধু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কীট পাত্রাভ্যন্তরস্থ জলে পতিত

হইয়া মরিয়া যায়। কিন্তু এই পাত্রাভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থের পরিপাক করিবার শক্তি নাই। এই পাত্রে একসঙ্গে অনেকগুলি কীট দেখিতে পাওয়া যায়। পাত্রস্থ জলে পতিত হইয়া এই কীটগুলি শীঘ্রই পচিতে আরম্ভ করে। অনেক কীট ও পতঙ্গ আছে যাহারা এই গাছ ভক্ষণ করে এবং অনেক কীট এই পাত্রে ডিম্ব প্রসব করে এবং এই অণ্ডোদ্গত কীট পাত্রস্থ বিকৃত ও গলিত পদার্থ হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করে। সময়ে সময়ে পক্ষীরা চঞ্চুদ্বারা এই পাত্র দ্বিখণ্ডিত করিয়া অণ্ডোদ্গত কীটগুলি ভক্ষণ করে।

এই জাতীয় উদ্ভিদ্‌গুলি আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া দেশে পাওয়া যায়।

Utricularia বা Bladder-wort (ঝাঁজি) এগুলি প্রায়ই জলে ভাসিয়া থাকে। হাজারীবাগে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রত্যেক পাতা বহুভাগে বিভক্ত এবং এক একটী পাতায় অনেকগুলি থলি (bladder) আছে। এই থলি ⅛ ইঞ্চি লম্বা এবং প্রত্যেকের মুখে ৬।৭টা লম্বা শুঁয়া আছে। থলির মুখে একটি অন্তর্মুখীণ পাতলা স্বচ্ছ পর্দ্দা valve আছে এবং এই পর্দ্দা অনেকগুলি গ্রন্থি দ্বারা এবং থলির আভ্যন্তরীণ পাত্র অনেকগুলি সূক্ষ্ম শুঁয়ার দ্বারা সমাবৃত। ছোট ছোট জলের কীট এই পর্দ্দা ভিতরদিকে ঠেলিয়া সহজেই থলিয়ার ভিতর প্রবেশ করে। প্রবেশ করার পরই পর্দ্দা বন্ধ হইয়া যায়। এই থলিয়া হইতে কোন প্রকার রস নিঃসৃত হয় না। কীট এই থলিয়াতে প্রবেশ করিয়া পচিতে আরম্ভ করিলে তাহা হইতে এই গাছ কিছু কিছু রস শোষণ করে।



(৫ম চিত্র)
ঝাঁজি

কেবলমাত্র উদ্ভিদ বিষয়ে নহে, সকল বিষয়েই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া, কত বিচিত্র রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছেন, বিজ্ঞানের বলে বিজ্ঞানের লীলাভূমি জর্ম্মাণিতে সামান্য আলকাতরা হইতে নানা রকম রং, সুমিষ্ট শর্করা এবং এমন কি Tonone (টোনোন) নামে একপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। এই বিজ্ঞানের সহায়তায় জর্ম্মাণি কৃত্রিম নীল আবিষ্কার করিয়া ভারতের নীলের ব্যবসায়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রসাদে আজ সমগ্র সভ্যজগত সুখসমৃদ্ধি সম্পন্ন। বিজ্ঞানের কল্যাণেই আজ সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে জাপান সমুচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু ভারত যে তিমিরে সে তিমিরে। স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমি আজ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, দারিদ্র্যজর্জ্জরিত। তাই বলি ভারতবাসি! যদি দেশের কল্যাণ চাও তবে বিজ্ঞানের সেবা কর। বিজ্ঞানের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ ব্যতীত ভারতের লুপ্ত বিদ্যা সঞ্জীবিত হইবে না। বিজ্ঞানের সুপবন প্রবাহিত না হইলে দেশ হইতে দারিদ্র্য-কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইবে না।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র সিংহ, এম, এ।

চয়ন।

যবদ্বীপে—বুইতেন্‌জর্গ।

সোমবার, ৩রা ডিসেম্বর।

বাতাবিয়া হইতে বুইতেন্‌জর্গ পর্য্যন্ত এক ঘণ্টার রেল-পথ। বুইতেন্‌জর্গ—ওলন্দাজ-ভারতের বড়লাটের বাসস্থান, বিশেষতঃ একটি বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদ্ উদ্যানের জন্য ইহা বিখ্যাত। আজ সারা প্রাতঃকালটা এই চমৎকার উদ্যানটিতে ভ্রমণ করিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম—ইহার যে একটা বিশ্বব্যাপী খ্যাতি আছে, বাস্তবিকই ইহা সেই খ্যাতির যোগ্যপাত্র।

প্রথমতঃ ইহা বিজ্ঞানের একটি রত্ন-ভাণ্ডার। এখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় দশসহস্র উদ্ভিদ ও প্রত্যেক জাতীয় উদ্ভিদেব দুইটি করিয়া নমুনা আছে। বৃক্ষ ও চারা গাছগুলি অনাবৃত স্থানে সংরক্ষিত; ঢাকা কাচ গৃহের মধ্যে সুরক্ষিত চারাগাছগুলাকে যেরূপ সুচারু রূপে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়া থাকে, এই সকল গাছগুলাকেও সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। এক পরিবারের অন্তর্ভূত উদ্ভিদদিগকে একই স্থানে পুঞ্জীভূত করা হয়; প্রত্যেক চারাগাছের গায়ে উহার ক্রম-সংখ্যা লিখিত থাকে এবং একটা কাষ্ঠখণ্ডের উপর উহার নাম নির্দ্দেশ করা হয়।—উদ্যানের অন্য একভাগে এই বৈজ্ঞানিক উদ্যানের সহিত একটি পরীক্ষা-উদ্যান সংযোজিত। ব্যবহারোপযোগী প্রয়োজনীয় গাছের চারাগুলি কি নিয়মে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা, নূতন কোন চাষের ও নূতন কোন সারমাটির পরীক্ষা করা—ইহাই এই পরীক্ষা-উদ্যানের কাজ। আবার ইহার সংলগ্ন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার স্থাপিত হওয়ায় এই পরীক্ষা-উদ্যানটি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদ্-উদ্যানে দুইটি ব্যাপার একসঙ্গে অনুসৃত হয়;—একদিকে নিঃস্বার্থ জ্ঞানের অনুশীলন, আর একদিকে, জাতীয় সমৃদ্ধি সাধন করিবার জন্য, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি কৃষিকার্য্যে প্রয়োগ করা।

কলাসৌন্দর্য্যের হিসাবেও এই উদ্যানটি অতীব মনোরম। ইহার পরিবেষ্টনটি কবিত্বময়; উহার প্রত্যেক দিকে, দুইটা বৃহৎ পর্ব্বতের দৃশ্য। উদ্যানের মধ্য দিয়া একটা নদী বহিয়া গিয়াছে; আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী চারিদিক হইতে ইহার সহিত মিলিত হইয়া উদ্যানটিকে বিখণ্ডিত করিয়াছে। খরতাপ ও নিত্য বৃষ্টির প্রভাবে এখানে উদ্ভিজ্জের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য। বিশেষতঃ এখানকার লতাকুঞ্জ ও তালজাতীয় তরুপুঞ্জের সন্নিবেশে আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছি। লতাগুলি বড় বড় "ক্যানারী" গাছকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে;—আবার এই লতাগাছগুলাও পরগাছায় আচ্ছন্ন—সমস্ত মিলিয়া যেন উদ্ভিদের একএকটা বৃহৎ হরিৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয় বহুসংখ্যক তালগাছ।

একটা সরু তরু-পথ বাঁকিয়া গিয়াছে—Brazil দেশের মসৃণ কাণ্ডবিশিষ্ট তালতরুর ছায়ায় ছায়াময়;—তালপত্র সকল নীচের

দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে পথটির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। বড়লাটের প্রাসাদ, ধবল মর্ম্মর-প্রস্তরে গঠিত—উদ্ভিদ্ উদ্যানের একেবারে পার্শ্বদেশে অধিষ্ঠিত। উদ্যানের ঘোর শ্যামলতার মধ্যে প্রাসাদের শুভ্রতা যেন আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উদ্যানে অনেকক্ষণ বেড়াইয়া, তাহার পর বড়লাটের সেক্রেটারির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। এই উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ আমাকে খুব আদর অভ্যর্থনা করিলেন; 'জোক্‌জকর্ত্তা' ও 'সিয়াকর্ত্তা'—এই দুই দেশীয়-সুলতানের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার আমাকে প্রদান করিলেন এবং অনেকগুলি শাসনকর্ত্তার নামে পরিচয়-পত্রও দিলেন। বড়লাট বড় চাপা লোক; আমি তাঁহাদের জাভা-উপনিবেশ-রাজ্যের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায়, তিনি তাহার ঠিক উত্তর না দিয়া, বাজে কথায় কথা চাপা দিলেন। তিনি বলিলেন—বড় দুঃখের বিষয়, যে সকল ফরাসী, রাষ্ট্রনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অনুশীলন করিবার জন্য এদেশে আসেন, তাঁহারা ওলন্দাজিভাষা একেবারেই জানেন না।

মধ্যাহ্ণ ভোজনের পূর্ব্বে, হোটেলের স্বত্বাধিকারীগণের সহিত আমার বাক্যালাপ হইল। এই হোটেলের ফরাসী নাম "Hotel du chemin de fer"—অর্থাৎ রেলপথের হোটেল। মনে হয়, যে সকল ফরাসী পুরুষ ও রমণী এদেশে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে, তাহারা সকলেই নিজ নিজ কাজে বেশ সফলতা লাভ করিয়াছে। একটি ফরাসী রমণী (Samarang) সামারঙ্গের দর্জ্জি ও বেশবিন্যাস-শিল্পিদিগের মধ্যে একজন প্রধান বলিয়া পরিগণিত; এদেশে আসিবার সময় তিনি একটি ফরাসী সহকারিণীকে তাঁহার সঙ্গে আনিয়াছিলেন। "বুনো লোকদিগের সহিত একত্র বাস করিতে হইবে" এই মনে করিয়া তাঁহার সেই সহকারিণী একেবারে বিস্ময়বিহ্বল হইয়াছিল।—জাভার ফরাসীরা, না জানে ওলন্দাজি ভাষা, না জানে মালাই ভাষা। সৌভাগ্যের বিষয়, অধিকাংশ ওলন্দাজ ফরাসী ভাষায় কথা কহিতে পারে। তাহাতেই একরূপ কাজ চলিয়া যায়। ওলন্দাজের অধিকৃত জাভাদেশকে ফরাসীভাষার দেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অপরাহ্ণে, য়ুরোপীয় অঞ্চলটা পর্য্যটন করিলাম। বড় বড় গাছের মধ্যে বাড়ীগুলি অধিষ্ঠিত—মনে হয় যেন উদ্ভিদ্ উদ্যানটি আরও দীর্ঘাকৃতি হইয়া তাহারই মধ্যে বাড়ীগুলি প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। উদ্যানের দেশীয় মজুরদিগের গ্রাম দেখিতে গেলাম। খোঁটার উপরে স্থাপিত, চুনকাম-করা ছোট ছোট কতকগুলি কাঠের বাড়ী। চীনে অঞ্চলের মধ্য দিয়া গেলাম; ভয়ানক দুর্গন্ধ। চীনেরা আসিয়ার যে দেশেই থাকুক্, তাহাদের অঞ্চলটা দুর্গন্ধ না হইয়া যায় না। অপরাহ্ণের শেষভাগে, বৈজ্ঞানিক উদ্যানে আবার ফিরিয়া গেলাম। একটা ঝড়ের বাতাস উঠিল। ঝড়ে গাছগুলা দুলিতে লাগিল। তাহার মধ্য হইতে ভীষণ সোঁ সোঁ শব্দ হইতে লাগিল। তালগাছগুলা যেন কি-এক যাতনা ভরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহাদের এই আর্ত্তনাদ শুনিলে, হৃদয়ে কেমন একটা অহেতুকী মর্ম্মবেদনা

উপস্থিত হয়। প্রায় ৬টার সময়, সূর্য্যাস্ত-কালে, ঝড়টা যেন আরও নিকটবর্ত্তী হইল। গ্রীষ্মদেশীয় আকাশের অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা দেখিবার জন্য আমি একটু দাঁড়াইলাম। গগনের দূরপ্রান্তে, মৃদু গোলাপী রং হইতে তীব্র লাল রং - এবং এই দুই রংএর মাঝামাঝি যতপ্রকার আভা হইতে পারে তাহাদের যেমন সুন্দর সংমিশ্রণ হইয়াছে। ক্রমে সেই দূরপ্রান্ত হইতে কতকগুলা হলদে ও কালো দাগ—(অবশ্য মেঘের দ্বারাই রচিত) যদৃচ্ছাক্রমে প্রসারিত হইতে লাগিল। মনে হয় যেন, চিত্রপটের উপর চিত্রকর সযত্নে রং লেপন করিয়া, পরে তাঁহার ঠিক্ মনঃপূত না হওয়ায় বিরক্ত হইয়া ইতস্ততঃ তুলি বুলাইয়া মুছিয়া দিয়াছেন...আকাশের এই অপূর্ব্ব ভাবটি বোধ হয় আমি আর কখন দেখিতে পাইব না; তাই অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলাম। আকাশের এই ভাবটি অতীব বিরল ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই আমার এত ভাল লাগে। তাই, বিশ্বপ্রকৃতির এই শোভাটি আমার স্মৃতিমাঝে ধরিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি; কেননা, একটু পরেই ইহা চিরকালের মত অন্তর্হিত হইবে।

বাহ্যবস্তুর প্রতি মানবের কর্ত্তব্য কি?—না তাহাদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা, তাহাদের শোভা সৌন্দর্য্যের মর্ম্মগ্রহণ করা, তাহাদের ক্ষণস্থায়ী বিচিত্র সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চীন-কুসুম।

(কবি লি পো—অষ্টম শতাব্দী)

শান্ত রজনীতে।

নিশীথ শয়ন পরে
চেয়ে দেখি আমি চাঁদের কিরণ
রেখা টানিয়াছে রজত বরণ,
এমনি উজল, এমনি শীতল,
এমনি ক্ষণেকতরে,
যেন সে আমার স্বপনের তীরে,—
হিমানীর মত হাসে ধীরে ধীরে।
উপাধান হ'তে তুলি ল'য়ে শির
চাঁদটিরে দেখি আমি, !
শয্যাতে পুনঃ করিলে শয়ন,
ভরিয়া আমার সকল স্বপন,
অসীম তোমার রূপ-গরিমায়
ভাসি উঠ ওগো তুমি,
হে মোর জনমভূমি।

চন্দ্রালোকে।

অর্দ্ধচন্দ্রমার ওই স্তিমিত আভায়,
ক্ষীণ প্রতিধ্বনি কত খেলিতেছে দূরে,
নীরবে আসিছে ধীর শারদ সমীর।
আমার অন্তর গেছে তাতার সমরে,
তুষারে আবৃত যথা কানসুর শির,—
প্রিয়তমে পাশে মোর ফিরাইতে চায়।

শ্রীসন্তোষকুমার বসু

আত্মোৎসর্গ।

মানুষ একদিকে যেমন স্বার্থপর, পশু-প্রকৃতি, অপরদিকে তেমনি আত্মত্যাগী, দেব-প্রকৃতি। জগতের ইতিহাস ছত্রে ছত্রে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সকল দেশে সকল কালেই স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ মানবের মুক্ত আত্মা বিপন্নের উদ্ধারের জন্য, পীড়িতের পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম্ম বা সত্যের মাহাত্ম্য রক্ষার জন্য, স্বদেশ বা স্বজাতির স্বাধীনতার জন্য আপনার সর্ব্বস্ব দান করিতে, প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের কতকগুলিকেই আমরা জানি মাত্র, অনেকেই আমাদের নিকট অপরিচিত,—গ্রাম্য কাহিনীর একটি ছত্রে পর্য্যন্ত তাহারা স্থান পায় নাই।

এত' গেল অতীতের কথা। কিন্তু আমাদের এই বর্ত্তমান জীবনে আজিও জগতের কতদিকে কতলোক কত ভাবে হাস্যমুখে আপনার সর্ব্বস্ব দান করিতেছে, অযাচিত আত্মোৎসর্গ করিতেছে, তাহাদের সন্ধান পর্য্যন্ত আমরা জানি না। অন্যান্য বিষয় ছাড়িয়া কেবল বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলেও আমরা বর্ত্তমান জগতে যে সকল সুমহৎ স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ দেখিতে পাই, তাহার তুল্য দৃষ্টান্ত জগতের অতীত ইতিহাসেও বিরল। সত্যের জন্য, জ্ঞানের জন্য, মানবের দৈহিক দুঃখ নিবারণের জন্য যাঁহারা নীরবে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন ও অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত দান করিতেছেন, আজ এইরূপ কয়েকটি মহাত্মা পুরুষের বীরত্ব কাহিনীর উল্লেখ করিব।

পাশ্চাত্য জগতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত ঔষধের ফলাফল পরীক্ষার জন্য যে সকল চিকিৎসক অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের বৃত্তান্ত একখানি বৃহৎ পুস্তকেও ধরে কি না সন্দেহ; সম্প্রতি 'এক্স রে' পরীক্ষায় যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রাণদান করিয়াছেন তাহার সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে।

ব্রিটিশ বৈদ্যুতিক চিকিৎসা সমিতির সভাপতি ডাক্তার জন্ হল্ এড্ওয়ার্ডস্ 'এক্স রে' চিকিৎসা পদ্ধতির একজন প্রতিষ্ঠাতা। বহুদিন নানা প্রকারে মানবদেহে 'এক্স্ রে'র ক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া ১৯০০ সালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে আহত সৈনিকগণের উপর তাঁহার চিকিৎসার উপকারিতা লক্ষ্য করিবার জন্য তথায় গমন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাগমনের কিঞ্চিৎ পরেই তাঁহার দুই হস্তে উক্ত তাড়িৎ সংস্পর্শজনিত একরূপ নালী ঘা হয়। 'এক্স্ রে' ঘা নামেই এ রোগ বিদিত। যতদূর জানা যায় এ রোগের তুল্য নিষ্ঠুর যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি মানবের আর নাই। তাঁহার জীবন যে কিরূপ যন্ত্রণাময় হইবে তাহা জানিয়াও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হইতে বিরত হন নাই। পরে যখন রোগ বৃদ্ধি পাইল, তখন তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের আর কোন উপায়ই রহিল না।

১৯০৬ সালের 'ব্রিটিশ মেডিকাল জার্ণেল' নামক মাসিক পত্রে তিনি এইরূপ এক পত্র লেখেন;

"আমি গত দুই বৎসরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই। সময়ে সময়ে যন্ত্রণা এতই বিষম হইয়া উঠে যে আমি শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার কর্ম্মেই অশক্ত হইয়া পড়ি। শীতকালে আমি নিজে পরিচ্ছদ পরিধান করিতে পারি না এবং সে সময়ে আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করি তাহা প্রকাশের ভাষা নাই। দুইটি করপুটের পশ্চাতে প্রায় শতাধিক স্ফোটক হইয়াছে। প্রত্যেকটি হইতেই পুঁজরক্ত পড়িতেছে। আজ পর্য্যন্ত কোন ঔষধেই আমার লেশমাত্র উপকার হয় নাই। এ অসহ্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের কোন উপায়ই দেখি না মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণা এতই অধিক হইয়া উঠে যে চীৎকার করিয়া উঠিতে হয়।"

বহুদিন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগের পর তাঁহার বামহস্তটি কাটিয়া দেওয়া হয়। বীরহৃদয় সাধক হস্তটি হারাইবার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তাঁহার তাড়িৎ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার একমাত্র

জয়, যে সত্যের জন্য তিনি আপনার দেহ মন বিসর্জ্জন করিলেন, সেই কষ্টলব্ধ সত্যের বৃত্তান্ত লিখিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পাছে মৃত্যু হয়।

মিষ্টার ক্লারেন্স্ ড্যালি—আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ এডিসন্ সাহেবের পরীক্ষা মন্দিরের প্রধান সহকারী ছিলেন। ১৮৯৭ সালে তিনি কয়েক সপ্তাহ 'এক্স্ রে' লইয়া নানা প্রকার পরীক্ষা করেন। ফলে তাঁহার হাত দুইটীও ফোস্কায় পরিপূর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিল এবং মুখের ও মস্তকের সমস্ত কেশ খসিয়া পড়িল। প্রথমে যন্ত্রণা আসিয়া দেখা দেয় নাই, হাত দুইটি অসাড় হইয়াছিল মাত্র। দুই বৎসর পরে বাম হস্তে ঘা দেখা দিল। ক্রমে সেই ভীষণ রোগ দক্ষিণ হস্তটিকেও আক্রমণ করিল। প্রতিকারার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইল। পদযুগ হইতে প্রায় দেড় শত চর্ম্ম তুলিয়া হস্তে লাগান হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিছু দিন পরেই বামহস্তটি কাটিয়া দিতে হইল এবং আবার কিছুদিন পরে দক্ষিণ হস্তের চারিটি আঙ্গুল কাটিয়া দেওয়া হইল। অবশেষে দক্ষিণ হস্তটিও হারাইবার পর দুইটি কৃত্রিম হস্ত বসাইয়া দেওয়া হইল। ইহাতেও কিন্তু রোগের উপশম হইল না। সাত বৎসর মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অবশেষে ইনি ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

ফরাসী ডাক্তার এন্ রাভিগেও 'এক্স্ রে' পরীক্ষা করিতে যাইয়া দুই বৎসর উক্ত রোগে কষ্ট পাইয়া ১৯০৩ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি বলিয়া যান "মানব দেহের উপর তাড়িতের ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য যে আমি এ জীবনে অবসর লাভ করিয়াছিলাম, এইজন্য ঈশ্বরের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।"

'এক্স রে' পরীক্ষা করিতে যাইয়া আরও অনেক বৈজ্ঞানিক বীর এইরূপে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত ভবিষ্যতে এরূপ রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় উদ্ভাবিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে সকল মহাত্মা জীবের উপকারের জন্য এইরূপ অকাতরে অযাচিত আত্মদান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি অনন্তকাল ধরিয়া স্বার্থান্ধ মানবের ইতিহাসকে উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই।

এই ত' গেল বিজ্ঞানসাধকের কাহিনী। কিন্তু আর্ত্তের দুঃখ নিবারণ, পীড়িতের পরিত্রাণ জীবনের ব্রত করিয়া আমাদের চতুর্দ্দিকে যে সকল চিকিৎসা ব্যবসায়ী প্রফুল্লচিত্তে আত্মদান করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অঙ্গুলিগণ্য নহে। মৃতদেহ পরীক্ষার সময়ে অস্ত্রের সামান্য আঘাত হইতে রক্ত বিষাক্ত হইয়া প্রাণ বিয়োগ হওয়ার বৃত্তান্ত আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি। অনেক সময়ে যখন অন্য জীবের উপর পরীক্ষার দ্বারা বিষয় বিশেষের অভিজ্ঞতা লাভ অসম্ভব হয়, তখন চিকিৎসকগণ অকুণ্ঠিতচিত্তে আত্মদেহের উপর পরীক্ষা করিতেও লেশমাত্র ভীত হন না। তাঁহাদের মহত্ত্ব সাধারণের নিকট দুঃসাহস বা বাতুলতা বলিয়াই প্রতিভাত হয়। বায়ুর সহিত কি পরিমাণে অঙ্গারাম্ল বাষ্প মিশ্রিত থাকিলে মনুষ্যের প্রাণনাশক হয় এই তথ্যটি আবিষ্কার করিবার জন্য টিউরিন নগরের একজন চিকিৎসক (Signor Teodors Seribande) চতুর্দ্দিক বদ্ধ একটি লৌহগৃহের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে অঙ্গারাম্ল বাষ্প মিশ্রিত বায়ু রাখিয়া তিনবার তাহার মধ্যে প্রবেশ করেন। তৃতীয় পরীক্ষার পর তিনি জ্ঞানহীন ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অনেক চিকিৎসার পর তাঁহার সংজ্ঞা পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের চিকিৎসা-সমিতিতে ডাক্তার হেড (Dr. Head) অনুভূতি-স্নায়ু সম্বন্ধে এক নব তথ্য আবিষ্কার করিয়া সেই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। লেখক বলেন যে তিনি তাঁহার স্বীয় হস্তের অনুভূতি-স্নায়ুগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বিচ্ছিন্ন করিবামাত্র তাঁহার অনুভূতি শক্তি একেবারে লোপ পাইল। স্নায়ুগুলিকে সংযুক্ত করিয়া দিয়া তাহার ফলাফলও লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ফলে তিনি এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে মানবচর্ম্মে দুই শ্রেণীর

বিভিন্ন স্নায়ু আছে, এক একটি শ্রেণী বিভিন্ন প্রকৃতির অনুভূতি উৎপাদনে সহায়তা করে। প্রথম শ্রেণী যন্ত্রণা ও শীতত পের অনুভূতি দেয়; দ্বিতীয় শ্রেণী আমাদের স্পর্শের অনুভূতি দ্বারা অনুভূতির স্থান নির্দ্দেশে সক্ষম করে। চর্ম্মের আরোগ্যশক্তি প্রথম শ্রেণীর উপরই নির্ভর করে।

বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য, নূতন সত্য লাভের জন্য যাঁহারা অজ্ঞাত দেশে হিংস্র পশুসঙ্কুল গভীর অরণ্যে তপ্তবালুকাময় দুস্তর মরুভূমে, দুর্গম পর্ব্বতশিখরে বা অকূল সমুদ্রবক্ষে প্রবেশ করিতেছেন তাঁহাদের মাহাত্ম্য, আত্মত্যাগও অল্প নহে। বিখ্যাত য়্যাণ্ড্রী (Andree) যখন বেলুনে উঠিয়া উত্তরমেরু আবিষ্কারে অগ্রসর হন, সেই সময়ে তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "আচ্ছা ধর, বেলুনটা যদি পথিমধ্যে ফাটিয়া যায়, তাহা হইলে তোমাদের কি হইবে?" য়্যাণ্ড্রী সহাস্য মুখে উত্তর করিলেন "হয় ডুবিয়া না হয় চূর্ণ হইয়া মরিব।" বন্ধু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কতদিনে তোমাদের সংবাদ পাওয়া সম্ভব?" য়্যাণ্ড্রী উত্তর করিলেন "অন্ততঃ তিন মাসের পূর্ব্বে নহে। এক বৎসর বা দুই বৎসর পরেও পাইতে পার। আর যদি কখনও আমাদের কোন সংবাদ না পাও—তাহা হইলে অপর লোক আবার আমাদের এই পথ অনুসরণ করিবে এবং কেহ না কেহ এক দিন উত্তর মেরুর অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কার করিবে।"

আত্মত্যাগী মহাপুরুষের এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত য়্যাণ্ড্রীর কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই, সম্ভবতঃ তাঁহারা ডুবিয়া বা অস্থি চূর্ণ হইয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পরে কত লোক তাঁহার পথের অনুসরণ করিল। কত লোক কত কষ্ট পাইল, কত লোক প্রাণত্যাগ করিল। আজ পিয়ারি সাহেব অবশেষে উত্তরমেরু আবিষ্কার করিয়া এতগুলি মহামূল্য জীবনের বলিদান সার্থক করিয়াছেন।

মেরুদেশের অবস্থা যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। গ্রীনল্যাণ্ড অতিক্রম কালে পিয়ারি সাহেব তথাকার কষ্টের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার ঈষৎ উদ্ধৃত করিলেই সে দেশের অবস্থাটা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। পিয়ারি লিখিতেছেন,—"সে তুষার দেশে বায়ু এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির নহে। বায়ুর সহিত সর্ব্বদাই এক ফুট বা দুই ফুট ঘন বরফের স্রোত ভাসিতেছে। বরফের এই অনন্ত মরুভূমির মধ্যে যখন প্রবল ঝড় বহিতে থাকে তখন এই বরফস্রোত গর্জ্জন ও আস্ফালন করিতে করিতে ভূমি হইতে তিনশত ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া এক ভীষণ জলপ্রপাতের ন্যায় উন্মত্ত অন্ধ বেগে বহিতে থাকে। তাহার সম্মুখের যাবতীয় বস্তুই বরফের স্তূপের মধ্যে সমাহিত হইয়া যায়। সে ঝড়ের মধ্যে মনুষ্যের নিশ্বাস গ্রহণ পর্য্যন্ত অসম্ভব। প্রকৃতি নিতান্ত অনুকূল হইলেও জানু পর্য্যন্ত গভীর বরফের স্রোত ঠেলিয়া প্রত্যেক পদ অগ্রসর হইতে হয়।"

১৯০২ সালে ওয়ালেস্ ও হাব্বার্ড সাহেব ল্যাব্রেডরের বিরাট মরুপ্রদেশ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করেন। পথে সাহায্য ফুরাইয়া গেল, বন্যপশুও বিরল। কষ্টের আর অবধি রহিল না। অনাহারে তাঁহারা অস্থিসার হইয়া পড়িলেন এবং কঙ্কালাবশিষ্ট দেহে উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হাব্বার্ড সাহেব এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। নিরুপায় দেখিয়া পথিমধ্যে তাঁহাকে কম্বল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া ওয়ালিস আহারের অন্বেষণে অগ্রসর হইলেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন হাব্বার্ডের প্রাণশূন্য দেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

পেলি (Mont Pellie) নামক আগ্নেয়গিরির উদ্গারের পর জি, সি কার্টিস (G. C. Cartis) নামে একজন সত্যসন্ধিৎসু তাহার সেই জ্বলন্ত গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করেন। পেলির আগ্নেয় উদ্গার তখনও বন্ধ হয় নাই। কুয়াসা, বৃষ্টি, বাষ্প ও ধূলিতে বায়ু এতই আচ্ছন্ন যে ভিতরে কয়েক হস্ত দূরে আর কিছুই দেখা যায় না। গন্ধকের ধূমে চতুর্দ্দিক এমনই আচ্ছন্ন যে নিশ্বাসগ্রহণ একপ্রকার অসম্ভব। সম্মুখের গহ্বর হইতে কামানের বজ্রধ্বনির ন্যায় ধ্বংসের ধ্বনি উঠিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে ভগ্ন পর্ব্বতের বিরাট খণ্ড

তাঁহার গাত্রপার্শ্বে আসিয়া পড়িতেছে। আগ্নেয় উদ্গারের উত্তাপে তাঁহার দেহ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইতে লাগিল। পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে অবতরণ কালে সহসা শৃঙ্গের মুখ হইতে কৃষ্ণবর্ণ তরল মৃত্তিকা স্রোত উত্থিত হইয়া পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া প্রবলবেগে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কার্টিস ও তাঁহার সঙ্গীদের ঠিক সম্মুখ দিয়া তাহা বেগে নামিয়া গেল। সম্মুখে যাহা কিছু পড়িল তৃণের ন্যায় তাহাতে ভাসিয়া গেল। তাহার ভীষণ গর্জ্জনধ্বনিতে সকলে বধির হইয়া পড়িলেন। আর দুই হাত নিকট দিয়া যাইলেই তাঁহারা সকলেই কোথায় ভাসিয়া যাইতেন তাহার ঠিক নাই।

পাশ্চাত্যজগতে এরূপ দুঃখ ও মৃত্যু বরণের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমরা গুটিকয়েকের উল্লেখ করিলাম মাত্র। আমাদের দেশের যুবকগণের মধ্যে স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগের প্রবৃত্তির অভাব নাই সত্য, কিন্তু তাহা উক্তরূপে বিশ্বের মঙ্গলপথে নিয়োজিত হইলে, তাহাদের জীবন ধন্য হয়, আর জননী, জন্মভূমিরও গৌরব বৃদ্ধি হয়। সত্যের জন্য, জ্ঞানের জন্য, পরোপকারের জন্য যে দিন দেশের লোক কষ্টসহিষ্ণু হইতে ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে শিখিবে, সেই দিনই ভারতের মুখ যথার্থ উজ্জ্বল হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

তান্‌কা।

['তান্‌কা' জাপানী সনেট। ইহা পাঁচ পংক্তিতে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে পাঁচটি করিয়া এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চরণে সাতটি করিয়া অক্ষর থাকে। তান্‌কা সাধারণতঃ অমিত্রাক্ষর হয়।]

(১)

ফাগুন এ ঠিক্,
গগনে আলো না ধরে ;
প্রসন্ন দিক,
তবু কেন ফুল ঝরে ?
ভাবি আর আঁখি ভরে। —কিনো।

(২)

ঝিঁঝিঁ ডাকা শীত !
একা জাগি বিছানায়,
কাঁপিতেছে হৃৎ,
কাছে কেহ নাহি, হায় ;
ধরণী তুষারে ছায়। —গোকু।

(৩)

দুঃখে কাঁদিনে,
নিয়তির পদে নমি,
ভয় শুধু মনে
শপথ ভেঙেছ তুমি ;
দেবতা কি যাবে ক্ষমি ? —শ্রীমতী উকন।

(৪)

মুগ্ধ প্রভাত,
শিশির ঝলকে ঘাসে ;
শরতের বাত
উদ্দাম ওই আসে,
সোনার স্বপন নাশে। —আসাযাসু।

(৫)

চপল সে ঠিক
দমকা হাওয়ার মত ;
জানি, তার কথা
ভুলিলেই ভাল হ'ত ;—
ব্যর্থ যতন যত। —শ্রীমতী দৈনী-নো-সাম্মি।

(৬)

যামিনী ফুরালে
প্রভাত আসিবে, জানি ;
সূর্য্য জাগালে,
তবু বিরক্তি মানি ;—
তোমারে বক্ষে টানি। —মিচি-নাবু-ফুজিবারা।

(৭)

রাগ কর না গো
জল দেখি' নয়নেতে ;—
বঁধু গেছে মোর
সুনাম বসেছে যেতে ;
মন বাঁধি কোন্ মতে ! —শ্রীমতী সাগামি।

(৮)

তার ব্যবহার
বুঝিতে পারি না আর ;
প্রভাত বেলায়
জটা বেঁধে গেছে, হায়,
চুলে আর চিন্তায়। শ্রীমতী হোরিকার।

প্রাচীন মুর্শিদাবাদ কাহিনী।

(১)

(এইচ্, এস্, সাহ্‌রাওয়ার্দ্দি)

পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা ভিন্ন বঙ্গে এমন কোন নগর নাই যাহা ঐতিহাসিক সম্পদে মুর্শিদাবাদের সমতুল্য। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ যখন সর্ব্বপ্রথম বঙ্গ জয় করেন, তখন হইতেই মুর্শিদাবাদ ইতিহাসের পত্রে আপন নাম অঙ্কিত করিয়াছে। তখন বঙ্গের রাজা লক্ষ্মণ সেন লক্ষ্মণাবতী বা বর্ত্তমান গৌড় হইতে নবদ্বীপে নূতন রাজধানী স্থাপিত করিয়াছেন। রাজ সভায় জ্যোতির্ব্বিদগণ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে হিন্দুরাজত্ব ধ্বংস হইবে এবং আজানুলম্বিত বাহু কোনও এক ব্যক্তি রাজপরিবারের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। নূতন আক্রমণকারীগণের শ্রেষ্ঠ রণ কৌশলের বলে উত্তর ভারতের হিন্দু রাজত্বগুলি একে একে সকলেই বিজয়ী শক্তির অধীন হইয়াছে। বিজিত হিন্দুরাজগণ সকলেই বঙ্গরাজের প্রবল হিন্দু-গৌরব রক্ষার জন্য নির্ভর করিতেছিলেন। বঙ্গ-রাজের পক্ষে স্বাধীনতা রক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, কারণ প্রথমতঃ বঙ্গদেশ চিরদিনই ধনধান্যে পরিপূর্ণ, দ্বিতীয়তঃ বঙ্গদেশের ন্যায় লোকসংখ্যা ভারতের অন্য কোনও রাজ্যমধ্যেই ছিল না। সুতরাং সকলেই আশা করিয়াছিলেন বল্লালের বংশই তাঁহাদের মুখোজ্জ্বল করিবে। কিন্তু বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজা যোদ্ধ্‌পদবাচ্যই ছিলেন না। দুর্ব্বল প্রকৃতি, ভীরুস্বভাব, বিলাস মগ্ন এবং কল্পনাপ্রিয় লক্ষ্মণ সেন অভিজ্ঞ ও কষ্টসহিষ্ণু মুসলমান সেনাপতির সমকক্ষ হইতে পারিলেন না। দিল্লীর নবাবের দ্বারা বঙ্গাধিকারে প্রেরিত বীর বক্তিয়ার খিলুজি যখন নবদ্বীপের নগরপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, লক্ষ্মণসেন নৈশ অন্ধকারের আবরণে একাকী রাজধানী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। বঙ্গের ক্ষত্রিয় সৈনিকগণ বিদেশী ম্লেচ্ছ আক্রমণকারীগণকে বিদূরিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু নৃপতির পলায়নে তাহারা হীনতেজ হইয়া পড়িল এবং বিনাযুদ্ধে বক্তিয়ার নবদ্বীপের রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই দিন হইতে বঙ্গদেশ দিল্লীসাম্রাজ্যের একটী বিরাট বহুমূল্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হইল এবং ইস্লাম খাঁ স্থাপিত ঢাকা নগরে বঙ্গের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে 'আকবর নামা'তেই মুর্শিদাবাদের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ইহার নাম ছিল মাকুস্দাবাদ। কেহ কেহ বলেন উক্ত নগরটি আকবর সাহই স্থাপিত করেন এবং বঙ্গের শাসন-কর্ত্তার ভ্রাতা মাকুস্দ্ আলির্খাঁর নামে ইহার নামকরণ হয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদের যথার্থ ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে, যখন মুর্শিদ কুলি খাঁ ঢাকা হইতে বঙ্গের রাজধানী এইখানে পরিবর্ত্তিত করেন। ইঁহারই নামানুসারে রাজধানীর নাম মুর্শিদাবাদ হয়। পূর্ব্বে মুর্শিদ কুলি খাঁর নাম মহম্মদ হাদি ছিল। তিনি একজন ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন, তাঁহার পিতা অল্পবয়সে ক্রীতদাস রূপে পারস্যে গমন করেন। তথায় তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। যে অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভার বলে তিনি সামান্য অবস্থা হইতে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজ্যের শাসনকর্ত্তা পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বাভাস তাঁহার বাল্য জীবনেই প্রকাশ পাইয়াছিল। কিছুকালের জন্য তিনি হায়দ্রাবাদে রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত ছিলেন। অবশেষে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ঔরাংজেব্ শাহার তাঁহাকে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ উপাধি দান করিয়া বঙ্গের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করিলেন। মুর্শিদ নাজিম

দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়াই ঢাকা হইতে রাজধানী মাকসুদাবাদে স্থানান্তরিত করিয়া আপন নামানুসারে রাজধানীর নাম মুর্শিদাবাদ রাখিলেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গে ডাকাতি ও যথেচ্ছ অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। মুর্শিদ দেশের জমিদারগণকে তাহাদের জমিদারীর সকল অপরাধের জন্যই দায়ী করিয়া দেশে এরূপ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত করিলেন যে, ১৭১৮ সালে দিল্লীশ্বর তাঁহাকে বঙ্গ ও উড়িষ্যার সহিত বিহার প্রদেশেরও শাসনভার অর্পণ করিলেন। সেই দিন হইতে বঙ্গচ্ছেদ পর্য্যন্ত এই তিনটি প্রদেশ একই রাজ্যভুক্ত বলিয়া গণ্য ছিল। এই তিনটি প্রদেশকে একত্র শাসন করিবার জন্যই যে মুর্শিদ কুলি খাঁর রাজত্বকাল ইতিহাসে প্রসিদ্ধ তাহা নহে, মুসলমান শাসনকর্তৃগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কাটোয়া এবং মুর্শিদগঞ্জে প্রহরী স্থাপিত করিয়া ও জমিদারদিগের বাণিজ্য-প্রভুত্ব খর্ব্ব করিয়া দেশের ভূস্বামীগণের যথেচ্ছ শক্তিকে নষ্ট করেন। স্বধর্ম্মত্যাগীর নবগৃহীত ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ অতিরিক্ত অযৌক্তিক অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়, মুর্শিদ কুলিখাঁরও সেইরূপ মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ পাইত। হিন্দুগণকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার অধিকাংশ সময়ই ব্যয়িত হইত এবং এ চেষ্টায় তিনি নিরীহ প্রজার প্রতি অনেক নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ইহা সত্বেও ন্যায়প্রিয়তার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। সপ্তাহে দুই দিন করিয়া তিনি প্রজাগণের অভিযোগ ও আবেদন শ্রবণ করিতেন এবং অপক্ষপাত বিচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার একজন জীবনী-লেখক লিখিয়াছেন "তাঁহার বিচারনীতি এতই বিশুদ্ধ ছিল এবং আইনের দণ্ডমর্য্যাদা রক্ষার প্রতি এতই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যে তিনি আইন ভঙ্গের জন্য তাঁহার পুত্রকে পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই।" তাঁহার রাজস্ব সংগ্রহের সুব্যবস্থার ফলে তিনি বৎসরান্তে আপন ব্যয় বাদে দেড় কোটী মুদ্রা রাজস্ব সম্রাটসমীপে প্রেরণ করিতেন। অনেকে মুর্শিদকুলিকে আত্মীয়পোষণপরতার অপবাদ দিয়া থাকেন। কিন্তু সকল দেশেই সকল কালে শক্তিশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে এই দোষটি এত প্রবল দেখা যায় যে এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার জন্য তিনি আমাদের ক্ষমার্হ। তিনি তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দৌলাকে উড়িষ্যার সহকারী নবাবপদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার দৌহিত্রীর স্বামীকেও তিনি ঐ পদে ঢাকায় নিযুক্ত করেন। মুর্শিদকুলি অধিক দিন রাজত্ব করেন নাই। তাঁহার জীবনের শেষ সময় উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া, তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে নিকটে ডাকাইলেন এবং সচিববর্গকে ঈশ্বরসাক্ষী করিয়া শপথ করাইলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহারা রাজকুমারকেই তদীয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদের মৃত্যু হয়।

মুর্শিদাবাদ নগর যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার এক পথিপার্শ্বে 'ক্ষেত্র মসজিদ' নামে একটি ভগ্ন মসজিদ্ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। মুর্শিদাবাদ মসনদের স্থাপয়িতার শবদেহ ইহারই গর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে এই অট্টালিকাটি দ্বিতল ছিল। ইহার মধ্যে কোরাণ পাঠের জন্য ৭০টী কামরা ছিল। মুসলমান বিশ্বাসানুসারে ৭০ জন ব্যক্তি মুর্শিদের আত্মার উদ্ধারের নিমিত্ত এই স্থলে নিত্য কোরাণ পাঠ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। গত ৯৭ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে এই অট্টালিকাটি ভূমিসাৎ হইয়াছে। কেবলমাত্র মুর্শিদের সমাধি গুম্বুটীই অটুটভাবে আজিও দাঁড়াইয়া আছে। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ যে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া ভগ্নদশায় পড়িয়া আছে। এই প্রাসাদ মধ্যেই ক্লাইভ্ ও তাঁহার সহকারীগণ সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন অপহরণের মন্ত্রণা স্থির করিয়াছিলেন। আজিও তথায় 'যাহান কোষ' বা পৃথিবীর ধ্বংসকারী নামে মুর্শিদের প্রসিদ্ধ তোপটী কুসংস্কারাপন্ন জনতার দ্বারা প্রতি বৃহস্পতিবারে ভক্তিভরে পূজিত হইয়া থাকে। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকার কর্ম্মকারগণ এই তোপটী নির্ম্মাণ করেন।

মৃত্যুশয্যায় মুর্শিদ তাঁহার সচিববর্গকে যে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনান্তে তাহার কোনও ফলোদয়ই হয় নাই। তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দৌলা আপন পুত্রের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন। উড়িষ্যা হইতে বিরাটবাহিনী লইয়া রাজধানীর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন, এবং পুত্রকে পরাস্ত করিয়া মুর্শিদাবাদের তোরণদ্বারে আপন বিজয় পতাকা উড্ডীন করিলেন। সুজাউদ্দৌলা ঢাকা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ যখন হায়দ্রাবাদের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত থাকেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত সুজার আলাপ হয়। সুজা সিংহাসন লাভ করিয়া ডাকাইতি ও অন্যান্য অত্যাচার অপরাধে অবরুদ্ধ জমিদারগণকে মুক্তিদান করেন। তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষ রাজত্বকালে তিনি বঙ্গের অনেকগুলি খণ্ডরাজ্য অধিকার করেন; ত্রিপুরারাজ্য তাহার মধ্যে একটি। তাঁহার বিজয়ী সেনা কুচবিহারের সীমান্তদেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয়। কুচবিহার পরাজয় স্বীকার করে নাই। সুজার রাজত্বকালে হাজি আমেদ, আলিবর্দ্দী খাঁ ও ইতিহাসখ্যাত জগৎ শেঠ, এই তিন জন তাঁহার প্রধান সচিব ছিলেন। ইঁহাদের পরামর্শ ফলেই দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছিল। মুর্শিদের ন্যায় সুজাও অপক্ষপাত ও ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার রহস্যপ্রিয়তা ও বিলাস-প্রাচুর্য্যের কাহিনী আজিও বৃদ্ধদিগের অতীত কথার মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদকে নানাভাবে অলঙ্কৃত করিয়া ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে সুজা ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

সুজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফ্রাজ খাঁ মুর্শিদাবাদের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি স্বভাবত দুর্ব্বল প্রকৃতি, চঞ্চল হৃদয়, অবিবেচক ও ভীরু স্বভাব ছিলেন। তাঁহার দুর্ব্বলতার ফলে তিনি তাঁহার পিতৃ-বন্ধু হাজি-আমেদ ও জগৎশেঠকে তাঁহার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করিয়া তুলেন। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইনি ধূর্ত্ত ও কৌশলী আলিবর্দ্দীকে বিহারের সহকারী নবাব পদে নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যেই আলিবর্দ্দী গোপনে মুর্শিদাবাদ আক্রমণের আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্যমধ্যে তিনি একদল যুদ্ধব্যবসায়ী আফগানকে নিযুক্ত করেন। তাহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাদিগের সাময়িক প্রভুর জন্য অকারণ রক্তপাত করিতেও বিমুখ হইত না। কিন্তু আলিবর্দ্দী কেবলমাত্র তাঁহার এই সৈন্যবলের উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহার কূটবুদ্ধি এবং সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার জয়লাভের প্রধান সহায় হইল। তাঁহার কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি মুর্শিদাবাদে ও দিল্লীতে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাঁহার আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে তিনি বঙ্গরাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সরফ্রাজ খাঁ স্বভাবতঃ অলসপ্রকৃতি ও বিলাসপ্রিয় হইলেও বিপৎকালে তিনি উদ্যম ও বীরত্ব প্রকাশে সক্ষম ছিলেন। আলির সহিত যুদ্ধে তিনি সিংহের ন্যায় প্রবল পরাক্রমে সংগ্রাম করিলেন। তাঁহার বীরত্ব প্রভাবে রাজপক্ষীয় সৈন্যগণ অমিত তেজে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। বীর নৃপতির নেতৃত্বে প্রাণপাত করিবার সুযোগ লাভের জন্য সৈনিকমাত্রেই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। নবাবের সৌভাগ্যলক্ষ্মী বিমুখ না হইলে সেদিন সেই রণক্ষেত্রে আলিবর্দ্দীর সর্ব্বনাশ সাধিত হইত সন্দেহ নাই। যুদ্ধের মধ্যাবস্থায় তিনি সংবাদ পাইলেন যে বিশ্বাসঘাতক রাজভৃত্যগণ বারুদের পরিবর্ত্তে ইষ্টক আনিয়া শিবিরমধ্যে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া নবাব এণ্টনি ফিরিঙ্গীর পুত্র পাঁচু ফিরিঙ্গীকে তাঁহার সেনাপতি পদে নিয়োজিত করিতে বাধ্য হইলেন। এণ্টনি একজন পর্টুগীজ চিকিৎসক ছিলেন। নূতন সেনাপতি অসীম সাহসে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকের দুর্দ্দমনীয় শত্রুস্রোতকে রোধ করিতে পারিলেন না। বীরবর শত্রুসংহার করিতে করিতে রণক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিলেন। ঘেরিয়ার ভীষণ যুদ্ধে নবাব এক বন্দুকের গুলিতে মর্ম্মান্তিকরূপে আহত হইলেন। এই আঘাতেই উভয়ের মধ্যে যুদ্ধকলের নিষ্পত্তি হইল। তাঁহার জামাতা কজলকর মহম্মদ খাঁ কয়েক দিন পরে নূতন সৈন্য লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু

তৎপূর্ব্বেই সব ফুরাইয়াছে। ইতিমধ্যেই আলিবর্দ্দী বিজয় গর্ব্বে রাজধানী প্রবেশ করিয়া নগদ অর্থ সত্তর লক্ষ এবং মণি মুক্তা অলঙ্কারে পঞ্চাশ ক্রোড় মুদ্রা আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং নবাব হাসামৎ উদ্দৌলা আলিবর্দ্দী খাঁ মহাবৎ জঙ্গ এই বিরাট উপাধি লইয়া বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার রাজমুকুট পরিধান করিয়াছেন। যে ঘেরিয়ার রণক্ষেত্রে আলিবর্দ্দী বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করেন, তেইশ বৎসর পরে সেই ঘেরিয়ার রণক্ষেত্রেই ইংরাজের নিকট মীরকাশিম পরাজিত হন, এবং ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বীজ রোপিত হয়। [ক্রমশঃ

বন্দী। ধারাবাহিক উপন্যাস।

৩

মৃত্যু! কিন্তু কি তাহাতে ক্ষতি! মানুষ চিরদিন বাঁচে না! একদিন ত, তাকে মরিতেই হইবে। সে দিন ও ক্ষণটুকু তার নির্দ্দিষ্ট নাই, এই প্রভেদ! তবে, কেন আমি মিছা ভাবিয়া মরি!

যেদিন বিচারে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়া গেল, সেদিন হইতে আজিকার মধ্যে ত কতলোক প্রাণ দিয়াছে! আমার ফাঁসি দেখিবার জন্য কত লোক আকুল হইয়া বসিয়াছিল, কেহ-বা আজ আর ইহলোকে নাই! আরো কত লোক, ইতিমধ্যে, আমার পূর্ব্বে, ইহলোক ত্যাগ করিবে! তবে আমারি বা, এ জীবনের প্রতি এত মায়া, কেন?

আলোক ও বায়ুহীন এই রুদ্ধ কারাগৃহ, কদর্য্য অন্ন, নিঃসঙ্গ জীবন—লাঞ্ছনার বিষে জরজর শিক্ষাগর্ব্বিত হৃদয়, অসভ্য রুক্ষ প্রহরী—ইহাদের মধ্যে বাঁচিয়া কি সুখ! জগতে আমার জন্য, আজ করুণার একবিন্দু অশ্রুও সম্বল নাই! আজ আমি রিক্ত! পাথেয় হারাইয়া বসিয়াছি! কিভীষণ, এখন এ জীবনের ভার বহিয়া বেড়ানো!

৪

কালো রঙের বদ্ধ গাড়ী আমাকে আমার কারাগৃহে পৌছাইয়া দিল।

পূর্ব্বে দূর হইতে বাড়ীটাকে মন্দ দেখিতাম না! কতবার তাহারি সম্মুখে, উন্মুক্ত প্রান্তরে বসিয়া গান গাহিয়াছি, গল্প করিয়াছি! কিশোর-জীবনের সে প্রাণ-ভরা উল্লাস, মন ভরা স্ফূর্ত্তি লইয়া, ইহারি সম্মুখে, চন্দ্রালোকে বসিয়া কত ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনা করিয়াছি! রাজার প্রাসাদের মত সুদৃশ্য গৃহ! পাশ দিয়া ছোট নদীটি খরস্রোতে বহিয়া গিয়াছে! এমন সুন্দর ছবির মত বাড়ীখানি! কিন্তু আজ পাপের পূতিগন্ধে যেন প্রাণের স্পন্দন চকিতে থামিয়া যাইতেছে!

আমার ঘর? জানালা নাই, সার্শি নাই, শুধু কতক গুলা লৌহগরাদ, বিরাট লৌহকবাট, আর চারিধারে পাষাণ প্রাচীর! তার কোনখানে স্নেহের এতটুকু চিহ্নও নাই! এই গরাদের মধ্য দিয়া পশুশালায় পশুর মত, উন্মাদমূর্ত্তি অপরাধীর দলকে বাহির হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়!

৫

সেই পাষাণ প্রাচীর নিমেষে যেন তার কঠিন আলিঙ্গনে আমাকে চাপিয়া ধরিল। প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি সতর্কতর হইল! কোন ক্লেশ, কোন অসুবিধা যেন না হয়! খুব সাবধানে, এখন এ অমূল্য জীবনটাকে রক্ষা

করিতে হইবে—আপনা হইতেই যেন না বাহির হইয়া যায়! খুব সাবধান! যেন আত্ম-হত্যা না করিয়া বসি!

এমনি রাজার যোগ্য আদরে, ছয়-সাত সপ্তাহ আমাকে বাঁচিতে হইবে! তার পর, আমার এই দেহখানা, ফাঁসিকাঠে চড়াইবার জন্য দেবতার অর্ঘ্যের মত, সযত্নে, ইহারা জল্লাদের হাতে তুলিয়া দিবে!

প্রথম দু-একদিন, কি সে করুণা! মৃত্যুর অনলে ফেলিবার পূর্ব্বে শীতল স্নেহের অমৃত-সিঞ্চন! ক্রমে ইহা সহিয়া আসিতেছিল! কিন্তু তাহার পর সেই পরিচিত ও পরিমিত ব্যবহার! আর মাঝে মাঝে বিদ্রূপের স্নিগ্ধধারা!

আমার বয়স, শিক্ষা, সংসর্গ ও চেহারাব কিছু কাজ হইল! লেখাপড়া করিবাব অনুমতি পাইলাম। সকাল-সন্ধ্যা ভগবানকে ডাকিবার অনুমতিও মিলিল! পরে প্রহরীবেষ্টিত হইয়া মুক্ত বাতাসে একটু পরিক্রমণ! আরো দু-একজন হতভাগ্য বন্দীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পাইলাম! তারা ইহারি মধ্যে, বেশ সুখ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আরামে আছে! তাদের অপরাধ কি, জিজ্ঞাসা করিলাম; কেহ বলিল,—কি সে অভদ্র, কুৎসিৎ ভাষা—বলিল, চুরি, কেহ-বা, প্রবঞ্চনা—কেহ বা আর-কিছু। কাজগুলা যেন, কত গর্ব্বের! আশ্চর্য্য, ইহাদিগের ধারণা! অদ্ভুত. ইহাদিগের সান্ত্বনাব রীতি!

তবু ইহারা আমার দুঃখে সহানুভূতি জানাইত। ইহারাই আজ আমার একমাত্র সঙ্গী, বন্ধু! একদিন ইহাদিগকে কি ঘৃণা করিতাম! আর, আজ, ইহাদিগের সহিত কথা কহিয়াই বাঁচিয়া আছি! নহিলে ত উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু ইহারা কি যথার্থই 'মনুষ্য' নামের যোগ্য! আহা, নিতান্তই হতভাগ্য! যে সাধু তার স্তবগান রচনা করিয়া ধন্য হইতে কে না চায়? যে ধনী, যে ভাগ্যবান, তার একটী প্রসাদবাণী-লাভের জন্য, কে না কাতর? কিন্তু এই সকল ঘৃণ্য, হতভাগ্য জীবকে মানুষ বলিয়া, ভাই বলিয়া যে বুকে টানে, জানিনা, সে কেমন! কোথায় তার স্থান! কি উদার তার হৃদয়!

আর ঐ ত প্রহরীগুলা—তারাও সহানুভূতি দেখাইতে আসিত, কিন্তু সে যেন পরিহাস! আজ দুর্দ্দশায় পড়িয়া প্রথম, মানুষ চিনিলাম! ইহারা ত আমার সহিত কথা কহিতে, আমার দুঃখে সহানুভূতি জানাইতে কুণ্ঠিত নহে, তাহাতে এতটুকু ঘৃণা বোধ করে না—আমার মধ্যে এমন কোন অসাধারণত্বের পরিচয় লইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠে না! অলস দর্শকের মত লোলুপ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকে না!

৬

ভাবিতেছি, এই কথাগুলা যদি লিখিয়া যাই ত, মন্দ হয় না! কথা কহিবার জন্য যখন সঙ্গী মিলিবে না, তখন এই কাগজ-কলমকেই সঙ্গী করিয়া লই! কিন্তু কি লিখিব? আমার এ ব্যর্থ চিন্তার রাশি কাগজের উপর সাজাইয়া লাভ কি? চারিটা প্রাচীরের বেষ্টনির মধ্যে ধরা দিয়া, নির্জ্জীব শৃঙ্খলিত জীবনে সুখদুঃখের মালা গাঁথিয়া, কি ফল! আমি আজ ঠিক এ জগতের নহি ত! ইহ-পরকালের মাঝামাঝি আজ আমি দাঁড়াইয়া! আপনার বলিয়া আশ্রয় করি, এমন কে

আছে, কি আছে, আমার, ভগবান! তবু এ অসহ্য বেদনার কথা লিখিয়া রাখিব।

দেখিয়া, লোকে ঘৃণা করিবে! করুক! লোকের সহানুভূতি ত এতটুকু বিচলিত হইল না! তবে তার ঘৃণাকেই বা ভয় করি, কেন!

অন্তরের মধ্যে যেন ঝড় বহিতেছে! একটা সংগ্রাম! মৃত্যুর সহিত বিপুল, কঠিন সংগ্রাম।

জীবনের দিনগুলি যার এমন করিয়া গণিয়া দেওয়া হইয়াছে, তার—উঃ—কি সে অবস্থা! আলো, হাসি, সমস্তই, হায়, একটা ফুৎকারে নিভিয়া যাইবে!

প্রতিমুহূর্ত্তে আমি যে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি—তুচ্ছ ফাঁসির রজ্জু, ইহার অধিক কি যন্ত্রণা দিবে! সে ত বিরাট মুক্তির আভাব দিতেছে! এই বদ্ধ বায়ু ও রুদ্ধ করুণার উপর হইতে বিরাট সঙ্কীর্ণতার প্রস্তরখানা সে যেন হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইবে! তার পর, আঃ, কি সে আশা-আলোকের অপূর্ব্ব রাজ্যে, কি সে মুঞ্জরিত সুখের মধ্যে চকিতে বিলীন হইয়া যাইব!

আর, এই লোকগুলা, যারা আইন করিয়াছে! তারা কি একদণ্ড ভাবে না, মানুষকে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলাইতে মানুষের কি অধিকার! তারও প্রাণ আছে, চেতনা আছে, বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে! একটা তুচ্ছ রজ্জুর বন্ধনে এ সমস্ত বাঁধিয়া নষ্ট করিবে! তাহারি সঙ্গে কত সাধ, আশা, প্রেম, কতখানি হৃদয় নিমেষে ঝরিয়া যাইবে! কি নৃশংস, এই অনুষ্ঠান! কিন্তু তারা এ সব কথা ভাবে না! তারা ভাবে, একটা রজ্জু, আর একটা কণ্ঠমাত্র, আর কিছু নাই! মূর্খ, অন্ধ প্রতিশোধ, আর হিংসাটাকেই তারা জগতে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়াছে!

সেইজন্যই আমি লিখিয়া রাখিব! আমার তুচ্ছ ক্ষুদ্র বেদনাটুকু অবধি ফুটাইয়া ধরিব—মনের মধ্যে কি এ দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, কেহ দেখিবে না, বুঝিবে না, এতটুকু তার আভাষ পাইবে না! কি তুচ্ছ শরীরের বেদনা! মনের মধ্যে বেদনার যে গুরুভার নিশ্বাস-রোধ করিয়া ধরিতেছে, তাহার যে, তুলনা নাই!

একদিনো কি কেহ এ কাগজগুলা পড়িয়া দেখিবে না, কি কষ্ট সহিয়া একজন হতভাগ্য প্রাণ দিয়াছে! কে জানে! হয়ত কেহ দেখিবে না! হয়ত, কোন এক দুর্দ্দিনে, ঝড়ের মুখে উড়িয়া, এই কাগজের টুকরাগুলা ধূলা-কাদা মাখিয়া, পথের ধারে পড়িয়া থাকিবে—কালির শেষ রেখাটুকু অবধি, আমার জীবনের শেষ নিশ্বাস-বায়ুর মতই একান্ত নীরবে নিভৃতে, মিলাইয়া যাইবে! লোকচক্ষুর একটা মৃদু ইঙ্গিতও সেগুলাকে স্পর্শ করিবে না!

৭

কিম্বা হয়ত, এ কাগজগুলার উপর একদিন কারো দৃষ্টি পড়িবে—তখন জজের মনে এমন একটী স্পন্দন উঠিবে যে, ফাঁসির প্রথা উঠিয়া যাইবে! কত নির্দ্দোষী, কত দুর্ভাগা, যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাইবে! কিন্তু তাহাতে আমার কি লাভ! আমার জীবনটা ত কঠিন রজ্জুসংস্পর্শেই বাহির হইয়া যাইবে!

প্রাণটা বাহির হইয়া যাইবে! মৃত্যু ঘটিবে! এই সূর্য্যের আলো, বসন্তের এই

স্নিগ্ধ বায়ু, এই ফলফুলে, পাখীর গানে ভরা, বিচিত্র শ্যাম ধরণী, রঙীন মেঘ, সমস্ত চরাচর, নিমেষে আমি হারাইয়া ফেলিব!

না! নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে! আপনাকে বাঁচাইব! কিছুতে কি এ মৃত্যু রোধ করা যায় না! আঃ, ইচ্ছা হয়, কারা-গৃহের এই পাথরের দেয়ালে ঘা দিয়া আপনার মাথাটাকে চূর্ণ করিয়া ফেলি! লোকগুলা ক্ষোভে নিরাশায়, হাহাকার করিয়া উঠিবে, আর আমার, আঃ কি সে আনন্দ!

৮

এখন আগাগোড়া আমি অবস্থাটা ভাবিয়া দেখি! আজ তিন দিন বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে! আপিল করিলে হয়! একবার শেষ চেষ্টা!

আট দিন ত দরখাস্তটুকু এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিবে। পনের দিন পরে কোর্টের হাতে পড়িবে। তার পর নম্বর, রেজিষ্টারীর হাঙ্গামা আছে! তবে মীমাংসা হইবে, আপিলের অধিকার মিলিবে কি না!

আবার পনের দিন ধরিয়া প্রতীক্ষা—অধীর কাতর প্রতীক্ষা! শেষে আবার বিচারের অভিনয়! গবর্ণমেণ্টের উকিল বুঝাইবে, অন্যায় আস্পর্দ্ধা ও ধৃষ্টতা এই বন্দীর! এমনভাবে অপরাধ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, এখনো আপিল,—ইত্যাদি!

এমনি করিয়া ছয় সপ্তাহ কাটিয়া যাইবে! বালিকার কথাই যথার্থ দেখিতেছি!

৯

একটা উইল লিখিলে হয়, মনে করিতেছি। কিন্তু বৃথা! মকদ্দমার খরচ দিতেই ত আমার যথাসর্ব্বস্ব বাহির হইয়া গিয়াছে! যাহা আছে, তাহার জন্য উইল করিলে কোর্টে আরো কিছু দণ্ড দিবার ব্যবস্থা হয়, বটে!

সংসারে এখনো আমার বৃদ্ধা মাতা, কিশোরী পত্নী, এবং একটি ছোট মেয়ে আছে! তিন বৎসরের শান্ত মেয়েটি! তার গোলাপের মত রাঙা ঠোঁটে হাসিটুকু লাগিয়াই আছে। উজ্জ্বল নীলচক্ষু, কোঁকড়া কেশের গুচ্ছ—তারি দু চারিটা কেশ মুখে-চোখে উড়িয়া পড়িতেছে—ফুলের গায় যেন লতাপাতার ঝালর দুলিতেছে! ছয় মাস তাহাকে আমি দেখি নাই! দীর্ঘ ছয় মাস!

আমার মৃত্যুতে জগতে তিনটি নারী অনাথা হইবে—পুত্রহারা, স্বামিহারা, পিতৃ-হারা—তিনটি অভাগিনী আইনের একটি ইঙ্গিতে তাদের একমাত্র আশ্রয়টুকু ঘুচিয়া যাইবে!

আমার যে দণ্ড হইয়াছে, স্বীকার করি, তাহা ন্যায্য—তাহার দোষ দিতেছি না! কিন্তু এই অসহায়া নারীগুলি, ইহারা কি দোষ করিয়াছিল?

লোকের ঘৃণা বহিয়া যে দুর্ব্বিষহ জীবন তারা বহন করিবে, তাহার জন্য ত ইহারা এতটুকু দায়ী নহে। তবু, ইহারি নাম বিচার! এবং ইহাই সে বিচারের চূড়ান্ত ব্যবস্থা!

বৃদ্ধা মাতার জন্য, আমি কাতর নহি! তাঁহার জীর্ণ দেহখানাকে ধূলিসাৎ করিবার পক্ষে, এ আঘাত পর্য্যাপ্ত!

স্ত্রীর জন্যও চিন্তা নাই! সে চিররুগ্না, শয্যাশায়িনী। রোগে তার জীবন-দীপ নিব-নিব—এ সংবাদ একটি ফুৎকারের মত সে শেষরশ্মিটুকু নিবাইয়া দিবে! অবশ্য যদি সে

পাগল না হইয়া যায়!—লোকে বলে, উন্মাদের জীবন সুদীর্ঘ হয়। হোক সুদীর্ঘ, তবু সে মৃত্যুর মত বিরাম দান করে! শান্তি বহিয়া আনে!

কিন্তু আমার কন্যা—এই শান্ত শিশু, আদরের কন্যা মেরি—হাসি, খেলা, গান লইয়াই যে সে আছে। অভাগিনী জানে না, তার মাথার উপর আজ কি বিপদ উদ্যত হইয়াছে! বজ্রের শিখার মত তার জীবনটী জীর্ণ, দীর্ণ হইয়া যাইবে—এ চিন্তাই যে আমার বক্ষপঞ্জরগুলাকে চূর্ণ করিয়া দিতেছে!

১০

এখনো রাত্রি শেষ হয় নাই। চোখে নিদ্রা নাই! অন্ধকার কারাগৃহ, বাহিরেও এতটুকু সাড়াশব্দ নাই! এখন কি করিয়া সময় কাটাই? রাত্রির এই শেষ দণ্ডটুকু যে একান্ত দুঃসহ!

ঘরের কোণে একটা দীপ জ্বলিতেছিল। তাহা লইয়া দেয়ালের চারিপাশ দেখিতে লাগিলাম। কোথাও কি এতটুকু ছিদ্র নাই—বাহিরের স্নিগ্ধ বায়ু প্রবেশের জন্য ছোট একটু পথ! না!

দেয়ালে কত রকমের মূর্ত্তি আঁকা রহিয়াছে! সে কত কথা, কত ভাষা, কোনটি খড়ির অক্ষর, কোনটী বা কয়লার! আহা, আমারি মত কত হতভাগ্য জীব মনের ব্যথা পাষাণের দেয়ালে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে! তার মর্ম্মের সমস্ত বন্ধন টুটিয়া গিয়াছে, তবু এ পাষাণ প্রাচীর সান্ত্বনাচ্ছলে একটী কথাও বলে নাই! একটু ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও নহে! মূক, নীরব পাষাণ এমনি দাঁড়াইয়া ছিল, তার ব্যাকুল কণ্ঠের আর্ত্তস্বর সেই পাষাণের গায় ঠেকিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে!

তাদের বেদনার কথা কি—তাই দেখিতে লাগিলাম! একটা কাজ জুটিয়া গেল! তাদের এই অশ্রুমাখা বেদনার মালা গাঁথিয়া সময় কাটাইয়া দিই! তবু মৃত্যুর কথা দুদণ্ডের জন্যও ভুলিয়া থাকিব।

ঠিক আমার শয্যার পার্শ্বে দেয়ালের গায়ে তীরে-গাঁথা দুখানি শোণিতাক্ত হৃদয়—শিল্পী আপনার যেন হৃদয়-শোণিত দিয়াই তাহার মধ্যে লিখিয়া রাখিয়াছে—'প্রাণভরা ভালবাসা!' আহা বেচারা—এখানে বসিয়া সারা দিনরাত্রি তার ভালবাসার কথাই ভাবিয়াছে! তাহারি পাশে কয়লার অক্ষরে কে লিখিয়াছে, "সম্রাটের জয় হোক্!" কি আশা, আশ্বাসের কি মহান আকাঙ্ক্ষা, এই অক্ষরগুলিতে!

একধারে কে লিখিয়াছে, "আমি মাথিয়াকে ভালবাসি!" আর একধারে 'এ' অক্ষরটি—সাদা খড়ির রেখা! সেই অন্ধকারে রূপার অক্ষরের মত সেটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল—'এ' বুঝি তার প্রাণের প্রিয়জন, এমা কিম্বা এডিথ! আহা, এই একটি অক্ষরে একখানি ব্যথিত কাতর প্রাণের কতখানি দীর্ঘনিশ্বাস মিশানো রহিয়াছে! আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। আমার এই নিঃসঙ্গ নির্জ্জন মুহূর্ত্তে পাষাণের দেয়াল যেন করুণা করিয়া জাগিয়া উঠিল! সে তার পাষাণ বক্ষে, এত মর্ম্মব্যথা, এত গোপন কথা লুকাইয়া রাখিয়াছিল! আজ কোথায় তারা, এই সব হতভাগ্যের দল! আজ কোথায় তাদের মাথিয়া, এমা, এডিথ! তারা কোন্ গোলাপকুঞ্জের আড়ালে, কিম্বা কোন বাতায়নের ধারে বসিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া

আছে! তাদের এ বিদায়ের বেদনা ঘুচিয়াছে কি না, কে বলিয়া দিবে?

দীপ লইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেয়ালের কোণে এ কি! এ যে ফাঁসিকাঠের ছবি! কে আঁকিয়া রাখিয়াছে! রূঢ়, মূর্খ, বর্ব্বর, এমন করিয়া মৃত্যুকে আবাহন করিয়া লইয়াছে! এই পৃথিবী, এই জীবন, তার কাছে কি এতই ভার বোধ হইয়াছিল। দুই খণ্ড কাঠ সোজা উঠিয়াছে, মাথায় আর একটা কাঠ লাগানো, মধ্যে দড়ি ঝুলিতেছে—একদৃষ্টে আমি তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম! মাথা ঘুরিতে লাগিল। হাত হইতে দীপ পড়িয়া গেল! কক্ষ অন্ধকারে পূর্ণ হইল। কি সে, গাঢ়, তীব্র, অন্ধকার, ছুঁচের মত যেন গায় বিঁধিতেছিল। অবসন্নভাবে আমি মেঝের উপর বসিয়া পড়িলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে।

(লেকঁৎ-দে-লিল্ হইতে)

মধ্যাহ্ন; গ্রীষ্মের রাজা, মহোচ্চ সে নীলাকাশে বসি'
নিক্ষেপিল রৌপ্যজাল, বিস্তৃত বিশাল পৃথ্বী 'পরে;
মৌন বিশ্ব, দহে বায়ু তুষানলে নিশ্বসি' নিশ্বসি';
জড়ায়ে অনল-শাড়ী বসুন্ধরা মূরছিয়া পড়ে।

ধূ ধূ করে সারা দেশ, প্রান্তরে ছায়ার নাহি লেশ,
লুপ্তধারা গ্রামনদী, বৎস গাভী পানীয় না পায়;
সুদূর কাননভূমি (দেখা যায় যার প্রান্তদেশ)
স্পন্দন-বিহীন আজি, অভিভূত প্রভূত তন্দ্রায়।

গোধূমে সর্ষপে মিলি' ক্ষেত্রে রচে সুবর্ণ সাগর,
সুপ্তিরে করিয়া হেলা বিলসিছে বিস্তারিছে তারা;
নির্ভয়ে করিছে পান তপনের অবিশ্রান্ত কর,
মাতৃক্রোড়ে শান্ত শিশু পিয়ে যথা পীযূষের ধারা।

দীর্ঘনিশ্বাসের মত, সন্তাপিত মর্ম্মতল হ'তে,
মর্ম্মর উঠিছে কভু আপুষ্ট শস্যের শীষে শীষে;
মন্থর, মহিমাময় মহোচ্ছ্বাস জাগিয়া জগতে,
যেন গো মরিয়া যায় ধূলিময় দিগন্তের শেষে।

অদূরে তরুর ছায়ে শুয়ে শুয়ে শুভ্র গাভীগুলি
লোল গল-কম্বলেরে রহি' রহি' করিছে লেহন,

আলসে আয়ত আঁখি স্বপনেতে আছে যেন ভুলি,'
আনমনে দেখে যেন অন্তরের অনন্ত স্বপন।

মানব! চলেছ তুমি তপ্ত মাঠে, মধ্যাহ্ন-সময়ে,
ও তব হৃদয়-পাত্র দুঃখে কিবা সুখে পরিপূর!
পলাও! শূন্য এ বিশ্ব, সূর্য্য শোষে তৃষামত্ত হয়ে,
দেহ যে ধরেছে হেথা দুঃখে সুখে সেই হ'বে চুর।

কিন্তু, যদি পার তুমি হাসি আর অশ্রু বিবর্জ্জিতে,
চঞ্চল জগত মাঝে যদি থাকে বিস্মৃতির সাধ,
অভিশাপে বরলাভে তুল্য জ্ঞান, ক্ষমায় শান্তিতে
আস্বাদিতে চাহ যদি মহান্ সে বিষণ্ণ আহ্লাদ,—

এস! সূর্য্য ডাকে তোমা, শুনাবে সে কাহিনী নূতন;
আপন দুর্জ্জয় তেজে নিঃশেষে তোমারে পান ক'রে,—
শেষে ক্লিন্ন জনপদে লঘু করে করিবে বর্ষণ,
মর্ম্ম তব সিক্ত করি সপ্তবার নির্ব্বাণ-সাগরে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

শক্তি ও সাধনা।

(বল্লভদাস হইতে)

সুকেশী কিশোরী কুমারী। তার মত রূপসী ও গুণবতী নারী সেকালে আর ছিল না। সুকেশী দরিদ্রের কন্যা। কিন্তু বিকশোন্মুখ নির্জ্জন পুষ্পটির স্নিগ্ধসৌরভ মুগ্ধ ভ্রমরকে যেমন আপনার দিকে টানিয়া আনে, তাহার রূপগুণের গৌরবটকুও তেমনি তাহাকে ছোট-বড় সকলেরই নিকট প্রিয় ও পরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল, এবং দেশ দেশান্তর হইতে নানা মুগ্ধচিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া নিকটে আনিয়াছিল।

এই সকল আগন্তুকের মধ্যে রাজকুমার ও এক ব্রাহ্মণকুমারই সর্ব্বপ্রধান। একজন শক্তি, অপরজন সাধনা। উভয়েই কুমারীর অন্তরের অনুরাগটুকু আপনার ধন করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। সুতরাং রাজকুমার ও ব্রাহ্মণকুমার উভয়েই নিঃসঙ্কোচে কিশোরীর অন্তরজয়ে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজকুমার বিরোচন শক্তি ও সম্পদের মদগর্ব্বে স্ফীত। তাঁহার পিতা দৈত্যকুলতিলক প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের শক্তি ও সাম্রাজ্যের

গৌরবে স্বর্গের দেবগণ পর্য্যন্ত লজ্জিত ও ঈর্ষান্বিত। প্রহ্লাদের প্রধান গুণ তিনি ন্যায়পরায়ণ। বিরোচন পিতার প্রবল সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর উপযুক্ত শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় ধনুর্ব্বিদ্ এবং মৃগয়ায় অদ্বিতীয়। কিন্তু লোকে চুপি চুপি বলাবলি করিত যে বিরোচন অহঙ্কারী এবং পিতার মহৎগুণে বঞ্চিত।

ব্রাহ্মণকুমার সুধন্বার প্রকৃতি ঠিক বিপরীত। সুধন্বার বিদ্যা ও গুণের যশ চতুর্দ্দিকেই ব্যাপ্ত। ত্রিলোকবিদিত আঙ্গিরসের ঔরসে তাঁহার জন্ম। সুধন্বা শূন্য সম্পদ ও শক্তিকে ঘৃণা করিতেন এবং ইহার গর্ব্বে স্ফীত ব্যক্তিকে নিতান্তই হীন বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সৌন্দর্য্য রাজা ও ভিখারী উভয়েরই প্রাপ্য ও ভোগ্য বস্তু। তাঁহার শ্রেষ্ঠ শক্তির বলে তিনি যে সুকেশীকে তাঁহার আপন ধন করিবেন এবং রাজপুত্রের শক্তি সম্পদের মোহ যে তাঁহার ঈপ্সিতাকে অন্ধ করিবে না এ বিষয়েও তাঁহার অন্তরে লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না।

সুকেশীর পাণিগ্রহণের জন্য দুইটি যুবককে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া যে তাহার মনে বিশেষ কোন বিরক্তির ভাব আসিত তাহা নহে। নারী চিরদিনই নারী। একদিকে প্রবল পরাক্রান্ত কুবের পুত্র বিরোচন অপরদিকে শুদ্ধাত্মা পণ্ডিতপ্রবর সতেজ সুন্দর ব্রাহ্মণকুমার সুধন্বা তাহার প্রেমভিখারী। সৌন্দর্য্যের পদতলে আজ শক্তি ও সাধনা লুণ্ঠিত! কিশোরী মনে মনে একটা অস্ফুট আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। ইচ্ছা করিলে সে আজ সমুদ্রমেখলা ধরণীর অধিশ্বরী হইতে পারে, কিন্তু এরূপ জীবনকে সে মর্ম্মমধ্যে ঘৃণা করে। এ সুখের তৃষ্ণা তার নাই,—শক্তিকে বরণ করিবার তার নাই। এই ব্রাহ্মণকুমারকে বরণ করিয়া সাহসও দৈত্যকুমারকে ক্রুদ্ধ করিলে সুধন্বার উপর বিরোচনের প্রবল শক্তির পীড়ন আরম্ভ হইবে সে কথাও সে কোনমতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

এক দিন সন্ধ্যায় বিলাস বাহুল্য-মণ্ডিত বিরোচন কিশোরীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কন্যা তাঁহাকে সাদরে অভিবাদন করিয়া এক বহুমূল্য আসনে উপবেশন করাইল। আজ বিরোচন কেমন বিরক্ত ও বিষণ্ণ।

সুকেশী জিজ্ঞাসা করিল "আজ আপনার মনটা এত বিষণ্ণ কেন রাজকুমার?"

"ব্রাহ্মণেরা দিন দিন শঠতায় ও ঔদ্ধত্যে পূর্ণ হইতেছে। তাদের যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক।" বিরোচনের স্বর ব্রাহ্মণদ্বেষে পূর্ণ।

"সুধন্বা আমার নিকট আসে বলিয়াই কি আপনি একথা বলিতেছেন?" সুন্দরী মনে করিল বুঝি সেইজন্যই বিরোচনের ঈর্ষা হইয়াছে।

রাজকুমার বলিলেন—"না, তার জন্য তেমন নয়। এটা একটা জাতিগত কথা। আমার স্বজাতি দৈত্যগণই সর্ব্বপ্রধান ও শক্তিবান। তাহারা স্বর্গমর্ত্ত্য শাসন করিতেছে, এমন কি স্বয়ং দৈত্যগণও তাহাদের ভয়ে ভীত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ব্রাহ্মণগণ যে শ্রেষ্ঠতার ভাণ ক'রে আমাদের উপর আধিপত্য করে, এ অসহ্য। এ পুরোহিত-গুলার ধৃষ্টতা আর সহ্য হয় না।"

দৈত্যরাজের ব্রাহ্মণের প্রতি এই অধীব ঈর্ষা ও ক্রোধ দেখিয়া সুকেশীর অধরে হাসি আসিয়া দেখা দিল; সে কষ্টে তাহা গোপন করিল। তাহার ভয় হইল হয়ত সুধন্বা তাহার অন্তর অধিকার করিয়াছে বলিয়া দৈত্যরাজের ঈর্ষা হইতেছে। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া সে তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিল।

বিরোচন আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি মত পদ্মাক্ষি?" সুকেশী একটু হাসিল, কোন উত্তর করিল না। পরে বলিল—"যুবরাজ, এ প্রশ্ন বড়ই কঠিন, আমার ন্যায় অনভিজ্ঞার এ বিষয়ে উত্তর দেওয়া সঙ্গত নয়।"

জয়োল্লাসে প্রফুল্ল হইয়া বিরোচন বলিলেন—"তাহা হইলে অভিজ্ঞতার একটা মূল্য আছে বলিয়া তুমি মনে কর?"

কিশোরী ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"নিশ্চয়।"

"তুমি কি মনে কর আমার অভিজ্ঞতার কোন অভাব আছে?"

"না না; তাহা কি কেহ বলিতে পারে?"

"তবে আমি যে বলিতেছি যে দৈত্যেরা শ্রেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণেরা নিকৃষ্ট, ইহাও ঠিক?"

মর্ম্মাহতা বালিকা উত্তর করিল—"আপনি কি সত্যই এইরূপ মনে করেন?"

"এ কথায় তোমার সন্দেহ কেন?"

"দৈত্য ও ব্রাহ্মণ উভয়েরই মধ্যে ত মহৎ ব্যক্তি আছেন।"

"কিন্তু জাতি ভাবে ধরিলে কাহারা বড়?"

"তা আমি জানি না, আমি ও সব বড় কথা বুঝিতে পারি না।" সুকেশী ধরা দিবার পাত্র নহে।

উত্তর শুনিয়া বিরোচন বুঝিলেন যে তাঁহার অন্তরের অধীশ্বরী কথায় ধরা দিতে প্রস্তুত নহে। কিন্তু তিনি যে প্রবল প্রতাপ প্রহ্লাদের পুত্র একথা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। অতি প্রিয় হইলেও তাঁহার সামান্য এক প্রজার নিকট এভাবে পরাজিত হইতে তাঁহার পুরুষত্ব কুণ্ঠিত হইল। তাঁহার প্রভূত অর্থ ও প্রবল পদমর্যাদা সত্ত্বেও যে একটা সামান্যা বালিকা তাঁহার গ্রাসের মধ্যে আসিল না ইহাতে বিরোচন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—"সুন্দরি, তুমি অত গর্ব্বিতা ও বিজ্ঞা হইবার চেষ্টা করিও না। আমি তোমাকে যে কথা বলি সে কথা কি তুমি অত বিচার বিবেচনা না করিয়াও বিশ্বাস করিতে পার না? যে নারী আমার রাজ্ঞী হইবে তাহার পক্ষে এরূপ অবহেলা কি সঙ্গত?"

"যুবরাজ আপনি উচ্চপ্রাণ রাজপুত্রেরই মত কথা বলিয়াছেন। আপনার মনে কি সত্যই ধারণা যে আমার গর্ব্ব ও জ্ঞান দুইই আছে? গর্ব্ব ও জ্ঞান কি একত্রে থাকা সম্ভব?" রাজ্ঞী হইবার প্রলোভন সুন্দরীকে মুগ্ধ করিল না।

বিরোচন কতকটা অনুযোগ কতকটা অসন্তোষের সুরে বলিলেন "অন্ততঃ তুমি যে গর্ব্বিতা তাহাত কথায় প্রকাশ করিতেছ?" সুকেশী আত্মরক্ষায় বলিয়া উঠিলেন—"তা আমি নিজে ত' কিছুই বুঝিতে পারি না। সে যা হোক গর্ব্ব জিনিসটা গুণ না দোষ যুবরাজ?"

"গর্ব্বটা গুণ, যখন তার পশ্চাতে শক্তি থাকে, নচেৎ নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র।"

"আমার কি কোন শক্তিই নাই? আমার এই সৌন্দর্য্য কি আমার একটা শক্তি নহে?" সুকেশীর আত্মসমর্থনের চেষ্টা দেখিয়া বিরোচন একটু হাসিয়া বলিলেন—"তোমার এ সৌন্দর্য্য লইয়া তুমি করিবে কি?"

চতুরা সুন্দরী বিরোচনের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। রাজপুত্র যে তাহার ন্যায় সামান্যা নারীর গৃহে উপস্থিত তাহাই ত তাহার সৌন্দর্য্যমাহাত্ম্যের যথেষ্ট প্রমাণ। সে মনে মনে বুঝিল রাজশক্তিও ইহার নিকট পরাজিত। তাহার হাসি ও দৃষ্টি দেখিয়া বিরোচন তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। তিনিও একটু হাসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কিন্তু তোমার এ সৌন্দর্য্য লইয়া তুমি করিবে কি?"

"তা আমি জানি না। পণ্ডিতে তার পাণ্ডিত্য লইয়া করে কি? রাজারা তাদের শক্তি লইয়া করে কি?"

বিরোচন মনে মনে তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন, মুখে বলিলেন—"ঠিক কথা। কিন্তু পণ্ডিত ও রাজা তার পাণ্ডিত্য ও শক্তি লইয়া কি করে তাহা শুনিতে চাও?"

"হাঁ বলুন, সেটা জানায় আমার স্বার্থ আছে।"

"পণ্ডিতেরা পণ্ডিতের সহিত মিশিয়া আপনার পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষ সাধন করেন। রাজারা প্রজারক্ষার নিমিত্ত আপনার শক্তিকে প্রয়োগ করেন। তোমার এ শক্তি লইয়া তুমি কি করিবে ক্ষীণাঙ্গি?"

কিশোরী বলিল—"আমার এ সৌন্দর্য্য জগতের ধর্ম্মসেবার জন্য! বলিতে পারি না আমার এ শক্তির সহিত রাজশক্তির তুলনা সঙ্গত কি না। তবে আমার মনে হয় ইহার রাজশক্তির সহিত মিলিত না হওয়াই ভাল।"

বিরোচন ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন সুন্দরি?"

ঈষৎ ব্রীড়াভরে সুন্দরী উত্তর করিল—"কারণ এ দুই প্রবল শক্তি একত্র সংযুক্ত হইলে, তাহার বেগটুকু নষ্ট করিবার মত শক্তি এ পৃথিবীতে আর থাকিবে না—সৃষ্টি একেবারে রসাতলে যাইবে।"

তাহার উত্তরে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বিরোচন বলিলেন—"না না, সেরকম কোন ভয় নাই। আমি দেখিতেছি তোমার শক্তি ও সরসতা দুইই বেশ আছে। এ দুটা যার তার থাকে না।"

"আনন্দিত হইলাম।"

"তাহ'লে আমার কথা তুমি স্বীকার কর?"

"সঙ্গত হইলে অবশ্যই স্বীকার করি।"

"কিন্তু সঙ্গত কি অসঙ্গত প্রমাণ হইবে কি রূপে?"

"আপনার এ আক্রমণ সুধন্বার উপর, সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহারই আবশ্যক। কাল প্রাতে তিনি আমার নিকট আসিবেন বলিয়া বোধ হয়। ততক্ষণ পর্য্যন্ত দৈত্যগণকেই মহৎ ও ধার্ম্মিক বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত।"

(২)

পরদিন সুধন্বা দেখিলেন বিরোচন কিশোরীর সহিত এক বহুমূল্য আসনে বসিয়া

আছেন, চতুর্দ্দিকে আজ্ঞাবাহী দেব-নর অনুচরবর্গ দাঁড়াইয়া আছে। মদমত্ত বিরোচন তাঁহার উপস্থিতি লক্ষ্যই করিলেন না। সুকেশী তাঁহাকে সাদর অভিবাদন করিবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন।

সুধন্বা ব'লিয়া উঠিলেন—"থাক্ থাক্ সুন্দরী, ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই। আমি রাজকুমার হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ব্রাহ্মণের উপযুক্ত আসনই গ্রহণ করিব।"

এতক্ষণে বিরোচনের যেন চেতন হইল। তিনি বলিলেন—"কে সুধন্বা যে! এস, এস। তুমি আমার পাশে ব'সতে পারবে না তা জানি। তোমার বসবার জন্য একখানা পিঁড়ি ও গাছকতক দর্ভ চাই। দাঁড়াও, আনতে ব'লচি।"

সুধন্বাকে অপমানিত করিবার জন্যই বিরোচন একথাগুলি বলিলেন এবং তাঁহার আশানুরূপ ফলও ফলিল। প্রহ্লাদ পুত্রের ঈদৃশ ব্যবহার দেখিয়া সুধন্বা বিস্মিত হইলেন, তাঁহার এরূপ অসদ্ব্যবহারের কোন কারণ না বুঝিয়া বলিলেন—"তুমি এ কি করিতেছ বিরোচন? এ প্রকারে আমাকে অপমানিত করিবার অর্থ কি? তোমার পিতার ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান বোধ আছে, তুমি তাঁহার পুত্র হইয়া এরূপ কেন?"

বিরোচন ঘৃণার সহিত উত্তর করিলেন—"তুমি একজন সামান্য ব্রাহ্মণ বই ত' নয়, ভূমিতলে দর্ভাসনে বসিতে পার না?" "তোমার মনে এতই অবজ্ঞার ভাব? আমাকে অপমানিত করাতেই কি তোমার মহত্ত্ব?"

"আমি তোমাকে অপমানিত করি নাই। আমি তোমাকে তোমার যথাস্থান দেখাইয়া দিয়াছি মাত্র। দৈত্যেরা শ্রেষ্ঠ জাতি, তাহারা ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিতে পারে না। তোমাকে তোমার যথাস্থানে থাকিতে হইবে।"

সুধন্বা অবাক্ হইলেন। দৈত্যের বহুমূল্য আসনকে তিনি ঘৃণা করেন। তাঁহার প্রিয়তমাকে দেখিবার নিমিত্ত তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছেন মাত্র। হায়, কোমলা-কিশোরী আজ গর্ব্বোদ্ধত দৈত্যের কবলে! প্রহ্লাদপুত্র মোহে অন্ধ,—সে মোহ জঘন্য অর্থের আর পাশব শক্তির! ঘৃণায় তাঁহার অধরে ঈষৎ হাসি আসিয়া দেখা দিল।

হাসি দেখিয়া বিরোচন আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"তুমি কি আমার কথায় সন্দেহ কর?"

"নিশ্চয়ই! দৈত্যরাজপুত্র, তোমার গর্ব্ব মিথ্যা।" সুধন্বার কণ্ঠস্বর ও বাক্যগুলি সহজ এবং সতেজ।

"আমি আমার পদসম্পদ পণ রাখিয়া বলিতে পারি যে দৈত্যই শ্রেষ্ঠ।" বিরোচনের মূর্ত্তি এতই উত্তেজিত যে সে সময়ে অন্য কেহ তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না। পূর্ব্বদিন তিনি দৈত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবেন বলিয়া সুকেশীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; সে তাহার প্রমাণ ভার সুধন্বার উপর দিয়াছিল। সুধন্বার উত্তরের প্রতীক্ষায় সুকেশী চাহিয়া রহিল।

সুধন্বা বলিলেন—"দৈত্যপুত্র, আমি তোমার রাজপদ বা সম্পদকে তৃণাপেক্ষাও হীন জ্ঞান করি। যদি তোমার যথার্থই এরূপ শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে জীবন পণ রাখিতে প্রস্তুত আছ কি?"

রাজকুমার বিরোচন একটু ইতস্ততঃ

করিলেন, মনে মনে ভাবিলেন ব্রাহ্মণদের শঠতারও সীমা নাই। জীবন পণ করিয়া তাঁহাদের এ কলহ নিষ্পত্তির জন্য তাঁহার কি দেবনরের দ্বারস্থ হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু দৈত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁহার প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করা কর্ত্তব্য ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "জীবন পণ রাখাই কি তোমার অভিপ্রায়?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"হাঁ তোমার কি মনে ভয় হইতেছে?"

"নিষ্পত্তির জন্য কাহার নিকট যাইতে চাও?" "তোমার পিতার নিষ্পত্তিই আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাতে তুমি সম্মত আছ?"

বিরোচন উত্তর করিলেন—"হাঁ।" মনে মনে ব্রাহ্মণের এরূপ প্রস্তাবের অর্থ কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দুইজনে কিশোরীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রহ্লাদের প্রাসাদ অভিমুখে চলিলেন। বৃদ্ধ রাজা এই দুই ভীষণ প্রতিদ্বন্দীকে একত্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। উভয়ে রাজসমীপে দণ্ডায়মান হইলে প্রহ্লাদ পুত্রকে বলিলেন— "ব্রাহ্মণ প্রতিনিধির সহিত তুমি একত্র কেন বৎস?"

"আমাদের মধ্যে একটা মতভেদ হইয়াছে, উভয়েই জীবন পণ রাখিয়াছি। আপনি নিরপেক্ষ হইয়া তাহার মীমাংসা করুন ইহাই প্রার্থনা।" বিরোচন তাঁহাদের বিবাদের বিষয় সমস্ত বলিলেন।

রাজা প্রহ্লাদ সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বড়ই চিন্তান্বিত হইলেন ও ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া অভিবাদন করিলেন।

রাজার এই ভদ্রতা দেখিয়া সুধন্বা বলিলেন—"মহারাজের সৌজন্য সর্ব্বজনবিদিত এক্ষণে আপনি ন্যায় ও সত্য অনুসারে আমাদের বিবাদের মীমাংসা করিতে প্রস্তুত আছেন কি?"

রাজা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন— "হে ব্রাহ্মণকুলগুরু, আপনি বিদ্বান ও বিজ্ঞ; আমার পুত্র নির্ব্বোধ ও উদ্ধত। এক্ষেত্রে আপনি জীবন পণের জন্য আজ্ঞা করিতেছেন কেন? এ বিবাদ ত্যাগ করা কি আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে?"

রাজার অভিসন্ধি বুঝিয়া সুধন্বা একটু বিরক্ত হইলেন,—বলিলেন—"মহারাজ শুনুন। আপনার নিকট বিচারপ্রার্থীর ন্যায়বিচার করাই আপনার প্রধান কর্ত্তব্য। তাহাতে অসম্মত হইলে বা অন্যায় বিচার করিলে আপনি ধর্ম্মে পতিত হইবেন।"

রাজা বিষম বিপদে পড়িলেন, একদিকে তাঁহার পুত্র অপরদিকে তাঁহার ন্যায় বিচারে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণতনয়! কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি চিন্তার জন্য সময় গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার পুত্রের ঔদ্ধত্য ও অসদ্ব্যবহারের কথা তিনি জানিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া একজন ব্রাহ্মণের জন্য পুত্রহত্যাই বা করেন কি করিয়া। অবশেষে রাজা নিরুপায় হইয়া সূর্য্যোপাসনা আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া এক শুভ্র মরালকে রাজসমীপে প্রেরণ করিলেন।

স্বর্গীয় দূতকে সম্মুখে দেখিয়া প্রহ্লাদ কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বিহঙ্গবর, আপনি সকলই জানেন, সকলই বুঝেন। এক্ষণে আমার পুত্র ও এই ব্রাহ্মণের মধ্যে কলহে আমার কি কর্ত্তব্য তাই বলিয়া দিন।

এস্থলে ধর্ম্ম কি এবং তাহা পালন না করিলেই বা ক্ষতি কি ?"

মরাল বলিল—"নৃপবর, আপনি পুত্রকে রাজ্য ও সম্পদ দান করিতে পারেন। কিন্তু যেখানে ন্যায় ও সত্যের বিচার তথায় আপনি যথার্থ ধর্ম্মপালনে বাধ্য।"

"সত্যকে গোপন করা কি সম্ভব নয় ?" দেবদূত বলিল "অসম্ভব! যে জানিয়া সত্যপ্রার্থীর নিকট সত্যকে গোপন করে সে না জানিয়া যে ভুল করে তাহার অপেক্ষা শতগুণ অধিক পাপী।"

রাজা কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন "হায়, তবে কি আমি নিজের পুত্রকে বলি দিব ?" "ন্যায়ানুসারে আপনি বাধ্য।" এই বলিয়া দেবদূত অন্তর্হিত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে সুধন্বা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ কি নিষ্পত্তি করিলেন ?"

প্রহ্লাদ দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন—"নিষ্পত্তি করিলাম যে আমার পুত্রই ভ্রান্ত। দৈত্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা মূর্খতা মাত্র। দৈত্যকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শক্তিশালী বলা যাইতে পারে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বলা ঠিক নহে। কেবল শক্তির কোন মূল্য নাই। শক্তি সৎকর্ম্মে প্রযুক্ত হইলে তবেই তাহা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের সৎ-সাধনা যে আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।"

বিচার শুনিয়া বিরোচন হতাশ্বাস হইলেন। কিন্তু তিনি তাহা গোপন করিবার পূর্ব্বেই সুধন্বা বলিলেন; তিনি পণরক্ষার জন্য পীড়ন করিতে প্রস্তুত নহেন। রাজা যে পুত্রকে বলিদান করিয়াও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। সাধনাই জয়ী হইল।

রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া সুধন্বা যখন পুনরায় সুকেশীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন শঙ্কিতা সুন্দরী দুইটি মৃণাল বাহু দিয়া তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া ধরিল, কিশোরীর গণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিল; প্রিয়তমের স্কন্ধোপরি আপনার মস্তকটি হেলাইয়া মৃদুস্বরে বলিল—"তুমি আমাকে এতক্ষণে সেই পশুপ্রকৃতি রাজপুত্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিলে! আমার জীবন ধন্য হইল, সাধনা সার্থক হইল।"

বিবিধ।

মানুষের মাথার খুলি।—বহুবৎসর পূর্ব্বে জিব্রাল্টারে একটী মনুষ্যের করোটি পাওয়া যায়। উহা লণ্ডনের Royal College of Surgeons নামক বিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। সম্প্রতি অধ্যাপক কিথ ঐ খুলি হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। "খুলিটী একটী স্ত্রীলোকের এবং খুব সম্ভব ছয় লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কোন স্ত্রীলোকের। খুলিটী দেখিয়া বোধ হয় যে স্ত্রীলোকটী বেশ চতুরা ছিল এবং তাহার চোয়াল দেখিয়া সে সাধারণতঃ কি কি দ্রব্য আহার করিত তাহাও অনুমান করা যায়। খুব সম্ভব বাদাম জাতীয় ফল ও শিকড়ই তাহার প্রধান খাদ্য ছিল এবং যে সমস্ত খাদ্যাদি অধিক চর্ব্বণ করিতে হয় তাহাই সে উপাদেয় খাদ্য বিবেচনা করিত। স্ত্রীলোকটীর হস্ত যুগল দীর্ঘ, পদযুগল খর্ব্ব, কণ্ঠদেশ কঠিন, এবং মস্তিষ্ক যথেষ্ট বড় ছিল।"

অধ্যাপক মহাশয়ের বিশ্বাস সে স্ত্রীলোকটী কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত। এবং ইহার সময় মানুষ গৃহাদি নির্ম্মাণে পারগ ছিল না এবং মনুষ্য অধিকাংশ সময় মৃগয়াতেই অতিবাহিত করিত; এবং ধীবর বৃত্তিও করিত।

নেপল্‌স্ উপসাগরের ফটোগ্রাফ।—এই ফোটোগ্রাফখানি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।



ইহা দৈর্ঘ্যে ২৪ হাত এবং প্রস্থে ৩½ হাত। ছয়খানি ফোটোগ্রাফিক প্লেটে আলাহিদা করিয়া ছবি তুলিয়া পরে সেগুলিকে এমন ভাবে চিত্রকরগণ যোড়া দিয়াছেন যে যোড়ার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না।

ম্যালেরিয়া ও গ্রীক ইতিহাস।—মিষ্টার জোনস্ নামক একজন ইয়ুরোপীয় গ্রন্থকার উল্লিখিত পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। সাহেবের মতে প্রাচীন গ্রীসের অবনতির কয়েকটী কারণের মধ্যে ম্যালেরিয়া একটী প্রধান কারণ।

জোনস্ সাহেব প্রাচীন গ্রীসদেশীয় ভৈষজ্যপুস্তকাবলী এবং অন্যান্যপুস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকালে গ্রীসে ম্যালেরিয়া ছিল না। খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে আটিকা প্রদেশে প্রথমে সামান্য ম্যালেরিয়া দেখা দেয়। আরিষ্টফানিস নামক সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসিক নাটকলেখক ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ডিক্লিয়ান এবং পিলোনিসিয়ান যুদ্ধে ইহার বিস্তৃতির সহায়তা করে।

জোনসের মতে গ্রীস যখন রোমের সম্পূর্ণ করতলগত হয় তখনই সেখানে ম্যালেরিয়ার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হওয়াতেই গ্রীস অত সহজে রোমের পদানত হইয়া পড়ে। জোনস্ সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে স্থলে ম্যালেরিয়া বিষ প্রয়োগ করে সেই দেশের লোকজনের শক্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লোপ পায়; শারীরিক এবং মানসিক উভয় প্রকারই অবনতি ঘটে।

সম্ভবতঃ খৃষ্ট-জন্মের ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ইতালিতে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করে এবং ক্রমে ক্রমে যদিও অনেক শত বৎসর পরে,—সার্ডিনিয়া, সিসিলি, ইট্রুরিয়া, আপুলিয়া, লাটিয়াম এবং সর্ব্বশেষে রোমেও ম্যালেরিয়া দেবী আশ্রয় গ্রহণ করেন।

খৃষ্ট জন্মের প্রথম পূর্ব্ব শতাব্দীতে রোমে জ্বর দেবী'র মন্দির ছিল—সিসিরো ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। দার্শনিক এপিকটেটাসও ইহার কথা তুলিয়াছেন। প্লিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিয়াছেন

যে, এই মন্দিরে জন সাধারণ অর্থ-সাহায্য করিত। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে এই জ্বর দেবী ম্যালেরিয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। এবং অনেকে বলেন যে, যে সকল জেলায় পূর্ব্বে যথেষ্ট ধনশালী লোকের বসতি ছিল, এখন সেই সকল স্থান শ্মশান হইয়া পড়িয়াছে।

জোন্স সাহেব তাঁহার গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে কয়েকটী বিষয় উল্লেখ করেন নাই—সেগুলি এই।

সোফোক্লিস নামক প্রসিদ্ধ নাট্যকার তাঁহার ফিলোকটেটিস নামক নাটকের একটী দৃশ্যে জ্বরের আক্রমণের চিত্র দেখাইয়াছেন। ফিলোকটেটিস নিওপটোলেমাসের সহিত যখন জাহাজে উঠিতে যাইবেন তখন হঠাৎ তিনি জ্বরগ্রস্ত হন। এই জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে গাত্রদাহ, এবং কম্পন আইসে এবং জ্বর-বিরামের সময় ঘর্ম্ম হয়।

আমাদের দেশের প্রায় সকলেই ম্যালেরিয়ার ভাব-ভঙ্গী জানেন, সুতরাং এ প্রসঙ্গে তাহার বিষয় অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। শ্রীভট্ট।

প্রাচীন তিব্বতে চিকিৎসা-বিধি।

ইয়ুরোপ যখন অসভ্য বর্ব্বরে পরিপূর্ণ, সেই প্রাচীন সময় হইতেই তিব্বতের পুরোহিত ও পণ্ডিতগণ সুনিপুন চিকিৎসক ছিলেন।

সম্প্রতি সাইবিরিয়ার বৌদ্ধগণ রুষ গবর্মেণ্টের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন যে, তাঁহাদের মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক এবং তথায় তিব্বতের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হউক। এই আবেদন লইয়া রুষ গবর্মেণ্ট তিব্বতের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিতেছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পাইয়াছে, যে বার শত বৎসর পূর্ব্বে তিব্বতে ব্যবহৃত ভৈষজ্যপুস্তকসকলও তৎকালে অতি প্রাচীন ও দুর্লভ বলিয়া গণ্য হইত। সেই পুস্তকে যে সকল ঔষধাদির উল্লেখ আছে, ইয়ুরোপের চিকিৎসকগণ তাহার বহুশতাব্দী পরে সেগুলি আবিষ্কারে সমর্থ হন।

অতি প্রাচীন কালের তিব্বতীয় চিকিৎসকগণ দেহ-তত্ত্ব সম্বন্ধে সকল কথাই প্রায় জানিতেন। মনুষ্য-দেহে কয়খানি অস্থি আছে, কতগুলি শিরা, স্নায়ু আছে সকলই তাঁহারা জানিতেন। এমন কি এই পুস্তকে লিখিত আছে যে, মনুষ্যের দেহে এক কোটি দশ লক্ষ লোমকূপ আছে। তাঁহাদের মতে মস্তকই সকল অবয়বের রাজা এবং আমাদের জীবনের অবলম্বন। মানবের কুঅভ্যাস বা অজ্ঞতা হইতেই এবং অধিকাংশ স্থলে অসংযত ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতেই তাহার যাবতীয় রোগের উৎপত্তি। কুচিন্তা আমাদের হৃৎপিণ্ড ও প্লীহার স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করে।

দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই চিকিৎসকগণ রোগ নির্ণয়ের জন্য আধুনিক চিকিৎসকগণের ন্যায়ই উপায় অবলম্বন করিতেন। তাঁহারাও রোগীর নাড়ী, জিহ্বা ইত্যাদি পরীক্ষা করিতেন। যে সকল চিকিৎসক তাঁহাদের অস্ত্রাদি বিশেষভাবে পরিচ্ছন্ন না রাখিতেন তাঁহাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করা হইত। এই পুরাতন পুস্তক স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন যে, সুস্থ ব্যক্তি বিবেচনার সহিত নিয়মিতরূপে জীবন অতিবাহিত করিবেন, সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার বা অনিয়ম পরিত্যাগ করিবেন এবং দেহ-মনকে সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী—

ইনডিপেণ্ডেণ্ট (Independent) নামক পত্রিকায় আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ এডিসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, আমরা নিত্য যে সকল ইন্ধন ব্যবহার করি, তাহার সম্পূর্ণ শক্তিকে আমাদের ব্যবহারে লাগাইবার উপায় উদ্ভাবন করাই, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান সমস্যা। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ইন্ধন মাত্রেরই শক্তির যেরূপ অপচয় হইয়া থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়কর বোধ হইবে। এক পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধ সের কয়লার এরূপ শক্তি আছে, যাহার বলে, সে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে। আমরা তাহার উত্তাপ ও শক্তির অতি সামান্য অংশমাত্রই আমাদের ব্যবহারে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হই; অধিকাংশভাগই নষ্ট হয়। আধুনিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাষ্পীয় এঞ্জিন কয়লার শতকরা

১৫ ভাগ শক্তিমাত্র ব্যবহারে সমর্থ। গ্যাস এঞ্জিন হইলে সম্ভবতঃ শতকরা কুড়ি হইতে পঁচিশ ভাগ পর্য্যন্ত ব্যবহারে সমর্থ।

বয়লারে কয়লাকে দগ্ধ না করিয়া, তাহা হইতে তাড়িৎ উৎপন্ন করিবার জন্য আজকাল অনেক প্রকার চেষ্টা হইতেছে। কতক স্থলে অম্লজানের (Oxygen) সাহায্যে, এইরূপ তাড়িৎ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। কয়লাকে অম্লজানের সহিত সংমিশ্রিত করিতে হইলেও তাহাকে প্রথমে দগ্ধ করা আবশ্যক। তবে সেটা খুব ধীরে ধীরে দগ্ধ করিলেই চলে। মরিচা পড়া, দাহ বা স্ফোটনের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই বলিলেই হয়, কেবল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার বেগের তারতম্য মাত্র।

স্ফোটনশীল পদার্থ অতি শীঘ্র পুড়িয়া যায়। জলযুদ্ধে আজকাল অনেক স্থলে এইরূপ পদার্থ ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু তাহা নিতান্ত ব্যয়-সাপেক্ষ। এক মণ কয়লার যে শক্তি আছে, এক মণ ডিনামাইটের (dynamite) তাহা নাই। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু যে আপনিই জ্বলিয়া উঠে না, তাহার কারণ কয়লা ভিন্ন প্রায় অপর সকল বস্তুই পূর্ব্বে কোন না কোন অবস্থায় একবার দগ্ধ হইয়াছে। লৌহকে খুব চূর্ণ করিয়া অগ্নিতে দিলে, তাহা জ্বলিতে পারিত এবং আমাদের ইন্ধনের কার্য্যও করিতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাহা প্রকৃতির অগ্নিকুণ্ডে পূর্ব্ব হইতেই দগ্ধ। কয়লা সঞ্চিত সূর্য্যকিরণ মাত্র; ইহা সূর্য্যের শক্তি-ভাণ্ডার মাত্র। সূর্য্য হইতেই আমরা যে আমাদের প্রায় সকল শক্তি লাভ করিয়া থাকি, তাহা, বোধ হয়, আর কাহাকে বলিয়া দিতে হইবে না।

ইন্ধনের সমস্ত শক্তিটুকু আমাদের ব্যবহারে নিযুক্ত করিবার উপায় শীঘ্রই আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব নহে, আবার বহুকাল বিলম্ব হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

রেডিয়ামের (Radium) শক্তি প্রভূত। তাহার শক্তি অসীম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রেডিয়াম জ্বলন্ত বস্তু নহে। ইহা আপনার পরমাণু পরম্পরা হইতে শক্তি বিকীর্ণ করে। ইহার এই শক্তি যে কিরূপে সংগৃহীত হয়, তাহা আমরা আজিও জানি না। এক গাড়ি রেডিয়ামের শক্তি পৃথিবীর প্রতি বৎসর উত্তোলিত অসংখ্য মণ কয়লার শক্তির সহিত সমান। আধুনিক অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদের মতে রেডিয়মই পৃথিবীর উত্তাপের কারণ। রেডিয়ম আছে বলিয়াই, অবিরাম উত্তাপ ত্যাগ সত্ত্বেও এই পুরাতন পৃথিবী আজিও সমানভাবেই উত্তপ্ত রহিয়াছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে রেডিয়ম না থাকিলে এত লক্ষ-লক্ষ বৎসরের উত্তাপ-ত্যাগের ফলে, এ পৃথিবী এতদিনে হিম-শীতল হইয়া যাইত। বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় এতদিনে রেডিয়াম অতি অল্পই বাহির হইয়াছে সত্য, কিন্তু জলে-স্থলে সর্ব্বত্রই রেডিয়াম বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই নবাবিষ্কৃত পদার্থের অনন্ত শক্তিকে মনুষ্যের উপকারে লাগাইবার উপায় উদ্ভাবন করার আশা এক্ষণে সুদূর-পরাহত। রেডিয়ামের সাহায্যে, সম্প্রতি একটি ঘড়ি প্রস্তুত হইয়াছে। ঘড়িটি বিনাদমে বহুশতাব্দী ধরিয়া চলিবে। যান্ত্রিক ব্যবহার ভিন্ন রেডিয়াম মনুষ্যের নানাপ্রকার রোগের চিকিৎসাতেও উপকারী বলিয়া শুনা যায়।

রেডিয়াম ভিন্নও এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার সম্বন্ধে আমরা কিছুই বুঝি না। আজকাল জলপ্রপাতের শক্তিকে মানবের কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার নানাপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে। হয়ত কিছুদিন পরে জোয়ার-ভাঁটার প্রবল শক্তি আমাদের দাসত্ব করিতে থাকিবে। জলস্রোতের শক্তি অসামান্য সন্দেহ নাই; বিরাট-দেহ জাহাজগুলাকে ক্রীড়া-পুত্তলির ন্যায় আন্দোলিত করিতে থাকে। পবনদেবের অসীম শক্তি হইতে তাড়িৎ উৎপন্ন করিয়া নানারূপ কর্ম্মে নিযুক্ত করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। সূর্য্যতাপে চালিত এঞ্জিনের শক্তিও প্রভূত। এইরূপ এঞ্জিন প্রস্তুত করিবার জন্য আজকাল অনেকে চেষ্টা করিতেছেন। দক্ষিণ আমেরিকাতে এইরূপ একটি এঞ্জিনে কাজ হইতেছে। আগ্নেয়গিরির উত্তাপ হইতে তাড়িৎ সৃষ্টি করিয়াও নানাপ্রকার কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।

চীনের বিবাহ-প্রথা। বিলাতের Lady's Realm নামক পত্রে চীনের বিবাহ-প্রথা সম্বন্ধে মিসেস লিট্‌ল্ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মিসেস

লিট্‌ল্ বলেন যে, চীনে কোর্টশিপ-প্রথা আদৌ প্রচলিত নাই। ঘটক ও ঘটকীই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেয়। বর-কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে কেহ কাহারো মুখ দেখিতে পায় না। চীনে যে ব্যক্তি বিবাহ করে না, তাহাকে "বক্র যষ্টি" বলে।

পত্নী প্রকৃতপক্ষে স্বামীর "বিনা মাহিনার" চাকরাণী, অথবা শ্বশ্রূমাতার সাহায্যকারিণী ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্ত্রী ও মাতাতে কলহ হইলে স্বামী সর্ব্বদাই নিজ মাতার পক্ষ অবলম্বন করেন। যখন বিবাহ হইয়া যায়, তখন বর ও কন্যা উভয়েই উভয়ের পরিধান বস্ত্রের উপর বসিবার চেষ্টা করে; কেন না যাহার বস্ত্রের উপর বসিবে, সেই অপরের দাস বা দাসী হইবে। বিবাহে কোনরূপ মন্ত্রাদি নাই।

বর্ত্তমানকালে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। এখন অনেকে বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী পত্নীকে দেখিতে চাহেন এবং বিবাহান্তে কেহ বা নিজ পত্নীকে প্রেম ও শ্রদ্ধার চক্ষেও দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ প্রেমপত্র—প্রেম জিনিষটা পদ মর্য্যাদার বাধ্য নহে। বড়লোক হইলেই যে তাহার প্রেমটাও বড় হইবে, এমন কোন কথা নাই। তবে বড় লোকের জীবনের অন্য সকল কাহিনী জানিবার জন্য, সাধারণের যেরূপ একটা কৌতূহল হয়, তাঁহাদের প্রেমের পরিচয়টুকু লাভ করিবার জন্যও, সেইরূপ কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অনেক নরনারীর প্রেমপত্র একত্র করিয়া ফরাসী দেশে একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা দুই একটা প্রেমপত্রের আভাষ তুলিয়া দিলাম।

একটি প্রসিদ্ধ সুন্দরী তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী এক খ্যাতনামা পুরুষকে লিখিতেছেন, "ভালবাসার বিপদ কোথায় তোমাকে বলব? প্রেমের একটা অত্যুচ্চ কল্পনা খাড়া করাই তার প্রধান বিপদ। সত্যকথা বলিতে গেলে, আমাদের প্রেমটা একটা অন্ধ আবেগ বা বন্ধুত্ব ও সস্নেহ শ্রদ্ধার বন্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি উপন্যাসের বীর নায়কের পথ অনুসরণ করে, তুমিও সেইভাবে প্রেমের পথে অগ্রসর হও, তা হলে অবিলম্বেই দেখতে পাবে যে, তোমার সে বীরত্ব প্রেমকে একটা দুঃখময়, এমন কি সাংঘাতিক নির্ব্বুদ্ধিতায় পরিণত করেছে। এরূপে প্রেমকে পেতে যাওয়া কেবল পাগলামিমাত্র। প্রেমকে তার যথার্থ-রূপে যদি পেতে চাও, তবেই তোমার পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব।

"প্রেমের মধ্যে সাধুতা! তুমি কি করে এ কথা মনে করতে পার, আমি বুঝতে পারি না। হায়, মানুষের মহৎ ভাবগুলার আজকাল আর চলন নাই। আজকাল প্রেম বলতে, কেবল মানুষের প্রকৃতি ও মনোভাব নিয়ে খেলাটাই বুঝায়। অনেক সময়ে যেমন আপনার প্রেমের মহত্ত্বকে গোপন রাখা আবশ্যক হয়, তেমনি যতটুকু সত্য, তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি বলেও প্রকাশ করতে হয়।

"আমি তোমায় ভালবাসি" এই তিনটী কথার মূল্য তোমার কাছে বড় বেশি দেখি। তুমি কি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক! আত্মসংযতা স্ত্রীলোকের পক্ষে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও "আমি তোমায় ভালবাসি" বলতে বাধ্য হওয়ার চেয়ে বেশী কষ্টকর কাজ আর নাই। তোমার পক্ষে মঙ্গল কিসে বলব? তোমার প্রেমপাত্রীকে ওই কথাটা বলাবার জন্য পীড়ন না করে, এমনভাবে চলো যে, সে যে তোমাকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছে, এ কথা যেন সে বুঝতেই না পারে। তোমায় কাছে তার অন্তরের প্রেম প্রকাশ করতে বাধ্য করার পূর্ব্বে, তার অন্তরে অজ্ঞাতে প্রেমের সঞ্চার হ'তে দেও। অনেক সময় স্ত্রীলোক পুরুষকে ভালবাসে বলেই, সে তার কাছে তার নিজের প্রেম প্রকাশ করতে চায় না। আমরা মনে মনে ইচ্ছা করলেও অন্তরের প্রেমটা স্বীকার করতে কেমন একটা অপমান বোধ করি।

"আমার বিশ্বাস, তোমার এমন আগ্রহ প্রেমের লক্ষণ নয়, আত্মম্ভরিতার একটা রূপান্তর মাত্র। এ বিষয়ে ভগবান আমাদের একটা স্বাভাবিক বোধ শক্তি দিয়াছেন, সেটা যেন মনে থাকে।"

নেপোলিয়নের ভ্রাতা তৎকালীন সর্ব্বপ্রধানা সুন্দরীকে লিখিতেছেন—

"সুন্দরী জুলিয়েট, (সেক্সপীয়রের এক নাটকের

নায়িকা) আজ রোমিও (নায়ক) তোমাকে এই পত্র লিখিতেছে। এই ক্ষুদ্র পত্র পাঠে যদি অসম্মত হও তাহা হইলে তুমি তোমার পিতামাতা অপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুর বলিয়া জানিব। কয়েকদিন পূর্ব্বে তোমার খ্যাতিই আমার নিকট তোমার একমাত্র পরিচয় ছিল। সময়-সময় তোমাকে কোন মন্দিরে বা উৎসবে দেখিয়াছি মাত্র। আমি জানিতাম যে, তোমার ন্যায় সুন্দরী আর নাই, সকলেই তোমার প্রশংসা করিত। কিন্তু তোমার সে রূপপ্রশংসা আমাকে মুগ্ধ করে নাই। এক্ষণে আমাদের সংসারে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার অন্তর অশান্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

"আমি আবার সেদিন তোমাকে দেখিয়াছি। প্রেম আসিয়া আমাকে অধিকার করিয়া বসিল। সেদিন আমরা দুইজনে একই আসনে একান্তে বসিয়াছিলাম। আমার মনে হইল, যেন তোমার উদ্বেলিত অন্তর হইতে একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনিলাম। সেটা কেবল আমার মনের ভ্রান্তিমাত্র। এখন তাহা বুঝিতেছি। আমি প্রাণের আবেগ জানাইয়া তোমার নিকট কেবল পরিহাস পাইলাম।

"হায়, জুলিয়েট! প্রেমহীন জীবন কেবল জ্ঞানহীন নিদ্রামাত্র। সর্ব্বপ্রধানা সুন্দরীর প্রাণও কোমল হওয়া আবশ্যক। তোমার অন্তরের উপর যে আধিপত্য করিবে, এ মরজগতে সে-ই সুখী।"

গ্যায়েটা তাঁহার প্রেমপাত্রীকে লিখিতেছেন—"প্রিয়ে, আমাদের পরস্পরের মনোভাব একই প্রকার; আমাদের উভয়ের আত্মা অভিন্ন। আমি তোমার পবিত্র প্রেমের স্বর্গীয় সুধা, প্রাণ ভরিয়া, পান করিতেছি। এ প্রেমের কণাটুকু পাইবার জন্য, পৃথিবীর মহত্তম মানবও চিরদিন লালায়িত। জগতের এই অসংখ্য নারীর মধ্যে একমাত্র তুমিই সে অপূর্ব্ব রত্ন-দানে সক্ষম। আমাদের যে মিলন, সেটা দেহের নয়—আত্মার। আমাদের এই প্রেম, আমার অন্তরে যে, কত অসংখ্য চিন্তা ও অশেষ সুখ আনিয়া উপস্থিত করে, তাহা আর তোমাকে কি বলিব। যে নূতন মনোরম জগৎ আবিষ্কার করিবার জন্য মানবমাত্রেই আকুল, আমি যে, আজ তাহা করায়ত্ত করিয়া অসীম সুখের অধিকারী হইয়াছি, তাহার জন্য আমি তোমারই নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী। আমি তোমাকে পবিত্র স্বর্গের দেবী জানিয়া অন্তর-মধ্যে পূজা করি।" যঃ।

কল্পবেশ সম্মিলন।

লেডি জেঙ্কিন্সের নিমন্ত্রণ। পুরুষ নাই, নানাদেশের নানাবেশের মহিলাগণ কেবল সমাগত।

কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা, এই প্রবচনটি ইংরাজদিগের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইতে দেখা যায়। বস্তুতঃ কাজের লোক বলিয়াই তাঁহারা জীবন উপভোগ করিতে জানেন। সন্ধ্যার নানারূপ খেলা আমোদপ্রমোদের মধ্যে কল্পবেশ বা ছদ্মবেশ সম্মিলন তাঁহাদের একটি উপাদেয় প্রমোদ। এইরূপ নিমন্ত্রণে আহূত অতিথিগণের বিভিন্ন মনোহারী সজ্জায় মিলন গৃহ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। কেহ দিবা, কেহ রাত্রি, কেহ বসন্ত ঋতু, কেহ শরৎ, কেহ পৌরাণিক কোন দেবতা, কেহ ঐতিহাসিক কোন ব্যক্তি কেহ ভিন্ন দেশবাসী; এইরূপ নানাজনে নানারূপ সুরুচিয়া বেশভূষার নিদর্শনে তাহা ফুটাইয়া তোলেন। এই কলায় যিনি যত পারদর্শী তিনি তত প্রশংসালাভ করেন। বলা বাহুল্য ইংরাজের মধ্যে ঐইরূপ সম্মিলনে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। কিন্তু লেডি জেঙ্কিন্স সম্প্রতি তাঁহার বিলাত-

যাত্রার পূর্ব্বে বঙ্গরমণীগণের আনন্দবিধান উদ্দেশ্যে কেবল মহিলাদিগকেই এই নিমন্ত্রণে আহ্বান করিয়াছিলেন। লেডি মিণ্টো লেডি বেকার হইতে সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ রমণী পর্য্যন্ত এখানে সমবেত হইয়াছিলেন। ইংরাজ রমণীর অনেকেই ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী মহিলা, কেহ বা বঙ্গরমণী, জিপসিরমণী জাপানরমণী, চীনরমণী, তুর্করমণী, ইজিপ্ট-রমণী, কেহ ইংলণ্ডের গ্র্যাজুয়েট ললনা; কেহ প্যানজি ফুল,—এইরূপ কতজনে কত রকম বেশ ধরিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণকর্ত্রী লেডি জেঙ্কিন্স স্বয়ং বারাণসী শাড়ী ও মণিমুক্তা অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সাজিয়াছিলেন বঙ্গদেশের একজন মহারাণী। এ সাজে তাঁহাকে কিরূপ সুন্দর দেখাইতেছিল তাহা চিত্র হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস ছিল— বাঙ্গালী মেয়েদের যেমন ইংরাজি পোষাকে মানায় না, ইংরাজ মেয়েদিগকেও বুঝি তেমনি শাড়ীতে বেমানান দেখায়। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল,—আমাদিগকে ইংরাজি পোষাকে মানায় না ইহাই ঠিক।

বাঙ্গালী মেয়েও অনেকে কল্পিত সাজে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাজ যে ইংরাজ মেয়েদের তুলনায় কম শোভন হইয়াছিল —তাহা নহে। ইঁহাদের কেহ পারসীরমণী, কেহ মহারাষ্ট্রী ললনা কেহ বা ইজিপ্টবালা কেহ বা সন্ন্যাসিনী, কেহ ভিখারিণী। একজন সাজিয়াছিলেন, রবিবর্ম্মার চিত্র কল্পিত গঙ্গাদেবী; একজন ফতেমা; একজন তুর্ক রাজকুমারী। ইঁহাদের সাজ এমন সুন্দর হইয়াছিল যে আমার মনে হয় প্রাইজ থাকিলে এই তিনজনের মধ্যেই কেহ পাইতেন।



লেডি জেঙ্কিন্স



আংশিক মিলন চিত্র।

নিমন্ত্রণে দুইএকজন মুসলমানকন্যা, ও দুএকজন নেপালকন্যা ছিলেন। তাঁহাদের স্বাভাবিক বেশই আমাদের নিকট কল্পবেশ বলিয়া মনে হইতেছিল।

এই সুচারু সুন্দর দৃশ্য,—বিভিন্ন জাতির অপূর্ব্ব মিলন; সর্ব্বোপরি গৃহকর্ত্রীর আতিথ্য সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। ইঁহার আতিথ্য প্রকৃতই আদর্শস্থানীয়। তিনি কেবল নিমন্ত্রিত মহিলাগণের আনন্দ আয়োজনেই তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তাঁহাদের ভৃত্যবর্গ সইস কোচমান দ্বারবান প্রভৃতি যাহাতে প্রভু-পত্নীর অপেক্ষায় রাস্তায় হাই তুলিয়া না কাটায়—সেইজন্য প্রাচীর গাত্রে বায়স্কোপ হইতেছিল,—ভৃত্যগণ সকলেই রাস্তা হইতে দেখিতেছিল। আমি গাড়ীর সঙ্গে একজন অল্পবয়স্ক দ্বারবানকে লইয়া গিয়াছিলাম। বায়স্কোপ দেখিয়া সে এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে আমার কাছেও তাহা প্রকাশের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বাড়ী ফিরিয়াই উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—"আজ যাহা দেখিয়াছি—এমন তামাসা জীবনে দেখি নাই।" পরে শুনিলাম—সে উহা প্রকৃত ঘটনা মনে করিয়াছিল।

লেডি জেঙ্কিন্স প্রকৃতই স্বামীর সহধর্ম্মিণী। দেশের লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশায়,—আদর যত্নে, কথায় ব্যবহারে ভারী একটা সহজ স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়।—তিনি যে অন্তর হইতে আমাদের শুভকামনা করেন, এবং আমাদের সহিত মিলন ইচ্ছাও যে তাঁহার মৌখিক নহে তাঁহার সহিত পরিচয়েই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

লেডি জেঙ্কিন্স একজন শিকারী মহিলা। শিকার অভিপ্রায়ে তিনি তিব্বত গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহাকে কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী পাঠে তাহা জানা যায়।

ধূমকেতু।

কয়েকমাস হইতে ইংরাজী এবং বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় ধূমকেতু সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। প্রায় সকল লেখকই হ্যালির ধূমকেতুর পুচ্ছের সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষণ হইবে বলিয়া অল্লাধিক ভীত হইয়াছেন। কেহ বলেন যে সেই সংঘর্ষণের ফলে আমরা হাসিতে হাসিতেই অথবা কাঁদিতে কাঁদিতেই মরিয়া যাইব। কেহ কেহ পৃথিবী চূর্ণ হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করেন। কেবল শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে হ্যালির ধূমকেতুর সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষণের কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু তাহার পুচ্ছের ভিতর দিয়া আমাদিগের যাওয়া অপরিহার্য্য। তাহাতে কোন অনিষ্ট হইবে কিনা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় চৈত্রের প্রবাসীতে লিখিয়াছেন "ঘর্ষণে বা স্পর্শনে কি অনিষ্ট হইতে পারে, কিংবা কি ইষ্ট কি সৃষ্টিস্থিতির মঙ্গল বিধান হইতে পারে, তাহা ভবিতব্যই জানে" এক ইউরোপীয় জ্যোতির্বিৎ লিখিয়াছেন যে, সূর্য্যতাপের চাপে ধূমকেতুর পরমাণু বাহির হইয়া পড়িয়াই পুচ্ছের আকার ধারণ করে। সেই পরমাণু কিরূপ তাহা

বিদিত নাই। পৃথিবী তাহার সংস্পর্শে আসিলে আমাদের মঙ্গলও হইতে পারে অমঙ্গলও হইতে পারে।

আমি ধূমকেতু সম্বন্ধে যতগুলি প্রবন্ধ পড়িয়াছি তাহাতে আমার আশঙ্কা হয় যে, কোন প্রবন্ধ লেখকই দুই আর দুই মিলাইলে যেমন চারি হয় সেইরূপ যুক্তি অনুসরণ করিয়া ধূমকেতুর পুচ্ছের উপাদান সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। তাঁহারা সকলেই লিখিয়াছেন যে কোনো ধূমকেতুরই কিছুমাত্র গুরুত্ব নাই বলিলেই হয়। বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন যে সূর্য্য ধূমকেতু ও পৃথিবীর সমসূত্রে অবস্থান কালে ধূমকেতু মধ্যবর্ত্তী হইলেও আমরা ধূমকেতুর ছায়া পাইব না। বিদ্যানিধি মহাশয় আর এক স্থানে লিখিয়াছেন "লোকে মনে করে কেতুর পুচ্ছ তাহার নিত্য অঙ্গ। হাত পা আমাদের দেহের নিত্য অঙ্গ, কিন্তু কেতুর পুচ্ছ সেরূপ নহে। ইহার প্রধান প্রমাণ, যখন কেতু সূর্য্যের নিকটে আসে, তখনই পুচ্ছ থাকে, এবং সে পুচ্ছ সূর্য্যের বামে যেদিকে, দক্ষিণে সেদিকে থাকে না। কেতু ভীষণ বেগে সূর্য্যের বাম হইতে দক্ষিণে (কিংবা দক্ষিণ হইতে বামে) চলিয়া যায়, পুচ্ছও সঙ্গে সঙ্গে দিক্ পরিবর্ত্তন করে।" অপিচ "যে ভীষণ বেগে দিক্ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাতে পুচ্ছ বিচ্ছিন্ন হইবার কথা।" অবশেষে বিদ্যানিধি মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে প্রতি মুহূর্ত্তেই ধূমকেতু হইতে নূতন পরমাণু বাহির হইয়া পুচ্ছাকার ধারণ করে। অথবা এখানে বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিজের কথাই উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাউক। তিনি বলেন "পুচ্ছ তরল বাষ্পে নির্ম্মিত। ধূঁআর পুচ্ছ এত বেগ সংবরণ করিতে পারিত না। সুতরাং যেমন ধাবমান রেলগাড়ী কিংবা জাহাজের ধূঁআ, কেতুর পুচ্ছও তেমনি বলিয়া অনুমান হয়। এইমাত্র যে ধূমপুঞ্জ দেখিলাম, পরক্ষণে তাহা দেখি না অন্য ধূম দেখি।"

বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হইত তাহা হইলে ধূমকেতুর অস্তিত্ব এতদিন লোপ পাইত। ধূমকেতুমাত্রেই অল্প পরমাণু। যদি প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহা হইতে নূতন পরমাণু বাহির হইয়া যাইত তাহা হইলে অন্তত হ্যালির ধূমকেতু যাহার অন্তত তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস সুপরিজ্ঞাত আছে তাহা বহুদিন বা বহু বৎসর পূর্ব্বে একেবারে নিঃশেষিত হইত।

বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন যে, "ধূমকেতুর পুচ্ছ সর্ব্বদা সূর্য্যের বিপরীত দিকেই থাকে কেন? কে জানে?"

বিদ্যানিধি মহাশয় এবং অন্যান্য জ্যোতির্বিদেরা ধূমকেতু সম্বন্ধে প্রধানত যে চারিটি তথ্য নির্ণয় করিয়াছেন তাহা হইতেই ত উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। (১) ধূমকেতুর গুরুত্ব বা ভার নাই। (২) ধূমকেতুর পুচ্ছ সর্ব্বদা সূর্য্যের বিপরীতদিকে থাকে। (৩) ধূমকেতু মধ্যে থাকিয়া পৃথিবী ধূমকেতু ও সূর্য্যের সমসূত্রপাত হইলেও পৃথিবীতে সূর্য্যালোকের ন্যূনতা হয় না। এই কয়েকটী নির্ণীত তথ্য হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তে আসা যাইতে পারে নাকি যে, ধূমকেতু কাচ সদৃশ স্বচ্ছ বস্তুর শূন্যগর্ভ গোলক বা প্রতি-গোলক বা গোলকাভাস মাত্র। তাহার মধ্য

দিয়া সূর্য্য কিরণ বাহির হইয়াই পাহারাওয়ালার লণ্ঠনের আলোকের মত ক্রমশঃ স্থূল পুচ্ছাকার ধারণ করে। গোলকাভাস (double convex) কাচ আলোকের নিকট ধরিলে যেমন তাহা হইতে বহুদূরগামী পুচ্ছবৎ আলোক বাহির হয় অথবা কোন বস্তু আলোকের যত নিকটে থাকে ততই যেমন তাহার ছায়া বড় হয় তেমনই ধূমকেতু সূর্য্যের যত নিকটে থাকে ততই তাহার পুচ্ছ দীর্ঘ ও স্থূল হয়। ধূমকেতু স্বচ্ছ পদার্থ বলিয়াই সমসূত্রপাতে তাহার ছায়া পড়ে না। সূর্য্যের আলোক কাচের ভিতর দিয়া বাহির হইলে যেমন তাহার রাসায়নিক কোন পরিবর্ত্তন হয় না সেইরূপ ধূমকেতুর মধ্য দিয়া পুচ্ছাকারে বাহির হইলে তাহার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় না; সুতরাং তাহা হইতে মঙ্গল বা অমঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই। সমস্ত বস্তুরই ছায়া যেমন সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে ধূমকেতুর পুচ্ছও তদ্রূপ সর্ব্বদা সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে।

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব জ্যোতিষী প্রক্টর এই মতের প্রবর্ত্তক ছিলেন। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ধূমকেতু শূন্যগর্ভ ভারহীন স্বচ্ছ পদার্থ এবং সূর্য্যের আলোক তাহার মধ্য দিয়া বাহির হইয়াই পুচ্ছের আকার ধারণ করে এবং সেই জন্যই পুচ্ছ সর্ব্বদাই সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

আলো ও ছায়া রচয়িত্রী।

শ্রীমতী কামিনী দেবী।

বাঙলার কাব্যসাহিত্যে শ্রীমতী কামিনী রায়ের নাম বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাঁহার রচিত 'আলো ও ছায়া'র পরিচয় নূতন করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কবিবর হেমচন্দ্র একদিন যাঁহার কবিতাবলী পাঠ করিয়া আনন্দিত চিত্তে বলিয়াছিলেন, "কবিতাগুলি ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্ম্মলতা, এবং সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি", তাঁহার কবিতার রসাস্বাদনে যিনি বঞ্চিত, তিনি হতভাগ্য, সন্দেহ নাই।

কামিনী দেবীর কবিতাগুলির প্রধান গুণ, তাহার কোনখানে অস্পষ্টতা দোষ নাই, ভাবের জটিলতা নাই—ছন্দের আড়ষ্ট ভাব নাই—তাহা অবাস্তব চিন্তাতরঙ্গে পাঠকের চিত্তপীড়ার উদ্রেক করে না, তাহা লঘু, স্বচ্ছ, নির্ম্মল। চটুলতা বা অসংলগ্নতা দোষ হইতে মুক্ত! এবং কামিনী দেবীর কবিতা যে, অনুকরণ নহে, এ কথাও মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

এতাবৎ তাঁহার চারি খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৮৯ সালে "আলো ও ছায়া," ১৮৯০ সালে "নির্ম্মাল্য," এবং "পৌরাণিকী", ও ১৯০৪ সালে "গুঞ্জন"। তন্মধ্যে "আলো ও ছায়া" এবং "নির্ম্মাল্য" খণ্ডকবিতার সমষ্টি, "পৌরাণিকী," একলব্যের গুরুদক্ষিণা বিষয়ক নাটিকা, এবং "গুঞ্জন" শিশুরাজ্যের কবিতা। খণ্ড কবিতাগুলি কবির সার্দ্ধ পঞ্চদশ হইতে

সার্দ্ধৈকবিংশতি বর্ষ বয়সের মধ্যে লিখিত। নির্ম্মাল্যের কোন কোন কবিতা আরো অল্পবয়সের রচনা।

'আলো ও ছায়া'র অধিকাংশ কবিতাই ভাবসম্পদে পূর্ণ! "যৌবন তপস্যা," "মুগ্ধ প্রণয়" প্রভৃতি কবিতার ভাবগুলি অতি



সুন্দর। স্থানাভাবে আমরা তাহার বিশদ পরিচয় প্রদানে অক্ষম। প্রণয় মানবকে দিব্য চক্ষু প্রদান করে—সেই দিব্য চক্ষুর অমৃত দৃষ্টি-স্পর্শে প্রণয়মুগ্ধ নর, নারীহৃদয়ে দেবীত্বের সন্ধান পায়। কবি বলিতেছেন,

"পাষাণের প্রতিমাটি যবে,
প্রাণময়ী নারীরূপ ধরে,
নারী তবে পারে না কি তবে
দেবী হতে বিধাতার বরে?"

মুহূর্ত্তের ভুলে স্খলিতা নারী অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কবি করুণ সুরে সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন,

"বর্ত্তিকা লইয়া হাতে, চলেছিলে একসাথে,
পথে নিবে গেছে আলো, পড়িয়াছে তাই,
তোমরা কি দয়া করে, তুলিবে না হাত ধরে,
অর্দ্ধদণ্ড তার লাগি থামিবে না ভাই?
তোমাদের বাতি দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া,
তোমাদেরি হাত ধরি হোক্ অগ্রসর,
পঙ্কমাঝে অন্ধকারে, ফেলে যদি যাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর!"

আবার বলিতেছেন,

'দিনেকের অবহেলা, দিনেকের ঘৃণাক্রোধ,
একটি জীবন তোরা হারাবি জনমশোধ।
তোরা না জীবন দিবি? উপেক্ষা যে বিষবাণ
দুঃখভরা ক্ষমা লয়ে, আন ওরে ডেকে আন।"

'আলো ও ছায়া'র পরিশিষ্ট অংশে "মহাশ্বেতা" ও "পুণ্ডরীক" খণ্ডকাব্য। এ দুটি ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে। "পৌরাণিকী"তে 'একলব্য' নাটিকা ভিন্ন "ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ" ও "রামের প্রতি অহল্যা" শীর্ষক দুইটি কবিতা আছে। "রামের প্রতি অহল্যা" কবিতাটি অপূর্ব্ব। অহল্যা বলিতেছেন,

নরদেব, কিছু ভুলি নাই,
কাল যাহা পাপ ছিল, আজো আছে তাই,
শুধু সেই পাপী নাই। পাপী চিরদিন
থাকে না পাপের পঙ্কে বিকৃত, মলিন,
অস্পৃশ্য। প্রভাতালোকে ধরণী তেয়াগি
যায় যথা অন্ধকার, পুণ্যালোক লাগি
দুষ্কৃতি কালিমা হয় চির অন্তর্হিত;
তাই অহল্যার নাম রমণী ঘৃণিত,
রবে না ঘৃণিত আর।"

* * * *

নারীর সতীত্ব যায় মানব ভাষায়
শোনা ছিল, নারী কভু সতীত্ব যে পায়
তুমি তা দেখালে প্রভু, সে কারণে রাম
চিরস্মরণীয় হবে অহল্যার নাম।"

এ কয় ছত্রের মধুরতা ও গভীরতা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

"গুঞ্জন" পুস্তকে যে কবিতাগুলি আছে, তাহা শিশুরাজ্যের। ছড়ার সহজ সুরটুকু কবিতাগুলির মধ্যে দিব্য ফুটিয়াছে! শিশুর কল্পনা বিকাশের পক্ষে কবিতাগুলি অদ্বিতীয় সহচর সেগুলি শিশুদিগের মতই চঞ্চল, সজীব!

এক্ষণে আমরা শ্রীমতী কামিনী দেবীর জীবনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাসন্ডাগ্রামে এক মধ্যবিত্ত বৈদ্যপরিবারে কামিনী দেবীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বনামখ্যাত গ্রন্থকার চণ্ডীচরণ সেন। কামিনীদেবীর পিতামহ ও পিতামহী অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ ও ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাদের জীবনের প্রভাব তাঁহাদের পুত্রের ও কিয়ৎ পরিমাণে পৌত্রীর জীবনে অনুরঞ্জিত হইয়াছে।

শিশুর কথা ফুটিবার পর হইতেই পিতামহ তাহার নিকট নানাপ্রকার শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। প্রতিদিন শুনিয়া শুনিয়া ইহার অধিকাংশই শিশুর মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। কেহ বাড়ীতে আসিলে পিতামহের আদেশে সেগুলি নানাপ্রকার ভঙ্গিসহকারে তিনি পুনরাবৃত্তি করিতেন।

এই সকল বাঙ্গলা ও সংস্কৃত মিশ্রিত শ্লোকে সকল সময়ে পদের মিল না থাকিলেও প্রায় শেষভাগে একটি করিয়া নীতি উপদেশ থাকিত।

যেমন "না করিব হিংসা না করিব রোষ
সভার মধ্যে পড়িব শ্লোক।"
"ওহে গোরা কালা কেন নিন্দ?
কালা রজনী সভা করে চন্দ্র,
কালা অক্ষর জপয়ে পণ্ডিত,
কালা কৃষ্ণ জগৎ পূজিত,

কালো কেশে উজ্জ্বল মুখ।
কালো কোকিলের বচন মধুর।"

কামিনীর প্রথম বর্ণপরিচয় মাতার নিকটে হয়। শিশুর জন্মের পূর্ব্বেই নিজের যত্নে তিনি একটু লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন। বাড়ীর প্রবীণাদের ভয়ে তাঁহাকে লুকাইয়া লেখাপড়া করিতে হইত। রন্ধন গৃহের যেস্থানটি হেঁসেল বা হাঁড়িশাল বলিয়া পরিচিত তাহা কাঁচা মাটীর দেয়ালে ঘেরা ছিল। তাহারি গায়ে কাঠ শলাকা দিয়া তিনি অক্ষর লিখিতে অভ্যাস করিতেন ও প্রত্যহ রন্ধনশেষে গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকার লেপ দিয়া সব ঢাকিয়া দিতেন। তখন বাসণ্ডাগ্রামের লোকের এইরূপ ধারণা ছিল যে, স্ত্রীলোকদিগকে লেখাপড়া শিখাইলে দুর্নীতির পথ উন্মুক্ত হইবে, স্ত্রীলোকেরা সকলের সহিত গোপনে পত্রালাপ করিবে। সুতরাং মধ্যবিত্ত পরিবারে লেখাপড়ার চর্চ্চাকে কেহ প্রশ্রয় দিত না। ধনাঢ্যগণের গৃহে দশটা সৌখীন কার্য্যের মধ্যে লেখাপড়া শেখাটাও একটা বলিয়া, কোনো কোনো মহিলা আত্মীয়গণের নিকট লেখাপড়া শিখিতেন; কেহবা বালিকা বয়সে সহোদরগণের সহিত গৃহ গুরুমহাশয়ের নিকট লেখা অভ্যাস করিতেন। বাসণ্ডাগ্রামে এই শ্রেণীর কোন কোন মহিলার সুন্দর হস্তাক্ষর আদর্শস্থানীয় ছিল। কামিনীর জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার মাতৃদেবীর সন্তান সম্ভাবনার সংবাদ পাইয়া পিতা স্ত্রীকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য, মাতৃত্বের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কিছু উপদেশ ছিল। পত্রখানি ডাকঘর হইতে বাটীতে না আসিয়া গ্রামের কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে গেল, তাহারা চিঠিখানি খুলিয়া পড়িয়া কামিনীর পিতামহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পুত্র বধুকে পত্র লিখিয়াছে দেখিয়া তিনি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন, পত্র লইয়া তাঁহার বৈবাহিকের নিকট গেলেন। তিনিও জামাতার কার্য্যে বড় অপ্রতিভ হইলেন। চিঠিখানি লইয়া বাড়ীতে খুব একটা হুলুস্থুল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছিল।

কামিনীর চারিবৎসর বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ হয়। মাতার নিকটেই তিনি বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ ও শিশুশিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ শেষ করেন। দেড় বৎসর ধরিয়া শিশুশিক্ষাখানি ক্রমাগত পড়িতে পড়িতে বইখানি আদ্যোপান্ত তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। মাতা যখন রন্ধনশালে রাঁধিতেন বা শ্বশুরের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকিতেন, কামিনী তখন মাটীর দোয়াতে স্বগৃহে ও স্বহস্তে নির্ম্মিত এক দোয়াত কালী ও একতাড়া তালপাতা ও একটা খাকের কলম লইয়া লিখিতে বসিতেন। লেখাপড়া শেষ হইলে তালপাতাগুলি গুছাইয়া একটা বন্ধনীর মধ্যে ভরিয়া তদুপরি কলম রাখিয়া ও কলমের উপর ললাট রাখিয়া নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করিতেন।

"লাগ লাগ্ সরস্বতী মোর কণ্ঠে লাগ
যাবজ্জীবন তাবৎ থাক্
আমার ভাগ্যে গুরুর যশ
দিনে দিনে বিদ্যা বাড়িতে থাক।"

"স্বং ত্বং সরস্বতী নির্ম্মল বরণে
রত্ন বিভূষিত কুণ্ডল করণে
উজ্জ্বল মুকুতা গজমতিহারে
দেবী সরস্বতী বর দেও আমারে
বীণাপুস্তক রঞ্জিত হস্তে
ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে।"

স্কুলে আসিবার কিছুদিন পরেই অপার প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান পাইলেন। পিতা তাঁহাকে গণিত এমন সুন্দর শিখাইয়াছিলেন যে, ক্লাসে সে সময়ে কেহই গণিতে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তাঁহাদের গণিতের শিক্ষক বাবু শ্যামাচরণ বসু তাঁহাকে গণিতের পারদর্শিতার জন্য লীলাবতী আখ্যা দিয়াছিলেন। ১৪ বৎসর বয়সে মাইনরপরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই সময় কামিনীর পিতা জলপাইগুড়ির মুন্সেফ। পিতা চিরকালই অধ্যয়নশীল ছিলেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি নানা বিষয়ক গ্রন্থরাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ রুচি থাকাতে এই সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক তাঁহার পুস্তকাগারে ছিল। মাইনর পরীক্ষা দিয়া বাড়িতে আসিয়া কামিনী সমস্ত সময়ই এই পুস্তকাগারে কাটাইতেন।

বাল্যকাল হইতেই কামিনী ভাবুকতা প্রবণ ও কল্পনাপ্রিয় ছিলেন।

অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে কামিনী প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। পদ্য রচনা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত উপহার দিলেন। তাঁহার যখন নয় বৎসর বয়স তখন তাঁহার পিতা দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁ সবডিভিসনে মুন্সেফ হইয়া যান। সে সময়ে সে স্থানে যাইতে হইলে কতকটা পথ গরুর গাড়ীতে যাইতে হইত; সপরিবার তথায় যাওয়া সুবিধাজনক নহে বলিয়া স্ত্রী ও কন্যাগণকে কেশববাবুর ভারতাশ্রমে রাখিয়া পিতা একাই কর্ম্মস্থানে গেলেন। ইহার কিছুদিন পরে কামিনী হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়ে বোর্ডার হন। ছয়মাসকাল এখানে থাকিয়া তাহার পর আবার পিতার কর্ম্মস্থান মাণিকগঞ্জে ফিরিয়া আইসেন। ইহার পরবর্ত্তী দেড় বৎসরকাল পিতাই কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন প্রতিদিন সকালে উপাসনার পরই হয় বাইবেল না হয় অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে অংশ বিশেষ কন্যার পাঠের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন; Morning & Evening Meditations নামক পুস্তক হইতেও প্রতিদিন একটি করিয়া কবিতা মুখস্থ করিতে দিতেন। যেখানে যাহা কিছু সুন্দর পড়িতেন, কন্যাকেও সেগুলি পড়াইতেন। ইংরাজী গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল সব বিষয়ই নিজেই পড়াইতেন। বার বৎসর বয়সের সময় আবার কামিনীকে বোর্ডিং এ পাঠান হইল। স্কুলে পাঠাইবার সময় পিতা কন্যাকে বলিয়া দিলেন যে সর্ব্বদাই মনে রাখিবে যে, "My life has a mission."

ষোড়শ বর্ষে কামিনী প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি বাঙ্গালা ভাষাই দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার পর দুই বৎসর পড়িয়াই F. A. পরীক্ষা দেন। এবং সংস্কৃতভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। আবার দুই বৎসর পরে B. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষায় দ্বিতীয় ক্লাশ অনার্স পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে বেথুন কলেজের Lady Superintendent Miss Lipscombe কর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে Miss Bose M. A. Lady Supt. হইলেন। সেই কাজ লইবার জন্য কামিনীকে প্রথমে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তাঁহার পিতা কন্যাকে কার্য্য লইতে দিলেন না।

"বেশীর ভাগ পুরুষেরা আজকাল চাকরী পাইবার আশায় লেখাপড়া শেখে" বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন; কাজেই কন্যার চাকরীর নামে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন "জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ও জ্ঞানের নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্যই আমি কন্যাকে শিক্ষাদান করিয়াছি। চাকরী আমি কখনই তাহাকে করিতে দিব না।" কতিপয় বন্ধু তখন বলিলেন যে "আপনার কন্যার নিজের জীবিকার জন্য অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যক নাই, সুতরাং সে যে অর্থের জন্য চাকরী করিতেছে এরূপ ভুল করা কাহারও সম্ভব নহে। কিন্তু এমন অনেক ভদ্র রমণী আছেন যাঁহাদের পক্ষে স্বাবলম্বন প্রয়োজন। কিন্তু দৃষ্টান্তের অভাবে এইরূপ রমণীরাও স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিতে পারিতেছেন না। আপনি যদি ইহাকে কাজ করিতে দেন তাহা হইলে পরে আর দশজন স্ত্রীলোকও কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবে।" কামিনীর পিতার এই কথাগুলি যুক্তি সঙ্গত মনে হইল।

১৮৮৬ সালে কামিনী বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার প্রণীত আলো ও ছায়া ১৮৮৯ সালে বাহির হয়। অধিকাংশ কবিতাই অনেক বৎসর পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল। কামিনীর পিতা ও তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে অনেক বার কবিতাগুলি ছাপাইতে অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। অবশেষে তাঁহার পিতার কোন বন্ধু কবিতাগুলি কবিবর হেমচন্দ্রকে দেখান ও লেখিকার নাম গোপন করিয়া কবিতাগুলি সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি কি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন 'আলো ও ছায়া'র ভূমিকাতেই লিপিবদ্ধ আছে। কোন

সমাজের কোন দিকই কামিনীর ভাল করিয়া দেখিবার অবসর বা সুবিধা ঘটে নাই। সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার বড়ই কম। তাঁহার আদর্শ বেশীর ভাগ ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্য-জগৎ হইতে লব্ধ ও কল্পনাপ্রসূত। কাজেই তাঁহার কবিতাগুলি পুরাতন ছাঁচে ঢালা হইতে পারে নাই।

১৮৯৪ সালে ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সহিত কামিনীর বিবাহ হয়। ইনি বহুপূর্ব্ব হইতেই কামিনীর গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। "আলো ও ছায়া" প্রকাশিত হইবার পর ইংরাজীতে তাহার এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। বিবাহের পর কামিনীর কেবল একখানি পুস্তক "গুঞ্জন" বাহির হইয়াছে। কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার কোন বন্ধু অনুযোগ করাতে, কামিনী তাঁহার সন্তানগুলিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "এই গুলিই আমার জীবন্ত কবিতা।" স্বামিসেবা, গৃহকর্ম্ম ও সন্তানপালনই তাঁহার নিকট পত্নী ও জননীর প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় এবং তাহাতেই তাঁহার সমুদয় অবসর ও শক্তি নিযুক্ত রহিয়াছে।

সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড।

গত ৬ই মে শুক্রবার রাত্রি ১১টা ৪৫ মিনিটে আমাদের ভারতসম্রাট্ ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় এই নিষ্ঠুর শোক-সংবাদ ভারতের ত্রিশকোটি প্রজাকে বিস্মিত, বিমূঢ় ও অপ্রত্যাশিত আঘাতে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই একদিন ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে বাধ্য! কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের প্রতি কালের সেই করাল কবল এতই আকস্মিক ও অদৃষ্টপূর্ব্ব যে তাঁহাকে এরূপভাবে অকস্মাৎ আমাদের মধ্য হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। তাঁহার মৃত্যুর একসপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি সুস্থদেহে রাজকর্ম্ম পরিচালনা করিয়াছিলেন। রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতে যাইয়া সহসা শ্লেষ্মা-পীড়িত হইয়া প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন! দুই দিনের মধ্যে মানবের চিরন্তন নির্ঘাত আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল!

এড্ওয়ার্ড ভারতের সম্রাট্ ছিলেন বলিয়াই যে আজ আমরা তাঁহার শোকে মুহ্যমান তাহা নহে। তাঁহার অশেষ গুণ-সমন্বিত চরিত্র ও হৃদয়ের জন্য ভারতের রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত ও ভক্তি করিত। স্বর্গগতা ভিক্টোরিয়ার জীবিতাবস্থায় যুবরাজ এড্ওয়ার্ড ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতসাম্রাজ্য পরিদর্শন উপলক্ষ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার সৌজন্য, সদাশয়তা ও সহানুভূতিতে ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়াছিল। মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার সেই স্নেহ ও সহানুভূতি অম্লান ও অক্ষুণ্ণ ছিল; আজ তাঁহাকে হারাইয়া আমরা যে কেবল আমাদের রাজা ও অধীশ্বরকে হারাইয়াছি তাহা নহে আজ তাঁহাকে হারাইয়া আমরা আমাদের আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষী অকপট বন্ধু ও প্রতিপালক পিতাকে হারাইয়াছি।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে এড্ওয়ার্ডের জন্ম হয়। সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ

হয়। একুশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি ইংলণ্ডের নানা বিদ্যালয়ে থাকিয়া তদানীন্তন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারন্ রেন্‌ফ্রিউ (Baron Renfrew) নামে ছদ্মবেশে স্পেন, পর্ত্তুগাল ও ইতালীতে ভ্রমণ করিয়া আসেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে আমেরিকার কানাডা রাজ্য পরিদর্শন করিতে প্রেরণ করেন। তথায় তাঁহার সদ্‌গুণমহিমায় তিনি প্রজামণ্ডলীর এতই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে যেখানে পদার্পণ করিতেন সেই-খানেই লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া তাঁহার দর্শনলাভের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিয়া থাকিত। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ডেন্‌মার্কের রাজ-



কুমারী আলেক্‌জান্দ্রার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সেই অবধি পতিব্রতা ভিক্টোরিয়া সাধারণ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন; সুতরাং সেইদিন হইতে যুবরাজ এড্-ওয়ার্ড সর্ব্বপ্রকার সাধারণ ও সামাজিক রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে বাধ্য হন। এই সকল গুরুভারকার্য্য তিনি এরূপ একাগ্রতা, সদাশয়তা ও বিচক্ষণতার সহিত সম্পন্ন করিতেন যে সেই অল্পবয়স হইতেই তিনি কেবল যে ইংলণ্ডবাসীরই প্রিয় হইয়াছিলেন তাহা নহে, সমগ্র সভ্যজগতই

তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিত। দেশের এমন ক্ষুদ্র বৃহৎ সাধু ও সৎকর্ম্ম ছিল না যাহাতে যুবরাজ এড্‌ওয়ার্ড সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান না করিতেন; এমন পণ্ডিত ও প্রতিভাবান লোক ছিলেন না যিনি যুবরাজের অনুগ্রহ ও উৎসাহবাক্য লাভ না করিতেন। তাঁহার নিকট উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্রের প্রভেদ ছিল না, তিনি সাম্রাজ্যের সকলকেই সমভাবে স্নেহ করিতেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে আগমন করেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার আগমনে ভারতের উচ্চনীচ সকলেই যে রাজভক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব্ব। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ২২শে জানুয়ারী এড্‌ওয়ার্ড রাজপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার অভিষেক উৎসবের উজ্জ্বল স্মৃতি আজিও আমাদিগের অন্তরে জাগিতেছে! হায় কে জানিত এই অল্প দিনের মধ্যেই আবার তাঁহার শোকে আমাদিগকে কাতর হইতে হইবে!!

তাঁহার রাজত্বকাল ভারতের ইতিহাসে চিরদিনই উজ্জ্বল রহিবে। ভারতসাম্রাজ্য-লাভের জুবিলি উৎসবে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন তাহাতে তাঁহার স্বর্গগতা জননী ভিক্টোরিয়ার চিরস্মরণীয় ঘোষণাপত্রের আশ্বাস ও অঙ্গীকার পালনে প্রতিশ্রুতি দান করিয়া তিনি ভারতের অশান্ত প্রজার মনোরঞ্জন করেন। তাঁহার সেই প্রতিশ্রুতিবাক্য আজ আমরা নানারূপে প্রতিপালিত হইতে দেখিতেছি। ভারতবাসীকে উচ্চরাজকার্য্য দান, ভারতের শাসনে সংস্কারবিধান আজ তাঁহার সেই বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিতেছে! সিংহাসনে অধিরোহণকালে তিনি তাঁহার পৃথিবীবাসী প্রজাবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া, বলেন, "স্বর্গগতা মহারাণীর প্রতি প্রজাবৃন্দের স্নেহ ও শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করিয়া আমি আজ ঈশ্বর সম্মুখে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি সর্ব্বকর্ম্মে আমার স্বর্গগতা জননীর পবিত্র পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিব এবং আমার অসংখ্য প্রজার সুখসমৃদ্ধিসাধনে নিজের সকল চেষ্টা ও চিন্তাকে উৎসর্গ করিব।" স্বর্গগত সম্রাট্ তাঁহার এই পবিত্র অঙ্গীকারপূর্ণ করিয়া আজ ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন!

তাঁহার জীবনের নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি হইতে আমরা তাঁহার অন্তরপ্রকৃতির যথার্থ পরিচয় পাইব। আমেরিকার প্রসিদ্ধ ক্রোর-পতি কার্ণেগী সাহেব (Mr. Carnegie) তাঁহার যৌবরাজ্যকালে আমেরিকার এক সংবাদপত্রে তাঁহার নিন্দা করেন। ইহা জানিয়াও সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার পর সম্রাট্ এডওয়ার্ড একদিন অনিমন্ত্রিতভাবে কার্ণেগীর ইংলণ্ডের প্রাসাদে উপস্থিত হন এবং আপনার অমায়িক সদাশয়তায় সকলকেই মুগ্ধ করেন।

ইংলণ্ডে অনেকগুলি রাজনৈতিক সম্প্রদায় আছে তাহা সকলেই জানেন। এডওয়ার্ড সকল সম্প্রদায়কেই সমচক্ষে দেখিতেন। প্রজাগণের মধ্যে যে কোন লোকের লেশমাত্র প্রতিভার পরিচয় পাইতেন তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রিত করিয়া আলাপে আপ্যায়িত করিতেন।

মৃত সম্রাটের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। একদিন পোষ্ট আফিসে যাইয়া তিনি দেখেন

বাতায়ন সম্মুখে এক কর্ম্মচারী বসিয়া আছে। সে ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিবামাত্র যথাযোগ্য অভিবাদন করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র এডওয়ার্ড বলিয়া উঠিলেন, "কেও পেন্ (Payne) যে?" এই বলিয়া সস্নেহে তাহার করমর্দ্দন করিলেন। ইহার চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে এই লোকটি রাজপ্রাসাদে ভৃত্যের কর্ম্ম করিত। সম্রাট এতদিনেও তাঁহাকে বিস্মৃত হন নাই। যাইবার সময় তিনি তাহাকে সস্ত্রীক তাঁহার প্রাসাদে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে এক ফোটোগ্রাফার তাঁহার ফোটো লইবার জন্য রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়। যথাসময়ে সম্রাট্ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করি-



লেন, "আজ আপনার শরীর ভাল ত?" সম্রাটকে মনোমতরূপে দণ্ডায়মান করাইবার জন্য লোকটি তাঁহাকে দক্ষিণ হস্তটি একটু সরাইয়া, আরো দুইপদ অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিল। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পরে বলিল, "মহারাজকে মস্তকটি একটু উচ্চ করিয়া রাখিতে অনুরোধ করিতে পারি কি?" সম্রাট্ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ঠিক বলিয়াছ, আজকাল মাথাটা একটু উঁচু করে চলাই দরকার।"

সম্রাট্ রুষের রাজপ্রাসাদে যাইয়া রাজপরিবারের সহিত আলাপ পরিচয়ের পর

বালকবালিকা দিগের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ প্রকাশ করেন। সম্রাটের সরলমূর্ত্তি দেখিবামাত্র রাজান্তঃপুরের বালকবালিকাগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে আসিয়া সমবেত হইল। রাজা তাঁহাদিগের জন্য নানাপ্রকার ক্রীড়া-পুত্তলি লইয়া গিয়াছিলেন। সেইগুলি পাইয়া তাহারা অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া ফেলিল। তাহাদের সহিত আলাপকালে সম্রাট দেখিলেন যে তাহাদিগের ধাত্রী একজন আইরিষ স্ত্রীলোক। ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সেই ধাত্রীকে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত এক পত্রের সহিত স্নেহনিদর্শন স্বরূপ এক পুরস্কার প্রেরণ করেন।

রাজ্যের সকল কর্ম্মে তিনি মনোযোগ ও অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। সহস্রবার কৃতকর্ম্ম পুনঃসম্পাদনেও তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও বিরাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। পৌত্র পৌত্রীগণকে লইয়া অবকাশ পাইলেই নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতেন এবং তাহাদিগের সুশিক্ষার প্রতি সর্ব্বদা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। দরিদ্রালয়, অনাথাশ্রম ও হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে তিনি আন্তরিক আনন্দবোধ করিতেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অবধি তিনি ইয়ুরোপে বিভিন্নজাতিগণের মধ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য সর্ব্বদাই যত্নবান ছিলেন। তাঁহার অমায়িক সরল ব্যবহারে এবং বিচক্ষণ রাজনৈতিক বুদ্ধিতে ইয়ুরোপের সকল রাজশক্তিই তাঁহার সহিত বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের গৃহবিবাদের এই সঙ্কটকালে তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ বিচক্ষণ রাজার অভাবে বিশেষ ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা!

আমেরিকা প্রবাসীর পত্র।

শ্রীচরণ কমলেষু—

আপনি আমাদের বিষয় কিছু জানিতে চাহিয়াছেন, তাই লিখিতেছি।

কালিফোর্ণিয়া, ষ্ট্যানফোর্ড, ওয়াসিংটন, অর্গণ বিশ্ববিদ্যালয় ও অর্গণ ও ওয়াশিংটনের ষ্টেট কলেজ এই সকল স্থানেই ভারত-ছাত্র আছে। কিন্তু কালিফোর্ণিয়া ও ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েই তাহাদের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। কারণ সেখানে আমাদের অনেক সুবিধা আছে, এবং আমেরিকার মধ্যে এই দুইটীই খুব ভাল বিদ্যালয় বলিয়া খ্যাত। কালিফোর্ণিয়াতে আমাদের দেশের আত্ম-নির্ভরপ্রিয় ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা এই, সেখানে ছাত্রোপযোগী নানারকম কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সুবিধা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; কারণ প্রাচ্যজাতির প্রতি এদেশের ঘৃণা দিন দিনই বাড়িতেছে, সেজন্য অনেক স্থলে আমাদের ছাত্রেরা কাজ ত পায়ই না বরং অপমানিত হইয়া আসে। এখানে আমাদের প্রতি ঘৃণা এত অধিক যে অনেক সময় আমাদের থাকিবার জন্য বাড়িভাড়া পাওয়াও কঠিন হইয়া উঠে, অনেক সময় অনেকে নাপিতের দোকান হইতে অপমানিত হইয়া আসিয়াছে। এই কারণে কালিফোর্ণিয়াতে আমেরিকানদের সহিত আমাদের মিশিবার সুযোগ বড়ই কম,

এখানে ছাত্রাবাসে থাকিতে অনেক খরচ পড়ে, তাই আমরা ৪।৫ জন মিলিয়া বাড়ী ভাড়া লইয়া একত্র থাকি। সেখানে আমরা প্রতি রবিবারে দেশের মত রান্না ও দেশী আহারের ব্যবস্থা করি। যদিও আমাদের মধ্যে অনেকেই দেশী রান্নায় একেবারে অজ্ঞ, তবু উহারি মধ্যে যে একটু রাঁধিতে পারে, তিনি সে দিনের জন্য সর্দ্দারপাচক (dean) এবং অন্যান্য সকলে তাহার সহকারী নিযুক্ত হন। 'ডিন' মহাশয় যাহাকে যাহা করিতে বলেন তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা করিতে হয়।

এইরূপ সর্দ্দারব্রাহ্মণের কার্য্য প্রায়ই যোগেন বাবু করিতেন, যোগেন বাবু ডিগ্রি নিয়া দেশে যাত্রা করিয়াছেন, বোধ হয় এত দিনে পৌঁছিয়া থাকিবেন, আমিও কালি-ফোর্ণিয়া ছাড়িয়া আসিয়াছি।

যাঁহারা আত্মনির্ভরপ্রিয় তাঁহারা কোন পরিবারে ৪ ঘণ্টা করিয়া প্রতিদিন কাজ করেন সেজন্য আহার ও বাসস্থান মিলে। রবিবারে এখানে কোন কাজকর্ম্ম হয় না, তাই তাঁহারা বাঙ্গলা ভোজে যোগদান করিতে পারেন। সপ্তাহের অন্যান্য দিন আমরা আমেরিকানদের মতই খাই, ঐরূপ রান্নায় সময় ও ব্যয় অল্পই লাগে। ষ্টানফোর্ড ও কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১৫।.৬ মাইলের ব্যবধান। কালিফোর্ণিয়ার তুলনায় ওয়াসিংটনে প্রাচ্যবিদ্বেষ নাই বলিলেই চলে; আমেরিকার অধিকাংশ স্থলেই প্রাচ্য বিদ্বেষের মাত্রা অত্যধিক। এখানে আমাদের আমেরিকানদের সঙ্গে মিশিবার বিস্তর সুযোগ; তথাপি আমরা নানাকারণে এ সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণে অপারগ। এখানেও আমাদের ছাত্রেরা অনেকে বাড়ী ভাড়া লইয়া থাকেন; এখানেও কোন পরিবারে ৪।৫ ঘণ্টা কাজ করিয়া খাওয়া ও থাকার যোগাড় করিয়া লন। এখানে ছাত্রের উপযুক্ত কার্য্য পাওয়া বড়ই কঠিন; আর পাওয়া গেলেও আমাদিগকে বিদেশী মনে করিয়া আমাদের উপর এদেশের লোকে অতিরিক্ত জুলুম করে। সিটলে (Seattle) অধি-কাংশই পঞ্জাবী ছাত্র ইঁহারা অধিকাংশই নিরামিষভোজী ও মাংসাহারবিদ্বেষী। এমন কি দুই একজন আর্য্যসমাজী ছাত্র মাংসের টেবিলে আহার করিতেও অনিচ্ছুক; ছাত্রাবাসে থাকিবার পক্ষে ইঁহাদিগের ইহাই একটি প্রধান অন্তরায়। অনেক সময় টাকা পয়সাতেও কুলাইয়া উঠে না। সম্প্রতি সিটলে সমস্ত ভারতবাসী ছাত্র মিলিয়া একটী বাড়ী ভাড়া নিয়া একত্রে বাস করিতেছেন, ইহাতে খরচ খুব কম হইতেছে।

একজন সদাশয় মার্কিন মহিলা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সন্নিকটে ভারতীয় ছাত্রদের একটি বাটী নির্ম্মাণ জন্য একখণ্ড জমি দান করিয়াছেন, জমির মূল্য ৪০০০ ডলার অর্থাৎ ১২০০০ হাজার টাকার কিছু বেশি। আমরা সেখানে একটী বাটী নির্ম্মাণের চেষ্টায় আছি; কিন্তু বাটী প্রস্তুত করাইতে আরোও বার হাজার টাকার প্রয়োজন; সে টাকার কোথা হইতে যোগাড় হইবে তাহা এখনো স্থির করিতে পারিতেছি না। দেশে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট এজন্য অনেক আবেদন করা হইয়াছে; টাকা দিয়া কোন সহায়তা করা দূরের কথা পত্র-

খানার পর্য্যন্ত উত্তর অবধি পাওয়া যায় নাই; এদেশে কিন্তু পত্রের জবাব না দেওয়া একটী গুরুতর অভদ্রতা বলিয়া বিবেচিত হয়, তা যিনি যত বড়লোকই হউন না কেন! আপনারা একটু চেষ্টা করিলে বোধ হয় বাড়িটা হইয়া যাইবে। আশা করি আপনি একটু কষ্ট লইয়া ভারতের ছাত্রদের জন্য এ সম্বন্ধে একটু চেষ্টা করিবেন। এ বাড়িটা হইলে এখন যে খরচ লাগিতেছে তাহার অর্দ্ধেক খরচে এখানে থাকা যাইবে।

সম্প্রতি অর্গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্র মোটে নাই। অর্গণ ষ্টেট কলেজে তিন চার জন ছাত্র আছেন, তাঁহারাও ঘর ভাড়া লইয়া একত্রে বাস করিতেছেন। অর্গণের পোর্টল্যাণ্ড সহরে আমাদের প্রতি ঘৃণার মাত্রা বেশ স্পষ্টানুভূত হয়। আমাদিগের জনৈক বন্ধুর এখানে থাকিবার জন্য ঘর ভাড়া পাইতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কলিসে আমাদের প্রতি তত ঘৃণা নাই, ওখানে আমরা বেশ পরিচিত হইয়াছি।

ওয়াশিংটন্ ষ্টেট কলেজে আমার পুর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী আসে নাই। এখানে আমি এখনও কোন প্রকার ঘৃণার ভাব পাই নাই বরং অনেক স্থলে আদরই পাইয়াছি। এদের সমস্ত সামাজিক সম্মিলনী ও নাচে মজলিসে আমার নিমন্ত্রণ হয়; এবং এ সমস্ত স্থলেও কোন ঘৃণার ভাব দেখি নাই।

আমি এখানে কলেজ নিবাসে (College Dormitory) আছি; এখানে তিন শত ছাত্র বাস ও আহার করে। এখানে দুইটী ডরমিটরি অর্থাৎ নিবাস। একটী মেয়েদের জন্য, অপরটী ছেলেদের জন্য। মেয়েদের নিবাসে প্রায় আড়াই শত মেয়ে আছেন।

এদেশের ছেলেদের সঙ্গে বেশ আছি, কখনও ইঁহারা আমার প্রতি কোন প্রকার ঘৃণার ভাব দেখান না বরং নানাপ্রকারে আত্মীয়তাই দেখাইয়া থাকেন। এখানে ছেলেদের ডরমিটরির জীবনটুকু বেশ উপভোগ্য। যখন নূতন ছাত্র প্রথম ডরমিটরিতে ঘর পাইবার দরখাস্ত করে, তখন সকলের ভাগ্যে প্রথম বারেই ঘর জোটে না। কারণ দুই তিন হাজার দরখাস্ত পড়ে। আমি বিদেশী বলিয়া প্রথম দরখাস্তেই ঘর পাইয়াছি। নূতন ছাত্র আসিলে উচ্চ নিম্ন সকল শ্রেণীর পুরাতন ছাত্রেরাই ইহাদিগকে দীক্ষিত করে। দীক্ষাটুকু বেশ মজার। কোনদিন দীক্ষা হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই, হঠাৎ একদিন রাত্রি দশটা কিম্বা এগারটার সময় ডরমিটরির হলে (Parlour) খুব হুলস্থূল বাধিয়া গেল। পুরাতন ছাত্রগণ একত্রিত হইয়া নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া, টিনের বাক্স পিটিয়া যে যে প্রকারে পারে গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছে। যতক্ষণ সমস্ত ছাত্র হলে একত্রিত না হয় ততক্ষণ এই প্রকারের গোলমাল চলিতে থাকে। সমস্ত ছাত্র একত্র হইলে প্রত্যেকে নিজের সুবিধামত ছদ্মবেশ ধারণ করে, কেহ আমেরিকার আদিম নিবাসীর (Red Indian) বেশ পরে, কেহ বা দাড়ি গোঁপ লাগাইয়া বৃদ্ধের বেশ ধরে, কেহ কলেজ সভাপতি কিম্বা কোন প্রোফেসারের মত পোষাক পরিয়া তাঁহার অনুকরণ করে, কেহ বা কলেজের মেয়ে-ছাত্রীর অনুকরণে গাউন প্রভৃতি পরিয়া,

লম্বা চুল লাগাইয়া মিহিসুরে কথা কহে ও তাঁহাদের অনুকরণে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে। এই প্রকাবে সাজসজ্জা শেষ হইলে, সকলে দল বাঁধিয়া মেয়েদের ডর্মিটরিতে যায়। তাহাদের গোলমালে আকৃষ্ট হইয়া যখন সমস্ত মেয়েরা হলে সমবেত হন, তখন ছেলেরা সেখানে নানা হাস্যোদ্দীপক গান করিতে থাকে। এইত গেল দীক্ষার প্রথম অঙ্ক। ইহা প্রায়ই শুক্রবার শেষ রাত্রিতে আরম্ভ হয় কারণ অপর দিন ছেলেদের পড়াশুনা থাকে, শনিবার তাহাদের ছুটি। এইরূপ দীক্ষার পর নূতন ছাত্রদিগের কাহাকেও ঘর ঝাঁট কাহাকেও বাগান পরিষ্কার কাহাকেও সার্শি পরিষ্কার এইরূপ নানা ধরণের কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। এই সমস্ত কাজ ছাত্রদের করিবার কোন দরকার নাই, সেজন্য স্বতন্ত্র চাকর আছে, তথাপি নূতন ছাত্রদের ঐ দিনে এ সমস্ত কাজ করিতে হয়। পুরাতন ছাত্রেরা কেবল পর্য্যবেক্ষণ করে মাত্র। শনিবার ১২টা পর্য্যন্ত এই সমস্ত কাজ হয়; ডিনারের পর সমস্ত ছাত্র একত্র হইয়া আমোদ আহ্লাদ করে; এই গেল দীক্ষা। এই প্রকারের অনেক প্রথা প্রচলিত আছে; আপনাদিগকে একটু আভাষ দেওয়ার জন্য একটীর মাত্র উল্লেখ করিলাম। শিক্ষা সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে এখানে স্কুল কেবল 'কেরাণী প্রস্তুতের' জন্য নহে, 'কেরাণী প্রস্তুতের' জন্য স্বতন্ত্র commercial school আছে। এখানে বিদ্যালয় বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য। হাইস্কুলের গ্রাজুয়েট ছাত্রগণই প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিম্বা কলেজে ভর্ত্তি হয়। যাহারা গ্রাজুয়েট নহে তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়া তবে ভর্ত্তি হইতে হয়। সাধারণতঃ এ দেশের বিদ্যালয়গুলিতে বৎসরে দুইটি করিয়া term; অর্থাৎ বৎসরে দুইবার কলেজ বসে। কোথাও বা তিন চারিটি টার্ম্মও আছে। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে কোন বিষয়ের প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং জানুয়ারির শেষ কিম্বা ফেব্রুয়ারির প্রথম তাহা শেষ হয়; এবং ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দ্বিতীয়বার শিক্ষা আরম্ভ এবং জুনের মাঝামাঝি শেষ হয়। এইরূপ ষাণ্মাসিককাল বিভাগকে semester বলে। কোথাও গ্রীষ্মকালে শিক্ষকদের জন্য গ্রীষ্ম স্কুলের (Summer School) ব্যবস্থা হয়। ডিগ্রি লইবার জন্য যে সমস্ত বিষয় প্রয়োজন গ্রীষ্মস্কুলে তাহার অনেক বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে এই স্কুলে যোগ দিতে পারিলে প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে কলেজশিক্ষা শেষ করা যাইতে পারে। গ্রীষ্মস্কুলে ৮ হইতে ১০ সংখ্যা (unit) পর্য্যন্ত রাখা যায়। প্রত্যেক সিমিষ্টারের প্রথমেই কেবল ছাত্র নেওয়া হয়। কলেজ কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হইলে ১৩০টী high school unit পূরণ করিতে হয়। এই সমস্ত ইউনিট্ কলেজ unit বলিয়া গণ্য হয় না। এই ১৩০টী unit যে দেখাইতে পারে না তাহাকে বাহিরের ছাত্র বলিয়া নেওয়া হয় সে নিয়মিত (Regular) ছাত্র হইতে পাবে না। যখন সে এই সমস্ত unit পূরণ করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ দিতে পারে কিম্বা পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে তখন তাহাকে নিয়মিত ছাত্র (regular) করিয়া নেওয়া হয়। কলেজ হইতে ডিগ্রি পাইতে প্রত্যেক ছাত্রকে

১৫০ হইতে ১৬০ unit পূর্ণ করিতে হয়। প্রতি সিমিষ্টারে অর্থাৎ প্রত্যেক ছমাসের প্রতি সপ্তাহের এক ঘণ্টা lecture work—বক্তৃতা শোনার কাজ কিম্বা দুই তিন ঘণ্টা laboratory work—বিজ্ঞানালয়ের কাজ এক এক unit রূপে গৃহীত হয়। আমাদের দেশের মত ডিগ্রির জন্য কোন পরীক্ষা দিতে হয় না, কেবল একটী প্রবন্ধ (thesis) লিখিতে হয়। কোথাও উচ্চতর ডিগ্রির জন্য thesis সত্বেও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। এ পরীক্ষায় সময় স্থান-বিশেষে এমন নিয়ম আছে যে সর্ব্বসাধারণে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা গ্রহণ দেখিতে পারেন এবং ছাত্রকে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। ছাত্র যে বিষয় পড়িতেছেন সেই বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করিয়া তিনি প্রবন্ধের বিষয় স্থির করিয়া লন, এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে সেই বিষয়ের অনুশীলনা অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ thesis একটু মৌলিক হওয়া চাই। এখানে কলেজশিক্ষা প্রত্যুষ আটটা হইতে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত হয়; মাঝে এক ঘণ্টা আহারের জন্য বন্ধ থাকে। ভোর আটটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত সময় lecture work হইয়া থাকে এবং বিকালে একটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত laboratory work হয়। বিজ্ঞান যন্ত্রালয়ে প্রত্যেক ছাত্রকে শিক্ষকের উপদেশ মত স্বাধীনভাবে যন্ত্র-পরীক্ষা করিতে হয়, এবং প্রত্যেক যন্ত্র-পরীক্ষার বিবরণী শিক্ষককে যথা সময়ে দিতে হয়।

এখানে আর একটী সুন্দর নিয়ম এই যে, প্রত্যেক ছাত্রের একজন পরামর্শদাতা (adviser) আছেন, সাধারণতঃ ছাত্র যে বিভাগে পড়েন তাহার অধ্যক্ষই সেই ছাত্রের পরামর্শদাতার কাজ করিয়া থাকেন; পরামর্শ-দাতা ছাত্রকে সমস্ত বিষয়ে সাহায্য করেন। যখন কোন ছাত্রের টাকা পয়সার অভাব হয়, তখন পরামর্শদাতা তাহার সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করেন। আমার অনেকবার দেশ হইতে টাকা পাইতে বিলম্ব হইয়াছে, পরামর্শদাতাকে তাহা বলায় তিনি কলেজের ছাত্র ঋণভাণ্ডার (Students Loan Fund) হইতে আমাকে ধার দিয়া উপকৃত করিয়াছেন। কাহারো কোন প্রকার অসুখ করিলে পরামর্শদাতার নিকট হইতে উপদেশ লইলে সদুপদেশ দিয়া থাকেন। যে কোন বিষয়ের দরকার হউক না কেন, পরামর্শদাতাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। পরামর্শদাতার অপর নাম 'ছাত্রবন্ধু'; বন্ধুর নিকট যে সকল বিষয় বলিয়া পরামর্শ লওয়া যায়, পরামর্শদাতাকেও সে সকল বিষয় অবাধে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই 'পাশ' হওয়া যায় না। ক্লাশের কার্য্যের (class work) ফলের উপরই 'পাশ ফেল' অধিক নির্ভর করে। শিক্ষক কিম্বা সহপাঠিগণ কখনও আমাদিগকে ঘৃণা করেন না; বরঞ্চ শিক্ষকগণ আমাদিগকে বিদেশী মনে করিয়া, আমাদের প্রতি অধিক যত্ন করিয়া থাকেন।

আরো অনেক কথা বলিবার আছে। বারান্তরে বলিব!

সেবক শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ।

চিত্র-ব্যাখ্যা।

দীক্ষা—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। এই চিত্র সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, কেবলমাত্র কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছবিখানি উপলক্ষ করিয়া যে গানটি রচনা করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

পূরবী—একতালা

নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোল দ্বার আজ লব তাঁর দেখা
সারাদিন শুধু বাহিরে ঘুরে ঘুরে কারে চাহিরে!
সন্ধ্যাবেলার আরতি হয়নি আমার শেখা।
তব জীবনের আলোতে জীবন প্রদীপ জ্বালি
হে পূজারি আজ নিভৃতে সাজাব আমার থালি।
যেথা নিখিলের সাধনা পূজালোক করে রচনা
আমিও সেথায় ধরিব একটি জ্যোতির রেখা॥

সমালোচনা।

গুচ্ছপুষ্প। শ্রীমতিলাল দাস, বি, এ, প্রণীত। এলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য বার আনা। রায় শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর লিখিত ভূমিকা সমেত। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। কবি, বোধ হয়, ওয়ার্ডস ওয়ার্থের অনুকরণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সফল হন নাই। উদাহরণ স্বরূপ

"এ শুভ্র বিজনে ক্ষুদ্র আত্মবোধ
আপনি নিভিয়া আসে;
অন্তর বাহির হয়রে বিলীন
বিরাটাসত্ত্বগ্রাসে।"

ইহা বুঝিতে হইলে, মল্লিনাথের শরণাপন্ন হইতে হয়। তবে কবির সকল কবিতাই যে এইরূপ জটিল, তাহা আমরা বলিনা—স্থানে স্থানে কবিত্বের পরিচয়ও পাওয়া যায়। ভূমিকা-লেখক মহাশয় কবিতাগুলির উপর 'Suggestive' ছাপ মারিয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কবিতা ও হেঁয়ালি উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, সেটুকু আমাদিগের কবিগণ মানিয়া চলিলে, অনেক অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাই।

জাতীয় মঙ্গল। মহম্মদ মোজাম্মেল হক প্রণীত। মহম্মদ আজিজল হক্ কর্তৃক প্রকাশিত। কুন্তলীন প্রেসে, আর্টিক কাগজে মুদ্রিত, মূল্য ।৵০। এখানি একখানি কবিতা-পুস্তক এবং একজন মুসলমান লেখক কর্তৃক রচিত হইলেও ইহা বাঙালী লেখকের রচনার মতই স্পষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলিতে, মাঝে মাঝে, মিষ্টতা, আন্তরিকতা ও জন্মভূমির প্রতি অকরুণ কবির অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতন। (নবম ও দশম খণ্ড) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বোলপুর, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য প্রতি খণ্ড, চারি আনা মাত্র। রবীন্দ্রবাবুর দার্শনিক প্রবন্ধগুলি বাঙলা সাহিত্যে অভিনবত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। সহজ ভাষায় লিখিত প্রাচ্য আদর্শাদির সুমধুর আলোচনা যথার্থই শান্তির সঞ্চার করে। বর্ত্তমান পুস্তিকা-খণ্ডদ্বয়ে "তপোবন," "চিরনবীনতা" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সীতার বনবাস। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ। ১৯০৯। মূল্য বার আনা। 'সীতার বনবাস' সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় মহিলাপাঠ্য এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার আদর্শ-

রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে'—সেজন্য 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় প্রকাশিত একখানি পুস্তককে আদর্শ করিয়া এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী-পরিচয় ও চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ ও পরিশিষ্টে টীকা সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থলিখিত ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। টীকাটুকু মন্দ হয় নাই। গ্রন্থের ছাপা ও সুদৃশ্য বাঁধাই প্রভৃতি বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্রের উৎকর্ষের পরিচায়ক। অথচ মূল্যও সুলভ। সীতার বনবাসের যে কয়টি সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি তন্মধ্যে এখানি শ্রেষ্ঠ বলিয়াই আমাদিগের ধারণা।

শকুন্তলা। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ ১৯০৯। মূল্য আট আনা। এখানিও, পূর্ব্বলিখিত গ্রন্থখানির ন্যায়, শকুন্তলার মনোজ্ঞ সংস্করণ। ছাপা কাগজ প্রভৃতি সুন্দর। টীকাগুলি উপাদেয়। গ্রন্থের প্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র ও গ্রন্থে আর তিনখানি চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পক্ষে গ্রন্থখানির বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস।

সঙ্গীত-দর্পণ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। ১৩নং কাশী মিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট, বাগবাজার। মূল্য এক টাকা। এখানি স্বরলিপি-সংগ্রহ। গ্রন্থের প্রথমেই মূলসূত্র ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সর্ব্বসমেত ৩৭টি গানের স্বরলিপি ইহাতে আছে। অধিকাংশ গানই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রশংসার সহিত গীত হইয়া গিয়াছে। পূর্ণবাবু একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন সঙ্গীতজ্ঞ। সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তির নিকট তাঁহার স্বরলিপি সংগ্রহখানির যে আদর হইবে, সে সম্বন্ধে সংশয় নাই। তবে মূলসূত্রগুলির আর একটু বিশদ বিশ্লেষণ এবং কয়েকটী সহজ সুর গ্রন্থের প্রথমে সন্নিবিষ্ট হইলে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে গ্রন্থখানি বেশ সহজ হইত। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্ণবাবু আমাদিগের এ কথাটুকু রক্ষা করিবেন। সঙ্গীত-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহাকে আরো একটু অবহিত দেখিলে আমরা সুখী হইব।

ফরিদপুরের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত। ১ম খণ্ড (ভৌগোলিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত)। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৷৶০ দশ আনা। ইতিহাসের প্রতি বাঙালী লেখক ও পাঠক উভয়েরি যে আগ্রহ-দৃষ্টি পড়িয়াছে ইহা যে, দেশের পক্ষে শুভলক্ষণ, সে সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানি হইতে লেখকের অনুসন্ধিৎসা ও পরিশ্রমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানিতে একখানি প্রাচীন মানচিত্র ও রাজনগর একুশ রত্নের একখানি চিত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানির ত্রুটি, লেখক বেশ গুছাইয়া সকল কথা বলিতে পারেন নাই। স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ বা রিপোর্টাদির পুস্তিকার মত গ্রন্থখানি নিতান্তই খণ্ড বিবরণীর সংগ্রহ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যেমন-কে-তেমন। (গীতিনাট্য) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত। মূল্য ৷০ আট আনা। এখানি পারস্যের সাহজাদা প্রভৃতির বিবরণী ঘটিত একখানি গীতিনাট্য। গ্রন্থকার ক্ষমা করিবেন, আমরা তাঁহার গীতিনাট্যের রসগ্রহণে অক্ষম। তবে একটা সুখের বিষয়, ইহাতে রঙ্গালয়-সুলভ অশ্লীলতাটুকু নাই।

হিন্দুসমাজ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। (১ম ও ২য় খণ্ড। নিবেদন পত্র।) ৭০ কলুটোলা ষ্ট্রীট ধন্বন্তরী ষ্টীম মেসিন প্রেসে মুদ্রিত। এখানি উপেন্দ্রবাবু রচিত Dying Race পুস্তিকার বাঙলা সংস্করণ। গ্রন্থখানি সকলেরি পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সামাজিক কঠিন সমস্যার সুন্দর আলোচনা। পুস্তিকার মূল্য লিখিত নাই। এখানি বিতরণ অথবা বিক্রয়ার্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বুঝা গেল না।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

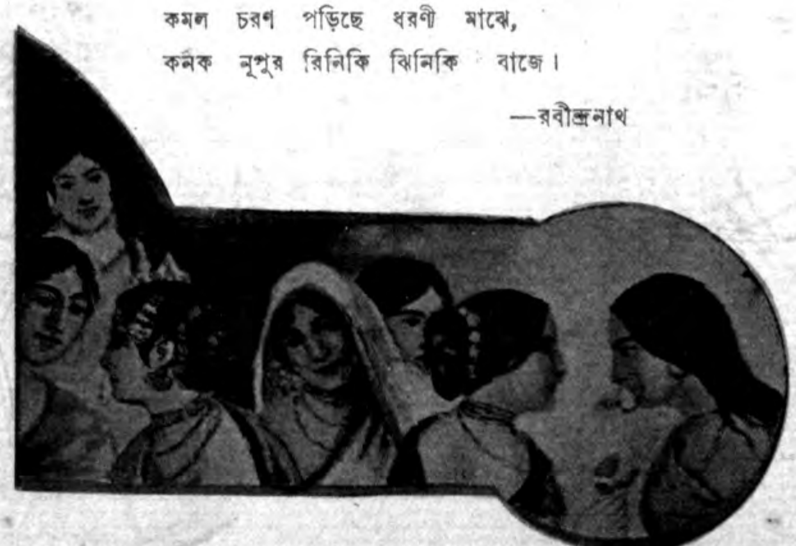


তোমরা এবং আমরা

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মত।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।

আপনা আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুক ছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমল চরণ পড়িছে ধরণী মাঝে,
কনক নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

—রবীন্দ্রনাথ



শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র হইতে

ইউ, রায় কর্ত্তৃক ব্লক] [কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত

ভারতী

৩৪শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩১৭ [৩য় সংখ্যা

প্রাচীন ভারতের পূজা।

সে এক স্নিগ্ধ উষায় সকলে যখন নিদ্রাবিষ্ট, তখন তরুণ তাপস ভারতবর্ষ আপন যোগাসনে জাগ্রত থাকিয়া সুপ্তবিশ্বের শিয়রে দাঁড়াইয়া, মেঘমন্দ্রস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিল, "হে অমৃতের অধিকারি' তোমরা জাগ, শাশ্বত জ্ঞানের যে অক্ষয় সুধা-ধার—নিখিল লোকের যাহাতে সম বিভক্ত-স্বত্ব, তাহা প্রত্যেকে গ্রহণ কর।" দিক্ দিগন্তরে লোক লোকান্তরে তাহার সেই বার্ত্তা প্রচারিত হইল; যে জাগিয়াছিল সে উঠিয়া দাঁড়াইল, যে নিরাশ ছিল সে আশান্বিত হইল, যে সন্ত্রাসিত ছিল সে নির্ভয় প্রাপ্ত হইল;—এই একটি মহা আমন্ত্রণ বিশ্বমানবের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়া নিখিলের মাঝখানে তাহার আবাহন ঘোষণা করিয়া দিল,"অমৃতের অধিকারী, তোমরা জাগ!"

প্রকৃতি লোক-জননী। শিশু-চিত্ত যেমন আপনার অজ্ঞাতসারে মাতৃপ্রভাবের দ্বারা বিকসিত হয়, ভারতবর্ষ তেমনি এই চির-নীল মুক্তাম্বরের নীচে থাকিয়া, এই শশি-সূর্য্য-তারার অবাধ আলোকে বাস করিয়া একটি অপূর্ব্ব উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই ঋতু-বৈচিত্র্য, এই শোভা-বৈচিত্র্য—আকাশে, বাতাসে, ফুল-পল্লবে বা সৌরভে এমন করিয়া তাহার মনকে প্রীতিময় গীতিময় করিয়া তুলিয়াছিল, এমন করিয়া তাহাকে উদার ও বিশাল করিয়া গড়িয়াছিল যে, সে নিখিল লোকের মাঝখানে পরিপূর্ণ শতদলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল! প্রজাপতি যেমন সমস্ত বিশ্বের শোভা লইয়া তাঁহার মানস-কন্যাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তেমনি ভারতবর্ষের চিত্ত তাহার চারিদিক্কার সমস্ত মহান্ বৈভবের অংশ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল! মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-কল্লোল যখন তাহার ঘুম পাড়াইবার গান গাহিয়াছিল, তখন দক্ষিণ পবন তাহার ক্রীড়া-সাহচর্য্য লইয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। এমনি করিয়া রূপশালিনী জননীর রূপ তাহার অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল।

অনন্ত তারকা-খচিত আকাশে একটী তারাই সীমন্ত-মণির মত দীপ্তি পায়। ভারতবর্ষের ললাটে এই রকম যে তারাটি উদিত হইয়াছিল, তাহার নাম ভক্তি—দীনভাব তাহার জনক, আত্মলোপ তাহার জননী। অহং জিনিসটা বাবলার মত, একবার স্থান পাইলে ক্রমশঃ সে নিজের অধিকারের সীমা ছাড়াইয়া সমস্ত দিককে গ্রাস করিয়া ফেলে, তখন তাহাকে উৎপাটন করিবার কোন পথ থাকে না, তাই ভারতবর্ষ ধর্ম্ম জীবনের প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া আপনাকে পদতল-দলিত তৃণের মত দেখিতে উপদেশ দিয়াছে। 'Self respect'

(আত্ম-সম্মান) বলিয়া যে জিনিসটি, তাহার সহিত কোনও সম্পর্ক রাখে নাই। কারণ যে সব জিনিস সমপ্রকৃতির, তাহার ভিতর হইতে একটি বিশেষ জিনিসের পার্থক্য রক্ষা করা সুকঠিন।

আত্ম-সম্মানের সঙ্গে আত্মাদরের একটা সাদৃশ্য আছে, এই সাদৃশ্য-সঙ্কট এড়াইবার জন্য, ভারতবর্ষের ধর্ম্মনীতি আত্মসম্মানকে দূরে রাখিয়া আসিয়াছে। ফল যখন পাকে, তখন আপনা হইতেই বোঁটা ছাড়িয়া পড়ে, পাকাইবার জন্য তাহাকে বৃন্তহীন করিলে তাহা বিকৃতই হয়, পরিণত হয় না।

এইরূপে চাষের প্রথম পত্তনে অহং-বৃত্তির সর্ব্ব-বিসারী গুল্ম উৎপাটিত করিয়া ভারতবর্ষ ধর্ম্ম-সাধনের ক্ষেত্র এমন সমতল করিয়া দিয়াছিল, যে কেহ তাহার দুয়ার হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক বর্ণ তাহার বিরাট রাজছত্রতলে একটা সুচারু শ্রেণীর ভিতর স্থান পাইয়াছে।

'পৌত্তলিক' বলিয়া ভারতবর্ষের একটা দুর্নাম আছে। বিরোধ জিনিসটা প্রধানতঃ সহানুভূতির অভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, দূর হইতে যাঁহারা অপযশ ঘোষণা করেন, তাঁহারা আপন অন্ধ অপ্রশস্ত অনুমানের দ্বারাই চালিত হন্, সত্যের দ্বারা নহে। জননী যেমন আপনার রুগ্ন ও সুস্থ—দুর্ব্বল ও সবল সন্তানকে সমস্নেহে যোগ্য আহার বণ্টন করিয়া দেন, তেমনিভাবে ভারতবর্ষ তাহার যোগ্য ও অযোগ্য অধিকারী ভেদে ধর্ম্মকে সমতুল্য করিয়া সকলের কাছে বিভাগ করিয়া দিয়াছিল। বিভিন্নমুখী শক্তি-সমূহকে এক সমতল-ক্ষেত্রে আনিয়া একটি মাত্র লক্ষ্যবেধের অক্ষমতার দ্বারা ভারগ্রস্ত করিয়া তোলে নাই। নির্গুণ ধারণাতীত ব্রহ্ম, বলিতে যত সহজ ধ্যানে তত সহজ নয়; অথচ এই পরাভক্তিকে বাদ দিয়া যে জীবন, ভারতবর্ষ কদাচ তাহার অনুমোদন করে নাই, ব্রহ্মবর্জ্জিত যে মানব তাহার মানবত্ব কখনও সে স্বীকার করে নাই! পদ্মপলাশলোচন হরিকে খুঁজিতে বাহির হইয়া, প্রহ্লাদ যেমন হিংস্র শ্বাপদের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ তেমনি তাহার অসীম আকুলতায় বিশ্বভুবনের দ্বারে লুণ্ঠিত হইয়াছে, শিলাখণ্ডের কাছেও কাঁদিয়া বলিয়াছে, "যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু"—সেই তুমি ইহারও ভিতর অধিষ্ঠিত আছ! সে জড়কে শুধু জড় বলিয়া দেখে নাই, তাহার পশ্চাতে যে চিন্ময় মূর্ত্তি, যাঁহার বিভাতিতে এই নিখিল লোক বিভাত হইয়াছে, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে দেখিয়াছে, তাই তাহার জড়-অজড়ের ভেদ ঘুচিয়া গিয়াছিল। কাজেই ভারতবর্ষকে যখন পৌত্তলিক বলা যায়, তখন তাহার দ্বারা কতখানি সত্য প্রচারিত করা হয়, তাহা বলা যায় না। ভারতবর্ষ ব্রহ্মকে বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছিল, আকাশে, বাতাসে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, মৃত্তিকায়, শূন্যে—এই বিশ্বলোকের মাঝখানে সেই বিশ্বনাথকে অনুভব করিয়াছিল, যিনি "অরা ইব রথনাভৌ" ইহার ভিতর অধিষ্ঠিত আছেন।

শিশু যেমন যাহা দেখে, তাহাকেই সচেতন বলিয়া মনে করে, তেমনি ভারতবর্ষ প্রভাতে জাগিয়া যখন এই বিচিত্র শক্তিশালিনী প্রকৃতিকে তাহার চোখের কাছে দেখিয়াছিল, তখন সে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহাতেই ঈশ্বরত্বের

আরোপ করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশই সে দেখিতে পাইল এই চন্দ্র, সূর্য্য, ক্ষিতি, অপ্, উষা, বরুণ, দিবস, রাত্রি—ইহাদিগের অন্তরে আর একটি শক্তি কার্য্য করিতেছে; তখন সে বলিয়া উঠিল, "এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্ত বৈ তৎকর্ম সবৈ বেদিতব্যঃ!" যিনি এই সূর্য্য-চন্দ্রাদির সৃষ্টিকর্ত্তা, এই সূর্য্য-চন্দ্রাদি যাঁহার দ্বারা সৃষ্ট, তাঁহাকেই জানা আবশ্যক। তখন তাহার চোখের কাছ হইতে সেই পর্দ্দাটি সরিয়া গেল, প্রকৃতির সেই গোপন অন্তর্কক্ষের দ্বার তাহার কাছে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা
বিদ্যুতোভান্তি কুতঃহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং যস্ত ভাসা
সর্ব্বমিদম্ বিভাতি॥"

সূর্য্য সেখানে কিরণ দেয় না, চন্দ্রতারা সেখানে কিরণ দেয় না; বিদ্যুৎ, অগ্নি, সেখানে প্রকাশিত হয় না। তাঁহার আলোই এই সমস্ত আলোকিত করিতেছে, তাঁহার প্রভায় এই সমস্ত প্রতিভাত হইতেছে।

এইখানেই সে নিবৃত্ত হইল না, তাহার পুলকোদ্বেল কণ্ঠ বিস্ময় ঘোষণা করিয়া দিল—

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতন্
যচ্চক্ষুসা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদম্ শ্রুতম্।
যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে
যং প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।

মন যাঁকে মনন করিতে পারে না, কিন্তু যিনি মনকে চালিত করিতেছেন, চক্ষু যাঁহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু যিনি চক্ষুতে দৃষ্টি-দান করিতেছেন, শ্রোত্র যাহাকে শুনিতে পায় না, কিন্তু যিনি শ্রুতিকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, প্রাণ যাঁহাকে প্রাণবান করিতে পারে না, কিন্তু যিনি জীবপ্রাণের প্রণেতা তিনিই ব্রহ্ম। অমৃতের অধিকারী, তোমরা তাঁহাকে জ্ঞাত হও!

ঠিক কথা যদি বলা যায়, তবে ভারতবর্ষই ব্রহ্মাকে আবিষ্কার করিয়াছিল।

বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে সাধনার তিনটি যুগ (Period) দেখা যায়। প্রথম, বৈদিক যুগ, সাধন-তন্ত্রের সোপান। ভারতবর্ষের নব উন্মীলিত শিশু-চক্ষে জড় প্রকৃতি ও তাহার দুর্দ্ধর্ষ শক্তি ঐশ্বরিক মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে, শুব্ধ বন-তল নিশাবসানে হিরণ্যগর্ভ পূজার অর্চ্চনা-গীতির ঝঙ্কারে ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি অগ্নিময় রথচক্রে দিবসকে বাঁধিয়া আনিতেছেন, তিনি যজ্ঞ-হবি গ্রহণ করিয়া শস্যক্ষেত্রকে উর্ব্বর ও যজ্ঞীয় পশুদল বৃদ্ধি করিয়া দিবেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদে ধন, বল, আয়ু বর্দ্ধিত হইবে। প্রত্যেক ঋক্ যেন এক একটি চিত্র, তাহার ভিতর দিয়া তখনকার অকৃত্রিম সরল জীবন উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার পর মধ্য যুগ। সেই অনায়াস-লব্ধ সহজ জ্ঞান তখন অপসারিত হইয়াছে, সৃষ্টি বৈচিত্র্যের পুলক-হিল্লোলের বিহ্বলতা চক্ষু হইতে অপগত হইয়াছে, তখন সে বিজ্ঞানের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বলিতেছে, "স এষ নেতি নেতি, নেত্যাত্মাহ গৃহ্যোন হি গৃহ্যতে" তিনি ইহা নন, ইহা নন, ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা যাহা গ্রাহ্য তাহা তিনি নহেন, তিনি

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসংনিত্যমগন্ধবচ্চযৎ
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যু মুখাৎ প্রমুচ্যতে"

তিনি অশব্দ অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য, অগন্ধবৎ, তিনি মহৎ হইতে মহৎ, নিত্য ও নির্ব্বিকার, তাঁহাকে জানিয়া জীব মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয়।

ইহা হইতে প্রাণ মন ও সমুদয় ইন্দ্রিয় আকাশ বায়ু জ্যোতি জল ও সকলের আধার পৃথিবী উৎপন্ন হইতেছে, এই অক্ষয় পুরুষের শাসনে ত্রিলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে, ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বর্ষণ করিতেছে, বায়ু বহমান হইতেছে, মৃত্যু ধাবমান হইতেছে! ইনি "পর্য্যগাচ্ছুক্রম কায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধম-পাপবিদ্ধম্, কবির্ম্মনীষী পরিভূঃস্বয়ম্ভুঃ!" শৈশবের খেলা-ধূলা তাহার অঙ্গ হইতে তখন মুছিয়া গিয়াছে, পরিপূর্ণ যৌবনের অপূর্ব্ব কান্তির ভিতর তাহার জটাজাল ভূষিত ললাটে তপস্তেজ বিচ্ছুরিত হইতেছে; মহোল্লাসে তখন সে বলিতেছে, "সোহহং" আমিই তিনি—যিনি এই "নদী গিরিগুহা পারাবারে জলে স্থলে ব্যাপ্ত" আছেন।

অবশেষে বার্দ্ধক্য! ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড আজ আনত হইয়া গিয়াছে, তাহার শক্তি ও তেজ জলিয়া নিভিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট পড়িয়া আছে শুধু ভস্ম—লোলচর্ম্ম ও শুষ্ক পেশী, আর তাহার নীচে একটি অতিশয় শীর্ণ কঙ্কাল! ভারতবর্ষ এখন জরাগ্রস্ত হইয়া ঝিমাইতেছে, যে বাণী একদিন তাহার আপন কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা সে নিজে এখন বুঝিতে পারিতেছে না, তাহার চক্ষের নেত্রচ্ছদ সমস্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! তাহার মন্ত্র এখন শব্দ সমষ্টিতে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠান-মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সব যেন প্রাণ-হীন অর্থহীন—অন্তরের যোগসূত্র যে তাহার কখন কোথায় ছিঁড়িয়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। এই বৃহৎ কঞ্চুকটির মধ্য হইতে সেই অতিকায় সর্প যে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই!

জাতবস্তু মাত্রেই জরার অধীন। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর বীজ উপ্ত হয়, এক একটি জাতি ও ধর্ম্ম তাহার ফুৎকারে প্রদীপের মত জ্বলিয়া নিভিয়া যাইতেছে! সৃষ্টির নেমিচক্র ঊর্দ্ধে ও নিম্নে আবহমান কাল উত্থিত ও পতিত হইতেছে—একের হস্তচ্যুত কেতন অপরে লইয়া অগ্রসর হইতেছে, এক একটি জাতি ও দেশকে অবলম্বন করিয়া অনন্ত কালের অনন্ত অভিব্যক্তি শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে—তাহা বিশ্বজগতের কেতন, বিশ্বমানবের কেতন, বিশ্ববাসীর কেতন, তাহা জাতি বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের অধিকৃত নয়!

ভারতবর্ষের প্রাচীন ধারাগুলির সহিত অনেক নূতন ধারা আসিয়া মিলিয়াছে। বর্ত্তমান উপাসনা-পদ্ধতি তাহার অন্যতম। ভগবদ্ভক্তির কয়েকটা স্তর আছে, তাহার এক একটি বিভাগ এক একটি রেখার দ্বারা বিভিন্নীকৃত। প্রথম দাস্য ভাব। মানব-চিত্ত তখন স্রষ্টার বিরাট মহিমার নিকট আপনার দৈন্যে কুণ্ঠিত ভাবে নতশিরে দাঁড়াইয়া আছে। পরে ঈশ্বরে পিতৃমাতৃত্বের আরোপ এবং পরে আরো নিবিড় হইয়া সে ভাব বাৎসল্যে ও তাহা হইতে

কান্তভাবে পৌঁছিয়াছে। কিছু পূর্ব্বে যে দৃষ্টির সম্মুখে সে কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল, এখন তাহাকেই প্রেমাবেশে বলিতেছে—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়া পর রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল"।

এই কান্তভাবের মধ্যে একটি অপরূপত্ব আছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় যে ভেদ হইয়াছিল, তাহা এই চরণ কয়টিতে বাজিয়া উঠিয়াছে; সেই অনন্ত কালের বিরহ-ব্যথা, দূরত্বে যাহা প্রতিদিন নিবিড় হইয়া উঠিতেছে, বিশ্বচরাচরের সেই অখণ্ড তৃষ্ণা, অসহ আকুলতা, লক্ষ যুগের বিচ্ছেদ-দুঃখ স্মরণ করিয়া আজ চিত্ত কাঁদিয়া উঠিয়াছে!

ভারতবর্ষের এই অনমুমেয় পরানুরক্তির ভিতর আর একটি জিনিস লালিত হইয়াছিল, তাহা উদারতা। একই ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যখন পৃথিবীর অপর জাতি শুধু আচারগত ভেদ লইয়া হিংস্র শ্বাপদের মত পরস্পরের রক্তপাতের জন্য যুঝিয়া মরিতেছিল, ভারতবর্ষ তখন শান্ত সমাহিত চিত্তে আপনার এক অঙ্গনতলেই আর্য্য অনার্য্য বর্ণসঙ্কর সমস্ত বিভিন্ন জাতির পূজার স্থান করিয়া দিতেছিল। কারণ সে একা শুধু জানিয়াছিল যে,

"যঁল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতী ভবতি
তৃপ্তো ভবতি।
যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি, ন শোচতি ন
দ্বেষ্টি ন রমতে ন উৎসাহী ভবতি॥"

যাঁহাকে লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ হয়, অমৃত হয়, তৃপ্ত হয়, যাঁহাকে পাইলে মনুষ্যের দ্বেষ, তৃষ্ণা, শোক গত হয়, বাসনার তন্তু ছিন্ন হয়, যিনি "গুণরহিতং জন্মরহিতং প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমানম্ বিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপ," "যিনি অদৃশ্যমগ্রাহ্যমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যম বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনি—যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষু, অশ্রোত্র, হস্তপদ রহিত, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম,অব্যয় ও ভূতযোনি—তাঁহাকে শুধু নামের দ্বারা বিভক্ত করা বিমূঢ়তা মাত্র। হ্রদ তড়াগ নদী সাগর উপসাগর প্রভৃতি নামের সহস্র বিভিন্নতা সত্ত্বেও জল যেমন বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয় না, তেমনি তিনি ও আধারের ভেদে বিভিন্ন হন না, কেন না ইনি-ই তিনি

"যদেবেহ তদমুত্র যদ-মুত্র তদন্বিহ
মৃত্যো স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"

যিনি এখানে তিনিই সেখানে, যিনি সেখানে তিনি-ই এখানে, যে ইঁহাকে নানা রূপে দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

একজন অপরিচিত লোককে দেখিলে যেমন প্রথমেই তাহার অবয়ব ও পরিচ্ছদ আমাদের চোখে পড়ে, কিন্তু নিকটতম-আত্মীয়কে দেখিলে শুধু তাহার স্নেহই মনে জাগ্রত হইয়া উঠে তেমনি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে ব্রহ্মের নামরূপ ভারতবর্ষের চোখে পড়ে নাই—সে শুধু তাহার মধ্য হইতে দেখিতে পাইয়াছে তাঁহাকে—যাঁহার

"অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্র সূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং
পৃথিবী।"

অগ্নি যাঁহার মূর্দ্ধা, চক্ষু চন্দ্র সূর্য্য, দিক্‌সমূহ শ্রোত্র, বাক্য বেদ, বায়ু প্রাণ, হৃদয় বিশ্বলোক, চরণ পৃথিবী।

হৃদয়ের এই তুঙ্গ শিখর হইতে যে উৎসটি নামিয়াছে—তাহা জড় অজড় চেতন অচেতনের বিভেদ মানে নাই—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরুলতায় তাহা প্লাবিত করিয়া গিয়াছে। দিগ্বিজয়ী রাজা দিলীপ রাজ্ঞীসহ বনছায়ায় নন্দিনী গাভীর তৃণাহরণ করিয়াছে, দীনবেশে যাজ্ঞিকের মত রাজসম্মান ত্যাগ করিয়া সম্বৎসর তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছে। সে কি বিরাট সমারোহ! তাহা বর্ণনা করিতে মহাকবির সর্গের পর সর্গ রচিত হইয়াছে তবু শেষ হয় নাই! মাধবী লতার সহিত সখীত্বে আবদ্ধ, শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রাকালে সেই সযত্ন জল-সেবিত ক্ষীণাঙ্গী লতার পুষ্পোদ্গম ও আশ্রম তরুগণের ছায়া-নিবিড় শাখার দিকে সাশ্রু নেত্রে সে ফিরিয়া চাহিতেছে, রাজ্যাধীপ স্বামীর সোহাগ স্মৃতি তাহা বারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। এই জটাজুট ধারী সন্ন্যাসী ভারতের বক্ষস্থলে যে অসীম প্রেম উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতেছিল, তাহা উৎসারিত করিয়া দিতে তাহার স্থান কুলায় নাই, কাহারো কথা সে বিস্মৃত হয় নাই, কাহারো বেদনা সে তুচ্ছ করে নাই, তাহার বিশাল প্রাণের বিরাট পরিসরের ভিতর বিশ্বনাথের বিশ্বরূপ ভরিয়া গিয়াছিল!

প্রাচীন ভারতের ঈশ্বরারাধনা একটী অত্যন্ত নিগূঢ় ব্যাপার। নিভৃতে, নির্জ্জনে, ইন্দ্রিয় প্রাণ নিরোধক তাহার অনুষ্ঠান একেবারে বহির্জ্জগত ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রথমেই তাহার যেখানে দাঁড়াইতে হইয়াছে তাহা ঐকান্তিক একাগ্রতা—তাহার এতটুকু ব্যত্যয় হইলে চলিবে না। হৃদয়ের এই প্রবাহ—বিষয় সমূহ যাহাতে প্রতিনিয়ত তরঙ্গ জাগাইতেছে তাহাকে সে একটা অমিত স্থৈর্য্যের দ্বারা বন্ধন করিয়া তাহার উপর বিশ্বনাথের নিস্তরঙ্গ আসনটি বিছাইয়াছে, কারণ—

"নায়ম্ আত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তসেষৈ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্।

এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন কিম্বা মেধা দ্বারা লাভ করা যায় না, যাঁহাকে ইনি আত্ম-দর্শনার্থ প্রেরণ করেন তাহা দ্বারাই ইনি লভ্য। মন যখন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি স্থির লক্ষ্য হয়, তখনই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিশ্বসংসার যখন মনের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন নয়।

এ কথাটা আমরা সম্প্রতি ভুলিয়া গিয়াছি, আজ আমরা বিরাট জনসঙ্ঘের সন্নিবেশ ছাড়া তাঁহাকে ডাকিতে পারি না, আমাদের অন্তরে এমন দৈন্য প্রবেশ করিয়াছে যে একাকী আমরা তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারি না! নিজের ভাণ্ডার খালি বলিয়া আমাদের নিরন্তর পরের ধন দিয়া আপন নগ্নতা ঢাকিতে হইতেছে, আপনার নিভৃত একাগ্রতাকে ছাড়িয়া বহুজনের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা হৃদয়ের শূন্যতা পুরাইবার জন্য চেষ্টিত হইতে হইতেছে!

পরস্পরে গভীর অনুরক্ত প্রণয়ী যেমন তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে প্রসন্ন না হইয়া বাধাই পাইতে থাকে, প্রাচীন ভারতবর্ষ তেমনি তাহার ও তাহার প্রিয়তমের মাঝখানে

অপর কাহাকেও আসিতে দেয় নাই। তাহার বিজন মিলন মন্দিরের অভিসার পথে তাহার মানস-বধূ অনন্তচিত্তের অখণ্ড অনুরাগ দীপ স্বরূপ জ্বালাইয়া গিয়াছে! এই খানে প্রাচীন ভারতের গুরুবাদের একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে,—কিন্তু বিজ্ঞানী ভারতবর্ষ জানিয়াছিল যে মানুষ নিরন্তর তাহার হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের অধীন। এই বন্ধুর পিচ্ছিল পথে চলিতে গিয়া পাছে তাহার পদ-স্খলিত হইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়, পাছে তাহার আপন চোখের দৃষ্টি কম বলিয়া ঠিক্ গম্য পথটি দেখিয়া লইতে ভুল হয়, সংশয় যখন ঝড়ের বেগে আসিয়া পড়িবে, হাতের ক্ষীণ আলোটি অন্তরালের অভাবে পাছে নিভিয়া যায়—তাই সে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানের সাহায্য লইবার উপদেশ দিয়াছে! প্রথম হাঁটিবার বেলায় শিশু যেমন জননীর অঙ্গুলি ধরিয়া হাঁটিতে শেখে ঠিক্ তেমনি ভাবে সে গুরূপদেশ গ্রহণ করিয়াছে—খঞ্জের যষ্টির মত তাহাতে চির-নির্ভর স্থাপন করে নাই!

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষজায়া।

হকিকত রায়।

পঞ্জাব প্রদেশে লাহোরের নিকটবর্ত্তী রাবিনদীর তীরে একটি অনতি বৃহৎ সমাধি রহিয়াছে। তথায় প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজার দিন খুব সমারোহের সহিত একটি মেলা হইয়া থাকে। ঐ সমাধিটি একটি একাদশ বর্ষবয়স্ক বালকের—যাঁহার অসাধারণ সাহস, অটল প্রতিজ্ঞা, অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা একদা সমস্ত ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; যাঁহার নাম স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র হৃদয় যুগপৎ ভক্তি, আনন্দ ও বিষাদে পূর্ণ হয়; সেই ধীরপ্রকৃতি স্থিরপ্রতিজ্ঞ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, স্বধর্ম্মপরায়ণ বালকের নাম হকিকত রায়।

অগ্গর নামক একজন পঞ্জাবী কবির রচিত একটি গ্রাম্য-সংগীত পাঠে জানাযায় যে, হকিকত রায় ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে স্যালকোট নামক জনপদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল লালা বাগমল। তিনি পুত্রকে সংস্কৃত ভাষায় বুৎপন্ন করিয়া পরে একমৌলবীর নিকট পারসী অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন।

শৈশব হইতেই হকিকতের ধর্ম্মের প্রতি একটা প্রবল আনুরক্তি ছিল, তিনি স্বীয় মাতার নিকট রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদির কথা শুনিতে খুবই ভাল বাসিতেন।

হকিকত যে মৌলবীর নিকট পারসী পড়িতেন, একদিন তিনি কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। সেই সময় সকল মুসলমানবালক মিলিত হইয়া হিন্দুদিগের ঠাকুর দেবতার প্রতি অসম্মান সূচক নানাবিধ ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিল। স্বধর্ম্মপরায়ণ হকিকতের তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হইল। তিনিও মহম্মদ এবং পৈগম্বর প্রভৃতির নামে উপহাস করিলেন। ক্রমশঃ উভয়পক্ষে কলহ উপস্থিত হইল। যথা সময়ে মৌলবী প্রত্যাগমন করিলে মুসলমান বালকেরা তাঁহার নিকট হকিকতের বিরুদ্ধে নালিশ করিল।

মৌলবী ক্রুদ্ধচিত্তে হকিকত রায়কে তৎক্ষণাৎ কাজির নিকট পাঠাইলেন। কাজি সবিশেষ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও কুপিত হইলেন, এবং হকিকতের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাদিয়া তদ্বিষয়ে চূড়ান্ত বিচারের জন্য তাঁহাকে লাহোরের সুবাদারের নিকট পাঠাইলেন।

জফর খাঁ নামক একজন পাঠান তখন লাহোরের সুবাদার ছিলেন। হকিকত রায় সুবাদারের সম্মুখে আনীত হইয়া সমুচিত বিনীতভাবে ও একান্ত অকপট-চিত্তে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন, নিজ জীবন রক্ষার জন্য এক চুলও অসত্য বলিলেন না। সুবাদার এই একাদশবর্ষীয় বালকের প্রবল স্বধর্ম্মানুরাগ, অটল সত্যনিষ্ঠা, ও সুকোমল শান্ত-স্বভাব নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত মুগ্ধ ও দয়ার্দ্র হইলেন; কিন্তু কাজির আজ্ঞা অমান্য করিতেও সাহসী না হইয়া বলিলেন—"হকিকত, তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি তোমার প্রাণ রক্ষার এক সুন্দর উপায় ঠিক করিয়াছি, তুমি পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর।" এই কথা শ্রবণমাত্র হকিকত রায় সমুচিত দৃঢ়তার সহিত বলিলেন "আমি মৃত্যুদণ্ড স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না।"

হকিকতের পিতামাতার নিকট এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ বিদ্যুৎবেগে আসিয়া পৌঁছিল। তাঁহারা শোকোন্মত্ত হইয়া পুত্রকে দেখিবার জন্য লাহোর যাত্রা করিলেন।

সুবাদার তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা ও সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—"হকিকত যদি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে—তবেই সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারে আপনারা তাহাকে বুঝাইয়া বলুন।" পুত্রের প্রাণের দায়ে হকিকতের মাতা পর্য্যন্ত তাঁহাকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণে পরামর্শ প্রদান করিলেন। মাতার নিকট হইতে এইরূপ অপ্রত্যাশিত আদেশ পাইয়া পুত্র বলিলেন, "মা তুমিই তো আমাকে বরাবর বলিয়াছ যে, এই ক্ষণ-ভঙ্গুর শরীরকে কোনো অসার পার্থিব ভোগবিলাসের অধীন না করিয়া সৎকার্য্যে উৎসর্গ করাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। এখনই ত আমার পরীক্ষার প্রকৃত সময়। এখন আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পরামর্শ না দিয়া আশীর্ব্বাদ কর যেন পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিতে পারি। আত্মা অবিনশ্বর ও চিরউন্নতিশীল, তাহাকে কেহই বধ করিতে পারে না। সুতরাং যথার্থ হকিকত রায়কে নষ্ট করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।" তাঁহার পিতাও তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, সুবাদার তাঁহাকে জামাতা করিবার লোভ পর্য্যন্ত দেখাইলেন। কিন্তু হকিকত স্থির অচঞ্চল ও দৃঢ়সংকল্প। পরিশেষে সুবাদার উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণবধের জন্য তাঁহাকে জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

পিতামাতার হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদের মধ্যে হকিকত রায় বধ্য-ভূমিতে আনীত হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই সেস্থান লোকে পূর্ণ হইয়া গেল, সকলের মুখেই হাহাকার ধ্বনি, সকলেরই চক্ষু জলপূর্ণ, কিন্তু হকিকত রায় নির্ভীক বীরপুরুষের ন্যায় প্রশান্ত ভাবে দণ্ডায়মান! জল্লাদ তাঁহার শিরচ্ছেদ করিবার জন্য খড়্গ উঠাইল, কিন্তু পারিল না;

খড়্গ মাটিতে পড়িয়া গেল। হকিকত রায় সেই মুহূর্ত্তে খড়্গ তুলিয়া জল্লাদের হাতে দিলেন এবং বলিলেন,—"নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ হয়ো না, শীঘ্র কায সমাধা কর।" এবার জল্লাদ তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিল। হকিকতের মস্তক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। সমাগত জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে বিলাপ ও ক্রন্দনের ধ্বনি উত্থিত হইল। বৃদ্ধ পিতামাতাকে শোকানলে নিক্ষেপ করিয়া স্বধর্ম্মপরায়ণ তেজস্বী বালক সহাস্যবদনে ও সগর্ব্বে এই মরজগত ছাড়িয়া অমরধামে পরম-পিতার ক্রোড়ে চিরাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে হকিকত রায়ের নাম জনসমাজে 'ধর্ম্মবীর' বলিয়া ঘোষিত হইল।

হিন্দুগণ এই অসাধারণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ তেজস্বী বালকের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য রাবি-নদীর তীরে তাঁহার এক সমাধি মন্দির স্থাপন করিলেন। অদ্যাপি তথায় প্রতিবৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিনে মহাসমারোহের সহিত একটি মেলা হইয়া থাকে। এই সমাধির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মহারাজ রণজিৎ সিং স্যালকোটের অন্তর্গত দুইটি গ্রাম দান করেন; কিন্তু সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ঐ গ্রাম দুইটি খাশ করিয়া লইয়াছেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে বার্ষিক একশত কুড়ি টাকা করিয়া দেন।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

দুর্লভ।

ঈশ্বরের মধ্যে মনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনে, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, এই কথা অনেকের মুখে শোনা যায়।

পারিনে যখন বলি তার অর্থ এই, সহজে পারিনে; যেমন করে নিঃশ্বাস গ্রহণ করচি কোনো সাধনার প্রয়োজন হচ্চেনা, ঈশ্বরকে তেমন করে আমাদের চেতনার মধ্যে গ্রহণ করতে পারিনে।

কিন্তু গোড়া থেকেই মানুষের পক্ষে কিছুই সহজ নয়; ইন্দ্রিয় বোধ থেকে আরম্ভ করে ধর্ম্মবুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্তই মানুষকে এত সুদূর টেনে নিয়ে যেতে হয় যে মানুষ হয়ে ওঠা সকল দিকেই তার পক্ষে কঠিন সাধনার বিষয়। যেখানে সে বল্‌বে "আমি পারিনে" সেইখানেই তার মনুষ্যত্বের ভিত্তি ক্ষয় হয়ে যাবে, তার দুর্গতি আরম্ভ হবে; সমস্তই তাকে পারতেই হবে।

পশুশাবককে দাঁড়াতে এবং চল্‌তে শিখতে হয় নি। মানুষকে অনেকদিন ধরে বারবার উঠে পড়ে তবে চলা অভ্যাস করতে হয়েছে; আমি পারিনে বলে সে নিষ্কৃতি পায়নি। মাঝে মাঝে এমন ঘটনা শোনা গেছে, পশুমাতা মানবশিশুকে হরণ করে বনে নিয়ে গিয়ে পালন করেছে। সেই সব মানুষ জন্তুদের মত হাতে পায়ে হাঁটে। বস্তুত তেমন করে হাঁটা সহজ। সেই জন্য শিশুদের পক্ষে হামা-গুড়ি দেওয়া কঠিন নয়।

কিন্তু মানুষকে উপরের দিকে মাথা তুলে

খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে। এই খাড়া হয়ে দাঁড়ানো থেকেই মানুষের উন্নতির আরম্ভ। এই উপায়ে যখনি সে আপনার দুই হাতকে মুক্তিদান করতে পেরেছে তখনি পৃথিবীর উপরে সে কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করেছে। কিন্তু শরীরটাকে সরল রেখায় খাড়া রেখে দুই পায়ের উপর চলা সহজ নয়। তবু জীবন-যাত্রার আরম্ভেই এই কঠিন কাজকেই তার সহজ করে নিতে হয়েছে; যে মাধ্যাকর্ষণ তার সমস্ত শরীরের ভারকে নীচের দিকে টানচে, তার কাছে পরাভব স্বীকার না করবার শিক্ষাই তার প্রথম কঠিন শিক্ষা।

বহু চেষ্টায় এই সোজা হয়ে চলা যখন তার পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়াল, যখন সে আকাশের আলোকের মধ্যে অনায়াসে মাথা তুল্‌তে পারল তখন জ্যোতিষ্কবিরাজিত বৃহৎ বিশ্বজগতের সঙ্গে সে আপনার সম্বন্ধ উপলব্ধি করে আনন্দ ও গৌরব লাভ করলে।

এই যেমন জগতের মধ্যে চলা মানুষকে কষ্ট করে শিখ্‌তে হয়েছে, সমাজের মধ্যে চলাও তাকে বহুকষ্টে শিখ্‌তে হয়েছে। খাওয়া পরা, শোওয়া বলা, বসা চলা এমন কিছুই নেই যা তাকে বিশেষ যত্নে অভ্যাস না করতে হয়েছে। কত রীতিনীতি নিয়ম সংযম মান্‌লে তবে চারদিকের মানুষের সঙ্গে তার আদানপ্রদান, তার প্রয়োজন ও আনন্দের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ও সহজ হতে পারে। যতদিন তা না হয় ততদিন তাকে পদে পদে দুঃখ ও অপমান স্বীকার করতে হয়—ততদিন তার যা দেবার ও তার যা নেবার উভয়ই বাধাগ্রস্ত হয়।

জ্ঞানরাজ্যে অধিকার লাভের চেষ্টাতেও মানুষকে অল্প ক্লেশ পেতে হয় না। যা চোখে দেখ্‌চি কানে শুন্‌চি তাকেই আরামে স্বীকার করে গেলেই মানুষের চলে না। এই জন্যেই বিদ্যালয় বলে কত বড় একটা প্রকাণ্ড বোঝা মানুষের সমাজকে বহন করে বেড়াতে হয়—তার কত আয়োজন, কত ব্যবস্থা! জীবনের প্রথম কুড়ি পঁচিশ বছর মানুষকে কেবল শিক্ষা সমাধা করতেই কাটিয়ে দিতে হয়—এবং যাদের জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল সমস্ত জীবনেও তাদের শিক্ষা শেষ হয় না।

এমনি সকল দিকেই দেখ্‌তে পাই মানুষ মনুষ্যত্বলাভের সাধনায় তপস্যা করচে। আহারের জন্যে রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে চাষ করাও তার তপস্যা, আর নক্ষত্রলোকের রহস্য ভেদ করবার জন্যে আকাশে দুরবীন তুলে জেগে থাকাও তার তপস্যা।

এমনি প্রাণের রাজ্যেই বল, জ্ঞানের রাজ্যেই বল, সামাজিকতার রাজ্যেই বল সর্ব্বত্রই আপনার পূর্ণ অধিকার লাভ করবার জন্যে মানুষকে প্রাণপণ করতে হয়েছে। যারা বলেছে, পারিনে, তারাই নেবে গিয়েছে। যা সহজ না, তারই মধ্যে মানুষকে সহজ হতে হবে—সহজের প্রকাণ্ড মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে তাকে সর্ব্বত্রই উপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে।

প্রথম থেকেই সহজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এই প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে এমনি স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে অনাবশ্যক দুঃসাধ্যসাধনও তাকে আনন্দ দেয়। আর কোনো প্রাণীর মধ্যেই এই অদ্ভুত জিনিষটা নেই। যেটা সহজ, সেটা আরামের, তার ব্যতিক্রম দেখ্‌লে অন্য কোনো প্রাণী সুখ বোধ

করতে পারে না। অন্য প্রাণীরা যে লড়াই করে সে কেবল প্রয়োজন সাধনের জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে, অর্থাৎ দায়ে পড়ে; সে লড়াই গায়ে পড়ে দুঃসাধ্য সাধনের জন্যে নয়। কিন্তু মানুষই কেবলমাত্র কঠিন কাজকে সম্পন্ন করাতেই বিশেষ আনন্দ পায়।

এই জন্যেই যে ব্যায়ামকৌশলে কোনো প্রয়োজনই নেই সেটা দেখা মানুষের একটা আমোদের অঙ্গ। যখন শুন্‌তে পাই বারম্বার পরাস্ত হয়েও মানুষ উত্তরমেরুর তুষার-মরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে আপনার জয়পতাকা পুঁতে এসেছে তখন এই কার্য্যের লাভ সম্বন্ধে কোনো হিসাব না করেও আমাদের ভিতরকার তপস্বী মনুষ্যত্ব পুলক অনুভব করে। মানুষের প্রায় প্রত্যেক খেলার মধ্যেই শরীর বা মনের একটা কিছু কষ্টের হেতু আছে—এমন একটা কিছু আছে যা সহজ নয় বলেই মানুষের পক্ষে সুখকর।

যখন কোনো ক্ষেত্রেই মানুষকে "পারিনে" একথাটা বল্‌তে দেওয়া হয়নি তখন ব্রহ্মের মধ্যে মানুষ সহজ হবে সত্য হবে, এসম্বন্ধেও "পারিনে" বলা তার চল্‌বে না। সকল শ্রেষ্ঠতাতেই চেষ্টা করে তাকে সফল হতে হয়েছে আর যেটা সকলের চেয়ে পরম শ্রেষ্ঠতা সেইখানেই সে নিতান্ত সামান্য চেষ্টা করেই যদি ফল না পায় তবেই একথা বলা তার সাজবে না যে আমার দ্বারা একেবারে সাধ্য নয়।

যতই সহজ ও যতই আরামের হোক্ তবু আমরা কেবল মাটির দিকেই মাথা করে পশুর মত চলে বেড়াব না মানুষের ভিতর এই একটি তাগিদ্ ছিল বলেই মানুষ যেমন বহু চেষ্টায় আকাশে মাথা তুলেছে—এবং সেই আকাশে মাথা তুলেছে বলে পৃথিবীর অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয়নি, বরঞ্চ পশুর চেয়ে তার অধিকার অনেক বৃহৎভাবে ব্যাপ্ত হয়েছে, তেমনি আমাদের মনের অন্তরতম দেশে আর একটি গভীরতম উত্তেজনা আছে, আমরা কেবলি সংসারের দিকে মাথা রেখে সমস্ত জীবন ঘোর বিষয়ীর মত ধূলা ঘ্রাণ করে করেই বেড়াতে পারব না—অনন্তের মধ্যে, অভয়ের মধ্যে, অশোকের মধ্যে মাথা তুলে আমরা সরল হয়ে উন্নত হয়ে সঞ্চরণ করব। যদি তাই করি তবে সংসার থেকে আমরা ভ্রষ্ট হব না বরঞ্চ সংসারে আমাদের অধিকার বৃহৎ হবে, সত্য হবে, সার্থক হবে। তখন মুক্তভাবে আমরা সংসারে বিচরণ করতে পারব বলেই সংসারে আমাদের যথার্থ কর্ত্তৃত্ব প্রশস্ত হবে।

জন্তু যেমন চার পায়ে চলে বলে হাতের ব্যবহার পায় না তেমনি বিষয়ীলোক সংসারে চার পায়ে চলে বলে কেবল চলে মাত্র, সে ভাল করে কিছুই দিতে পারে না এবং নিতে পারেনা। কিন্তু যাঁরা সাধনার জোরে ব্রহ্মের দিকে মাথা তুলে চল্‌তে শিখেছেন, তাঁদের হাত পা উভয়ই মাটিতে বদ্ধ নয়—তাঁদের দুই হাত মুক্ত হয়েছে—তাঁদের নেবার শক্তি এবং দেবার শক্তি পূর্ণতালাভ করেছে—তাঁরা কেবলমাত্র চলেন তা নয়, তাঁরা কর্ত্তা, তাঁরা সৃষ্টিকর্ত্তা।

যে সৃষ্টিকর্ত্তা সে আপনাকে সর্জ্জন করে, আপনাকে ত্যাগ করেই সে সৃষ্টি করে। এই ত্যাগের শক্তিই হচ্চে সকলের চেয়ে বড় শক্তি। এই ত্যাগের শক্তির দ্বারাই মানুষ বড় হয়ে

উঠেছে। যে পরিমাণেই সে আপনাকে ত্যাগ করতে পেরেছে সেই পরিমাণেই সে লাভ করেছে। এই ত্যাগের শক্তিই সৃষ্টি শক্তি। এই সৃষ্টি শক্তিই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য। তিনি বন্ধনহীন বলেই আনন্দে আপনাকে নিত্যকাল ত্যাগ করেন। এই ত্যাগই তাঁর সৃষ্টি। আমাদের চিত্ত যে পরিমাণে স্বার্থবর্জ্জিত হয়ে মুক্ত আনন্দে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় সেই পরিমাণে সেও সৃষ্টি করে, সেই পরিমাণেই তার চিন্তা, তার কর্ম্ম, সৃষ্টি হয়ে উঠে।

যাঁরা সংসার থেকে উচ্চ হয়ে উঠে ব্রহ্মের মধ্যে মাথা তুলে সঞ্চরণ করতে শিখেছেন তাঁদের এই ত্যাগের শক্তিই মুক্তিলাভ করেছে। এই আসক্তিবন্ধনহীন আত্মত্যাগের অব্যাহত শক্তি দ্বারাই আধ্যাত্মিকলোকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করেন। এই অধিকারের জোরে সর্ব্বত্রই তাঁরা রাজা। এই অধিকারই মানুষের পরম অধিকার। এই অধিকারের মধ্যেই মানুষের চরম স্থিতি। এইখানে মানুষকে "পারিনে" বল্লে চলবে না—চিরজীবন সাধনা করেও এই চরম গতি তাকে লাভ করতে হবে, নইলে সে যদি সমস্ত পৃথিবীরও সম্রাট হয় তবু তার "মহতী বিনষ্টিঃ"।

যে ব্রহ্মের শক্তি আমার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই নিজেকে উৎসর্জ্জন করচে, যিনি "আত্মদা", আমি জলে স্থলে আকাশে সুখে দুঃখে সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় তাঁর মধ্যেই আছি এই চেতনাকে প্রতিদিনের চেষ্টায় সহজ করে তুলতে হবে। এই সাধনার ধ্যানই হচ্চে গায়ত্রী। এই সাধনাই হচ্চে তাঁর মধ্যে দাঁড়াতে এবং চলতে শেখা। অনেকবার টলতে হবে, বারবার পড়তে হবে, কিন্তু তাই বলে ভয় করলে হবে না, তবে বুঝি পারব না। পারবই, নিশ্চয়ই পারব। কেননা অন্তরের মধ্যে এইদিকেই মানুষের একটা প্রেরণা আছে—এই জন্যে মানুষ দুঃসাধ্যতাকে ভয় করে না তাকে বরণ করে নেয়—এই জন্যেই মানুষ এত বড় একটা আশ্চর্য্য কথা বলে জগতের অন্য সকল প্রাণীর চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাগাও।

জাগাও জাগাও,
মম অন্তর আলোকে তব আলোক মিলাও।
মম অজানা বেদন,
মম অফুট চেতন,
তব আলোক কিরণে
এবে—ফুটাও ফুটাও।
মম হৃদয় মন্থন,
মম নিবিড় ক্রন্দন,
তব পরশে, নিমেষে
এবে—ঘুচাও ঘুচাও।
মম গোপন মরম,
মম গভীর সরম,
তব মোহন মিলনে
এবে—ডুবাও ডুবাও।

শ্রীহেমলতা দেবী।

পোষ্যপুত্র।

ধারাবাহিক উপন্যাস।

২৬

দেবমন্দিরের মধ্যে তখন সন্ধ্যারতির কাঁশরঘণ্টা বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে। উপরে সাটিনের উপর জরীর বুটিদার চাঁদোয়া, তাহার নীচে মর্ম্মর প্রস্তরের বেদির উপর রৌপ্য সিংহাসনে রাধা শ্যামের যুগলমূর্ত্তি পাশাপাশি স্থাপিত। যুগলকিশোরের নিকষ কৃষ্ণপাথরের চিক্কনদেহ পীতাম্বরে এবং ময়ূরপুচ্ছ সুবর্ণবংশী ও স্বর্ণচূড়ায় সাজান। বিগ্রহের গলায় তখনও সেই শান্তির হস্তের গাঁথা বিনাসূতায় মালা চামরের অল্প বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া সুবাস ছড়াইতেছে। সে মালা এখনও অম্লান। রাধার তপ্তকাঞ্চনবর্ণ নীলাম্বরে সুশোভিত। সে বস্ত্রের প্রত্যেক চুমকি-সলমাটি শান্তি নিজের হাতে অনেক যত্নপূর্ব্বক বসাইয়াছিল। বস্ত্রালঙ্কারশোভিত সেই কাঞ্চনমূর্ত্তি দুই পার্শ্বস্থ অন্যান্য দেবপ্রতিমাগণের সহিত প্রতিদিনকার মতই আলোকঝলকিত। তবুও আজ সমস্ত দেবালয়টা যেন বর্ষার বাতাসের মতন হাহা করিয়া উঠিতেছে, তবুও যেন আজ সেখানে কেহই নাই।

পুষ্পচন্দনের সুকোমল ঘনসৌরভে মন্দিরের বায়ুস্তর আমোদিত। বাতির আলো বহুশাখাবিশিষ্ট বেলওয়ারি ঝাড়ের মধ্য হইতে তাহাদের পিঙ্গলবর্ণ আভা বিচ্ছুরিত করিয়া নিয়ে চাহিয়া দেখিতেছে। নিত্যসেবার ভোজ্য নৈবেদ্য প্রতিদিনকার মতই সযত্নে রচিত। কিন্তু তথাপি বৃদ্ধ পুরোহিত তাহারি মধ্য হইতে আজ শত খুঁটিনাটিতে ত্রুটি ধরিতে লাগিলেন। ঠাকুরের পানের বাটা আজ এপর্য্যন্ত আসিয়া পৌছে নাই। ধুনা জ্বালাইবার জন্য অগ্নি রাখা হয় নাই। রাজরাজেশ্বরীর পূজার উপকরণ শ্যামের সম্মুখে এবং শ্যামের ভোজ্যপেয় শ্যামার বামভাগে রাখা হইয়াছে। পুরোহিত ঠাকুর বিলম্বে প্রাপ্ত ধুনাচির অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে ধুনাচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া অপ্রসন্ন মুখে কহিলেন "মালক্ষ্মী তো বাড়ী এসেছেন, তবে আবার এসব বে'বন্দোবস্ত হচ্চে কেন?"

শ্যামাকান্ত যখন আলোক প্রদর্শিত পথে ছাতা মাথায় দিয়া অল্পবৃষ্টিটুকু বাঁচাইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন আরতি শেষ হইয়া আসিয়াছে। আচার্য্য পঞ্চপ্রদীপ, শঙ্খ ও পুষ্পদ্বারা আরতি সমাপ্ত করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ সমাধা করিতেছেন।

বৃদ্ধ জমীদার তাঁহার বিগ্রহত্রয়কে ভক্তি-ভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া উঠিয়া বসিতেই এই মঙ্গল উৎসবের সর্ব্বাঙ্গীন অপূর্ণতা প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পুরোহিতের পশ্চাতে, অঙ্গুরে মর্ম্মর মেজের উপর কোমল করতল রক্ষা করিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী শান্তি তো আজ বসিয়া নাই। শ্যামাকান্তের মনটা সহসা বিকল হইয়া উঠিল, সেতো কখনোই এখানে অনুপস্থিত থাকে না! উঠিয়া দ্বারের নিকট আসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৌমারা এসেছিলেন?" সে জানাইল "তাঁহারা আসেন নাই"। "বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে আয় বৌমা কেন আসেননি, অসুখ করেনি তো?"

ভৃত্য চলিয়া গেল। শ্যামাকান্ত সেইখানেই দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, উদ্বেগে ও অনুতাপে মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়া-

ছিল। সে কেন আসিল না? সেও কি আজ তাঁহার স্নেহে সন্দিহান হইয়াছে? না অভিমান করিয়া আসে নাই? কয়দিন যে তিনি হেমের নিষ্ঠুর আঘাতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন! সেও বুঝি বা স্বামীর অবিবেচনার নিদারুণ আঘাতে লুটাইয়া পড়িয়াছে! এখনি তিনি সেখানে গিয়া দুই হাতে তাহার লুণ্ঠিত মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া ডাকিবেন "মা, কেন মা ছেলের ওপোর আজ রাগ করেছিস্? কুপুত্র হলেও কুমাতা তো হবার যো নেই।" শ্যামাকান্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, শান্তির সজল বিশালনেত্রের মেঘান্ধকার বিদারণ করিয়া স্নিগ্ধ বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া সে মধুর কলহাস্যের সহিত উত্তর দিল "আমি আবার রাগ করলুম কখন জ্যেঠামশাই?" কিন্তু কে জানে মানুষের কেমন সঙ্কীর্ণ সভয়চিত্ত সে সহজ কথাটা মনে করিতে গিয়াও হাজারবার পিছাইয়া আসে। মুহুর্মুহু চকিত বিদ্যুতালোকে শ্যামাকান্তের ক্রোড়স্থ মুখখানাকে দশরথ রাজার স্বহস্তবিদ্ধ ঋষিকুমার সিন্ধুর মরণাহত শুভ্রমুখের মতন বলিয়া মনে হইল, তিনি শিহরিয়া দেবীপ্রতিমার পানে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিলেন "দুর্গে!" অল্প পরেই ভৃত্য বিস্ময়চকিত ভাবে ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, "তারিণী বল্লে একটুখানি আগে ছোটবাবু ছোটমাকে নিয়ে গাড়ি করে কোথায় চলে গেছেন, আর বড়মা তাঁর ঘরে বসে কান্‌চেন?"

শুনিয়া শ্যামাকান্তের চোখের উপর হইতে অকস্মাৎ সমুদয় আলোকদীপ্তি নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তিনি নিশ্চলভাবে প্রস্তরপ্রতিমাদের মতই অন্ধকার বাহিরের দিকে চাহিয় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে যখন প্রস্থানোদ্যত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাহস করিয়া মূর্চ্ছিত প্রায় স্তব্ধ বৃদ্ধ জমীদারের নিকটবর্ত্তী হইয়া ধীরে ধীরে সসঙ্কোচে তাঁহার বাহুস্পর্শ করিলেন, তখন চমকিয়া উঠিয়া প্রথমটা শ্যামাকান্ত ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না, যে তিনি ঘুমাইয়া একটা ঘোরতর দুঃস্বপ্নের দ্বারা এতক্ষণ পীড়িত হইতেছিলেন কিনা? পুরোহিতের দিকে চাহিয়া বলিলেন "সত্যি কি মা, আমায় ছেড়ে চলে গেছেন?"

"একি কথা বলছেন? মা জগদম্বা আপনার ভক্তি ডোরে বাঁধা, আপনার মত ভেদবোধহীন সাধক কি এ কলিকালে দ্বিতীয় আছে? মার প্রসন্নমুখে অপ্রসন্নতার ছায়াটিও পড়ে নাই। ঐ দেখুন বরাভয়দায়িনী আপনার পানে চেয়ে অভয় হাস্য কচ্চেন।"

মাতৃহীন শিশু যখন মা বলিয়া আব্দার ধরে তখন যদি তাহার বিমাতাকে দেখাইয়া কেহ বলে এই তোমার মা তাহা হইলে যেমন হয় তেমনিভাবে বৃদ্ধ জমীদার হতাশার সহিত একমুহূর্ত্ত দেবীমূর্ত্তির প্রসন্নমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "মাগো জগদম্বে! যদি অপ্রসন্ন হোস্‌নি তবে কেন আমার মাকে কেড়ে নিলি মা? আমার মাকে আমায় ফিরিয়ে দে মা, আমার শান্তিকে আমায় ফিরিয়ে দে।"

আচার্য্য অদ্ভুতভাবে শ্যামাকান্তের পানে তাকাইলেন "মালক্ষ্মীর কি হয়েছে? তিনিতো ভালই ছিলেন।—

বৃদ্ধ জমীদার কাঁদিয়া ফেলিলেন "হেম মাকে এখান থেকে নিয়ে গ্যাছে, নিশ্চয়ই জোর করে নিয়ে গেছে"—

"সেকি এই দুর্য্যোগে এই ভাদ্র মাসে? ছোটবাবু পুরো নাস্তিক হলেন যে। এতোবড় বংশের সন্তান! হা জগদম্বে!" বিস্ময়ে পুরোহিতের নেত্র বিস্ফারিত হইয়া রহিল। এই কথায় ব্যাকুলবৃদ্ধ ছটফট করিয়া মন্দিরের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া ফেলিয়া একেবারে দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

জমাট বাঁধা কালো মেঘে থাকিয়া থাকিয়া তখনও বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে ঝুপ্ ঝুপ করিয়া বর্ষণও চলিতেছে, পুখুর ঘাটে ভেকদলের আনন্দ-কলরবের শেষ নাই। দুর্যোগ পূর্ণ অন্ধকার প্রকৃতির পানে তাকাইয়া তাঁহার সহস্র বেদনায় বিদ্ধ অশান্ত চিত্ত আজ আবার নূতন নৈরাশ্যে হাহাকার করিয়া উঠিল।

এই অন্ধকার প্রলয়বার্ত্তা ঘোষণার মাঝখানে তাঁহার সাধনার লক্ষ্মী কাহার নিষ্ঠুর শাপে আজ অতল সিন্ধুতলে নিমজ্জিত হইয়া গেল! শোকদীর্ণা প্রকৃতির বুকের ক্রন্দন আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রাণের মধ্যে হাহা-কার ধ্বনি উঠিল, ঝড়ের শব্দে মিশিয়া তাঁহার বেদনারুদ্ধ ক্রন্দন ব্যাকুল আবেগে বিমানের স্তরে স্তরে উঠিয়া বলিতে লাগিল, "তুই কেন গেলিমা! তুই কোথা গেলি? আর কি আমি তোকে ফিরে পাবো?"

২৭

লর্ড কর্জ্জনের প্রবর্ত্তিত বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপার লইয়া বাঙ্গালায় সেই সময় স্বদেশী আন্দোলন তুমুল হইয়া উঠিয়াছে। সুখসুপ্ত বঙ্গবাসীগণ রাবণের আহ্বানে অকাল জাগ্রত কুম্ভকর্ণের ন্যায় তখনও বিস্ময় বিহ্বল, তখনও পর্য্যন্ত তাহারা বুদ্ধি বা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে পারে নাই। যুবকগণ বিশেষতঃ বালকের দল উদ্যমের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেও বড় বড় প্রবীণ 'লীডারেরা' তখনও পর্য্যন্ত চিন্তাঙ্কিত মুখে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বলিতেছেন "এ কি টিকিবে?"

মহৎ উদ্দেশ্য এপর্য্যন্ত কোন দেশে কখনও ব্যর্থ হয় নাই; আজো হইল না। স্বদেশী আন্দোলন বৈশাখী আকাশে ক্ষণিক বজ্র বিদ্যুতের অগ্নিমুখী গর্জ্জনের পর একটা স্থায়ী বর্ষণের আগ্রহে পরিপূর্ণ নবীন মেঘরাশি সুশোভিত রূপ ধারণ করিল। যে সকল দেশবাসী এই সময়ে প্রকৃত পথই অনুসর-ণোদ্যত হইলেন রজনীনাথ তাহাদের মধ্যে একজন।

রজনীনাথ কদিন হাঁফ ফেলিবারও অবসর পান নাই। নিজের কাজের ভিড় ঠেলিয়া ফেলিয়া নূতন উদ্যমে নূতন উৎসাহে সভায় যোগদান ও মফঃসলের কার্য্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, স্বদেশী শিল্প গ্রহণে উৎসাহ দান করিয়া বহু দিনের আক্ষেপ মিটাইতে ছিলেন। একদিন কাজকর্ম্ম সারিয়া ভিতরে আসিলে বসুমতী তাঁহার উৎসাহদীপ্ত অথচ স্নানাহারের অনিয়মে ঈষৎ শুষ্ক মুখেরদিকে চাহিয়া অনুযোগের সুরে বলিলেন "একি শ্রী হয়েচে, মাগো তোমার সকলি কি বাড়া-বাড়ি!" রজনীনাথ আয়নার সম্মুখে গিয়া হাসিয়া কহিলেন "কেন বসু? এইতো দিব্যি শ্রী রয়েছে, আবার কি চাও?" বসুমতী চেষ্টা করিয়া হাসি চাপিয়া রাখিলেন; "হ্যাঁ হ্যাঁ বড্ড শ্রী বেড়েছে! বলি একেবারেই

কি বাড়ী ঘর সব ত্যাগ করবে না কি? শান্তিদের যে দু এক দিনের মধ্যে লক্ষ্মীপুরে ফেরবার কথা ছিল তার কিছু কি খবর পেলে? "তাইতো তোমায় বলিনি বুঝি!" রজনীনাথ একটু অপ্রতিভভাবে পত্নীর সাগ্রহ দৃষ্টির উপর সহাস্য দৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রফুল্ল মুখে কহিলেন; "তারা যে এসেছে আজ বিকেলে আমি সেখানে যাব মনে করেছি।"

লক্ষ্মীপুর গিয়া সেখানকার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে শ্যামাকান্তের বাকী রহিল না। তাঁহার প্রতি হেমেন্দ্রের ভক্তিপ্রীতিশূন্য অবিনীত ব্যবহার; শান্তির প্রতি প্রেমহীন অবহেলা সমস্তই তাঁহাকে নিদারুণ পীড়িত করিয়া তুলিল। শ্যামাকান্তও সেই প্রথম দিনেই উইলের কথাটা পাড়িয়া বসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা বিনোদের পুত্রের সহিত শান্তিকে তিনি তুল্যাংশে বিষয় ভাগ করিয়া দিবেন। হেমেন্দ্র নিজের হাত খরচের মতন মাসিক কিছু কিছু টাকা পাইবেন মাত্র। শুনিয়া রজনীনাথ একটুখানি উত্তেজিত ভাবে মুখ তুলিয়া ঈষৎ তীব্রভাবে বলিয়া উঠিলেন "কেন, আবার কি কৃষ্ণকান্তের উইলের অভিনয় করাতে চান? চৌধুরী মশায় মনে কর্ব্বেন না আপনার হেম কোনও অংশে গোবিন্দলালের চেয়ে ভাল।" তার পর একটু লজ্জিত হইয়া নম্রভাবে কহিলেন "আমার পরামর্শ এই যে বিনোদের ছেলের সঙ্গে জমীদারির ভাগ অন্য কারুকে না দেওয়াই উচিত। এ থেকে চিরকালের জন্য একটা বিবাদের সৃষ্টি করা ভিন্ন অন্য কোন লাভই হবে না।"

শ্যামাকান্ত বৈবাহিকের নিকটে অপরাধহীন হইলেও নিজের মনকে তাহা কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। পাছে রজনীনাথ কিছু মনে করেন সেই জন্যই বিষয় ভাগের কথাটা হঠাৎ তাড়াতাড়ি করিয়া তুলিয়াছিলেন। বেহাইএর প্রস্তাবে আনন্দে বিস্ময়ে কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেল। কিছু পরে রজনীনাথের পিঠে হাত রাখিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন "কিবলে আশীর্ব্বাদ করব রজনি! ঈশ্বর তোমার চিরমঙ্গল করুন, মা তোমার সহায় হোন। তোমার কাছে আজ আমার যে মুখ দেখাতে লজ্জা করচে ভাই; কি বলবো! যাহোক আসল কথাটা হচ্ছে এই, হেমের হাতে বিষয়টা পড়ে এটা আমার মোটেই ইচ্ছা নয়। সত্যি কথা বলতে কি ভাই আমি ওটা সাহসই করচি না। একেতো সে আমার মার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না তার উপর টাকাকড়ি হাতে যদি পড়ে তাহলে কি আর রক্ষা আছে। আমার মাকে যে অযত্ন করে আমার তার মুখদেখতে ইচ্ছে করে না। বৃদ্ধ হয়েছি কোনদিন আছি কোন দিন নেই,—ও সব হাঙ্গামা মিটিয়ে রাখাই ভাল। মাকে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি দেবোই।" শুনিয়া একমুহূর্ত্ত রজনীনাথ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এক মুহূর্ত্ত বেদনাদীর্ণ চিত্তে হাহাকার উঠিল; কিন্তু দুঃখে নিরাশায় অবসন্ন বা হতাশ হওয়া রজনীনাথের স্বভাব নয়। পরমুহূর্ত্তেই ক্রোধ ও বেদনাকে সবলে বক্ষে চাপিয়া জামাতাকে সংশোধন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধীরভাবে কহিলেন, "কিন্তু ভেবে দেখুন আপনার উইলও তো শান্তির পক্ষে কিছু মঙ্গলের হবে না। যে প্ল্যানটা আপনি নিচ্ছেন সেইটেই যে হেমের পক্ষে সবচেয়ে

অমঙ্গলের। আমি শান্তির বাপ হিসাবে সুধু এ পরামর্শ চক্ষু লজ্জার খাতিরে দিচ্চিনা। আপনার বন্ধু হিসাবেই বলচি এখন উইলের নামও কর্বেন না। এই অবসরে যদি হেম একটু মানুষ হয়ে উঠতে পারে সেই চেষ্টাই করুন। বোধ হয় ভগবান তারি রক্ষার জন্য এই শুভ মুহূর্ত্ত দান করলেন।—"

শ্যামাকান্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। "আমার অদৃষ্টে তা কি হবে, তারা আমার এমন দিন কি দেবেন! কিন্তু দেখো ভাই শেষটা আমি যেন আমার মার উপর অন্যায় না করে ফেলি, যদি আমি হঠাৎ মরে যাই তা হলে আইন তো—"

"আপনার নগদ টাকাও তো খুব অল্প নয়। ইচ্ছে করেন তো জমীদারি ভাগ না করে ওদের সেইটেই দেবেন। কিন্তু এখন ওসব কথা থাক। হেমকে একটু খানি তার ভবিষ্যৎ ভাববার অবসর দিন। না হলে জানবেন চৌধুরী মশায় অপনার সমুদয় জমীদারি ও বিষয় বিভব শান্তির চোখের জল থামাতে পার্ব্বেনা।"

শ্যামাকান্ত শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন "তারা!"

মনের জ্বালা মনে গোপন করিয়া, এই ঘটনাটাকে ছাঁটিয়া কাটিয়া রজনীনাথ বাড়ী ফিরিয়া বসুমতীকে যাহা জানাইলেন তাহার অর্থ এই যে, শ্যামাকান্তের শান্তিকে অর্দ্ধেক সম্পত্তিদানে রজনীনাথই বাধা দিয়াছেন; কারণ আইনানুসারে যখন পোষ্যপুত্রের বধূ এই সম্পত্তির অধিকারিণী নহে তখন তাঁহার কন্যা ইহা কেন লইবে? বসুমতী এস্বার্থ-ত্যাগের মহত্ব বুঝিলেন না। বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "তারপর মেয়েটা খাবে কি? বিনোদের বউ যখন বিদায় করে দেবে? হেমের তো ঐ বিত্তে!"

রজনীনাথ বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন "কেন তুমি মেয়েকে যে ঘরজামাই করতে চেয়েছিলে এরি মধ্যে ভয় হয়ে গেল পাছে দুদিন খেতে দিতে হয়। দক্ষপিতার কথাই পড়া গিয়েছিল মা এমন কৃপণ কখনও শুনা যায়নি!" পরে গম্ভীর মুখে কহিলেন "হেম একটু মানুষ হোকনা। কেন তাতে তোমরা সকলেই বাধা দিতে চাও? জেনো বসু, ঈশ্বর যা করেন সবি ভালর জন্য। কারণ চৌধুরী যদি হেমকে সত্য সত্যই বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে পারতেন তা হলেই হেমের পক্ষে সবচেয়ে মঙ্গল হতো। আর আমার লতিটারও বড্ড উপকার হতো। গরীবের স্ত্রীর আদর থাকে বসু। বড়লোকের স্ত্রী হওনি তাই বুঝতে পারবেনা তারা কি আগুন হীরের জ্যোতিতে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। ভগবান আমার মেয়েকে তাদের দল থেকে রক্ষা করুন।"

ঠিক মনের সহিত না মিলিলেও বসুমতী চুপ করিয়া রহিলেন, স্বামীর মতের বিরুদ্ধ মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতে তিনি সাহসী হইতেন না। জামাতার দারিদ্র্য লাভের আশীর্ব্বাদটা কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনঃপুত হইল না; মনে মনে শান্তিকে রাজরাণী হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

রাস্তায় একটা গোলমাল ও সেই সঙ্গে ফটকের মধ্যে একখানা গাড়ি জোরে প্রবেশ করিবার শব্দ উভয়কেই সেইদিকে আকৃষ্ট করিল। সম্মুখের দেয়ালের উপর একটা ঘড়ি নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল,

সেইদিকে চকিত নেত্রপাত করিয়া রজনীনাথ ঈষৎ উত্যক্তভাবে আপনাআপনি বলিলেন "এত রাত্রেও মক্কেল নাকি? কি মুস্কিল!" চকিতমাত্র একটা সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হইল কিন্তু হেম যে এতরাত্রে আসিবে না তাহা স্থির নিশ্চয় করিয়া সেদিক হইতে মনটাকে ফিরাইয়া লইলেন। বসুমতী একটু উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি যে বল্লে হেম আজকালের মধ্যেই আসবে কই এলোনা তো?"

রজনীনাথ উত্তর করিলেন না; ক্ষোভের সহিত নীরব হইয়া রহিলেন, গাড়িখানা গাড়ি বারান্দার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থামিল।

রজনীনাথ জোর করিয়া মনটাকে প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; "বঙ্গলক্ষ্মী মিলের মতন আরও দুটো একটা মিল যদি বসান যায় এই সময় তাহলে বড়ই কাজ হয়। চৌধুরীর নগদ টাকা অনেক, সেই টাকাটা তিনি যদি এরকম করে খাটান ত উভয় পক্ষেই মস্ত কাজ হয়। মনে করচি এবার গিয়ে হেমকে নিয়ে আসি আর তাঁকেও এ পরামর্শ দিয়ে দেখি। আমার মনে হয় তাঁর শান্তির বাবার পরামর্শ তিনি অগ্রাহ্য করতে পার্ব্বেন না; আমার বুড়ির যে রকম উৎসাহ—একি? একি শান্তি তুই?" নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে কম্পিত পদে গৃহে প্রবেশ করিয়া শান্তি সহসা বাধাপ্রাপ্তের মতন থমকিয়া দাঁড়াইল। সে ভাবিয়াছিল এত রাত্রে তাহার পিতামাতা নিদ্রিত হইয়াছেন। সে সুধু গৃহের স্তিমিতালোকে বিছানার পাশে একবারটিমাত্র তাঁহাদের ঘুমন্ত স্নেহমুখ নিরীক্ষণ করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইবে। রাত্রের মত তাহাদের কাছে জবাবদিহি করার হাত হইতে নিস্তার পাইবে মনে করিয়াও একটুখানি আরাম বোধ করিতেছিল। যে মাবাপের স্নেহকোল সে উৎকণ্ঠিত আগ্রহে কামনা করিয়া আসিয়াছে, আজ নিকটে আসিয়াও সে আশ্রয় গ্রহণ করিতে শান্তি সঙ্কুচিত।

একবার চিরঅভ্যস্ত মা শব্দ তাহার মুখে আসিয়া পৌঁছিল। সে জানিত সে ডাকে আগমনীর প্রভাতে গিরিরাজ পত্নী উমা জননীরই মত তাহার মা ব্যাকুল স্নেহে প্রাণাধিকা কন্যাকে বক্ষে টানিয়া লইবেন। কিন্তু হায় হায় শান্তি কি সে অধিকার লইয়া তাঁহাদের দ্বারে আসিয়াছে? সে কি দুহিতৃগর্ব্বে পিতামাতার স্নেহবক্ষে স্থান পাইতে অধিকারিণী? অপরাধী স্বামীর সহিত অপরাধিণী পত্নী আজ তাহার পিতৃগৃহের নির্ম্মল বায়ুটুকু পর্য্যন্ত যে দূষিত করিতেছে। আজ সে কোন মুখে চিরমধুর মা' নাম লইয়া ডাকিয়া বলিবে "আমি এসেছি"। কিন্তু দ্বার খুলিয়াই সে কুণ্ঠিত বিস্ময়ে দেখিল, আলোকিত কক্ষে তখনও পিতামাতা জাগিয়া। আর তাঁহারা তাহারি নাম স্নেহকম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করিতেছেন। তাহার পাদুখানা যেন সেইখানেই আটকাইয়া গেল। খুব সাবধানে প্রবেশ করিলেও শান্তির হাতের চুড়ি বালা ও আঁচলে বাঁধা চাবির গোচ্ছার একটুখানি মৃদু শব্দ হইয়াছিল। সে শব্দটুকু রজনীনাথের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বিস্ময়ের সহিত দ্বারের দিকে চাহিলেন। সত্য! শব্দ তবে তাঁহাকে প্রতারণা করে

নাই! যে শব্দে তাঁহার বক্ষের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডটা অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে আঘাত করিয়া উঠিয়াছিল তাহা বাস্তবিকই শান্তির হাতের চুড়ির! আনন্দপূর্ণ বিস্ময়ে কলের মতন বলিয়া উঠিলেন "এত রাত্রে তুই কেমন করে এলিরে বুড়ি?" পরক্ষণেই আনন্দে নির্ব্বাক বসুমতীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন "দেখছো বসু তোমার বেহাই কত ভদ্র, অনেকদিন তুমি মেয়েকে দেখনি তাই নিজেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওকিরে লতি অমন করে দাঁড়িয়ে রৈলি কেন? আয় মা আমার কাছে আয়, হেম এসেছে তো? তোকে হঠাৎ যে বড় পাঠালেন?"

বিদ্যুতে পরিপূর্ণ জলীয়বাষ্পে ভরা মেঘখানা বর্ষণোন্মুখ ভাবে যখন আকাশের গায়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায় তখন কতটুকুই বা উত্তরে হাওয়ার প্রয়োজন থাকে! একটু-খানি মাত্র ঠাণ্ডা বাতাসের একটা দম্‌কাতেই সেখানাকে ফাটাইয়া সরাইয়া এককালে নিঃশেষে বর্ষণ করিয়া দেয়। তেমনি করিয়া শান্তির রুদ্ধ বাষ্পে ভরা হৃদয় সেই বিশ্বাসপূর্ণ স্নেহাদরে যেন ফাটিয়া পড়িল। পিতার পদতলে মাটিতে বসিয়া অবরুদ্ধ স্বরে উত্তর করিল—

"আমায় তিনি পাঠাননি বাবা, আমি লুকিয়ে চলে এসেছি, আমি সেখানে থাকতে পারলুম না—"

আর কিছু শান্তি বলিতেও পারিল না; আর কিছু শুনিবারও প্রয়োজন ছিল না বজ্রাহতের মতন রজনীনাথ অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। একথাও তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে?

শান্তি নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। বিস্ময়ে বেদনায় কম্পিতকণ্ঠে পিতা কহিলেন "নীচের সঙ্গে থেকে তুমি এতো হীন হয়ে গ্যাছ শান্তি! একথা আমি যে স্বপ্নেও মনে করতে পারিনি! আমার সব যত্ন সব শিক্ষা এমনি করেই জলে ডুবিয়ে দিলে?"

অপরাধিনী একবার নতমুখ তুলিয়া পিতার পানে চাহিল, কিন্তু সেই কঠিন বিচারকের দৃষ্টির সম্মুখে তাহার চকিত দৃষ্টি আপনা হইতে পুনরায় নত হইয়া আসিল। সে কি বলিবে? বলিবে কি তাহার ঈর্ষা-পীড়িত স্বামী জোর করিয়া তাহার আশ্রয় নীড় হইতে তাহাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে, সে স্বেচ্ছায় আসে নাই? স্ত্রী হইয়া স্বামীকে পিতার নিকট অপদস্থ করিবে কি করিয়া?

বসুমতী স্বামীর রূঢ়তায় একটু বিরক্তির সহিত উঠিয়া আসিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া একটু তীক্ষ্ণভাবে বলিয়া উঠিলেন "তুমি ওর ওপোর মিথ্যে রাগ করচ কেন? নিশ্চয়ই বিনোদের বউ ওকে কিছু বলেছে; না হয়তো চৌধুরী ভাল ব্যবহার করেনি। নৈলে আমার এমন মেয়ে নয় যে আপনা হতে চলে আসে। তখনি তো তোমায় বলুম ছোট ঘরের মেয়ে কখন ভাল হয় না—আমার বাছাকে আমার কাছে এনে দাও। আয় মা তুই উঠে আয়।"

শান্তি নড়িল না, তাহার চোখের কোল ছাপাইয়া যে অজস্র অশ্রুজল উথলাইয়া উঠিতেছিল, তাহা ঝর ঝর করিয়া বিন্দুর পর বিন্দু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কেমন করিয়া সে এ অপবাদ সহ্য করিবে, কেমন করিয়াই বা সব কথা বলিবে!

রজনীনাথ তীক্ষ্ণ গম্ভীর দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চাহিলেন "আমি এখনি আ'সচি, শান্তি তোমার কাছ থেকে এ আমি আশা করিনি, পরের কাছে দাবী নেই—নিজের সন্তানও শেষে এমন করে আশা ভঙ্গ করবে।"

রজনীনাথ উঠিয়া গেলেন। বসুমতীও উঠিয়া কন্যা জামাতার সেবার জন্য দাসদাসীদের ডাকিয়া আদেশ প্রদান করিলেন। কয়দিন ধরিয়া মেয়ের জন্য তাঁহার মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল, কোনরকমে তাহাকে কাছে পাইয়াই তিনি বর্ত্তাইয়া গিয়াছেন।

সেখানে যে আর বনিবনাও হইবার সম্ভাবনা নাই সে কথাতো তিনি প্রথম হইতেই 'পই পই' করিয়া বলিতেছেন। রজনীনাথ যদি তাহা হাসিয়া না উড়াইয়া দিতেন তাহা হইলে আর এ সমস্ত কাণ্ড হয় না। অনেক নির্য্যাতন না পাইলে কিছু আর শান্তি এমন করিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হয় নাই। পুরুষ মানুষে লেখাপড়া বিষয় কার্য্য ভাল বুঝিলেও গৃহস্থালীর ব্যাপার ও লোকচরিত্র মেয়েমানুষের মত বোঝেনা। কিন্তু ঐ যে পুরুষ মানুষের কেমন একটা 'সবজান্তা' রোগ সেই দোষেই তাহারা মেয়েদের বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করিতে গিয়া যখন তখন সংসারে অস্বস্তির সৃষ্টি করিয়া বসে! বৃদ্ধ বৈবাহিকের উপরেও বসুমতীর রাগ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাঁহার কন্যার উপরে সে বৃদ্ধের বরাবরই অত্যাচার! তিনি যখন নিজের ঠিক মনের মতন দেখিয়া শুনিয়া সেই ছেলেটীকে বাছিয়া লইলেন, মনে মনে একখানা কাল্পনিক চিত্র আঁকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহাতে নূতন রং নূতন ধরণে ফুটাইয়া তুলিয়া সেখানাকে একেবারে শোভা সৌন্দর্য্যের আদর্শ করিয়া তুলিয়াছেন, হঠাৎ এমন সময় কোথা হইতে লোভাতুর বৃদ্ধ তাঁহার সে কল্পনা কুসুম ছিন্ন করিয়া লইতে হাত বাড়াইল। বসুমতী অন্য মায়েদের মত মেয়ের ঐশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া তাহার মনের সুখই অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন, তাই তাঁহার কল্পনাভঙ্গের দুঃখ বড়লোকের পোষ্যপুত্র জামাতায় এখন পর্য্যন্ত মিটিতেছিল না। বিশেষতঃ মেয়ে যখন শ্বশুরের সঙ্গে দীর্ঘ তীর্থ ভ্রমণে চলিয়া গেল তখন আর তাঁহার বিস্ময় ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। রজনীনাথের সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার কোন আস্থাই হইল না; বলিলেন, "হ্যাঁগা তুমি কি আমায় এরকম করে ছেড়ে দিতে? তাই মনে করে দেখ না!"

বসুমতী ক্রমে স্পষ্টই দেখিতেছিলেন "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী" বলিয়া শাস্ত্রকারেরা যে একটা ভয়ানক ভুলকে চিরদিন লোকের মনের মধ্যে প্রশ্রয় দিবার সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, তাহার বিষময় ফল তাঁহার সংসারে কি রকম করিয়া ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। জামাই কখনও মা' বলিয়া কথা কহিল না, মেয়ের উপর তাহার টান তো কিছুই নাই তার উপর হরিহরি, সে আবার লক্ষপতির পরিবর্ত্তে একজন দরিদ্র ভিক্ষুকে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল! তখন যদি রজনীনাথ নীরদের সহিত মেয়ের বিবাহ দেন তাহা হইলে এসব নাটকীয় অভিনয়ের অংশ আর তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হয় না।

রজনীনাথ যখন ফিরিয়া আসিলেন, বসুমতী তাঁহাকে কি বলিতে গিয়া তাঁহার ঝড়ের আকাশের মতন শুষ্ক গম্ভীর মুখের

দিকে চাহিয়াই থমকিয়া গিয়া চুপ করিলেন। শান্তি তখনও মাটিতে বসিয়াছিল তাহার চোখের জল তখনও ফুরায় নাই। রজনীনাথ বলিলেন "যা শুনলুম তাতে বেশ দেখচি তুমিই দোষী। লোকের কথাই তোমার বড় হলো! একবার ভেবে দেখলে না যে তোমার এই ব্যবহার তোমার বাপকে কতখানি আঘাত করবে—তুমি আমার সেই শান্তি! যাক্ সবি আমার কপাল, আমার সবি সহ্য করতে হবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না তোমার শ্বশুর তোমায় ক্ষমা করচেন সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে তোমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই,—

শান্তির চোখের জল মুছাইবার চেষ্টা করিতে করিতে বসুমতী তীব্রভাবে ফিরিয়া মুহূর্ত্ত সংযত হইয়া ব্যাকুলভাবে কহিলেন; "অমন কথা বলোনা; দোষ তোমার গোঁয়ার গোবিন্দ জামায়ের। ওরে কেন শুধু শুধু ওসব নিষ্ঠুর কথা বলচো—তুমিতো এমন নিষ্ঠুর ছিলে না।"

রজনীনাথ ঈষৎ চঞ্চলভাবে বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন। "সত্যই কি তিনি নিষ্ঠুরতা করিতেছেন? কাহার প্রতি সে নিষ্ঠুরতা? যে তাঁহার জীবনের আধখানা জুড়িয়া রহিয়াছে, তাহার প্রতি। না নিষ্ঠুরতা নয়, লোকে ইহাকে যেমন ইচ্ছা শব্দ দ্বারা বিশেষিত করুক—তিনি জানেন তিনি কর্ত্তব্য পরায়ণ পিতা; সন্তানের ভুলের, অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশের পথে আনা পিতৃ কর্ত্তব্য নয়।

বসুমতী স্বামীকে একটু চিন্তিত দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন "এখন এরা থাক; তুমি তুমি না হয় একদিন লক্ষ্মীপুরে গিয়ে—

"না আমি হেমকে বলে এসেছি কাল সকালের ট্রেনেই এরা বাড়ি ফিরে যাবে।"

পাশের ঘরের খোলা দরজার মধ্য দিয়া সদ্যনিদ্রোত্থিত সুপ্রকাশ অনাবৃত দেহে অসংযত বস্ত্রে উঠিয়া আসিল। তাহার বড় বড় চোখের চঞ্চল কালো তারা ও দীর্ঘ পল্লবগুলি ঘুমে জড়াইয়া রহিয়াছে, স্থূল শুভ্র স্কন্ধের কাছে কালো চুলের গোছাগুলিকেও যেন নিদ্রিত সর্পশিশুর মতন দেখাইতেছিল। "বাবা দিদি কি এসেচে? আমি দিদিকে যেন স্বপ্নে দেখছিলুম। ঐতো দিদি—" বলিতে বলিতে হঠাৎ দিদির উপরে দৃষ্টি পড়ায় বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দধ্বনি করিয়া বালক দিদির কাছে ছুটিয়া গিয়া দুইহাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। নিদ্রাবিদূরিত কালো চোখ আহ্লাদে উজ্জ্বল করিয়া সাগ্রহে ঈষৎ অভিমান প্রকাশ করিল। "হ্যাঁ দিদি চুপি চুপি না এসে আমায় কেন আগে থেকে লিখলিনে ভাই,তা হলে তো আমি কক্ষণো ঘুমতুমনা, নিশ্চয়ই তোকে ইষ্টিসান থেকে আনতে যেতুম—" রজনীনাথ আদেশ করিলেন "সুকু তুমি এখন দিদির কাছে যেওনা নিজের বিছানায় যাও—"

চমকিয়া শান্তি তাহার বক্ষলগ্ন স্নেহের ভাইটিকে ছাড়িয়া দিল, সাশ্চর্য্যে বালক দিদিকে পরিত্যাগ করিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু তখন তাঁহার মুখের এমন একটা ভাব ছিল যাহা দেখিয়া আদুরে নির্ভীকছেলে সুপ্রকাশও ভয় পাইল। সেই অলঙ্ঘ্য আদেশের বিরুদ্ধে একটিমাত্র প্রতিবাদের শব্দ উচ্চারণ করিতে সাহসহীন সুকু ছলছল চক্ষে একবার দিদির অশ্রুহীন চোখের পানে চাহিয়া দেখিল—দিদির

মুখে হাসি নাই, চোখের দৃষ্টি নত, মুখ এমন ম্লান যে পূর্ব্বে কখনও এ রকম সে দেখে নাই। মৃদু অনিচ্ছুক পদে সে চলিয়া গেল; কিন্তু পাশের ঘর হইতে তাহার রোদনের ফোঁপানির শব্দ আসিতে কোন বাধা পাইল না। এবার শান্তি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, মুখ তুলিয়া দৃঢ়ভাবে সে পিতার দিকে চাহিয়া বলিল "বাবা আর কারু সঙ্গে আমায় তাহলে লক্ষ্মীপুরে পাঠিয়ে দিন, নাহলে" হেমেন্দ্রের সহিত পথে বাহির হইবার সাহস তাহার নাই একথা সে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিতেছিল না। স্বামীকে পিতার চক্ষে মসিবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিতে কষ্টের চেয়ে লজ্জা অনেকখানি বেশি ছিল। তা ভিন্ন সে স্বামীকে এইটুকু পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে না দেখিয়া তাহার পিতাই বা কি মনে করিবেন? তাই সে তাহার মনের আতঙ্ক স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে না পারিয়া কথাটা অসমাপ্ত থাকিতেই মাথা নীচু করিল। রজনীনাথ একটু চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাকি হয়, হেমও ফিরে যাক। দোষ সত্যি সত্যি ওরিই তো! ওকে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। দেখ মা অনেকখানি ভেবে চলতে হয়—"

"জামাই বাবু বলচেন যেতে হয়তো এই চারটের টেরেণে যাওয়াই সুবিধে"। এই বলিয়া মোক্ষদা গৃহে প্রবেশ করিল।

বসুমতী ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "সে আবার কি কথা! যেতে হয় বিকেলে যাবে, এই রাত্তিরে না খাওয়া না ঘুমন, এখন কোথায় যাবে? যাতো রে শিগ্গির করে তোলা উনানটা ধরিয়ে চাট্টি ময়দা মাখ্‌গে, বামুনদিকেও উঠিয়ে দিগে, আমিও যাচ্ছি। কপির একটা ডালনা আর খানকতক আলু বেগুন ভাজা লুচিস্। আর কিছু কাজ নেই অনেক দেরি হয়ে যাবে।"

মোক্ষদা চলিয়া গেল ও একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল "জামাইবাবু বল্লেন এই ভোর রাত্তিরে কি খাওয়া যায়, মাকে ওসব করতে বারণ কর। এই টেরেণে যেতেই হবে। আবার কাল নাহোক পরশু তিনি এইখানেই তো আসচেন, দেরি হলে মিথ্যে একটা লোক জানাজানি হবে বৈতো নয়—"

জামাতার সুমতি দেখিয়া রজনীনাথের মুখের কঠিনভাব অনেকটা কমিয়া আসিল। হেমেন্দ্র তবে নিজের অন্যায়টা বুঝিতে পারিয়াছে। শান্তির একটু কাছে আসিয়া বলিলেন "তবে সেই ভাল, দেরি করে তাহলে আর কাজ নেই। শান্তি এবার যেন তোমায় তুচ্ছ বিষয়ে কর্ত্তব্য ত্যাগ করতে না দেখি,"—শান্তি মাটিতে পিতামাতার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বসুমতী তাহাকে দুইহাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কপালে চুম্বন করিলেন, রজনীনাথ মুখ ফিরাইয়া একমুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া খাটের পিছনের জানলাটা খুলিবার জন্য চলিয়া গেলেন। মাহুত যেমন করিয়া অনিচ্ছুক হস্তীকে অঙ্কুশাঘাতে ফিরায় তেমনি করিয়া প্রবল ইচ্ছাকে তাঁহার রোধ করিতে হইল। শান্তি মায়ের বুকে একবারটি মাথা রাখিয়া একমুহূর্ত্তকাল স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, তারপর আস্তে আস্তে সেই স্নেহবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া সকালবেলাকার ম্লান

শুকতারা যেমন তাহার সবটুকু জ্যোতিঃ একেবারে উষার নবীন কিরণালোকের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়া ঘননীলিমার মাঝখানে নিঃশব্দে মিলাইয়া যায় তেমনি করিয়া নীরবে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহার চোখে তখন আর জলের রেখাটুকুও দেখা যাইতেছিল না, স্থিরপ্রতিজ্ঞার একটি দৃঢ়তা সে যেন পিতার নিকট হইতে তাঁহার মৌনআশীর্ব্বাদস্বরূপ সেই মুহূর্ত্তে লাভ করিয়াছিল, বেদনা ও লজ্জার বিহ্বলতা দূরে ফেলিয়া সে স্থিরপদে ফিরিয়া গেল। বসুমতী দুঃখে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন; রুদ্ধস্বরে বলিলেন "তখনি আমি বলেছিলুম ওখানে শান্তির বিয়ে দিও না, তাতো তুমি শুনলে না। এমনি করে মেয়েকে আমার ঐ হেমন্ত দেখছি খুন করবে, মাগো বাছা আমার এমন গোঁয়ারের হাতেও পড়লো।"

মোক্ষদা দ্বারের নিকট গিয়া ফিরিয়া আসিয়া চুপে চুপে সাবধান করিয়া দিল; "চুপ করো মা জামাইবাবু বাইরে রয়েছেন।"

রামতনু লাহিড়ী।

রামতনু লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গীয় সমাজ। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ।

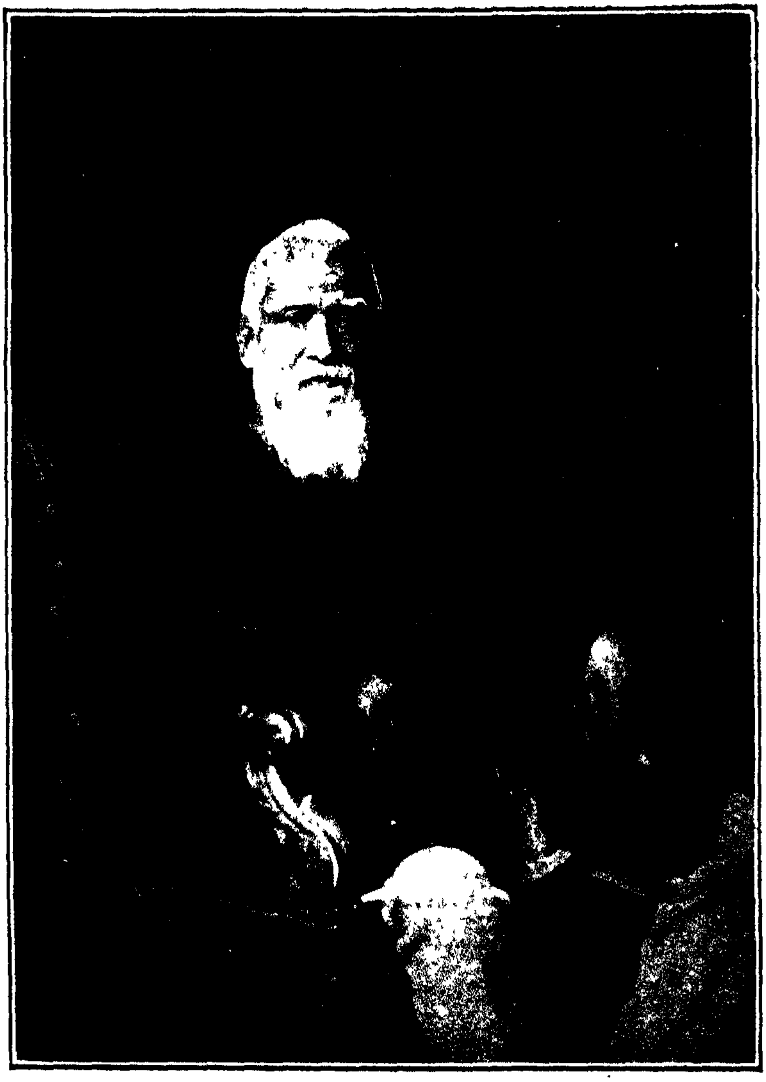
Ramtanu Lahiri Brahman and reformer—from the Bengali of Sivanath Sastri by Sir Lethbridge K. C. I. E.

বাঙলা সাহিত্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর নামের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষার মধ্যে এমন একটা কমনীয় বৈচিত্র্য ও সারল্য আছে যে, তাঁহার রচনা পাঠ করিবার সময় মনে হয় যেন কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মুখে মনোরম কাহিনী শুনিতেছি! ভাষার যেমন মিষ্ট সুর, তেমনি কেমন একটী স্নেহের প্রবাহ আগাগোড়া বহিয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রত্যেক কথাটি একেবারে মর্ম্মবিদ্ধ করে। মতভেদ সত্বেও তাঁহার সমস্ত কথাটুকু শুনিবার প্রলোভন ত্যাগ করা সম্ভব পর বা সহজসাধ্য হইয়া উঠে না। তাঁহার রচিত রামতনু লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গীয় সমাজ বাঙলা সাহিত্যে একখানি অভিনব গ্রন্থ। লেখকের বিচিত্র তুলিকায় বাঙলার পুরাতন সমাজের ছবি এমন সুন্দর ফুটিয়াছে যে নির্নিমেষ নয়নে তাহার প্রতি দুই দণ্ড চাহিয়া থাকিতে হয়। বহিখানি উপন্যাস অপেক্ষাও হৃদয়গ্রাহী। সেই গ্রন্থের একখানি ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে—অনুবাদক স্যার রোপার লেথব্রিজ কে, সি, আই, ই।

দুইখা'ন গ্রন্থই লোকসাহিত্যে বিশিষ্ট সম্পদ স্বরূপ! আমরা এই দুই খানির অবলম্বনে স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

রামতনু লাহিড়ী আত্মপ্রকাশের একান্ত বিরোধী ছিলেন। নিষ্কামী পুরুষের ন্যায় তিনি নীরবে আপনার কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার সমসাময়িক মহাপুরুষগণ দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, মধুসূদন, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, যেন নেতা হইবার জন্যই জগতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। প্রতিভায় ইঁহারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন সন্দেহ নাই, কেহ ধর্ম্মালোচনায় কেহ বা সমাজসংস্কারে আবার কেহ বা



রামতনু লাহিড়ী

সাহিত্য সাধনায় আপনার নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নব্যবঙ্গের জ্ঞানোন্মেষে ও সুস্থ বিচারশক্তি প্রবুদ্ধ করিবার বিষয়ে রামতনু বাবুর প্রভাব সামান্য ছিল না। অথচ যশের লালসা রামতনুর চিত্তে এতটুকু রেখাপাত করিতে পারে নাই। সংসারে

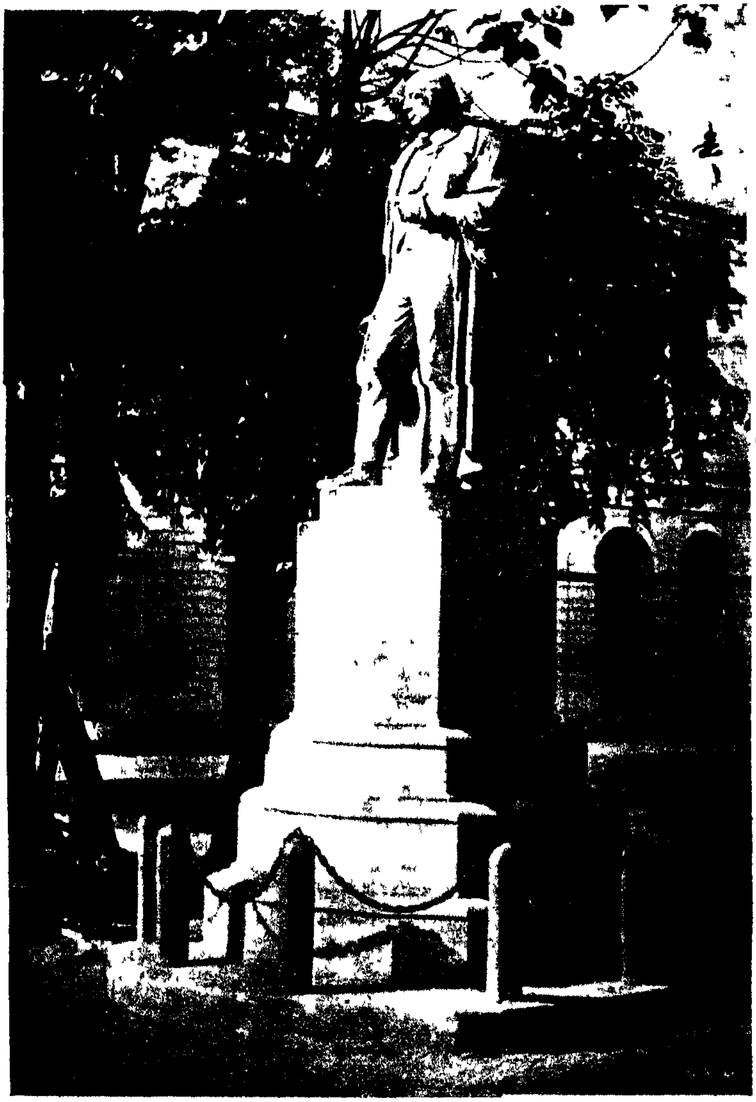
থাকিয়া আদর্শ গৃহীর স্থায় জীবন যাপন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। প্রকৃত মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে রামতনুর চরিত্র সমুজ্জ্বল।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে নদীয়ার অন্তঃপাতী বারুইহুদা গ্রামে, মাতুলালয়ে রামতনু বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামকৃষ্ণ লাহিড়ী সম্ভ্রান্ত কুলীনবংশোদ্ভব ও সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। রামতনুর পূর্ব্বপুরুষগণ সহস্র প্রলোভনের মধ্য দিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা ও পরোপকারিতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মাতা জগদ্ধাত্রী দেবী পিতৃগৃহের অতুল সুখস্বচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করিয়া দরিদ্র স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত পতিগৃহে হৃষ্টচিত্তে অনভ্যস্ত শারীরিক শ্রমের দ্বারা সমুদয় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রতিবেশীবর্গ তাঁহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী নামে অভিহিত করিতেন। এই মহৎকুলে জন্মগ্রহণই রামতনুর আদর্শ চরিত্র লাভের কারণ।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পাঠশালার পৈশাচিক নির্য্যাতন হইতে রামতনু মুক্তিলাভ করেন। কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন পঙ্কিল সমাজ এবং বিশেষতঃ স্থানীয় কলুষিত চরিত্র বালকদিগের কুপ্রভাব হইতে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য রামতনুর পিতামাতা অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে রামতনুর অগ্রজ কেশবচন্দ্র জনক জননীর ব্যগ্রতা দেখিয়া কনিষ্ঠকে কর্ম্মস্থল আলিপুরের সন্নিকটস্থ চেৎলার বাসাতে আনিলেন। চেৎলার নিকটে ইংরাজী বিদ্যালয় না থাকাতে কেশবচন্দ্র প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহাকে আরবী পারসী ও ইংরাজী হস্তলিপি লিখন প্রণালী শিখাইতেন। অবশেষে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের আনুকূল্যে হেয়ার সাহেব রামতনুকে বিনা বেতনে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লন। রামতনু কখনও হেয়ারের এই মহানুভবতা বিস্মৃত হন নাই। উত্তরকালে তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার পরিচিত বন্ধুবর্গকে হেয়ারের স্মৃতি রক্ষার জন্য অনুরোধ করিতেন। বৃদ্ধাবস্থায় চলৎশক্তিহীন হইলেও কলেজস্কোয়ারে মৃতগুরুর বার্ষিক স্মরণসভায় শিবিকারোহণে উপস্থিত হইতেন। কেশবচন্দ্র রামতনুকে গৌরমোহনের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া চেৎলায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তথায় তাঁহার বন্ধুবর্গের কুরুচিপূর্ণ আলাপ বালকের নীতিশিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় ছিল। তদ্ভিন্ন রামতনুকে সর্ব্বদা রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত বলিয়া তিনি পাঠের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দিতে পারিতেন না। এই সকল অসুবিধা কেশবচন্দ্রের শ্রবণগোচর হইবামাত্র তিনি কনিষ্ঠকে শ্যামপুকুরে তাঁহার সম্পর্কীয় রামকান্ত খাঁ মহাশয়ের ভবনে রাখিয়া দিলেন। খাঁ মহাশয়ের পত্নী রামতনুকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। এখানে আসিয়া রামতনু তাঁহার সহপাঠী দিগম্বর মিত্রের ভবনে যাতায়াত করিতেন। ভবিষ্যতে দিগম্বর বাবু রাজা ও C. S. I উপাধি পাইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। দিগম্বরের জননী তাঁহার পুত্রের সহাধ্যায়ীকে সস্নেহে সদুপদেশ প্রদান করিতেন।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া রামতনু হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এখানে সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ,

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার প্রভৃতি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুহৃদগণ উক্ত কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ করিতে-ছিলেন। সেই সময় রামতনুর শ্রেণীতে



কলেজ স্কোয়ারে স্থিত ডেভিড্ হেয়ারের প্রতিমূর্ত্তি।

অসামান্য প্রতিভাবান (Henry Vivian Derozio) হেন্‌রি ভিভিয়ান ডিরোজিও নামক একজন ফিরিঙ্গী যুবক অধ্যাপনা করিতেন। নব্যবঙ্গের উপর এই অসাধারণ

শক্তিশালী পুরুষের প্রভাবের সীমা ছিল না। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে এমন ভাবে ছাত্রদের জীবন নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিয়া কেহই গঠিত করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ বঙ্গের জ্ঞান ও নীতির ইতিহাসে তিনি একটি সম্পূর্ণ নূতন যুগ আনিয়াছিলেন। রামতনু, রামগোপাল, কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চরিত্রের ভিত্তির মূলে ডিরোজিও। চতুর্থ শ্রেণীতে শিক্ষকতা করিলেও বিদ্যালয়ের প্রায় সকল বালকের সহিতই ডিরোজিও পরিচিত ছিলেন। এবং অপরাহ্ণে রামগোপাল, রামতনু প্রভৃতি ছাত্রবৃন্দ ডিরোজিওর স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া গুরুগৃহে পানাহার ও বিবিধ প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন।

সত্যের উপাসনা এবং স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ডিরোজিওর জীবনের আদর্শ ছিল। ছাত্রদিগের প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারের অযৌক্তিকতা তিনি এরূপ সবল ভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন যে তাহাদের চক্ষে ডিরোজিও অভ্রান্ত মহাপুরুষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার একটি কুফল হইল এই যে, যাহা কিছু প্রাচ্য তাহাই হেয় এবং যাহা প্রতীচ্য তাহাই সাদরে গ্রহণীয় এইরূপ একটি ধারণা ছাত্রদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল। মেকলের কথামত তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "A single shelf of European books is worth the whole native literatures of India & Arabia. হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি ছাত্র প্রকাশ্য সভায় আপনার মত ব্যক্ত করিলেন "পৃথিবীতে যদি কোন জিনিসকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত, সেটি হিন্দু ধর্ম্ম।" রামতনুও এই প্রতীচ্য উপাসনার প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। সুরাপান ও সমাজনিষিদ্ধ অন্যান্য ক্রিয়া তখন তাহার নিকটও নিন্দনীয় ছিল না।

ফলতঃ ডিরোজিওর শিষ্যত্ব গ্রহণ রামতনুর জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সেই দিন হইতে তাঁহার বহুদিনের সঞ্চিত অন্ধ বিশ্বাসের উপর ধীরে ধীরে যে আঘাত পড়িতে আরম্ভ হইল তাহার ফলে তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ নূতন পথ গ্রহণ করিল। হিন্দুসমাজের সংকীর্ণতা চূর্ণ করিয়া বিভিন্ন জাতির সহিত পানাহার করিতে তাঁহার উৎসাহের সীমা ছিলনা।

শিক্ষকতার যশের জন্য রামতনু তাঁহার গুরুর নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী এবং তাঁহার ছাত্রদের প্রতি যত্ন ও স্নেহ ডিরোজিওর জীবনের অনুকরণ মাত্র। ডিরোজিওর সত্যানুরাগ রামতনুর জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে উজ্জ্বল ভাবে প্রতিফলিত।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রামতনু কলেজ হইতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া ৩০৲ টাকা বেতনে হিন্দুকলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই স্বল্প আয়ে তিনি নিজের ও ভ্রাতৃবর্গের ব্যয় নির্ব্বাহ এবং অনেক নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করিয়াও দেশে পিতামাতাকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ ও আশ্রিতদিগের প্রতি তাঁহার যত্নের সীমা ছিলনা। কনিষ্ঠ কালিচরণ বাবুর পরীক্ষার কয়েকমাস পূর্ব্বে চক্ষের পীড়া হওয়ায় রামতনু বাবু প্রতিদিন কলেজের কার্য্যসমাপনান্তে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ভ্রাতার পাঠ্যগ্রন্থ পড়িয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হইলে রামতনু বাবু স্কুল বিভাগের দ্বিতীয়

শিক্ষক হইয়া গমন করেন। তৎকালে বঙ্গে প্যারিচরণ সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হরগোবিন্দ সেন প্রভৃতি অনেক উপযুক্ত শিক্ষক ছিলেন; কিন্তু পাণ্ডিত্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ হইলেও অধ্যাপনায় কেহ রামতনুর সমকক্ষ ছিলেন না। রামতনু যেন শিক্ষক



হেন্‌রি ভিভিয়ান ডিরোজিও

হইবার নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মানবজীবনে শিক্ষকতা অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ পবিত্র ও মহৎ কার্য্য এই ধারণা রামতনুর হৃদয়ে চিরকাল বদ্ধমূল ছিল। হিন্দুকলেজের সুবিখ্যাত রিচার্ডসন সাহেব ও ডিরোজিও যে জ্ঞানস্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন রামতনু ছাত্রদের হৃদয়ে সেই বহ্নিই প্রজ্জ্বলিত করিবার প্রয়াস পাইতে

লাগিলেন। কিরূপে মানব হৃদয়ের উচ্চতর ভাবগুলি ছাত্রদিগের মনে অঙ্কুরিত করিয়া দিবেন এই চিন্তায় তিনি অহরহ রত থাকিতেন। ছাত্রদিগকে আয়ত্তাধীন করিবার নিমিত্ত তিনি তাহাদের সহিত মিশিতেন, তাহাদের ক্রীড়াকৌতুকে যোগ দিতেন, নাম, ধর্ম্ম, অভিভাবকের অবস্থা ইত্যাদি প্রত্যেক খবরটি তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে থাকিত। গুরু ডিরোজিয়র ন্যায় সন্ধ্যাকালে ছাত্রগণ পরিবৃত হইয়া ধর্ম্ম নীতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিতেন। এইরূপে ছাত্রহৃদয় সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া তিনি তাহাদিগকে ক্রীড়া পুত্তলিকার ন্যায় চালিত করিতেন। যখন কোন শ্রেণীতে ছাত্রগণ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া অধ্যাপনার ব্যাঘাত ঘটাইত, রামতনুবাবুর উপস্থিতি সে স্থলে নিমেষে শৃঙ্খলা ও শান্তি পুনরানয়ন করিত। ছাত্রেরা তাঁহার সন্তানের ন্যায় ছিল। যাহাতে তাহাদের শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীণ হয়, এবং তাহারা আপনার ও সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, সে বিষয়ে রামতনুবাবুর প্রখর দৃষ্টি ছিল। ছাত্রজীবন যে বালকের সাংসারিক উন্নতি বা অবনতির সোপান এই কথাটি তিনি এমন গভীরভাবে বালকদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিতেন যে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহারা তাঁহার উপদেশ ভুলিতে পারিত না। স্বাবলম্বন ও যত্নের দ্বারা প্রত্যেক ছাত্রই আপনার এবং দেশের অশেষ উপকার করিতে পারেন, রামতনুবাবুর এই উপদেশটি উত্তরকালে অদ্ভুত ফলপ্রসূ হইয়াছিল।

আদর্শ শিক্ষকরূপে রামতনুবাবু চিরকাল বাঙ্গালীর হৃদয়ে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন। সরল ও চিত্তাকর্ষক করিয়া বুঝাইবার শক্তি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে Kindergarten বা বস্তুশিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, অৰ্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বেও রামতনুবাবুর তাহা অগোচর ছিল না। ছাত্রদিগের সৌন্দর্য্যশক্তির উন্মেষের জন্য তিনি Milton,, Burns, Campbell প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের গ্রন্থ হইতে স্থানবিশেষ আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার পাঠের ঐকান্তিকতা ও তন্ময়তা দৃষ্টে ছাত্রেরাও আত্মহারা হইয়া যাইত। শিক্ষকজীবনের সফলতার অন্তরালে তাঁহার প্রবল জ্ঞানস্পৃহা উল্লেখযোগ্য। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তিনি গৃহে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন। তিনি পড়াইতেন অল্প, কিন্তু অধীত অংশগুলি সম্বন্ধে ছাত্রগণ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিত। যদি কোন ছাত্র তাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা করিতে পারিত, কিম্বা তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিতে পারিত, তিনি অতিশয় আনন্দের সহিত ছাত্রসমক্ষে আপন ত্রুটি স্বীকার করিতেন। ছাত্রদিগের অদ্ভুত গুরুভক্তি তাঁহার শিক্ষকতায় সাফল্য লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। যে কেহ তাঁহার উজ্জ্বল চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বর্গীয় গুরুর গুণাবলী ঘোষণা করিয়াছেন। রামতনু অসামান্য আদর্শচরিত্রবলেই ছাত্রগণের নিকট পুত্রোচিত ব্যবহার পাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে উত্তরপাড়ার পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় কালীচরণ ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১৫০৲ টাকা বেতনে

রামতনুবাবু বর্দ্ধমানের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে জনসাধারণ তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও মানসিকবলের পরিচয় পায়। সাম্য মতের পোষক ও নিরাকার ভগবানের উপাসক



রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়

রামতনু যজ্ঞোপবীতসহ হিন্দুমতানুযায়ী শ্রাদ্ধ করিতে গিয়া জনৈক বালকের বিদ্রূপ আকর্ষণ করেন। রামতনু আপনার ভ্রম বুঝিলেন; বিশ্বাস ও কার্য্যের মধ্যে বিসদৃশতা লক্ষ্য

করিয়া উপবীত বর্জ্জন করিলেন। অচিরে বর্দ্ধমান তুমুল আন্দোলনে বিক্ষোভিত হইয়াছিল। রজক, ক্ষৌরকার, দাসদাসী, একে একে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। রামতনু এ বিপদে হিমাচলের ন্যায় অটল ছিলেন, বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রকাশ্য দিবালোকে প্রফুল্লচিত্তে ভৃত্যের অভাব স্বকীয় বাহুবলে পূরণ করিয়া লইতেন। জল বহা কাঠ কাটা বাজার করা প্রভৃতি ভৃত্যের সমস্ত কার্য্যই তিনি নিজে করিতে লাগিলেন; কোন দিন ক্লান্তি বোধ করিতেন না। সাধারণের অসহ্য নির্য্যাতনে তিনি কখনও বিন্দুমাত্র বিরক্তি বা বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই।

কৃষ্ণনগরে লাহিড়ী মহাশয়ের উপবীত ত্যাগের কথা প্রচারিত হইল। রামতনুর বৃদ্ধ পিতা শোকে মর্ম্মাহত হইলেন। তদুপরি প্রতিবেশীর তীব্র লাঞ্ছনা বৃদ্ধের শোকতপ্ত বক্ষে দারুণ কশাঘাত করিতে লাগিল। রামতনু শুনিলেন। প্রাণবিনিময়েও যদি পিতার শোকোপশম করিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি অকাতরে প্রাণবিসর্জ্জন করিতেন। কিন্তু এ ত প্রাণের সহিত সংঘর্ষ নয়, এ যে সত্যের সহিত সংঘর্ষ! সত্যনিষ্ঠা যে তুচ্ছ প্রাণের অনেক উচ্চে! যে সত্যানুরাগ তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা, যাহার উজ্জ্বল আলোক অম্লান ও অক্ষুণ্ণ হইয়া জীবনপথের প্রিয়তম সহচর হইয়াছে, ডিরোজিও যাহা কৈশোরে স্বর্ণ অক্ষরে তাঁহার হৃদয়ে খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা তাঁহার মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট—সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও রামতনু আজ তাহাকে ত্যাগ করিতে অক্ষম! রামতনু উপবীত পুনর্গ্রহণ করিতে পারিলেন না। নিজের বিশ্বাসমত কার্য্য করিতে গিয়া যিনি পৃথিবীর বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে দাঁড়াইতে পারেন, ঘনীভূত বিপদের মেঘ ভ্রূকুটির সহিত হৃদয় আচ্ছন্ন করিবার উদ্যোগ করিলে যিনি সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় বীর ও প্রশান্তচিত্ত থাকিতে পারেন তাঁহার অমানুষিক মহত্ত্বের কথা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহার সহিত আমাদের অনেক মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার গুণরাজির প্রতি উদাসীন হইলে মনের সঙ্কীর্ণতাই প্রকাশ পায়।

সত্যের প্রতি অসীম অনুরাগ তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে প্রতিফলিত। মদ্যপায়ী ইংরাজজাতিকে জ্ঞান ও সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আসীন দেখিয়া রামতনু মদ্যপানকে দূষণীয় বিবেচনা করিতে পারিতেন না। কিন্তু যেদিন তিনি অতিরিক্ত সুরা-পানজনিত বিকৃত মস্তিষ্ক কোন যুবকের নির্লজ্জ আচরণ প্রত্যক্ষ করিলেন সেই দিন হইতে তিনি সুরাপান ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। প্রিয়বন্ধু রামগোপাল ঘোষকে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ রামগোপাল আমাদের সুরাপান দেখিয়া বাড়ীর ছেলেরা খারাপ হইয়া যাইতেছে এস আমরা সুরা পান ত্যাগ করি।"

রামতনু চরিত্রের আর একটি উজ্জ্বল দিক আমরা এখনও লক্ষ্য করি নাই। সেটি তাঁহার ভগবদ্ভক্তি। "Never take the Lord's name in vain". ভগবানের নাম কখনও বৃথা লইও না, এই কথাটি তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেই

এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে তাঁহার অশ্রুপ্রবাহ গণ্ডদেশ সিক্ত করিত। ভগবানের গুণকীর্ত্তনের সময় প্রিয়তম বন্ধুরও লঘুচিত্ততা বা চপলতা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিত। ভবিষ্যতে



রামগোপাল ঘোষ

সেই লোককে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন কার্য্যে আহ্বান করিতেন না। ভক্তদিগের প্রতিও তাঁহার অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। এবিষয়ে তিনি কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন না। হিন্দু, ব্রাহ্ম, ক্রিশ্চিয়ান সকল সম্প্রদায়ের লোককে তিনি সমভাবে

শ্রদ্ধা করিতেন। এই উদারতাটুকু রামতনু চরিত্রের বিশেষত্ব এবং ইহাই তাঁহাকে অপর সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের করুণার প্রতি তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পেনসন গ্রহণ করিবার পর তিনি সাংসারিক সুখোপভোগে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন। উপযুক্ত কন্যা ও পুত্রত্রয়ের অকাল মৃত্যু, জামাতার আত্মহত্যা, প্রাণপ্রিয় কনিষ্ঠের তিরোধান কিছুই তাঁহার বিশ্বাসকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সক্ষম হয় নাই। তাঁহার কন্যার মৃত্যুতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "তোমরা শুনিয়া সুখী হবে যে ইন্দুমতীর রোগযন্ত্রণা আর নাই, সে এখন বেশ সুখে আছে।" যদি কেহ তাঁহার পুত্রকন্যাবিয়োগের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তিনি বলিয়া উঠিতেন, "এর জন্য আপনারা দুঃখ কচ্ছেন কেন? ভগবান যে এই কয়টি রাখিয়াছেন, তাহাই কি যথেষ্ট নয়?"

ভগবানের প্রতি কি অপূর্ব্ব অসাধারণ বিশ্বাস! রামতনুর জীবনী আলোচনা করিলে এই শিক্ষাটি আমাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকে যে পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে হইলে অসাধারণ প্রতিভা বা অর্থের কোন প্রয়োজন হয় না। অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া চরিত্রবলে মনুষ্য আপনাকে ও স্বজাতিকে কতদূর উন্নীত করিতে পারে রামতনু লাহিড়ীর জীবন তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

রামতনু বাবুর জীবনের ছোট ছোট অনেক গল্পে তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বাহুল্যভয়ে আমরা এস্থলে তাহার আবৃত্তি হইতে বিরত রহিলাম! ভবিষ্যতে তাহা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল!

শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

বর্ষাগমে।

পরিব্যাপ্ত নীলিমায় সম্মুখ আকাশে
নির্ম্মল প্রসন্ন-দৃষ্টি সূর্য্যরশ্মি হাসে
বরদাত্রী অভয়ার মত; দূরতর
দিগন্ত সীমায় ঘনকৃষ্ণ মেঘস্তর
নেমেছে প্রান্তরে, যেন স্থান নাহি তার
অপার আকাশে; চমকিছে চপলার
বিহ্বল প্রলয় দীপ্তি ত্রস্ত ক্ষণে ক্ষণে,
উঠিতেছে, পড়িতেছে মত্ত আন্দোলনে
দ্রুমদল, পবনের ভৈরব আক্রোশে।
চেয়ে আছি ব্যাকুল আগ্রহে, রুদ্ররোষে
মেঘপুঞ্জ আবরিবে মঙ্গল কিরণ?
অথবা আনিবে বর্ষা করুণা প্লাবন,
হবে ইন্দ্রধনু মিশি হাসি অশ্রুজল
ব্যাপি সীমাহীন নভ স্পর্শি ধরাতল!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

প্রবাসী।

গ্রাম্যস্কুলবিদ্যা শেষ করিয়াই প্রবাসীর দলে ঢুকিলেও গত পাঁচ ছয় বৎসর যাবৎ প্রকৃত প্রবাসী হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আজ প্রবাসী জীবনের কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা পাঠকগণের নিকট নিবেদন করিব। প্রবাসী জীবনে শান্তি নাই। নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাস্রোত প্রবাসীর হৃদয়ে কিরূপ অশান্তির উদ্রেক করে তাহা যাঁহারা বঙ্গের আবহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন এবং গৃহের স্নেহ-মমতা বিচ্ছিন্ন করিয়া ভিন্ন প্রদেশে না গিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ধারণা করা সুকঠিন। সাময়িক উত্তেজনায় অথবা উদরান্নের সংস্থানে কখন কখন আমরা স্থানান্তরে যাইতে উৎসুক হইয়া উঠি বটে, কিন্তু কতিপয় দিবসেই সে উত্তেজনা সে ঔৎসুক্য একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। এমন কি তখন যেন মনে হয় আত্মীয় স্বজনপরিবৃত হইয়া উদরান্নের তাড়না সহ্য করাও শতগুণে শ্রেয়ঃ।

যখন বিদেশযাত্রা উদ্দেশে প্রস্তুত হইতে ছিলাম তখন যেন কোনো দৈবশক্তি হৃদয়ে বল সঞ্চার করিয়া দিতেছিল। আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের ভয় প্রদর্শন, এবং অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করিয়া সপ্তরথীর ন্যায় অসীম সাহসে ভর করিয়া আমরা সাতজন কলিকাতার ঘাটে জাহাজে চড়িলাম। আত্মীয় স্বজন সাশ্রুলোচনে ডিঙ্গির সাহায্যে খিদিরপুর পর্য্যন্ত আমাদের জাহাজের অনুগমন করিয়াছিলেন। আমরা সকলেই নূতন সাহেব সাজিয়া অতি স্ফুর্ত্তির সহিত লম্ফ ঝম্প দিয়া জাহাজে উঠিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু জাহাজ যখন কলিকাতার সীমানা অতিক্রম করিয়া মেটেবুরুজ গার্ডেনরিচের নিকট গিয়া দ্রুত গতিতে সাগর উদ্দেশে ছুটিল তখন চাহিয়া দেখিলাম আমার ন্যায় সকলেই নিঃশব্দে ম্লানবদনে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। চক্ষু সকলেরই রক্তবর্ণ; কাহারও কাহারও দুই এক ফোঁটা অশ্রুজলও কপোল বাহিয়া পড়িতেছিল। সমস্ত দিন কত কি নূতন নূতন দৃশ্য দৃষ্টি পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল কিন্তু অন্তরে অন্তরে সকলেই মায়ার তাড়নায় জর্জ্জরিত হইতেছিলাম বলিয়া, কিছুই ভাল করিয়া দেখা হইল না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে জাহাজ সমুদ্রে পড়িল, তারপর একে একে সকলেই শয্যাগত হইলাম, বলাবাহুল্য দুই দিন অনাহারে অনিদ্রায় শয্যাশায়ী হইয়া সকলেই বিদেশ যাত্রায় ধিক্কার দিয়াছিলাম।

তার পর জাপানে পৌঁছিলে ভাষা এবং আহার্য্য বিভিন্নতায় প্রথম প্রথম এতই অসুবিধা বোধ হইত যে তখন সোনার ভারত কেন ছাড়িয়াছিলাম বলিয়া আরও অনুতাপ জন্মিত। ভাষার অসুবিধা সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ করি। একদিন জনৈক জাপানী বন্ধুর সহিত রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। স্থানে স্থানে বিজ্ঞাপন পত্রে বড় বড় অক্ষরে "রাইওন" দেখিতে পাইয়া বন্ধুকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন রাইওন অর্থাৎ দন্তমার্জ্জন। তখনই দন্তমার্জ্জনের প্রতিশব্দটী মুখস্থ করিয়া রাখিলাম। অপর এক দিন

বেড়াইতে বাহির হইয়া এক দোকানে দন্তমার্জ্জন কিনিতে গেলাম। সেদিন একাকী। কখন দোকানে কোন জিনিস ক্রয় করিতে যাইলে প্রথমতঃ অভিধান দেখিয়া প্রস্তুত হইয়া যাইতাম। কিন্তু দন্তমার্জ্জনের প্রতিশব্দ জানি বলিয়াই সেদিন অভিধান দেখিবার আবশ্যক আদৌ বোধ করি নাই। দোকানদারের নিকট গিয়া "রাইওন" চাহিলাম, সে অনেক ইতস্তত করিয়া একটী রংয়ের বাক্স বাহির করিয়া দিল। আমি বলিলাম উহা নহে। তার পর দ্বিতীয় ব্যক্তি বুঝিয়াছি বলিয়া এক বাণ্ডিল তুলি বাহির করিয়া দিল। মহাবিপদে পড়িলাম, উপায়ান্তর না দেখিয়া যে ভাবে দন্ত পরিষ্কার করিতে মাজন ব্যবহৃত হইয়া থাকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তাহা দেখাইলাম। দোকানদার ঠিক ঠিক বলিয়া চেঁচাইয়া একটি ফ্লুট (বাঁশী) বাহির করিয়া দিল। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হওয়ায় অবশেষে দোকানদার আমাকে অন্য এক দোকানে লইয়া গেল। অদৃষ্টক্রমে সে দোকানের সম্মুখ ভাগেই কতকগুলি দন্তবুরুশ সাজান ছিল। উহার একটি হাতে লইয়া যেভাবে বুরুশের সাহায্যে মার্জ্জন ব্যবহৃত হইয়া থাকে দেখাইতেই দোকানদার তাহা বাহির করিয়া দিল। বলাবাহুল্য আমার এই বিপত্তিতে দুই দোকানেই অনেক লোক জমিয়াছিল। নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতে দিতে কলেজ বোর্ডিংয়ে ফিরিয়া আমার সেই বন্ধু প্রবরের নিকট গেলাম। তাঁহাকে টুথপাউডারের জাপানী প্রতিশব্দ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন "হামিগাকি", আমি চমকিয়া উঠিয়া সেই দিনের রাইওনের কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন রাইওন কোন এক বিশেষ দন্তমার্জ্জনের ট্রেডমার্ক। রাইওন (লায়ন) অর্থাৎ সিংহ মার্কা। জাপানী অক্ষরে লিখিতে এবং উচ্চারণ করিতে লায়ন রাইওন হইয়া দাঁড়ায়। উহাদের ভাষায় "ল" নাই। জাপানী ভাষায় ট ঠ ড ঢ অক্ষর বা উহার উচ্চারণ নাই। উহার পবিবর্ত্তে ত, থ, দ, ধ। ইংবাজী ভাষা হইতে অনুবাদ করা হয় বলিয়া আমার মনে হয় আমাদের সংবাদ পত্র সমূহে তোকিও কিওতো, তোঁগো, ইতো প্রভৃতির পরিবর্ত্তে টোকিও, কিওটো, টোগো, এবং ইটো প্রভৃতি লিখিত হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য এরূপ উচ্চারণ জাপানীরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

সামান্য বিষয়ে ভাষার জন্য এতটা বিপদে পতিত হইলে কাহার না তখন স্বদেশের কথা মনে পড়ে। জাপানের উত্তর ভাগে সাগালিয়েন দ্বীপের নিকট হোক্কাইদো দ্বীপ। ঐ দ্বীপের রাজধানী ছাপ্পোরো সহর তোকিও সহর হইতে প্রায় ৭৫০ মাইল দূর। জনৈক ভারতীয় বন্ধুর সহিত তথাকার কৃষি-কলেজে পড়িবার জন্য ঐ দ্বীপে গমন করি এবং এক বৎসর কাল তথায় অবস্থান করি, শীতের পাঁচ মাস ঐ স্থান অনবরত ৪।৫ ফুট বরফে আবৃত থাকে। ঐ কয়েক মাস বাড়ী ঘর গাছপালা মাঠ ময়দান পাহাড় পর্ব্বত সমস্তই যেন রজত নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। শীতের প্রকোপ অতি ভীষণ, জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে কোন কোন দিন তাপ পরিমাণ —২২০ ডিগ্রিতে পরিণত হইত। নীচের তলার ঘরে গরম জলে মাথা ধুইয়া উপরে উঠিতে উঠিতেই মাথার জল গলিত চর্ব্বির ন্যায়

জমাট বাঁধিয়া যাইত। স্কুল কলেজ সর্ব্বদাই ষ্টিম ইঞ্জিনের সাহায্যে গরম রাখা হইত। এরূপ প্রদেশে বাস করিতে কোন্ ভারতবাসীর প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে স্বদেশের কথা মনে না হয়?

এই একবৎসর অজ্ঞাত বসবাস বা দ্বীপান্তর বাস সমাপ্তির পর যখন কয়েক বৎসর প্রায় ৩০।৪০ জন ভারতবাসীর সহিত তোকিও সহরে বাস করিতেছিলাম তখনই কি কেহ স্বদেশের কথা ভুলিতে পারিয়াছিলাম? আমার মনে হয় সেই সময়ই স্বদেশের জন্য সকলে আরও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ সে সময় বঙ্গ বিচ্ছেদ স্বদেশী বয়কট প্রভৃতি আন্দোলনে ভারত আলোড়িত। চিঠিপত্রে এবং খবরের কাগজে জানা যাইত কাহার ভাই জেলে গিয়াছে, কাহার শ্যালক হাজতে আছে, কাহার পিসে মহাশয় জরিমানা দিয়াই অব্যাহতি পাইয়াছেন। কাহার পিতা সরকারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইয়াছেন, কাহার কোন আত্মীয় পিউনিটিভ পুলিসের যষ্টি প্রহারে ক্লিষ্ট হইয়া হাঁসপাতালে আছেন ইত্যাদি। কাযেই অনেক বন্ধু এক সঙ্গে থাকিলেও তখন দেখিতাম যে স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজনের জন্য সকলেই নিরতিশয় চিন্তাগ্রস্ত। সাধারণতঃ সপ্তাহে একদিন ভারতের ডাক পাইতাম। উহাও প্রায় রাত্রি ১০টা হইতে ১১টার মধ্যে। নির্দ্দিষ্ট দিনে অনেকেই ডাকের প্রতীক্ষায় থাকিতেন। তার পর ডাক পৌঁছিলে খবরের কাগজে মোটামুটি ঘটনাগুলি দেখিতে দেখিতেই কোন কোন দিন রাত্রি তিনটা বাজিয়া যাইত। ভারতবাসী পরিচালিত হিন্দুস্থানের প্রায় সকল প্রদেশের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রই আমরা পাইতাম। এই সকল কারণে দেখিয়াছি যে প্রবাসী জীবনে শান্তি অতি বিরল। যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে বিদেশে থাকিতে হয় তাহার দায়িত্ব অতি গুরুতর। তার উপর আবার দেশ ও আত্মীয় স্বজনের চিন্তা!

বৈদেশিক সমাজে যখন আমরা ঘৃণিত জীবজন্তুর ন্যায় বিবেচিত হই এবং বৈদেশিক সংবাদপত্র সমূহ যখন আমাদের দেশের কেবল নিন্দা কুৎসাই গাহিতে থাকে তখন ইচ্ছা হয় না যে সে দেশে ক্ষণকালের জন্যও অবস্থান করি। তখন কি সেই দেশের প্রতি ঘৃণার ভাব এবং স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমির প্রতি প্রীতির ভাব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে না? জাপানেও আমাদের তেমনি হইত। জাপান আজ বড় হইয়াছে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতি উহাদের নিকট মস্তক অবনত করিতেছে তাই আজ জাপানীরা আমাদের ভারতের কিছুতেই সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না। আজ তাহারা স্তবস্তুতির পরিবর্ত্তে ভারতবাসীর প্রতি কেবল গালি বর্ষণ করিতেই আনন্দ বোধ করে। যে জাপানীরা স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা এবং যাহারা কাহারও মুখে জাপানের সামান্য কিছু নিন্দা শুনিলেই তাহাকে চিরশত্রু বলিয়া মনে করে, সেই জাপের দেশে অবস্থান কালে তাহাদের মুখে ভারতের নিন্দাবাদ শুনিলে আমাদেরই বা তাহা প্রীতিকর হইবে কেন? এই জন্যই জাপানজীবনে প্রত্যেক শিক্ষিত প্রবাসী ভারতবাসীর এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয় না যেদিন তিনি তাঁহার স্বদেশের বিষয় কিঞ্চিৎ চিন্তা

না করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর কোন প্রবাসী ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রগণ যখন ষ্টেশনে তাঁহাকে বিদায় দিতে যান তখন প্রত্যেকেরই সেই জাহাজে ভারতযাত্রার ইচ্ছা হয়।

সেই বিদেশে যে কোন অশিক্ষিত ভারতবাসীকে পাইলেও কত আনন্দ। আমাদের একটী প্রবচন আছে যে "দেশের কুকুর আর বিদেশের ঠাকুর" সমান। এই জন্যই জাহাজে অন্যান্য দেশীয় শিক্ষিত আরোহীদিগকে উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় অশিক্ষিত খালাসীদের সহিত আলাপ করিতেও ঔৎসুক্য জন্মে। আমাদের জাহাজ সাঙ্ঘাই বন্দরে পৌঁছিলেই তীরে একজন ভীমমূর্ত্তি শিখ প্রহরীকে দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হইল। নামিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই দেখিতে পাইলাম যে সেই প্রহরী একজন নির্দ্দোষ চীনা রিক্‌শওয়ালাকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতেছে। কাযেই তাহার সহিত আলাপের আর প্রবৃত্তি রহিল না। সহরে ঢুকিলাম। স্থানে স্থানে সহরের রাস্তায় এবং বড় বড় বৈদেশিকের কুঠীর দ্বারদেশে সবলকায় এক এক হিন্দুস্থানী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আগ্রহের সহিত প্রত্যেকের নিকট গিয়া দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রায় সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—ভাই হিন্দুস্থানের কোন প্রদেশে তোমার বাড়ী? কত দিন এখানে আছ? আহারাদি বাদে দেশে কিছু পাঠাইতে পার কি? ইত্যাদি। বলাবাহুল্য দুই একজন বাদে সকলেই গরম মেজাজে এবং তুচ্ছ জ্ঞানে উত্তর দিয়াছিল।

একজন কোটপেণ্টলুন এবং টুপী পরিহিত হিন্দুস্থানীকে মিউনিসিপাল বাগানে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার নিকট গিয়া ঘেঁসিয়া বসিলাম। কথাবার্ত্তায় জানিতে পারিলাম সে জনৈক বৈদেশিকের দরোয়ান, ইংরাজী কিম্বা হিন্দি লিখিতে পড়িতে কিছুই জানে না, একেবারে নিরক্ষর। তাহার প্রভু প্রদত্ত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া রবিবারের অবকাশ সময় টুকু বাগানে হাওয়া খাওয়ার জন্য বাহির হইয়াছে। লোকটী ছয় বৎসর সাঙ্ঘাই সহরে আছে। অথচ সহরের কোন খবরই সে দিতে পারিল না, যেহেতু সে নাকি তাহার কার্য্যস্থল আর ঐ বাগান ছাড়া উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম কিছুই জানে না। আমি কোথা হইতে আসিতেছি, জাপানে কতজন ভারতবাসী ছাত্র আছে, তাহাদের মাসিক আয় কত ইত্যাদি সে জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে—ছাত্রদের কোন আয় নাই, প্রতি মাসেই ভারত হইতে টাকা আনিয়া বিস্তর খরচ করিতে হয় শুনিয়া সে অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল, তবে ছেলেরা জাপান ছাড়িয়া এখানে কেন চলিয়া আইসে না? এখানে দরোয়ানী কাযে মাসিক ১০৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়া আহারাদি বাদে অন্ততঃ চারি টাকা দেশে পাঠাইতে পারিবে। মনের ভাব চাপা দিয়া বন্ধুদিগকে লেখাপড়া ছাড়িয়া দরোয়ানী কাযে সাঙ্ঘাই আসিতে লিখিব বলিয়া তাহাকে আশ্বাস দিলাম; বাস্তবিক তথা হইতে বন্ধুদিগকে এ বিষয় জ্ঞাপনও করিয়াছিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, হা ভগবান ভারতের লোককে এমনই অবস্থার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত রাখিয়াছ যে ছয় হাজার মাইল দূরে আসিয়াও শিক্ষালোকে তাহার নেত্র উন্মীলিত হয় না?

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলাম এমন নিরক্ষর প্রবাসীরও স্বদেশের প্রতি আন্তরিক টান রহিয়াছে; যেহেতু প্রতি মাসে প্রত্যেকে অন্ততঃ চারি টাকা দেশে পাঠাইতে পারিবে বলিয়া জাপানস্থ ভারতীয় ছাত্রদিগকে সে সাজ্ঘাই আসিতে পরামর্শ দিতেছিল।

বাস্তবিক প্রবাসী প্রত্যক্ষভাবে দেশের কাযে যোগ দিতে না পারিলেও তাহার মন যে নিরন্তর স্বদেশের দিকে আকৃষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রবাসী হাজার মাইল দূরে থাকিলেও জন্মস্থানের উদ্দেশে স্বপ্নে ও জাগরণে বলে

কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষাহারে
দ্যুতিমান মধ্যমণি যেমন সুন্দর
সেইরূপ সমুদায় মেদিনী মাঝারে
আছে দিব্যস্থান এক অতি মনোহর!

(ক্রমশঃ)। শ্রীযদুনাথ সরকার।

আদেশ পালন।

পরীক্ষায়, বহুবার ফেল্ হইলে ছাত্র যেমন সিদ্ধিলাভে হতাশ হইয়া পড়ে, আমার বিবাহের বিস্তর সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় উহাতে সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে আমিও সেইরূপ সন্দিহান্ হইয়াছিলাম। যাহা হউক বহুকাল পরে হঠাৎ একদিন একটি নূতন সম্বন্ধ আসিয়া উপস্থিত। ঘটকী রূপ-বর্ণনা করিবার পূর্ব্বেই আমি মনে-মনে পাত্রীর ছবি আঁকিয়া ফেলিলাম—ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা—রঙটুকু চাঁপা ফুলের মত—এক পিঠ কালো চুল, তার কতকগুলি গণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িয়া বাতাসে সর্পশিশুর মত খেলা করিতেছে—সুন্দর নিটোল ললাট, যেন আধখানি চাঁদ ফুটিয়া আছে,—তুলিটানা বঙ্কিম ভ্রূরেখার নিম্নে দুইটি ডাগর চক্ষু—মধ্যভাগে "শুকচঞ্চুজিনি নাসা"—তার নীচে দুইখানি গোলাপের পাপড়ি—কিন্তু, হায়! আমার কল্পনার ছবিটুকু শেষ না করিতেই ঘটক ঠাকুরাণী তাঁর ব্যবসা-ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বলিলেন,—"পাত্রীটি সুশ্রী নয়, তবে দেবে-থোবে ঢের, জামাইকে বিলেত পাঠাবে।" আমার বুকটা যেন 'ধড়াস্' করিয়া উঠিল! সুশ্রী নয়, অর্থাৎ তবে রীতিমত কুৎসিত!'

'দেবে-থোবে ঢের, জামাইকে বিলেত পাঠাবে' এই কথাটা কিন্তু আমার অভি-ভাবকের কাণে বড় মিষ্ট লাগিল। বধূর রূপ লইয়া বাড়ির সকলে কি ধুইয়া খাইবে? টাকা! অল্প-স্বল্প নয়—'বিলেত পাঠাবে জামা-ইকে!' অন্ততঃ দশ বারো হাজার টাকা! শুধু তাই? আবার এক খানা বাড়ি!

তার পর সে এক শুভ দিনে শুভ লগ্নে আমার বিবাহ হইয়া গেল—সেই কাল কুৎসিত মেয়ে-টার সহিত। একটি জীবন্ত অন্ধকারকে আমি বিবাহ করিয়া আনিয়া ঘর কালো করিয়া তুলিলাম।

আকাশের অন্ধকারে তারার শোভা আছে, আমার "অন্ধকারে" গহনার শোভা ছিল। অন্ধকার রাত্রে লোকে আকাশের দিকে চাহে অন্ধকার দেখিতে নয়, তারা দেখিতে, আমাদের বাড়ীতেও যে

মেয়ের গাঁদি লাগিত, তারাও সত্য বলিতে গেলে, গহনা দেখিতেই আসিত।

বিবাহের আট দিন এক রকমে ত, কাটিয়া গেল। দাম্পত্য প্রেমের প্রথম আলাপ শুনিবার উৎকট ইচ্ছায় অনেককে কক্ষের আশে-পাশে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, আঁধারে মশক-দংশন সহ্য করিয়া অবশেষে নিরাশ হইতে হইয়াছিল।

যখন আমার শয্যার আধখানা অন্ধকার করিয়া তিনি শয়ন করিতেন তখন আমার মনে হইত, 'আমি'-রূপ চন্দ্রে 'তিনি-, রূপ 'গ্রহণ' লাগিয়াছেন!

নয় দিনের দিন আমি'গ্রহণ'মুক্ত হইলাম। এ কয়দিন তাঁহার সঙ্গে আমার বাক্যালাপ— তোমরা যদি বিশ্বাস কর—একটুও হয় নাই। তবে একদিন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সেদিন বড় গরম পড়িয়াছিল। শয্যার একাংশে পড়িয়া আমি ছট্-ফট্ করিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম—"কোথা থেকে উড়ে এসে (অর্থাৎ শয্যার অর্দ্ধেকটা) জুড়ে বসেছেন"— সেই সময় আমার হৃদয়ের "অন্ধকার" অতি মৃদু —আর, আর, তোমরা যদি ঠাট্টা না কর— অতি মধুর স্বরে বলিলেন, "বাতাস করব?"

কিন্তু সে মধুরতায় আমার রূপতৃষ্ণা মিটিল না; সুতরাং মনও নরম হইল না। কোন উত্তর না দিয়া আমি বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। একটু পরেই চুড়ীর মৃদু আওয়াজের সহিত পাখার বাতাস সুরু হইল। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে দেখি দেবী "অমাবস্তা" আমার পদপ্রান্তে অন্ধকার ছড়াইয়া নিদ্রা যাইতেছেন।

এক মাস অতীত হইলে আমার বিলাত যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। বিলাত গমনের পূর্ব্বে একবার আমাকে শ্বশুরালয়ে যাইতে হইয়াছিল। যাইবার ইচ্ছা ছিল না— কিন্তু নেহাৎ খারাপ দেখায়, সেই জন্য গিয়াছিলাম, কিন্তু বড় ভয়ে-ভয়ে! যদি আবার আমার "অন্ধকার" দেখা দিয়া সম্ভাষণ করিতে আসেন? তাহাকে দেখিলেই আমি যে তাহার স্বামী এই কথাটা আমার মনে আসিয়া পড়িত—আমার তাহাতে বড় লজ্জা ও অপমান বোধ হইত! ছিঃ ছিঃ আমি এই বিশ্বকুৎসিতার স্বামী!

শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া দেখি সেখানে রটিয়া গিয়াছে 'অন্ধকার'কে আমার পছন্দ হইয়াছে। আমি অতি "সুবোধ" "সুশীল" ইত্যাদি নানা-বিধ প্রশংসা-বাণী আমার উপর বর্ষণ করিয়া শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা জানাইলেন যে,তাঁহাদের অন্ধকার মেয়েটিকে আমি হাসি মুখে গ্রহণ করেছি শুনিয়া তাঁহারা পরম সুখী! আমি-ত শুনিয়া অবাক! তাঁহারা যে আমাকে এইরূপ সৌন্দর্য্যজ্ঞানহীন ভাবিয়াছেন ইহাতে আমি মনে মনে বড়ই চটিয়াছিলাম—কিন্তু হাজার হোক্ তবু শ্বশুরবাড়ী!

সেদিন সেখানেই রাত্রিটা কাটাইতে হইল।

'অন্ধকার' আসিয়া আমায় প্রণাম করিলেন।

আমাকে নীরব দেখিয়া 'তিনি' একটি ছোট-খাট নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি তোমার কি করেছি?"

আমি নীরব। এবার যেন একটু অভিমানভরে তিনি বলিলেন, "আমি কালো-কুৎসিত, তা তুমি কেন আবার বিবাহ কর না!"

তার পর শ্বশুরের অর্থে বিলাত যাত্রা করিলাম। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল, আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া যাইবার সময় তাহা রহিল না। বন্দর হইতে জাহাজ যতই সমুদ্রের দিকে যাইতে লাগিল আমার হৃদয়ের স্নেহে ততই টান পড়িতে লাগিল। দেশের প্রতি, দেশের দশ জনের প্রতি যে ভালবাসা এতদিন আমার অজ্ঞাতসারে অন্তরে বিলীন হইয়াছিল আজ সহসা যেন সে আমার সম্মুখে আসিয়া আত্মপরিচয় দিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে যে কয়জন বাঙালী ছিলেন তাঁহারাই যেন আমার একান্ত আত্মীয় হইয়া উঠিলেন। বাঙ্‌লাদেশ ছাড়িয়া প্রথম বুঝিলাম, বাঙ্‌লা-দেশকে কতখানি ভালবাসি—তখন বাঙ্‌লাদেশে, বাঙালীর মধ্যে সকলকেই আমার প্রিয়জন বলিয়া মনে হইল। আর আমার "অন্ধকার"? আহা, সে-ও তো বাঙ্‌লাদেশের মাটিতে জন্মিয়াছে!

মনে করিলাম, বিলাত পৌঁছিয়া তাহাকে পত্র দিব। কিন্তু সেখানে গিয়া তাহাকে পত্র দেওয়া দূরে থাক্, জন্ম-ভূমির প্রতি আমার যে মনের ভাব ছিল, তাহারো পরিবর্ত্তন হইয়া গেল! পোষ্যপুত্র যেমন পালিকা মাতার বাহিরের বিভব দেখিয়া তাঁহাতেই আকৃষ্ট হইয়া আপনার স্নেহময়ী দুঃখিনী মাতাকে অবজ্ঞার চোখে দেখিতে থাকে, আমার দশাটা কতকটা সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। ইংলণ্ড আর ভারতবর্ষ! স্বর্গ আর মর্ত্ত্য! তখন ভুলিয়া গিয়াছিলাম, ইংলণ্ডে এ স্বর্গের সৃষ্টি কাহার ধনরত্নে হইয়াছিল!

পড়াশুনায়, আমোদ-আহ্লাদে বিলাস-বিভ্রমে তিন বৎসর কাটাইয়া দিলাম। বিলাতে থাকিবার সময় আমার দুই কূল (পিতৃ ও শ্বশুর) হইতে চিঠিপত্র আসিত। আমিও নিয়মমত সকলকে উত্তর দিতাম, ত্রুটি করিতাম না। আমার "অন্ধকার"ও আমায় দুইখানি চিঠি লিখিয়া তাহার উত্তর না পাইয়া আর আমায় চিঠি লিখিয়া অনুগৃহীত করেন নাই! আমিও তাহাতে তখন বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলাম বলিয়া ত মনে হয় না। তাঁহার পত্রের এক স্থানে লেখা ছিল, "বাড়ী ফিরিবার আগে আমায় খবর দিয়ো।" আমি কিন্তু কথা মত কাজ করি নাই—আর করিলেই বা কি হইত!

ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিলাম। ফ্লোরা সঙ্গে আসিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিল, নানা কারণে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। আমার মনে হইয়াছিল যেন প্রাণের আধখানা সেই শ্বেতদ্বীপে রাখিয়া আমি স্বদেশে ফিরিতে-ছিলাম। ফ্লোরা আমার কে? আজ সে আমার কেহ নয়!

প্রবাস হইতে যেদিন বাঙালী বাঙ্‌লা দেশের কোলে ফিরিয়া আসে, সেদিন তার কি আনন্দ! কিন্তু আমার মত দুর্ভাগ্যের কপালে সে আনন্দলাভ ঘটে নাই! বিদেশের লতাকে প্রাণে জড়াইয়া বিদেশেই ফেলিয়া আসিতে হইলে, বুঝি, মানুষের কপালে স্বদেশের স্নেহলাভ তেমন ঘটে না!

কলিকাতায় পৌঁছিয়া দেখি, আত্মীয়-স্বজনেরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতে-ছেন। দেখিয়া ভাবিলাম বাড়িতে

অবরোধের মধ্যে কতগুলি হৃদয় আমার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। সেই সঙ্গে আমার 'অন্ধকার'ও হয়ত পথ চাহিয়া আছে। আবার মনে হইল, কেন সে থাকিতে যাইবে? আমা দ্বারা সে কতটুকু সুখী হইয়াছে?

ফ্লোরাকে ভালবাসি আর যাই করি 'তাহাকে' আর ব্যথা দিব না এইটা একরকম ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু বাড়ি আসিয়া 'তাহাকে' দেখিতে পাইলাম না। রাত্রি আসিল, কিন্তু আমার অন্ধকার কৈ! আমার নিকট আসিল না ত! ভাবিলাম একবার শ্বশুর বাড়ি যাই! কিন্তু মনে একটু অভিমান হইল! তিন বৎসর পরে বিদেশ হইতে আসিলাম, এখন কি না 'তিনি' বাপের বাড়ি বসিয়া রহিলেন! কিন্তু আমি ত, তাহার প্রার্থনামত তাহাকে জানাই নাই যে, আমি বাটী যাইতেছি! ইচ্ছা করিলে সে কি জানিতে পারিত না, আমি কবে আসিব? আমার রাগ-অভিমান হইতে পারে আর তাহারি কি হইতে পারে না? তবু কেমন রাগ হইল—শ্বশুর বাড়ী যাওয়া স্থগিত রাখিলাম।

তার পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। বাটীর কাহারও নিকট তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না—কেহ উপযাচক হইয়াও আমাকে কিছু বলিতে আসিল না।

ইহার কিছুদিন পরেই ঘটকঠাকরুণ দশহাজার টাকার এক সম্বন্ধ লইয়া উপস্থিত! আবার আমার বিবাহ! এবার মেয়ে নিখুঁত সুন্দরী! বাড়ীর মেয়েদের বড় আহ্লাদ। এবার তাঁরা কালো-কুৎসিত বউ ফেলিয়া আলো-করা বউ ঘরে তুলিবেন! আর আমি!

শুভসংবাদ যেমন আগ্রহে মানুষ মানুষকে জানায়, বাড়ীর মেয়েরা তেমনি আগ্রহভরে আমাকে জানাইলেন যে, সেই 'কালো বৌ' আজ দু'মাস হইল, মারা গিয়াছে!

তাঁরা ভাবিয়াছিলেন এ সংবাদে আমি সুখী বই অসুখী হইব না—নিজেও আমি তাহা মনে করিতাম—কিন্তু কই সুখী হইতে পারিলাম না তো! আমার মর্ম্মে মর্ম্মে একটা আঘাত বেদনা জাগিল; তাহার প্রতি আমার নিষ্ঠুর ব্যবহার স্মরণ করিয়া আমি এক মুহূর্ত্তে জাগরিত, সন্তপ্ত, অনুতপ্ত হইয়া উঠিলাম। তাহার প্রতি নিমেষের জন্য আমার যে করুণা জাগিয়া উঠিয়াছিল এই মৃত্যুসংবাদে তাহা জলন্ত প্রেম রূপে হৃদয় দগ্ধ করিয়া তুলিল। জীবনে আমার জন্য যে সতত লালায়িত হইয়া থাকিত মৃত্যুতে তাহারই জন্য আমার হৃদয় চির লালায়িত হইয়া উঠিল। একদিন যে আমার নয়নে অসুন্দর, ধ্যানে অপ্রিয়, জীবনে অভিশম্পাতস্বরূপ ছিল, মৃত্যু আজ তাহাকে আমার অন্তর-নয়নে চিরসুন্দর, ধ্যানে চিরপ্রিয়, পরজন্মের আকাঙ্খিত বস্তু করিয়া তুলিল! কেন এমন হইল? জানিনা!

একমাস পরে অনেক ডাকঘরের ছাপ পড়া একটী পার্সেল আমার নিকট পৌঁছিল। দেখিলাম, পার্সেলটি কলিকাতা হইতেই পাঠান হইয়াছিল! তারপর স্বদেশে ফিরিবার সময় আমি যে যে দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম পার্সেলটিও সেই সেই দেশ ঘুরিয়া শেষে এখানে আসিয়াছে। কিন্তু উহার ভিতর

জিনিষটা কি? কে উহা এখান হইতে পাঠাইয়াছিল? বুঝিতে পারিলাম না। পার্সেলটা খুলিয়া ফেলিলাম।

দেখিলাম, একখানি ফোটো—তাহার তলে লেখা, "তুমি আসিয়া আবার বিবাহ করো, আর এখানা পুড়াইয়া ফেলো।"

এই আদেশের দুইটিই আমি পালন করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। একটি ইহারি মধ্যে পালন করিয়াছি—আবার আমি বিবাহ করিয়াছি! কাহাকে? সেই ফোটোখানিকে!

ফোটোখানি পুড়াইয়া ফেলিবারও আদেশ আছে। সে আদেশও পালন করিব, যেদিন পুড়িয়া ছাই হইব, সেইদিন!

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

চয়ন।

যবদ্বীপে। (গ্যারোয়েট্ ও পপন্দয়ন্)

মঙ্গলবার, ৪ঠা ডিসেম্বর।

যেখান হইতে পপন্দয়ন্ নামক আগ্নেয়-গিরিতে আরোহণ করিতে হয়, সেই গ্যারোয়েট, বুইতেন্‌জর্গ হইতে রেলে সাত ঘণ্টার পথ। প্রাতঃকাল প্রায় ৮ ঘটিকার সময় আমরা বুইতেন্‌জর্গ ছাড়িলাম। বুইতেন্‌জর্গ ছাড়িয়া, অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করিলাম। প্রথমেই ত শ্যাম-তরঙ্গময়ী একটি বৃহৎ নদী। এই নদীতে দেশীয় লোকেরা স্নান করিতেছে; আবার কতকগুলি লোক, গাছের গুঁড়ির সরু সরু ডোঙ্গার উপর দাঁড়াইয়া যাতায়াত করিতেছে। নদীর পশ্চাদ্‌ভাগে তালগাছের যেন একটা সমুদ্র বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে। দুরান্তে কঠোর দর্শন অগ্নেয়গিরি—সালক্। একখণ্ড পাতলা ধূম-জালের মুকুটে তাহার চূড়া বিভূষিত। যেন চিত্রটি অতি যত্নে অঙ্কিত হইয়াছে। চারি-দিকের সহিত সুর মিলাইয়া এমন একটি সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—দেখিলে মনে হয় ঠিক যেন সেকেলে গ্রীশীয় শিল্পকলার সৌন্দর্য্য।

সমস্ত পথটা, যাবা-দেশীয় ভূখণ্ডের চিত্রপট ক্রমশঃ যেন উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল। ধানের ক্ষেতগুলি মাটির দেয়ালে ঘেরা। দেয়ালের উপর দেয়াল চাপানো। অনেকগুলি ক্ষেত জলপ্লাবিত; সেই কর্দ্দমের মধ্যে কৃষকেরা চাষ করিতেছে। উহারা শ্যামবর্ণ, উহাদের মাথায় কোণাল্ ধরণের খড়ের টোপা। উহাদের গায়ের জামা খাটো, উহাদের পায়জামা হাঁটু পর্য্যন্ত গুটাইয়া তোলা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাদা মহিষ উহাদের কাজে খাটিতেছে;—অতীব ধৈর্য্যসহকারে হাল টানিতেছে। প্রায়ই দেখা যায়,—বৃহৎ অরণ্যের মধ্য দিয়া ট্রেন্ চলিতেছে। এই অরণ্যের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলি প্রায়ই লতাসমাচ্ছন্ন। এই সকল বৃক্ষের বিচিত্র সৌন্দর্য্য আমি মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিলাম; উহাদের বৃহৎ কাণ্ড, বৃহৎ পত্রাবলী,—বিচিত্র আকারের ও বিচিত্র বর্ণের;—কোনটা গোলাকৃতি, কোনটা বিখণ্ডিত, কোনটা ম্যাড়্‌মেড়ে, কোনটা চক্‌চকে, কোনটা উজ্জ্বল সবুজ, কোনটা ঘোর সবুজ, কোনটা লাল্‌চে সবুজ।

৩টার সময়, গারোয়েটে আসিয়া পৌঁছিলাম। ক্ষুদ্র সহর; ওলন্দাজেরা, উপকূলের উত্তাপ পরিহার করিয়া এইখানে বিশ্রামার্থ আসিয়া থাকে। ইহা যবদ্বীপের অধিকাংশ নগরেরই মত,—একটা আগ্নেয়গিরি প্রদেশের কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়াই যাহা কিছু ইহার বিশেষত্ব। সহরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রধান রাজপুরুষদিগের বাসগৃহ কার্য্যালয় ও মস্‌জিদ্। তাহার পর য়ুরোপীয় অঞ্চল,—এখানকার বাড়ীগুলি উদ্যানে বেষ্টিত। সর্ব্বশেষে দেশীয় অঞ্চল; এক-তলা কাঠের বাড়ী, খোটার উপর স্থাপিত;—ইটের কিংবা খড়ের ছাদ। গৃহের পার্শ্বে ও গৃহ হইতে উচ্চ, খোটার উপর স্থাপিত ধানের গোলা ঘর।

আমি এই দেশীয় অঞ্চলে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভ্রমণ করিলাম; যাবাবাসী কৃষকদিগের শান্তিময় জীবনের উদ্বেগহীন কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিলাম। আমি এখন ভিন্ন জাতির মধ্যে, ভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে বাস করিতেছি। ইহাদের জীবন আমাদের জীবন হইতে কত তফাৎ—ইহাদের আচার ব্যবহার আমাদের হইতে কত ভিন্ন,—আমাদের অপেক্ষা কতটা চাঞ্চল্যবর্জ্জিত, কতটা স্বাভাবিক, কতটা জ্ঞানীজনোচিত।

যখন হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত্রি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ঐ দেখ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নৈশ অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে; চারিদিক হইতে, চলমান্ ভাস্বর বিন্দুসমূহ জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে; একবার নিকটে আসিতেছে, আবার দূরে পলাইয়া যাইতেছে; ইহারা সেই প্রাচ্যখণ্ডের জোনাকী—জ্যোতিরিঙ্গণ। অপূর্ব্ব মায়াদৃশ্য। মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখিতেছি। এই তারাগুলি—যাহা এইমাত্র আকাশে উদয় হইয়াছে—মনে হয়, কে যেন অসংখ্য জোনাকি গগনমণ্ডলের গায়ে বিঁধাইয়া রাখিয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এক পৃষ্ঠায় পঞ্চাঙ্ক নাটক।

প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ইতালীয় কবি গাওভেনী ভেণ্টুরা (Giovanni Ventura) **এক পৃষ্ঠার** মধ্যে একখানি করুণরসাত্মক **পঞ্চাঙ্ক** নাটক লিখিয়াছিলেন। নাটকখানির নাম 'রসমুণ্ডা' (Rosmunda)। টুরীণ ও মিলানপ্রদেশে বহুবার এই নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনয়ক্ষেত্রে রসমুণ্ডা জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়া তৎকালীন নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল। আমরা এই অতি ক্ষুদ্র, অথচ পঞ্চাঙ্ক, নাটকখানির সম্পূর্ণ অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

(করুণরসাত্মক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

গাওভেনী ভেণ্টুরা প্রণীত।

নাট্যোক্ত চরিত্র।

এল্‌বিয়ন্ ... ... রাজা।

রসমুণ্ডা ... ... রাণী।

(রাজা কুনীমণ্ডের কন্যা)।

পেরিডেন্স্ ... ... নফর।

রসমুণ্ডা।

প্রথম অঙ্ক।

মদ্যপূর্ণ নরকপাল রসমুণ্ডার মুখের সম্মুখে ধরিয়া এল্‌বিয়ন্ বলিলেন—নাও, তোমার পিতার মাথার খুলিতে ভ'রে এই মদ এনেছি—পান কর।

রসমুণ্ডা (পানপাত্র দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া)—ওঃ!

এল্‌বিয়ন্। আমার আদেশ—পান কর।

রসমুণ্ডা। (মদ্যপান করিতে করিতে) তুমি অধঃপাতে যাও!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

এল্‌বিয়ন্। (প্রেমবিহ্বলভাবে)—প্রিয়তমে, এত বিষণ্ণ কেন?

রসমুণ্ডা। কিরূপে প্রসন্ন থাকৃব বল?

এল্‌বিয়ন্। অতীতের কথা ভুলে যাও, প্রিয়ে!

রাজা রসমুণ্ডার দিকে অগ্রসর হইলেন।

রসমুণ্ডা। (সরিয়া যাইয়া) যাও আমাকে স্পর্শ করোনা।

এল্‌বিয়ন্। রসমুণ্ডা, আমাকে তুমি ঘৃণা করছ?

রসমুণ্ডা। ঘৃণা? না!

তৃতীয় অঙ্ক।

রসমুণ্ডা ছুরিকার ধার পরীক্ষা করিতেছিলেন। পরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—গোলাম!

পেরিডেন্স্ প্রবেশ করিল এবং জানু পাতিয়া বসিয়া বলিল—মহারাণী!

রসমুণ্ডা একটু থামিয়া, পরে পেরিডেন্সের প্রতি প্রেমচকিতনয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—গোলাম, আমি তোমাকে ভালবাসি।

পেরিডেন্স্ চমকিয়া কহিল—অ্যাঁ, সেকি!

রসমুণ্ডা। হাঁ, এস—কাছে এস।

রাণী নফরকে আলিঙ্গন করিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক।

পার্শ্বস্থ কক্ষে রাজা সুপ্তিমগ্ন, তাঁহার নাসিকাধ্বনি শুনা যাইতেছিল।

রসমুণ্ডা পেরিডেন্সের হস্তে ছুরিকা প্রদান করিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন—যাও, এই মুহূর্ত্তে খুন কর।

পেরিডেন্স্। (ইতস্ততঃ করিয়া) রাজাকে খুন করব?

রসমুণ্ডা। হাঁ, রাজা!—যে রাজা তোমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী!

পেরিডেন্স্। তবে—

পেরিডেন্স্ দ্রুতপদে রাজার শয়নগৃহের দিকে গমন করিল।

পঞ্চম অঙ্ক।

নেপথ্যে রুদ্ধকণ্ঠে রাজা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—রক্ষা কর! রক্ষা কর!

রসমুণ্ডা (শব্দলক্ষ্যে)—তোমার নিপাত হোক্!

(রক্তাক্ত ছুরিকাহস্তে প্রবেশ করিয়া)

পেরিডেন্স্। কাজ শেষ!

রসমুণ্ডা পেরিডেন্সের হস্ত হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লইলেন এবং তাহার অগ্রভাগ ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিলেন—পিতা! পিতা! এই রক্ত! এই রক্ত পান ক'রে আজ তোমার আত্মা তৃপ্ত হোক্!

যবনিকা।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত।

মুর্শিদাবাদের প্রাচীন কাহিনী।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে আলিবর্দ্দী খাঁর নামই সর্ব্বপ্রধান। পঞ্চদশ বর্ষ রাজত্বকালের নানা ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে তিনি এরূপ মহৎ গুণাবলীর পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহা হইতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও বীর ছিলেন এবং তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞও তৎকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল। তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও অসাধারণ সদ্গুণের ফলে তিনি মুর্শিদাবাদকে তৎকালীন রাজধানী সকলের মধ্যে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে পূর্ব্ব ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকলা ও সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্রস্থল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

প্রাচীন ঢাকা নগরীর গৌরবঘটা তখন উজ্জল নীরবতার মধ্যে নিমজ্জিত; যে দিল্লিনগরী এতকাল অতীত ভারতের বিশাল সাম্রাজ্যের বিচিত্র স্মৃতির সহিত জড়িত ছিল এবং যাহা বহুশতাব্দী ধরিয়া প্রাচ্য-দেশের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর বস্তুর কেন্দ্রস্থল ছিল, সে দিল্লিও তখন অধঃপতনোন্মুখ; দক্ষিণভারতের বিশাল মুসলমান সাম্রাজ্য ভারতে আধিপত্য বিস্তার-লোলুপ দুই ইয়ুরোপীয় জাতির কৌশলজালে জড়িত হইয়া কিছুদিন হইতে পীড়িত। দেশের এই দুর্দ্দশার দিনে একমাত্র মুর্শিদাবাদই ইহার পারদর্শী নবাবের নেতৃত্বে মুসলমান বীর্য্য ও গৌরব প্রকাশে সক্ষম হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ তদানীন্তন ভারতের মধ্যে এতাদৃশ মূল্যবান নগরী বলিয়া বিবেচিত হইত যে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম যখন সরফ্রাজের মৃত্যু ও আলিবর্দ্দীর বিদ্রোহ ও সিংহাসন লাভের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি মুর্শিদাবাদের অধঃপতন আশঙ্কায় অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু আলিবর্দ্দী মুর্শিদাবাদের গৌরব হীন করা দূরে থাক, বর্দ্ধন করিয়া তুলিয়াছিলেন। একজন প্রখ্যাতনামা ইংরাজ ঐতিহাসিক আলিবর্দ্দীর মহত্ত্ব বর্ণনাকালে বলিয়াছেন যে, তাঁহার সমসাময়িক প্রাচ্য নৃপতিগণের মধ্যে একমাত্র তাঁহাকেই কেহ কখনও হত্যা করিবার বাসনা করে নাই। তাঁহার সদ্গুণাবলী এবং তাঁহার চমক দ রণযাত্রা ও বিজয়গৌরব এবং বার বার শত্রু জয়ে ও দুষ্ট দমনে কৃতকার্য্যতা তাঁহাকে তাঁহার প্রজার প্রিয়পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। আলিবর্দ্দী যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়স ষাট বৎসরের অধিক। তাহার পরেও দশ বৎসর তিনি প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেই মুর্শিদাবাদ উন্নতির শীর্ষস্থান আরোহণ করে, তাঁহার দরবার দেশের শ্রেষ্ঠ কলাবিৎ ও গায়কে পরিপূর্ণ থাকিত; তাঁহার প্রাসাদ দরিদ্র ও পীড়িতের আশ্রয় স্থল ছিল। তিনি মুর্শিদাবাদকে শিক্ষা ও সাধনায় এরূপ উন্নত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর তিন বৎসর পরেও ক্লাইভ ইহাকে লণ্ডন নগরের সহিত সমতুল্য বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

'যুদ্ধক্ষেত্রের যম' নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের মসনদে আরোহণ করেন। ঘেরিয়ার ভীষণ যুদ্ধে সরফাজকে পরাজিত করিয়া তিনি একদিন নগরের বাহিরে অবস্থান করিলেন, পাছে তাঁহার লুণ্ঠনপ্রিয় সৈনিকগণ নগর লুণ্ঠন করিয়া তাহার সুন্দর স্থপতিকীর্ত্তিগুলি নষ্ট করে। নগরের তোরণ-দ্বারে প্রবেশ করিয়াই তিনি সর্ব্বপ্রথম রাজপ্রাসাদে যাইয়া মুর্শিদের কন্যা ও হতভাগ্য নবাব সরফ্রাজের জননী যেয়নেৎ-অল-নিসার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন প্রাসাদদ্বারে হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া নতশিরে নবাব-জননীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—

"অদৃষ্টে যাহা লিখিত ছিল তাহা ঘটিয়াছে। আপনার অযোগ্য ভৃত্যের অকৃতজ্ঞতা ইতিহাসের অমর পত্রে মুদ্রিত হইল। কিন্তু আজ সে শপথ করিয়া বলিতেছে যে ভবিষ্যতে কোনও দিন সে আর সম্মান বা বশ্যতার পথ হইতে বিচলিত হইবে না। সে আশা করে কালে আপনার ক্ষমাপূর্ণ অন্তর হইতে তাহার দুষ্কর্ম্মের কালিমা মুছিয়া যাইবে এবং আজ আপনি তাহার সম্পূর্ণ বশ্যতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার নিদর্শন স্বরূপ এই উক্তিগুলি সস্নেহে গ্রহণ করিবেন।"

পুত্রশোকাতুরা জননীর নিকট কোনও উত্তর না পাইয়া এবং আলির সরল উক্তিকে তিনি তখনও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন বুঝিয়া, নবাব সমারোহের সহিত "চেহেল সাটুন" (চল্লিশ স্তম্ভ) নামক দরবার প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তথায় বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নৃপতির অভিষেক উৎসব সম্পূর্ণ হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই আলি তাঁহার সিংহাসন রাজানুমোদিত করিবার জন্য দিল্লীর সম্রাটের নিকট এক ক্রোড় মুদ্রা ও সাত লক্ষ মুদ্রা মূল্যের রেশম মখমল মণি-মুক্তাদি উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। এই বহুমূল্য উপঢৌকন লাভ করিয়াই সম্রাট সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে সপ্তদশ সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়ক নিযুক্ত করিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহাকে, তাঁহার জামাতাকে ও তাঁহার দৌহিত্রগণকে উপাধি বিতরণ করিলেন। কিন্তু সম্রাট এই উপঢৌকনে অধিক দিন সন্তুষ্ট না থাকিয়া, দুই বৎসরের রাজস্ব ও মৃত নবাবের সম্পত্তি আদায় করিবার জন্য মুরীদ খাঁ নামে এক কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন। আলিবর্দ্দী সরফরাজের সম্পত্তি তাহার স্ত্রীপুত্রকে দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই সম্পত্তি লইয়া ঢাকায় যাইয়া বাস করিতেছিলেন। মৃত নবাবের এক ভগিনী কেবল মুর্শিদাবাদে থাকিয়া আলিবর্দ্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জ্যেষ্ঠ জামাতা সাহামৎ জঙ্গের অন্তঃপুরে প্রাসাদরক্ষিকার কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্রাটের নিকট হইতে দূত আসিতেছে শুনিয়া আলিবর্দ্দী রাজধানী ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে অগ্রসর হইলেন এবং রাজমহলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সম্রাটকে বিপুল উপঢৌকন প্রদান করিয়া এবং মুরীদ ও তাহার অনুচরবর্গকে গোপনে অর্থদান করিয়া তিনি তাহাদিগকে দিল্লীতে ফিরিয়া পাঠাইলেন।

এই প্রকারে মুর্শিদাবাদের মসনদে নিরাপদে বসিয়া নবাব তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মনোযোগ প্রদান করিলেন। মৃত নবাবের শ্যালক মুর্শিদকুলি উড়িষ্যারাজ্যে প্রায় স্বাধীন রাজার মতই রাজত্ব করিতেছিলেন। মুর্শিদের হস্ত হইতে উড়িষ্যা উদ্ধার করাই নবাবের প্রথম লক্ষ্য হইল। তিনি মুর্শিদের প্রতি হুকুম জারি করিলেন যে, "অবিলম্বে সিংহাসন ত্যাগ কর, নচেৎ বিশেষ শাস্তি লাভ করিবে।" উড়িষ্যার সুবা রাজা যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি প্রথমে মনে করিলেন নবাবের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়া সপরিবারে রাজ্যত্যাগ করাই শ্রেয়। তাঁহার পত্নী কিন্তু বীরহৃদয়া ও উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন এবং তিনি স্বামীকে ওরূপ নির্ব্বোধের মত রাজ্যত্যাগ করার সংকল্প হইতে বিরত করিলেন। পত্নীর অবাস্ত উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া রণক্ষেত্রে তিনি নবাবকে রণক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া স্বদেশ রক্ষার আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন। আলিবর্দ্দীও উড়িষ্যা আক্রমণের একটা সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এই আহ্বান পত্র তাঁহাকে অপরাধমুক্ত করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্বাদশসহস্র সৈন্য লইয়া, রাজধানীর কর্ম্মভার তাঁহার ভ্রাতা হাজি আহমেদের হস্তে অর্পণ করিয়া উড়িষ্যা যাত্রা করিলেন। নবাবের আগমন সংবাদ শুনিবামাত্র মুর্শিদ কুলি কটক ত্যাগ করিয়া বালেশ্বরে অগ্রসর হইলেন। আলিবর্দ্দীর সৈন্য যখন উড়িষ্যায় উপস্থিত হইল তখন তাহারা দীর্ঘকাল যুদ্ধের পক্ষে নিতান্তই অনুপযুক্ত। দীর্ঘ পথের শ্রান্তি এবং আহার্য্যের অভাবে নবাবের সৈন্য যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাতে বিজয়লক্ষ্মী মুর্শিদের পক্ষানুবর্ত্তিনী হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। মুর্শিদ প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে তাহাই হইত, কিন্তু অদৃষ্টের বিধান বিপরীত! জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া এবং আপনাদের অধিকৃত স্থানের শ্রেষ্ঠতার প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভর স্থাপন করিয়া উড়িষ্যার এক সেনাপতি আলিবর্দ্দীর সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। নবাবের সৈন্য কেবল এই সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ জলস্রোতের ন্যায় তাহারা শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিয়া উড়িষ্যাবাহিনীকে পরাজিত করিল। আলি বিজয়গর্ব্বে কটকনগরে প্রবেশ করিলেন এবং আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সাউলাৎ জঙ্গকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। পরাজয়ের পরমুহূর্ত্তেই

মুর্শিদ জাহাজে চড়িয়া মাসুলিপট্টমে পলায়ন করিলেন।

কিছুকাল উড়িষ্যা শান্ত হইয়া রহিল কিন্তু অচিরেই আবার অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। বিলাসপ্রিয় ভীরুস্বভাব নূতন শাসনকর্ত্তা প্রজাগণকে রাজার প্রতি বীতানুরাগ করিয়া তুলিলেন, এবং বিপদের একমাত্র সহায়স্বরূপ সৈন্যবলকে উপেক্ষা করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনি সাধন করিলেন। প্রজাগণ গোপনে মুর্শিদ কুলিকে শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠাইল। মুর্শিদ নিশ্চিন্তচিত্তে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তিনি পুনরায় রণক্ষেত্রে ভাগ্যনির্ণয়ের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বকির খাঁ নামে তাঁহার এক ধূর্ত্ত সেনাপতি অনায়াসে উড়িষ্যাবাসীর প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন, এবং দেশে সাধারণ বিদ্রোহ উপস্থিত করাইয়া সাউলাৎকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। উড়িষ্যার এই গোলযোগের সংবাদ পাইবামাত্র আলিবর্দ্দী বিশ সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন, এবং সৈনিকগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য ঘোষণা করিলেন, যে কেহ সাউলাৎকে কারাগারমুক্ত করিতে পারিবে তাহাকেই প্রচুর পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। এবার আলি মুর্শিদাবাদের শাসনভার তাঁহার জামাতা শাহমতের উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় উপনীত হইয়া বকিরকে পরাজিত করিয়া নবাব তাহাকে দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন। সাউলাৎ নিরাপদে মুক্তি লাভ করিলেন। পরামর্শ হইয়াছিল যে যদি বকিরের পরাজয় হয়, তাহা হইলে সাউলাতের শিবিকার প্রহরিগণ তৎক্ষণাৎ শিবিকা মধ্যে তাহাদিগের বধবিদ্ধ করিয়া বকিরের প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাণ বধ করিবে। সাউলাৎকে কৌশলে শিবিকা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া তাহার বৃদ্ধ পিতা হাজি আহমদ্ শিবিকার মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। ভ্রমক্রমে প্রহরিগণ তাঁহাকেই বধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। বিজয়লাভে নিশ্চিন্ত হইয়া আলিবর্দ্দী এই স্থানে তাঁহার সৈনিকগণকে বিদায় দান করিলেন। এই ভ্রমের ফলে অনতিবিলম্বে মহারাষ্ট্রদিগের বঙ্গ আক্রমণকালে তাঁহাকে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। মহম্মদ মসুম নামে তাঁহার এক বীর ও বিচক্ষণ কর্ম্মচারীকে উড়িষ্যার নায়েবের পদে নিযুক্ত করিয়া ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে, মেদিনীপুর নগরে আলিবর্দ্দী শুনিলেন যে, বেরার মহারাষ্ট্রের অধিপতি ভোঁসলা তাঁহার প্রধান সেনা-নায়ক পণ্ডিত ভাস্কর রাওর নেতৃত্বে নবাবের নিকট হইতে বঙ্গের 'চৌথ' অর্থাৎ রাজস্বের এক চতুর্থাংশ আদায় করিবার জন্য চল্লিশ সহস্র সেনা প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে মহারাষ্ট্র সৈন্য বেহারের মধ্য দিয়া বঙ্গে প্রবেশ করিবে। তিনি দ্রুতপদে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করিলেন। মুর্শিদাবাদে যাইয়া মহারাষ্ট্রগণকে রাজ্যপ্রবেশে বাধা দিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু যাত্রা করিতে না করিতেই তিনি শুনিলেন মহারাষ্ট্রগণ রাজ্য মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা দক্ষিণপথ দিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং তাঁহার নিকট হইতে বিশ ক্রোশ দূরেও নাই। ছল ও কৌশলই এক্ষণে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। নবাব তৎক্ষণাৎ বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইলেন ও তথায় তাঁহার যুদ্ধদ্রব্যাদি রাখিয়া দ্বিগুণবেগে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। দ্রব্যাদি রক্ষকগণ নির্দ্দয় লুণ্ঠনকারী মহারাষ্ট্রের যথেষ্ট পীড়নের পাত্র হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে অসম্মত হইল। অল্পশস্ত্র দ্রুতাশ্বারোহী লুণ্ঠনকারিগণ নবাবের সৈন্য অপেক্ষা স্বভাবতই অধিক দ্রুতগামী। বর্দ্ধমানের কয়েক ক্রোশ দূরেই তাহারা নবাবের দ্রব্যাদি আক্রমণ করিল, পশ্চাৎপদ যাবতীয় সৈনিককে হত্যা করিল এবং পথিমধ্যস্থ গ্রাম সকল ধ্বংস করিল। বঙ্গে প্রবেশ করিয়া ভাস্করের 'চৌথ' স্বরূপ দশ লক্ষ মুদ্রা দাবী করিয়া বসিল এবং এক্ষণে আলিবর্দ্দীও উক্ত অর্থ দানে সম্মত হইলেন। কিন্তু পরে জয়োন্মত্ত সে উত্তেজিত মহারাষ্ট্র সেনা আলিবর্দ্দীর প্রস্তাবকে ঘৃণার

সহিত অবজ্ঞা করিয়া এক কোটি মুদ্রা দাবী করিয়া বসিল। আলিবর্দ্দীও বীর ছিলেন। মহারাষ্ট্রের এ অপমানকর প্রস্তাবে তিনি অসম্মত হইলেন। কাজেই যুদ্ধ চলিতে লাগিল। নবাবের সৈন্য ক্রমেই পলায়ন করিতে লাগিল, মহারাষ্ট্রগণও তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিল। অবশেষে অনাহারক্লিষ্ট শ্রান্ত নবাবসৈন্য কাটোয়ায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। মহারাষ্ট্রগণ ইতিপূর্ব্বেই কাটোয়া লুণ্ঠন করিয়া নবাবের শস্যাগারগুলিতে অগ্নিদান করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল। ক্ষুধিত সৈনিকগণ সেই দগ্ধ শস্যই আগ্রহভরে গ্রহণ করিতে লাগিল এবং যতদিন না মুর্শিদাবাদ হইতে শাহমৎ নূতন সৈন্য লইয়া তথায় উপস্থিত হন ততদিন নবাবসৈন্য কাটোয়াতেই অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময়ে সৌভাগ্যবশতঃ বর্ষা নামিল এবং ভাস্কর রাও শীতের প্রারম্ভে পুনরাগমন করিবার অভিপ্রায়ে বেরারে যাইবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু উড়িষ্যায় সারফাজকে সাহায্য করিবার জন্য যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদিগের অধিনায়ক মীর হবিব্ এক্ষণে মহারাষ্ট্রের অধীনে কর্ম্ম করিতেছিলেন। ভাস্কর রাওকে তিনি নবাবের কাটোয়ায় অবস্থানের অবসরে মুর্শিদবাদ আক্রমণ করিবার পরামর্শ প্রদান করিলেন। মহারাষ্ট্র সেনা গোপনে নৈশ অন্ধকারের অন্তরালে যাত্রা করিল। কিন্তু তাহাদের এই গুপ্তযাত্রার সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইবামাত্র, তিনি অবিলম্বে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মহারাষ্ট্রগণ নবাবের একদিন পূর্ব্বে আসিয়া রাজধানী অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এইদিন মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় দিন। লুণ্ঠনকারী শত্রুগণ যথাসাধ্য লুণ্ঠন করিয়াও জগৎ শেঠের ধনাগার ভস্ম করিয়া, নবাবসৈন্যের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ মাত্র নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল এবং হবিবের পরামর্শমতে কাটোয়া নগরে শিবির স্থাপন করিল। নবাব অবিলম্বে রাজধানী পুনর্গঠনে মনোযোগী হইলেন। ১৭৪২ সালের বর্ষায় কিন্তু ভাস্কর নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। হবিবের সাহায্যে তিনি মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, রাজশাহী ও বীরভূম অধিকার করিলেন।

ক্রুদ্ধ আলিবর্দ্দী ভীষণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সংকল্প করিয়া তাঁহার পত্নীকন্যাকে পারিবারিক ধনরত্নাদির সহিত শাহমতের রক্ষণাবেক্ষণে গোদাগরিতে প্রেরণ করিলেন। রাজধানীর এতাদৃশ নিকটে মহারাষ্ট্রদিগকে দেখিয়া রাজধানীর অনেক অধিবাসী কলিকাতায় ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আশ্রয়ে যাইয়া উপস্থিত হইল। নবাবের অনুমতি ক্রমে কলিকাতার ইংরাজগণ মহারাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে কলিকাতা রক্ষা করিবার জন্য নগরীর চতুর্দ্দিকে দুইশত হস্ত দীর্ঘ এক জলপ্রণালী খনন করিলেন। সেই অবধি এই প্রণালীটি 'মহারাষ্ট্র খানা' নামেই খ্যাত।

সমস্ত বর্ষা ধরিয়া আলিবর্দ্দী গোপনে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এক প্রবলবাহিনী সংগ্রহ করিয়া শীতের প্রারম্ভেই ভাগীরথী বক্ষে এক নৌসেতু নির্ম্মাণ করিলেন, এবং রাত্রের অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মহারাষ্ট্রসেনাকে সহসা আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্র সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, এবং আলিবর্দ্দী কাটোয়ার বহিঃপ্রদেশে তাহাদিগের প্রভূত যুদ্ধদ্রব্যাদি অধিকার করিলেন মহারাষ্ট্রগণ বিষ্ণুপুরে পলায়ন করিল। তথায় গভীর অরণ্যের আশ্রয়ে নবাবের অনুসরণকে ব্যর্থ করিয়া মেদিনীপুরে উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্ত্তা মসুম মহারাষ্ট্র কবল হইতে স্বকীয় প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য এক ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর হইতে মহারাষ্ট্রসেনার এক অংশ তদভিমুখে অগ্রসর হইল। যুদ্ধে মসুম পরাজিত হইলেন। আলিবর্দ্দী তখন বর্দ্ধমানাভিমুখে অগ্রসর হইয়া মেদিনীপুরে মহারাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে নবাব জয়ী হইলেন এবং মহারাষ্ট্রগণ অবিলম্বে বেরারে পলায়ন করিল। অতঃপর আলিবর্দ্দী কটকে উপস্থিত হইয়া রসুল খাঁকে তাঁহার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া স্বকীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। মহারাষ্ট্রের প্রথম বঙ্গাক্রমণ এইভাবে অবসিত হইল।

সুইস্-গার্ড।

"লিমোইন-কুমারি! এই মুহূর্ত্তেই আপনার প্যারিস্ ত্যাগ করা উচিত"।

সোফি চিত্রক্রেমের উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" সোফি তার সুন্দর নীলনেত্রদ্বয় উপদেষ্টার মুখে স্থাপন করিয়া তুলি নামাইয়া রাখিল। পীতাভ সুপ্রচুর কেশের রাশি তার শুভ্র মুখের চারিদিকে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সোফি অপূর্ব্ব সুন্দরী।

যাহার সহিত সে কথা কহিতেছিল, তার গঠন সুদৃঢ় ও বয়স সাতাশ বৎসর হইলেও তাহাকে সুপুরুষ বলা যায় না। সচ্চরিত্র উচ্চহৃদয় সংস্কারক। ক্যাজটি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কেন? কারণ, প্যারিস খুব শীঘ্রই আপনার বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয়ে দাঁড়াবে।"

"ওঃ, আপনি বিপ্লবের কথা বলচেন?" সোফি তার সূক্ষ্ম ভ্রূদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিল, কহিল, "কতকগুলো চোরডাকাত ও ছোটলোক জড় করে আপনারা এ সব কি করচেন? ইউরোপ দুদিনেই এ বিদ্রোহকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে।"

"ক্ষমা করবেন—এই বিপ্লবই ইউরোপের-যথেচ্ছাচারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে। আমরা এখন এক নূতন যুগের সম্মুখে দণ্ডায়মান! সুপ্রভাত আগত।"

"যার যেমন ইচ্ছা, সে তেমনি বিশ্বাস করবার অধিকারী। কিন্তু ক্যাজটি মহাশয়, আপনার রাজনৈতিক বক্তৃতা আমাকে ক্লান্ত ক'রে তুলছে।"

"আমি রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলি নাই; সাধারণ ধারণার কথা বলছি মাত্র। ভেবে দেখুন, আপনার পৃষ্ঠপোষক কারা? অভিজাত সম্প্রদায় ও ধনী লোকেরাই ত? তারা ক্রমেই ফ্রান্স ত্যাগ করে সুইজারল্যাণ্ড অষ্ট্রিয়া এমন কি অসভ্য ইংলণ্ডে পলায়ন করছে, তাদের সাহায্য ব্যতীত আপনি এখানে চিত্রাঙ্কন করে জীবিকানির্ব্বাহ করবেন কেমন করে? তা ছাড়া আর একটা মস্ত বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেটাও ভাববেন। এই মুহূর্ত্তে না ঘটুক, আপনার সৌন্দর্য্য যে আপনার মহাশত্রু হয়ে দাঁড়াবে।"

সোফি কহিল, "সে বিপদ সকল সময়েই নাই কি, ক্যাজটি মহাশয়?" আপনি বুঝি বিদ্রোহীদের বন্ধু? তাদের মতলব আপনার সব জানা আছে, তাই অত ভয় দেখাচ্চেন, আমি তো বিপদ কোথা খুঁজেও পাচ্ছি না।"

"আমি স্বাধীনতার বন্ধু! অত্যাচারিত লোকদের পক্ষে আছি, যত কিছু নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে চিরদিন আমি একটা শত্রুতা পোষণ করে আসছি। আমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিই আমাকে পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে যে, দেশের লোকের পায়ের বেড়ি ভাঙ্গবার পূর্ব্বে সমস্ত দেশে রক্তের নদী বয়ে যাবে, অত্যাচারের আগুন নির্ব্বাণের জন্য কলস ভ'রে রক্তের ধারা ঢেলে দিতে হবে। নবজাগ্রত শক্তি কোন বাধা মানবে না, দোষীরা দণ্ড পাবে, কিন্তু সেই সঙ্গে অনেক নির্দ্দোষীও কষ্ট পাবে। আমি মিনতি করে বলচি, এখনি আপনি দেশ ছেড়ে যান, আবার

সুসময়ে এই নবগঠিত উন্নত জাতির উদ্দীপ্ত গৌরবের সময় তাদের আশা উৎসাহের অংশ গ্রহণ করতে আসবেন, তারা আপনাকে আদর করে ডেকে নেবে।"

পাম্পলেটের লেখক ও বক্তা জীন ক্যাজটি এই কথা বলিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন ও গৃহের মধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন। সোফি আপনার কাজ করিয়া যাইতেছিল; এখন একটু করুণা ও বিদ্রূপের সহিত উত্তেজিত সংস্কারকের দিকে চাহিয়া বলিল. "ক্যাজটি মশায়, আসুন, আমরা আরো একটা বেশি চিত্তাকর্ষক বিষয় নিয়ে কথাবার্ত্তা কই! আমার মডেল পিরি না আসাতে আমি ভারি হতাশ হয়ে পড়েছি, সে কিন্তু আর কখনো আমায় এরকম হতাশ করেনি।"

ক্যাজটি নতমস্তকে নম্র অভিবাদনের সহিত কহিলেন, "অধিক চিত্তাকর্ষক বিষয় ত আপনার কথা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাই না, বিশেষতঃ, এ সময়ে।"

"অনুগ্রহ করে আমাকে আর ক্লান্ত করে তুলবেন না। আপনি আজ যা খুসী তাই বলছেন। আমাদের সর্ত্তটা মনে রাখবেন! আপনি যতক্ষণ অবধি না ভালবাসার কথা বলবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি আমার পরম বন্ধু! নয়, কি মশায়?" সোফি তার সুকোমল কর ক্যাজটির দিকে বাড়াইয়া দিল।

ক্যাজটি ধীরে ধীরে নিজের হাতের মধ্যে সেই শুভ্র হাতখানি তুলিয়া লইয়া তাহাতে চুম্বন করিলেন, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি নিজের অধিকার রক্ষা করতে জানি, সুন্দরি! আমি জানি, আপনি ভীত নন, কিন্তু বাতাসে ঝড়ের বেগ বাড়ছে। আজকার দিন একটা স্মরণীয় দিন হয়ে দাঁড়াবে। আমি জানি মারসেল্‌স্ থেকে একদল দুর্দ্ধর্ষ নাগরিক সৈন্য প্যারিসে এসেছে। তা ছাড়া অসংখ্য ক্ষুধিত, ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত লোক সেণ্ট আণ্টনি ও সেণ্ট মারসিও থেকে জলপথে এসে জমা হয়েছে। সে ভয়ানক দৃশ্য আপনার দেখবার যোগ্য নয়। তাই বলি, এখানে আপনি থাকবেন না। এখনও পালান, এখনও আমি আপনাকে অনুমতি পত্র এনে দিতে পারবো"!

"না, ক্যাজটি মহাশয়! আমি প্যারিস্ ছেড়ে কিছুতে যাবো না। ডাকাতগুলো জমা হোক, তারা কি করতে পাবে, সৈন্যেরা নিশ্চয়ই রাজপক্ষে আছে"।

"সে সম্বন্ধেও একেবারে নিশ্চিন্ত হবেন না। ক্যাজটি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। গ্রীষ্মের শুষ্ক বায়ু আলোড়িত করিয়া অসংখ্য বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। সে শব্দ সহসা থামিল না, অবিশ্রাম রহিয়া গেল। ক্যাজটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সোফির বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "টুইলারীর উপর আক্রমণ হচ্ছে। বেতন-ভূক্‌গুলা আমার দেশের লোকের উপর গুলি চালাতে সাহস করচে। শীঘ্রই এর ফল পাবে, একটা বদমায়েসও আজ সূর্য্যাস্তের পর বেঁচে থাকবে না।"

"ও মশায়! আমার সুইস্ সৈন্য! আমার সাহসী স্বদেশী!" শিহরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সোফি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তুলিটা হাত হইতে পড়িয়া গেল—"তারা তাদের রাজার জন্য যুদ্ধ করচে?"

ক্যাজটি ঘৃণার সহিত কহিলেন, "রাজা!

দুর্ব্বল, ভীরু! তাকে তার দলের সঙ্গে শীঘ্রই ঝাঁট দিয়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া হবে। কুমারি! আমি এখন চল্লেম, ঠিক খপর নিয়ে আবার শীঘ্রই ফিরে আসবো।" ক্যাপ্টেন ছড়ি ও টুপি লইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

তখন সোফি সহসা একখানা আসনে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। গুলিবর্ষণ চলিতেছে, মৃত্যু যন্ত্রণার তীব্র আর্ত্তনাদে বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সোফি কল্পনানেত্রে দেখিতে লাগিল, সুইস্ সৈন্যগণ তাহার দেশের অটল পর্ব্বতমালার মতই অটলভাবে আপন স্থানে দাঁড়াইয়া রাজার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে। "ঈশ্বর তাদের শক্তি দান করুন!" হঠাৎ বন্দুকের শব্দ থামিয়া গেল, সোফি ভাবিল, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই একসঙ্গে বজ্রের মত, সহস্র কামান, মহাশব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল! বন্দুকের কামানের চীৎকারে প্যারিস কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার পর আবার সে শব্দ থামিয়া জয়ের উল্লাস ধ্বনি ও প্রতিহিংসার হিংস্র চীৎকার সোফির শিরায় শিরায় চলন্ত রক্তস্রোত স্তম্ভিত করিয়া দিল। লোকের দর্পিত পদধ্বনি, পৈশাচিক চীৎকার ও মধ্যে মধ্যে পিস্তলের আওয়াজ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সোফি বুঝিতে পারিল, বিদ্রোহীর দলই জয়ী হইয়াছে। এবং একটা ভীষণ নির্ম্মম হত্যা-কাণ্ডের অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছে।

সহসা সেই ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে বিচ্ছিন্ন এক ঘোর পরিশ্রান্ত ব্যক্তির প্রাণপণ শক্তির দ্বারা প্রাচীরারোহণ শব্দ সোফিকে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিল, পরক্ষণেই জানালার মধ্য দিয়া এক দীর্ঘাকৃতি রক্ত পরিচ্ছদধারী যুবক লাফাইয়া পড়িল। সোফি তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর আগন্তুকের দিকে চাহিয়া দারুণ আতঙ্কে বলিয়া উঠিল "হেনরি!" পলাতক সৈনিক পুরুষ বিস্ময়ের সহিত কহিল, "সোফি! ক্ষমা কর! তাড়া-তাড়িতে আমি এটা তোমার বাড়ি বলে চিনতে পারিনি, এখনি ফিরে যাচ্ছি।" আগন্তুক জানালার দিকে অগ্রসর হইল। সোফি আতঙ্কে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—"না না ক্যাপ্টেন লেস্‌ট্রেঞ্জ! ওরা তোমায় মেরে ফেলবে, তুমি এখানে লুকিয়ে থাক।"

"অসম্ভব! হত্যাকারীদের আমি তোমার বাড়ি আনতে পারি না! অসম্ভব। তারা এই রাস্তায় আমায় ঢুকতে দেখেছে। সমুদয় বাড়ি অনুসন্ধান করবে। তোমার উপর আমার কোন দাবী নেই, লিমোইন-কুমারি, তুমি তো আমায় ত্যাগ করেছ!" "এ রকম কথা বলোনা, হেনরি, তুমি আমায় যত নিষ্ঠুর মনে কর ততো নিষ্ঠুর আমি নই, তোমার এই ভয়ানক বিপদ, তা ছাড়া তুমি আমার স্বদেশী। আর সময় নষ্ট করোনা। যাও, শীঘ্র এই পর্দ্দার মধ্যে যাও, ওখানে অনেক পোষাক আছে।" লেস্‌ট্রেঞ্জ মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্তত করিল; একবার সোফির উৎকণ্ঠিত নীল চোখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরমুহূর্ত্তে তার আজ্ঞা পালন করিল।

যখন জীন ক্যাপ্টেন বিজয় গৌরবে প্রফুল্লচিত্তে ফিরিয়া আসিল তখন, সোফি নিবিষ্ট চিত্তে চিত্রাঙ্কন করিতেছে, মঞ্চের উপর একজন মডেল সেকালের বড় লোকদের

মস্ত পোষাক-পরা, হাতে ক্ষুদ্র তরবারি ও নস্তদানী লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ক্যাজটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মডেলের প্রতি চাহিল। “এতক্ষণে তাহলে পিরি এসেছে!

“না, না, পিরি তো নয়। সে সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত বলে আসতে পারেনি একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। জ্যাক্‌স্ তোমার মাথা বাঁ দিকে একটু ফেরাতে হবে। আপনার দলই জিতেছে, না, ক্যাজটি মশায়? ব্যাপারটা দেখচি বড় সহজ নয়! যে রকম গোলমাল শোনা যাচ্চে, তাতে মনে হয় ত, তারা নীতিজ্ঞানশূন্য হয়ে দেশ উজাড় করচে।”

ক্যাজটি আসন গ্রহণ করিলেন এবং উত্তর দিবার পূর্ব্বে আবার একবার মডেলের পানে চাহিয়া দেখিলেন, কহিলেন,“হাঁ জাতীয় দলই জয়ী হয়েছে, সম্পূর্ণ জয়ী। ভাড়া করা কসাইগুলোর মধ্যে একটাও বেঁচে আছে কি না, সন্দেহ। সিটিজেন লুইস্ কেপেট সপরিবারে টুইলারী ছেড়ে গেছে। সুইস্‌রা রক্ষী ছিল। পেট্রিয়টদল প্যালেসে পৌঁছিলে বন্দুকের গুলি দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করেছিল, অনেক পেট্রিয়ট মারা গিয়াছে, এমন সময় সিটিজেন ক্যাপেট গুলি চালান বন্ধ করবার হুকুম পাঠায়।” “উত্তম, বাকি অংশটা কেবল হত্যাকাণ্ড?”

“মারসিনারিরা খুব শিক্ষা পেয়ে গেছে। যাহোক অন্যদল থেকে আমাদের কোন কষ্ট পেতে হয়নি। তোমার মডেলকে যে বড় ক্লান্ত দেখাচ্চে, একে কেউ দেখলে মনে করবে, বুঝি এইমাত্র ভয়ানক ছুটে পালিয়ে এসেছে”। “আমি যে অপেক্ষায় ছিলেম, ক্যাজটি মশায়, সে জন্য জ্যাক্‌স্‌কে আমি ধন্যবাদ দিচ্চি।”

“নিশ্চয়! আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, মডেলটি ফরাসী কিনা?” “তা আমি কেমন করে বলবো? মডেলের সঙ্গে কেউ এ সব বিষয়ে কথা কইতে বসে না,আমার এই পর্য্যন্ত দরকার যে তার চেহারাটি ভাল।” “তা সত্য! আমার ভয় হচ্ছে, আপনি আপনার অবস্থা বুঝছেন না। এ বাড়ি খুব ভাল রকম অনুসন্ধান করবারই সম্ভাবনা, তা কি ভুলে যাচ্চেন? পেট্রিয়টরা খুব কাছে এসেছেন।”

“অসম্ভব! কিছুতে এরকম অত্যাচার হতে পারবে না, আমি এ অশিষ্টতা সহ্য করতে পারব না। ক্যাজটি মশায়, আপনার তো ঐ সব দস্যুবীরদের উপর কিছু ক্ষমতা আছে, আপনি অবশ্য তাদের বাধা দেবেন?” “আমি!” ক্যাজটি বিস্মিতনেত্রে সোফির পানে চাহিলেন, “স্বয়ং জেনারেল লাফেট বা মিরাবো পর্য্যন্ত এ অনুসন্ধান বন্ধ করতে পারেন কিনা সন্দেহ। আমার উপর আপনি কোন ভরসা রাখবেন না।” “ওঃ, বুঝেছি, আমাকে বাধিত কর্ব্বার জন্য আপনি নিজেকে বিপদগ্রস্ত কবতে ইচ্ছুক নন, জ্যাক্‌স্, একটু স্থির হও, নড়োনা—”ক্যাজটি ঘরের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারি করিয়া আসিয়া সোফির চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সোফি এক মনে ছবির দিকেই চাহিয়াছিল। ক্যাজটির মুখে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কেশের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া তিনি বলিলেন, “আজ আমি আপনার ছবির সুখ্যাতি করতে পারলেম না, কুমারি! আপনার অসাধারণ অঙ্কন

ক্ষমতা আজ আপনি হারিয়ে ফেলেছেন। সত্য কথা বলতে কি, চিত্রখানা জঘন্য হচ্ছে। ক্ষমা করবেন, এতটা স্পষ্ট বলা আমার উচিত নয়!”

“আপনার মত বন্ধুর উপদেশে আমি উপকৃত, আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্চি, আপনি পুরানো বন্ধুর মতই কথা বলেছেন। সত্যই এ গোলমালে আমার ছবি ভাল হয় নাই। এই দেখুন আমার হাত কাঁপচে।”

“বাস্তবিক তাই। আপনার মডেলকে কি এখন বিদায় করা ভাল নয়? ঐ শুনুন, পেট্রিয়টরা দুইটা বাড়ি তফাতে চীৎকার করছে—“পরাভূতগণ নিপাত যাক্।” “জ্যাকস্ তোমার হাত তরবারি থেকে সরিয়ে নাও, তুমি তোমার ভাব ঠিক রাখবার চেষ্টা করচোনা।” সোফি নির্ভীকভাবে কথা কহিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার দেহ কাঁপিতেছিল, মুখ একেবারে রক্তহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ক্যাজটি তীব্র স্বরে কহিল, “আপনার এই জ্যাক্স্, বোধ হয়, তার কাজে শিক্ষানবিসি আরম্ভ করেছে, না? তাকে এ অবস্থায় রাখা ভারী নিষ্ঠুরতা হচ্চে, কারণ সে ভারী চঞ্চল হয়ে পড়েচে—”

সোফি ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, “ক্যাজটি মশায়, আপনার নিজের চেয়ারে বসুন, আমার পিছনে কেউ দাঁড়ায় আমি সেটা পছন্দ করি না।” ক্যাজটি পর্দার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন; সোফি তীব্রস্বরে কহিল, “পর্দার ভিতর এমন কোন আশ্চর্য্য জিনিষ নাই, যে জন্য ওখানে উঁকি দিচ্চেন, আপনার চেয়ারে বসুন।”

কিন্তু, আপত্তি টিঁকিল না। ক্যাজটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্দার পিছনে যেখানে কতকগুলা কাপড় চোপড় পড়িয়াছিল সেইদিকে দেখিতে লাগিলেন। একটা উজ্জ্বল বর্ণ! সহস্র বর্ণের মধ্যেও তাহা লুকান যায় না। ক্যাজটির তীক্ষ্ণ চক্ষু মডেলের পোষাকের মধ্য হইতে আবিষ্কার করিল। ঈষৎ হাসিয়া তিনি ফিরিলেন, বলিলেন, “ক্ষমা করুন, কুমারি! আমি জানি আপনার লুকাইবার কিছু নাই। ঐ সিটিজেনরা প্রায় আসিয়া পৌঁছিল। আর কয় মিনিট মাত্র পরে, যারা সুকুমার শিল্পের আদর বুঝে না, তাদের কঠোর হস্তে এই চিত্রশালা বিধ্বস্ত হবে, তখন তাদের কেমন করে প্রতারণা করবেন? মনে করুন, তারা আমাদের জ্যাকস্ বেচারাকে হয় তো একজন অভিজাত বলে ভুল করে বসবে! ভুলে অনেক সময় অনেক বিপদ ঘটে—কিন্তু আপনার মডেলের হলো কি? আমি দেখছি, সে কাঁপচে। তাকে সিটিজেনদের কাছে নিজেকে একজন দরিদ্র ব্যক্তি এবং মডেলের কাজ করেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে এর জন্য প্রমাণাদি দিতে হবে ত।” “জ্যাক্স্, স্থির হও!” মডেল কম্পিত হয় নাই! সে প্রস্তর মূর্ত্তির মত স্তব্ধ ও গতিহীন হইয়া গিয়াছিল। সোফি তার চিত্রাঙ্কন দ্রব্য দূরে নিক্ষেপ করিয়া শঙ্কিতভাবে চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িল। ক্ষুধার্ত্ত বন্য জন্তু যেমন গভীর গর্জ্জনে অরণ্য প্রতিধ্বনিত করিয়া শীকার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তেমনি গর্জ্জনের সহিত সৈন্যদল বাড়ির কাছে আসিয়া পৌঁছিল। ক্যাজটি সোফির মডেলের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল, তার পর সোফির কাছে আসিয়া তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, “কুমারি

আপনার হ্যাট নিয়ে এই বেলা আমার সঙ্গে আসুন, আমায় সকলে চেনে—এখনও আপনাকে রক্ষা করবার সময় আছে, কিন্তু মডেলটকে এইখানেই ছেড়ে যেতে হবে"।

"তা আমি পারব না, কিছুতে না, ক্যাজটি মশায়, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আপনি—"

ক্যাজটি তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "এ আপনার কে?" সোফি মস্তক নত করিল, মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "এ আমার স্বদেশী, তারা একে হত্যা করবে।" হেনরি লেসট্রেঞ্জ মঞ্চ হইতে নামিয়া পড়িয়া দ্রুতকণ্ঠে কহিল, "লিমোইন-কুমারি, আমার জন্য তুমি আত্মরক্ষায় পরাঙ্মুখ হয়ো না! আমায় ফিরে যেতে অনুমতি দাও, সব সমস্যা দূর হোক। মশায়। আপনাকে কিছু বলবার নাই, যারা আমার সহচর, বন্ধুদের হত্যা করেছে, আপনি তাদেরি দলের লোক, অন্য স্থানে আপনার সঙ্গে দেখা হলে বড় সুখী হতেম, কিন্তু তা অসম্ভব, আমি আমার মৃত্যুকে বরণ করতে চল্লেম। যুদ্ধ করে মরবো, এবং আমার হত্যাকারীদের সঙ্গে নিজের পোষাকেই সাক্ষাৎ করতে যাবো। বিদায়, সোফি! তোমার করুণার জন্য শত ধন্যবাদ। কিন্তু মিনতি করে বলচি, তুমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যাও, ঈশ্বরের নিকট আমার শেষ প্রার্থনা, তুমি সুখী হও।"

সোফিকে অভিবাদন করিয়া সে পর্দার দিকে অগ্রসর হইতে গেল। কিন্তু সোফি দুই হাতে তাহাকে ধরিয়া রাখিল, "হায়, হেনরি! সেদিন নিজের হৃদয় না বুঝে তোমায় বিদায় দিয়েছিলাম, কিন্তু এতদিন পরে আজ যখন এসেছ, আর আমায় ছেড়ে যেও না, আসুক তারা, আমরা এক সঙ্গে মরবো।" হেনরি সোফির মৃত্যু বিবর্ণ অধরে চুম্বন করিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কি আনন্দ! কি বিজয়! কিন্তু প্রাণের সোফি, আমরা ফাঁসি কাঠের নীচে দাঁড়িয়ে আছি। আমি তোমাকে আমার মৃত্যুর সঙ্গী করতে পারব না, আমায় ছেড়ে দাও, যেতে দাও।"

ক্যাজটির উপস্থিতি তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল! রিপবলিকান ক্যাজটি প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া বিস্ময়ব্যাকুল নেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়াছিলেন। সোফিকে সত্যই তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসেন, আজ আপনার সম্মুখেই তাহাকে অন্যের বাহুবন্ধনে বদ্ধ দেখিয়া তাঁহার প্রশস্ত বক্ষ যেন চূর্ণ হইয়া গেল। যাহাকে ভালবাসেন, আর কয় মিনিট পরেই তাহাকে তাহার প্রেমাস্পদের পাশে দলিত পুষ্পের মত ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিবেন! তাহার মস্তিষ্ক জ্বলিয়া উঠিল। এখন ইহাদিগকে কিছুতেই কি বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন না। এদিকে ক্রুদ্ধ সমুদ্রতরঙ্গের মত বিপুল জনসঙ্ঘ বাড়ির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ক্যাজটি নিজে এখানে উপস্থিত থাকিলে বিপদে পড়িবেন। কিন্তু কেমন করিয়া ইহাদিগকে ত্যাগ করেন। সৈনিকটা মরিলে-বাঁচলে তাঁহার সমানই ক্ষতি, সোফি চিরকালের জন্য তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। কখন তো সে তাঁহার দিকে এমন করিয়া চাহে নাই। কখনও ত সোফির হৃদয় তাঁহার জন্য এমন ব্যাকুল হয়

নাই? ক্যাজটি একটি সুগভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন তারপর সহসা একটা নূতন চিন্তা তাঁহার যন্ত্রণা-পীড়িত মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যুতের মত চমকিয়া উঠিল, "আঃ, এই পথ, এই একমাত্র উপায়ে ব্যর্থ জীবন এবং যন্ত্রণার উপশম হইবে, এই অসাধারণ ত্যাগের মহিমাদ্বারাই সোফির অন্তরে তাহার স্মৃতি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত রাখিবে। মনুষ্যত্বের ও বীরত্বের এই শৃঙ্খল দিয়া তাহাকে নিজের কাছে বাঁধিয়া রাখিবার লোভ, ক্যাজটি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বক্তা ও কবির কল্পনা তাঁহাকে এ উৎসর্গের দিকে সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কলের পুতুলের মত ক্যাজটি বলিলেন, "মশায়, আপনি মঞ্চের উপর যান। লিমোইন কুমারি, আপনার কাজ আরম্ভ করুন। আমার দ্বারা যেটুকু সাহায্য হতে পারে, তা করব। এই ছাড়পত্র, —ইহার সাহায্যে আপনারা পালাতে পারবেন। এখন আমি চল্লেম, হয়তো আর আসতে পারবো না।" পর্দা সরাইয়া ক্যাজটি সুইস্‌ গার্ডের লাল পোষাকটা সংগ্রহ করিয়া লইলেন। তার পর এক বার শুধু সোফির মুখের দিকে চাহিয়া তার শীতল হস্তে একটিমাত্র ব্যগ্র চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইল।

হেনরি লেসট্রেঞ্জ মঞ্চের উপর আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তরবারিখানা এবার খাপ হইতে খুলিয়া রাখিল, জিজ্ঞাসা করিল "লোকটাকে বিশ্বাস করবো কি, সোফি?"

"হাঁ, আমি জানি, ক্যাজটি আমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।"

কিন্তু কি করে এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার লাল পোষাকটা লুকিয়ে ফেলবে, আমি ভেবে পাচ্চি না, যদি ওগুলো ধরা পড়ে, তাহলে এ বাড়ির প্রত্যেক ইট সুদ্ধ খসিয়ে তারা অনুসন্ধান করতে ছাড়বে না। ঐ শোন! তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠছে!" "ভয় কি হেনরি? সাহস আনো!" —সোফির কণ্ঠরোধ হইল, দারুণ আতঙ্কে দুই জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে কাঁপিতে লাগিল। দ্বারের সম্মুখে বহু লোকের পদধ্বনি শুনা গেল, শব্দটা সরিয়া গেল। তার পর উচ্চ চীৎকার, "রাজা দূরে দীর্ঘজীবী হোন" এবং বন্দুকের গর্জ্জন ঘরটাকে কাঁপাইয়া তুলিল। সেই সঙ্গে একটা গুরু বস্তু পতনের শব্দে সোফি মূর্চ্ছিতা হইল। সৈনিক সোফিকে আসন হইতে তুলিয়া তার হাত ধরিয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সেথায় কেহই প্রবেশ করিল না, বরং তাহারা শুনিল হত্যাকারীগণ বিকট চীৎকারে জয়ধ্বনি করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের প্রতিহিংসা কিসে চরিতার্থ হইল?

চিত্রশালার দ্বার হইতে কিছু দূরে লাল পোষাক পরা মৃত জীন ক্যাজটির দেহ পড়িয়া আছে। তাহার অসংখ্য ক্ষত হইতে শোণিতধারা প্রবাহিত হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া পড়িতেছিল। প্যারিসের প্রসিদ্ধ বক্তা, চিরদিনের জন্য, আজ নীরব হইয়া গিয়াছেন।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

মধ্যহিমালয়ের কুলুজাতি।

কুলু মধ্য হিমালয়ের অন্তর্বর্ত্তী একটী উপত্যকা ভূমি। সিমলা হইতে প্রায় ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় দুই মাইল, স্থানে স্থানে আরও সঙ্কীর্ণ। প্রধান উপত্যকার সহিত আরও কতকগুলি ছোট ছোট উপত্যকার সংযোগ আছে। এই উপত্যকাগুলি সাধারণতঃ 'নালাদ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ উপত্যকাগুলি সর্ব্বদাই তুষারাচ্ছন্ন। নিম্নভাগেরও কতকাংশ প্রায় জুন মাস পর্য্যন্ত বরফাবৃত থাকে। কেবল মধ্য প্রদেশটুকুই লোকের বাসস্থান ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী।

ইহার উত্তরে দুইটি এবং দক্ষিণে একটি প্রবেশ পথ আছে। উত্তর পথ দুইটীর মধ্যে একটীর নাম ডল্‌চি-পাস (Dulchi pass) ইহা প্রায় ছয় হাজার ফুট উচ্চ। অপরটীর নাম বুবু-পাস (Buboo pass) ইহাও প্রায় দশ হাজার ফুট উচ্চ হইবে। দক্ষিণ দিকের পথটীর নাম রোটং পাস (Rohtung pass) ইহার উচ্চতা ন্যূনকল্পে পনের হাজার ফুট।

কুলুর অধিবাসিগণ সাধারণতঃ অলস প্রকৃতির। কাজকর্ম্ম করিতে তাহারা বড় একটা ভালবাসে না। কৃষি ইহাদিগের প্রধান উপজীবিকা। অধিবাসিগণের মধ্যে সকলেরই কিছু না কিছু জমি আছে। তাহারই চাষ করিয়া কোনমতে জীবনধারণ করে। জমিগুলি প্রায়ই নদীর সমীপবর্ত্তী ছোট ছোট সীমানায় বিভক্ত এবং পাহাড়ের গায়ে বলিয়া ঈষৎ ঢালু।

কুলু দেশীয় পুরুষগণ সাধারণতঃ সুশ্রী নহে। তাহাদিগের তুলনায় স্ত্রীলোকদিগকে সুরূপা বলা যাইতে পারে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের আয়ুকাল অল্প। পঞ্চবিংশতিবর্ষ অতিক্রম না করিতেই তাহারা প্রায় জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

ইহাদিগের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই অংশ স্বরূপ। প্রত্যেক গ্রামেই 'দেওতা' নামে একপ্রকার দেবমূর্ত্তি আছে। কুলুবাসিগণ সেই দেবপ্রতিমার পূজা করিয়া থাকে। ইনি জলের দেবতা, যখন অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হয় তখন গ্রামবাসিগণ তাঁহার নিকট আবেদন জ্ঞাপন করে, বৎসরের মধ্যে একদিন কেবল এই আবেদন জ্ঞাপনের দিন। সেই জন্য তাহারা শস্য সংগ্রহের জন্য যে শুভদিন নির্দ্ধারিত করে—সেই দিনই ধূমধামের সহিত এই দেবতার পূজা করিয়া থাকে। পূজা উপলক্ষে দেবতার নিকট জীবজন্তু বলি দেওয়া হয়, এবং পরে তাহারা প্রসাদ গ্রহণ করে।

এই প্রথা এখন ইহাদিগের মধ্যে বার্ষিক উৎসবে পরিণত হইয়াছে। দেবতার প্রতি যে বিশেষ কিছু ঐকান্তিক ভক্তি বশতঃ তাহারা এইরূপ করে তাহা বোধ হয় না। ইহা যেন একটা জাতীয় বাৎসরিক ভোগের দিন,—সকলে মিলিয়া এই দিন আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। কিন্তু শুধু পূজা নহে, দেবতাকে শাস্তিও গ্রহণ করিতে হয়। যদি কখনো তাহাদের প্রার্থনা-পূরণে দেবতার কৃপণতা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহারা উপযুক্ত শাস্তি

দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অনেক সময় দেবতাকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া আনে, কখন বা হেটমুণ্ডে রাখে; এমন কি দেবতার পৃষ্ঠে পাদুকা বর্ষণ অবধি বাদ যায় না।

কুলুবাসিগণ অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। পবিত্রজ্ঞানে যে সকল বৃক্ষ ইহারা পূজা করে সেই সকল বৃক্ষের তলদেশে ক্ষুদ্র মন্দির গঠিত থাকে। এই সকল বৃক্ষে ভূত বা প্রেতযোনি বাস করে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। কতকগুলি নদীও পবিত্রজ্ঞানে পূজিত হইয়া থাকে। এই সকল নদীর জলে কোনপ্রকার অপবিত্র জিনিস নিক্ষেপ করিতে দেয়না। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি বিদেশী এই স্থান দেখিতে আসিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহারা এই সকল নদীর জল অপবিত্র করায় সে বৎসর উক্ত দেবতার কোপে অতিবৃষ্টি হইয়াছিল। এই ঘটনায় কুলুবাসিদিগের হৃদয়ের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।



বৃক্ষতলস্থ মন্দির।

কুলুবাসিদিগের আবাসগৃহ প্রায়ই দ্বিতল এবং একটীমাত্র প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। সাধারণতঃ কেবল একটীমাত্র দ্বার ব্যতীত বায়ুসঞ্চালনের দ্বিতীয় উপায় নাই। গৃহপালিত জীবজন্তু নীচের ঘরেই থাকে। এই সকল গৃহ বৎসরে একটি দিন মাত্র পরিষ্কার করা হয়। এবং সমস্ত জঞ্জাল জমির সারের জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বাস্থ্যের দিকে ইহাদের মোটেই দৃষ্টি নাই। পর্ব্বতের স্বাভাবিক নির্ম্মল বায়ু না থাকিলে, ইহাদের মধ্যে সংক্রামক রোগ অতিরিক্ত প্রবল হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই। গৃহের চারিধারের বারাণ্ডায় শস্যাদি সংগৃহীত থাকে। শীতকালে অত্যধিক বরফ পড়ায় এই সকল বারাণ্ডা কাষ্ঠের বেষ্টনিতে ঘেরিয়া রাখা হয়। কুলুর পুরুষদিগের পরিচ্ছদের মধ্যে পট্টু নামক এক প্রকার তদ্দেশজাত পশমের একটি কোট, একটী পেণ্টলুন ও একটী টুপি। কখনও কখনও শোভার জন্য তাহারা পুষ্পাভরণও ব্যবহার করিয়া থাকে। স্ত্রীজাতির পোষাকের মধ্যে কেবল একটী কম্বল। পরিধানের এমনি কৌশল যে, এই কম্বল ঘাগরার মত কটি বেষ্টন করিয়াও দেহের ঊর্দ্ধভাগের অনেকটা অংশ আচ্ছাদন করে। সভ্যজাতীয়া রমণীর ন্যায় কুলুনারীও অল-

ভূষণের বিশেষ অনুরাগিনী। কোন মেলা উপলক্ষ্যে তাহাদের বেশভূষার বিশেষ পারিপাট্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এখানে স্ত্রীলোকেরাও চাষের কার্য্য করে। বহুবিবাহ-প্রথার এখানে প্রচলন আছে। যাঁহারা একটু ধনবান গৃহস্থ, কিম্বা প্রচুর জমিজমার অধিকারী, সাধারণতঃ তাঁহাদের অনেক কর্ম্মীর প্রয়োজন হয়। কাজেই বহুবিবাহ তাঁহাদিগের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। বিবাহের পূর্ব্বে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে বিস্তর যৌতুক দিয়া থাকে এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্যে রীতিমত প্রীতিভোজেরও ব্যবস্থা আছে। এই সকল কার্য্যে 'লুগরি' নামক একপ্রকার দেশী মদ্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ একাদশ বা দ্বাদশ বৎসর বয়সেই বালিকাদিগের বিবাহ হয়, বিবাহিতা বালিকাদের মধ্যে অনেকটা স্বাধীনতাও আছে।

কুলুদেশের বর্ত্তমান কৃষিকর্ম্মপদ্ধতি দশসহস্র বৎসর পূর্ব্বেকারই অনুরূপ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কুলু দেশের কৃষিক্ষেত্রগুলি সাধারণতঃ অতি অল্প পরিসর স্থানে সীমাবদ্ধ। এইজন্য হলচালনে সুবিধা না হওয়ায় হস্ত দ্বারাই জমি কর্ষিত হইয়া থাকে। এখানে মই দিবার ব্যবস্থাও অনুরূপ। একখানি বড় তক্তার উপর আর একটী তক্তা রাখা হয়। সেই তক্তা দড়ির সাহায্যে কর্ষিত জমীর উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ইহাদিগের মধ্যে শস্য-সংগ্রহের প্রথাও বিশেষ আয়াসসাধ্য। প্রত্যেক শস্যের শীষ পৃথকভাবে সংগৃহীত হইয়া থাকে। শস্য হইতে দানা বাহির করিবার ব্যবস্থা অনেকটা বঙ্গদেশেরই অনুরূপ। উপত্যকায় বসতি যে খুব ঘন, তাহা নহে। এই জন্য যে সামান্য শস্য উৎপন্ন হয় তাহাতেই দেশবাসীর অন্নাভাব দূর হয়। কুলুজাতি বেশ আমোদপ্রিয়। কুলুজাতির আমোদ মেলায়। আমাদের দেশের মেলায় অনেক দোকান পাট বসিয়া থাকে। স্থানীয় জনসাধারণ হাটবাজার, আমোদ-



সালঙ্কারা কুলুকুমারী।

প্রমোদ প্রভৃতি করিয়া থাকে। কিন্তু কুলুদিগের মধ্যে এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। তাহাদিগের মেলায় সাধারণতঃ দুই তিনখানি গ্রামের অধিবাসী একত্র সম্মিলিত হয়। যে যাহার গ্রামের দেবতা লইয়া আসে। সেই সকল দেবমূর্ত্তি মধ্যে রাখিয়া নাচগান আমোদ-আহ্লাদ করে। সেদিন প্রত্যেকেই কিছু না

কিছু মদ্যপান করিয়া থাকে। এই সময়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে, সাধারণতঃ, বিলাসিতার প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষেরা রঙ্গিন টুপি এবং পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইয়া মেলায় যোগদান করে।

কুলুদিগের মধ্যে কোন দুরারোগ্য রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। নিম্ন উপত্যকায় শরৎকালে কখনো কখনো ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হয় বটে, কিন্তু, এত সামান্য যে দুই এক মাত্রা কুইনাইন সেবনেই তাহা আরোগ্য হইয়া যায়। সমুদায় উপত্যকা প্রদেশে কেবল বাত ও গলগণ্ড রোগেরই যা একটু প্রাদুর্ভাব। ভূটান, লাডক্, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি যে সকল স্থানে শীত আরও অধিক, থাকার অধিবাসীগণ অনেকেই শীতকালটা এখানে কাটাইতে আসে।

এই সকল প্রবাসী সাধারণতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা নদীর ধারে তাঁবু খাটাইয়া বাস করে; এবং কোনরূপে প্রবল শীতের কয় মাস কাটাইয়া দেয়। তাহাদের নিকট সর্ব্বদাই একটী ছোট বাক্স দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাক্সে তাহাদের প্রার্থনাচক্র এবং তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত সাজসরঞ্জামাদি থাকে। সিংহল, ব্রহ্ম, জাপান প্রভৃতি প্রদেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ইহাদের ধর্ম্মের মিল নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সূক্ষ্ম আবরণের মধ্যে ইহা ভোজবাজী, দৈত্য-পূজা ও কুসংস্কার সংমিশ্রণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাদের বিশ্বাস, বাতাসে ভূতযোনি বাস করে। কোন উপায়ে নিজেকে বিপদ হইতে রক্ষা করাই ইহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এইজন্য প্রত্যেক লামা (ধর্ম্মগুরু) অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকে এবং প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষেই এক একটী মাদুলি ধারণ করে।

কুলুর বাহ্যিক ধর্ম্মভাবটা বড় বেশি বলিয়া বোধ হয়। চারিদিকেই লামাদিগের মঠ। এগুলি সাধারণতঃ প্রস্তরনির্ম্মিত এবং বহু কোণ্‌যুক্ত। প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডে লেখা আছে "ওঁ মণিপদ্মে হুম্"। লামাগণ এই সকল মঠ প্রস্তুত করিয়া তথাকার অধিবাসিগণের নিকট তাহা বিক্রয় অবধি করিয়া থাকে।

এখানে লামা সম্প্রদায়ের সংখ্যা এত অধিক যে, প্রত্যেক ছয়জন অধিবাসীর মধ্যে অন্ততঃ একজন লামা আছেই। ইহারাও আবার দুইটী বিভিন্ন দলে বিভক্ত। একটী দলের নাম গেলুগ-পা (gelugpa) এবং অপর দলের নাম নিন্‌-মা-পা। (Nin-ma pa)

কুলু উপত্যকা সকল জাতির পক্ষেই বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। নাসপাতি আপেল প্রভৃতি ফলের জন্য এ স্থান প্রসিদ্ধ। খাদ্যদ্রব্যও এখানে নিতান্ত দুর্ম্মূল্য নহে। সুতরাং অল্প খরচেই বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস আদক।

বিবিধ।

রমণীর অধিকার।

আমরা গতবর্ষের বৈশাখের ভারতীতে ইংলণ্ডের রমণীগণের রাজনৈতিক অধিকারলাভের জন্য সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছিলাম। এই এক বৎসরে তাঁহাদের আদর্শে ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশের রমণীকেও রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভে উত্তেজিত করিয়াছে। ফরাসীদেশের প্রায় প্রত্যেক স্থান হইতেই শিক্ষিতা রমণীগণ শাসন-সমিতির সভ্য হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। ইঁহারা অনেকেই ডাক্তার, ব্যবহারজীবি বা অপর কোন শিক্ষিতক্ষেত্রে অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত। ইঁহাদের মধ্যে আবার নানাপ্রকার রাজনৈতিক দল আছে, কেহ উদার-নৈতিক, কেহ সোসিয়ালিষ্ট, কেহ বা অপর কোন প্রচলিত দলভুক্ত। অপরাপর বিষয়ে ফরাসী রমণীরা পুরুষের সহিত প্রায় তুল্যাসনেই অধিষ্ঠিতা। এক্ষণে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও তাঁহারা তুল্যাধিকার লাভের জন্য পুরুষজাতির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের রমণীরা এই রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার জন্য যেরূপ আয়োজন, চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করিতেছেন তাহার কতকটা আভাস আমরা লেডি লিটনের দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারি। লর্ডের কন্যা হইয়া, কুলশীলমানে উচ্চপদস্থ হইয়া, চিরসুখ-পালিতা লেডি লিটন যেরূপ অম্লানবদনে সুখসম্মান ও সংসারকে উপেক্ষা করিয়া কারাগৃহে সামান্যা দুষ্কৃতা নারীর ন্যায় কালাতিপাত করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার বীরত্বে, একাগ্রতায় ও আত্মত্যাগে নরনারী সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহার এই কারাকাহিনী আমরা তাঁহার নিজের কথাতেই বর্ণনা করিলাম। বিলাতের প্রসিদ্ধ টাইমস্ পত্রিকায় তিনি এই পত্রটি প্রকাশিত করেন—

"গতবর্ষে অক্টোবর মাসে বিলাতের স্বদেশসচিব পার্লামেণ্টের সাধারণ সভা সমক্ষে বলেন যে;—আড়াই দিন অনাহারের পরেও যে তাঁহারা আমাকে বলপূর্ব্বক আহার না করাইয়া কারাগার হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, আমার হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাই তাহার কারণ। তিনি ইহাও বলেন যে,আমার পদের বা সামাজিক মর্য্যাদার জন্য যে আমাকে মুক্তিদান করা হইয়াছিল একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু আমার বিচার ও মুক্তি সংক্রান্ত ঘটনাবলী সমালোচনা করিয়া দেখিলে, অন্যান্য কারাবাসিনীর তুলনায় আমার প্রতি যে বিশেষ পক্ষপাত ব্যবহার হইয়াছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

"আজ পর্য্যন্ত গবর্মেণ্ট নারীগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের প্রস্তাবকে সমভাবেই উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এবং এই সম্প্রদায়ভুক্ত বন্দিনীগণের প্রতি দুর্ব্যবহার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপ কতকগুলি বন্দিনীর প্রতি অত্যাচারের কাহিনীতে উত্তেজিত হইয়া আমি গত ১৪ই জানুয়ারি শুক্রবারে লিভারপুলের কারাগারের সম্মুখে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য এক সভায় যোগদান করি। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে এবারে আমি সাবধান হইয়াই উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমি ছদ্মবেশে যাইয়া আপনাকে জেন ওয়ার্টন্ নামে প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমি শ্রোতৃবৃন্দকে গবর্ণরের বাটী পর্য্যন্ত আমাকে অনুসরণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলাম বলিয়া পরদিন আমার প্রতি চতুর্দ্দশ দিবস সশ্রম কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা হইল।

"কারাগারে যাইয়া আমি প্রায় দুই দিন (৮০ ঘণ্টা) কিছুই আহার করিলাম না। অবশেষে আমাকে বলপূর্ব্বক আহার করান হইল। এবারে আর আমার হৃৎপিণ্ড বা নাড়ী কেহই পরীক্ষা করিয়া দেখিল না। সেইদিন হইতে আর আমার মুক্তির দিন পর্য্যন্ত আমাকে এইভাবে বলপূর্ব্বক আহার করাইয়াছিল। সে যে কি কষ্ট তাহা বলা যায় না। আমি যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন সে যন্ত্রণার কথা ভুলিতে পারিব না। প্রথম দিন আহারে অসম্মত হওয়ায় ডাক্তার আমার গালে চপেটাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। প্রতিদিনই

তাঁহারা বলপূর্ব্বক খাওয়াইতেন ও যন্ত্রণার তাড়নায় আমি তাহা বমি করিয়া ফেলিতাম। ইহা দেখিয়া ডাক্তার আরও রাগিয়া যাইতেন। পরে যখন ক্রমাগতই বমি হইতে থাকিল তখন তিনি অপর এক ডাক্তার আনাইয়া আমার হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করাইলেন। ডাক্তার একটু নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন "না, হৃৎপিণ্ড বেশ সবল"। তার কারণ এ হৃৎপিণ্ড যে জেন ওয়ার্টনের—লেডি লিটনের ত নয়। তাহার পর হইতে কিন্তু আমার প্রতি ইঁহারা অনেকটা ভদ্র ব্যবহার করিতেন।"

ইংলণ্ডের রমণীগণ দিন দিন তথাকার অনেক শিক্ষিত ও গণ্যমান্য পুরুষের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছেন। সেদিন প্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক য্যাঙ্গুইল (Zanguill) সাহেব বলিয়াছেন—"আমাদের দেশে এমন দিন আসিতেছে যেদিন বৈদ্যুতিক শক্তিহীন গাড়ী ও রাষ্ট্রীয় অধিকারহীন নারী আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া আমাদের দেশের রমণীগণ যে কঠোর সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। এই ইংলণ্ড হইতেই নরনারীর সাম্যনীতি জগতে ব্যাপ্ত হইবে এবং ইংলণ্ড আবার জগতে মুক্তিজননীর আসন পুনরধিকার করিবে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে এ অধিকারের পার্থক্যের যে কারণ কি তাহা ভাবিয়া দেখিলে মনে মনে লজ্জিত হইতে হয়। নরনারীগণের বিরুদ্ধে এক প্রধান যুক্তির অস্ত্র এই যে, তাহারা যখন শত্রুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ নয়, তখন তাহারা দেশশাসন সম্বন্ধে পুরুষের সহিত তুল্যাধিকার পাইতে পারে না। কিন্তু সকল পুরুষই কি যুদ্ধ করিতে সক্ষম? আমি নিজে ত' বন্দুক ধরিতে জানি না, কিন্তু আমার চারিটি ভোট আছে। কেহ কেহ বলেন স্ত্রীলোকেরা রাজ্যের জটিল ব্যাপার বুঝে না। আমরাই কি বুঝি? আমার মতে তুমি রাজকর্ম্ম বুঝ না, তোমার মতে আমি রাজকর্ম্ম বুঝি না।"

আবার, প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ মেচ্‌নিকফ (Metchnikoff) সাহেবের মতে নারী কোনকালেই পুরুষের তুল্য হইতে পারে না। তিনি বলেন—"পুরুষের সহিত তুল্যাধিকারপ্রার্থিনীগণের তর্ক এই যে, বহু শতাব্দীর দাসত্বের ফলে আজ নারীর শক্তি পুরুষের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছে। পুরুষ নিষ্ঠুর ক্রীতদাসঅধিকারীর ন্যায় তাহাকে সমাজের সর্ব্ববিধ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিয়াছে, সর্ব্বপ্রকার উন্নত বৃত্তিবৃত্ত হইতে বঞ্চিত করিয়াছে এবং নানাবিধ অস্বাভাবিক উপায়ে নারীকে তাহার ক্রীড়ার পুত্তলি করিয়া তুলিয়াছে। এই অত্যাচারের ফলে নারীর মানসিক শক্তি পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহার বুদ্ধিও হীন হইয়া পড়িয়াছে। সুযোগ পাইলে তাঁহারা তাঁহাদের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া পুরুষের তুল্য হইতে পারেন, এমন কি পুরুষকেও পরাজিত করিতে পারেন।

"আমরা স্বীকার করিলাম য অনেক বিষয় হইতে আমরা নারীকে বঞ্চিত রাখিয়াছি এবং সেই জন্যই সে সকল ক্ষেত্রে তাঁহারা হীনশক্তি হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু এ স্থলে ইহাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কতকগুলি বিষয়ে তাঁহাদের চিরদিনই অবাধ অধিকার আছে। যেমন সঙ্গীত বিদ্যা। আমাদের দেশে পুরুষগণ কন্যা, পত্নী বা ভগিনীকে সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী করিবার জন্য যথাসাধ্য উৎসাহ দিয়া থাকেন। কিন্তু এই কলাবিদ্যায় নারীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠা কোথায়? অসংখ্য সঙ্গীতবিদ্‌ পুরুষের সমকক্ষ একটা নারীও কি আজ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? পৃথিবীর সঙ্গীত গুরুদের সহিত কি একটী নারীর নামও মানবের ইতিহাসে অমর স্থান অধিকার করিয়াছে?

"চিত্রকলাতেও পুরুষ নারীর পথে বাধা প্রদান করে নাই। কিন্তু কৈ, পৃথিবীর প্রসিদ্ধ চিত্রকরগণের মধ্যে নারীর নাম কৈ?"

এই বলিয়া মেচনিকফ্‌ সভাস্থল হইতে ফিরিতে ছিলেন; এমন সময়ে কতকগুলি নারী আত্মরক্ষায় অক্ষম হইয়া পার্শ্বস্থ কয়েকটি পুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা চুপ করিয়া আছেন কেন? উঁহার আক্রমণের প্রতিবাদ করুন না।"

মেচনিকফ্ হাসিয়া বলিলেন "এইবার আপনারা নিজ মূর্ত্তিতে ধরা পড়িয়াছেন। আপনাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্যও আপনাদের পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে চলে না।"

ভেরা ফিগ্‌নার।

ভেরা ফিগ্‌নার রুষের বিদ্রোহীদলের একজন অসাধারণ বীর রমণী এবং অধিনায়িকা। ইঁহার জীবনের বিশ বৎসর ইনি রুষের এক দুর্গ কারাগারে অতিবাহিত করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন।

১৮৫২ সালে এক অর্থবান উচ্চপদস্থ পরিবারে—ভেরার জন্ম হয়। বাল্যকালে ধনী কন্যাদিগের সহিত এক বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং প্রতি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া তথাকার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। সে সময়ে রুষিয়াতে স্ত্রীশিক্ষা ও প্রজাগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার লইয়া এক বিরাট আন্দোলন চলিতেছিল। ভেরা এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন। ১৮৭২ সালে ভেরা সুইজর্লণ্ডে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বদেশে দরিদ্রদিগের মধ্যে চিকিৎসা করিবেন ইহাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

কিন্তু তাঁহার এ সাধু উদ্দেশ্য সফল হইল না। ১৮৭৫ সালে রুষ গবর্মেণ্ট আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, সুইজর্লণ্ডে যত রুষছাত্র আছে সকলের অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাগমন করা আবশ্যক—নচেৎ তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত বলিয়া স্থির করা হইবে। স্বদেশের যথেচ্ছ রাজশক্তির সহিত ভেরার এই প্রথম সংঘর্ষণ। নিরুপায় দেখিয়া তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় ধাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দরিদ্র কৃষকদিগের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন।

কারাবাস কালে তাঁহার মোহিনী শক্তির প্রভাবে কারাস্থিত অপরাপর বন্দী ও বন্দিনী অন্তরে শান্তিলাভ করিত। তাহারা ভেরাকে চক্ষেও দেখিতে পাইত না, কিন্তু ভেরার তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিতি ও অসম সাহস তাহাদিগের অন্তরে বল প্রদান করিত। স্বাধীন অবস্থায় ভেরা তাঁহার স্বদেশবাসীর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারিতেন, কারাগারে তাঁহার সহবাসীগণের জন্যও তিনি প্রাণদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

অনেক দিন ধরিয়া অনেক চেষ্টা, অনাহার, আত্মহত্যা ও আত্মোৎসর্গের ফলে বন্দিনীগণ পুস্তকপাঠ ও কিঞ্চিৎ শারীরিক শ্রম করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিল। ১৯০২ সালে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের সে অধিকার টুকু হরণ করিলেন। ভেরা দেখিলেন, এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ অনেকেরই পক্ষে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞার তুল্য হইবে। অনেকেই উন্মত্ত হইয়া, ভীষণ রোগে প্রাণত্যাগ করিবে বা যন্ত্রণার তাড়নায় আত্মহত্যা করিবে। ইতিপূর্ব্বে এই ভাবে বহু অভাগা ও অভাগিনীর ইহলীলা শেষ হইয়াছে।

এই ভাবিয়া ভেরা সকলকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে উৎসর্গ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে তিনি কারাগারের কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে সত্য, কিন্তু বিচারালয়ে নীত হইলে তিনি এই কারাপ্রাচীরের অন্তরালের দুর্দ্দশাকাহিনী ব্যক্ত করিবার অবসর লাভ করিবেন।

একদিন কারা রক্ষক তাঁহার অন্ধকূপে প্রবেশ মাত্র তিনি তাহার বস্ত্র ছিন্ন করিলেন। তিনি জানিতেন ইহার ফলে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে কিন্তু তিনি তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

কিন্তু রুষের শাসননীতি অপরাপর দেশের মত নহে। স্থানীয় শাসনকর্ত্তা কোনও বিচার না করিয়াই অভিযুক্তের প্রাণদণ্ড করিতে পারেন। আবার আইন অনুসারে যে প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত সে বিনা কারণে মুক্তিলাভও করিতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সামান্য গোলমাল করার অপরাধে প্রায় দুই শত ছাত্রকে রুষ গবর্মেণ্ট ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই পোর্ট আর্থারে সৈনিকের কর্ম্ম করিবার জন্য নির্ব্বাসিত করিয়া ছিলেন।

ভেরা যখন এই কঠিন অপরাধ করিলেন ঠিক সেই সময়ে রুষ রাজ্যে ছাত্রদিগের ব্যাপার লইয়া এক তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। এরূপ উত্তেজনা ও আন্দোলনের কালে ভেবার ন্যায় একজন রমণীর প্রাণদণ্ড করা নিরাপদ নহে ভাবিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাহা করিলেন না।

যাহা হউক দেশবাসীর দুঃখ ও দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা করিয়া ভেরা রুষের অপরাপর সংস্কারকের ন্যায় একই ফল লাভ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে কর্ত্তৃপক্ষের এরূপ যথেচ্ছ শক্তি থাকিতে প্রজার দুঃখ দূর করিবার কোন চেষ্টাই সফল হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং সেই দিন হইতে তিনি দেশের শাসননীতি পরিবর্ত্তন প্রয়াসী দলের একজন সভ্য হইলেন।

প্রফুল্ল যৌবন, মনোহর রূপ, ধন সম্পদের লালসা, জীবনের ব্যক্তিগত সকল আশা সাধ,—স্বদেশের জন্য এ সমস্তকেই তিনি ঘৃণাভরে পদাঘাত করিলেন। ১৮৮০ হইতে ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত দেশে প্রবল বিদ্রোহী-দল যে সকল অসমসাহসিক কর্ম্ম করিয়াছিল, তিনি তাহার একজন প্রধানা অধিনায়িকা ছিলেন।

১১৮২ সালে এক বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে তিনি ধৃত হন। দুই বৎসর তাঁহাকে নির্জ্জন কারাবাসে অন্ধকূপ মধ্যে থাকিতে হয়। পরে ১৮৮৪ সালে অপর ত্রয়োদশটি বিদ্রোহীর সহিত তাঁহার বিচার আরম্ভ হয়।

বিচারে প্রথমে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পরে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাবাসের আজ্ঞা হইল। কিন্তু সাধারণ কারাগারে না রাখিয়া তাঁহাকে এক দুর্গের অন্ধকূপ মধ্যে যাবজ্জীবন বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দেওয়া হইল। সে অন্ধকূপ হইতে কেহ কখনও জীবিত অবস্থায় মুক্তি পায় নাই।

সেই অন্ধকূপ মধ্যে ভেরা বিশ বৎসর অতিবাহিত করেন। ১৯০৪ সালে পর্য্যন্ত তিনি বাহ্য জগতের কোনও সংবাদই পান নাই। ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট একখানি পত্র পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারিত না, বা তাঁহার বৃদ্ধা মাতাকে তিনি কোন পত্র লিখিতে পাইতেন না।

ইহার দুই বৎসর পরে রুষ রাজের বংশধর জন্মগ্রহণ করিলেন এবং ভেরার কারাবাস কাল বিংশতি বৎসরে পরিণত হইল। তিনি কারামুক্ত হইয়া রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে নির্ব্বাসিত হইলেন।

তাহার পর চিরস্মরণীয় ১৯০৫ সাল আসিয়া উপস্থিত হইল। অক্টোবর মাসে যখন প্রজাগণের মন্ত্রণাসমিতি স্থাপিত হইল তখন তাঁহার অন্তর আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী! তরবারি, গলরজ্জু ও অগ্নির সাহায্যে প্রাচীন শাসননীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল,—ভেরার প্রফুল্ল অন্তর আবার বিষাদ কালিমায় আচ্ছন্ন হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে ভেরা এক বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন—"আমি আমার সেই অন্ধকূপ হইতে মুক্ত হইয়াছি বলিয়া দুঃখ হয়। সেখানে মৃতের ন্যায় আমি ইহা অপেক্ষা সুখে ছিলাম। বহির্জগতের কোন সংবাদই পাইতাম না সুতরাং দুঃখও কম ছিল।

শ্রীভঃ।

জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে কুসংস্কার।

আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরের Popular Science Monthly নামক সংবাদ পত্রে জন ডিন সাহেব উক্ত বিষয়ে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রাতঃকালে পূর্ব্বাকাশে উদিত উজ্জ্বল নক্ষত্রটির নাম অনেকেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। যিশু খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে বেথলিহেমে যে নক্ষত্র উদিত হইয়াছিল এবং যাহা তিন শত বৎসর অন্তর আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকেই ভাবিয়াছিলেন যে উহা তাহাই। বস্তুতঃ উহা শুক্র গ্রহ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ডিন সাহেবের উত্তরে প্রশ্নকর্ত্তাগণ যখন বুঝিলেন যে ইহা বেথলিহেমের তারা নহে, তখন ও সম্বন্ধে তাঁহাদের সকল অনুসন্ধিৎসা লোপ পাইল।

ডিন সাহেব লিখিয়াছেন যে সৌখীন সমিতিতে

(যাহাকে Fashionable Society বলা হয়) সামুদ্রিক বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ, আত্মাসম্বন্ধীয় বিষয়-বিশেষের যথেষ্ট আলোচনা হয় কিন্তু যদি ঐরূপ স্থলে কেহ জ্যোতিষ বা বিজ্ঞানের কোন বিষয় আলোচনা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সভাসমাজে প্রচলিত Bore (অর্থাৎ হাড় জ্বালান জীব) উপাধি ধারণ করিতে হয়। এই বিষয়টি চিত্রে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে সুপ্রসিদ্ধ কৌতুকচিত্র-শিল্পী ডুমরিয়ার সাহেব "পাঞ্চ" নামক সংবাদ পত্রে 'সান্ধ্যসমিতিতে বিজ্ঞান ও সঙ্গীত' (Science and music at an Evening Party) নামক ছবিতে রহস্যচ্ছলে দেখাইয়াছেন যে একটি সান্ধ্যসভায় একজন অধ্যাপক বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিতেছেন তাঁহার একটিমাত্র শ্রোতা। বক্রী সকলেই পিয়ানো ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চেষ্টারফিল্ডের নাম অনেক পাঠক অবগত আছেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে এই কথাই প্রকারান্তরে লিখিয়াছিলেন যে, "তোমার বিদ্যা এবং ঘড়ী উভয়ই পকেটের বাহির করিও না। ঘড়ী বাহির করিলে লোকে মনে করিবে তুমি ঐ স্থানে থাকিতে চাওনা। আর অন্যটী প্রকাশে আমন্ত্রিতগণকে তুমি বিরক্ত করিয়া তুলিবে।"

ডিন সাহেব তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধে বিভিন্ন জাতির জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কুসংস্কারের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে মুসলমানদিগের বিশ্বোৎপত্তি ও সৃষ্টি বিজ্ঞানের ধারণা বালকেরই শোভা পায়। কোরাণে, পৃথিবী সমতল এবং সমুদ্রে ভাসমান। পর্ব্বতগুলি ইহার সমতা রক্ষা করে এবং একটী প্রকাণ্ড গম্বুজই আকাশকে বহন করে। আকাশের উপরে সপ্তম স্বর্গ। একের উপরে অন্যটী এবং সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্বর্গে ভগবান বাস করেন। এই উচ্চতম স্বর্গ পক্ষবিশিষ্ট জন্তুগণ বহন করেন। উল্কাসকল কুস্বভাবাপন্ন প্রেতদিগের প্রতি নিক্ষিপ্ত অলন্তপ্রস্তর ব্যতীত আর কিছুই নয়।

তৎপর, লেখক ইহুদীদিগের সৃষ্টি বিজ্ঞানের কথা লিখিয়াছেন—ইহাদের পৃথিবী ছয় দিবসে প্রস্তুত হইয়াছিল, মধ্যস্থলে পৃথিবী এবং চতুর্দ্দিকে আকাশ। সূর্য্য, চন্দ্র এবং তারা সকল পৃথিবীতে আলোকরশ্মি বিতরণার্থই প্রস্তুত। মনুষ্যই সৃষ্ট পদার্থের প্রধান বস্তু। এই মত মুসলমান এবং খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যেও প্রচলিত। রোম এবং গ্রীসের অনেকগুলি পৌরাণিক কথা এই জ্যোতিষ সংক্রান্ত কুসংস্কারের উপরই স্থাপিত। প্রথিতনামা চিত্রকর গিডোর (guedo) উষাদেবীর (Aurora) চিত্রে এই বিষয়টী বেশ পরিস্ফুট। সূর্য্যদেব এই চিত্রের প্রধান দেবতা; তাঁহার চতুর্দ্দিকে পল দণ্ডগুলি (hours) তাঁহাকে ঘিরিয়া আছেন এবং উষাদেবী সকলের অগ্রগামিনী হইয়া পুষ্প এবং শিশির বিতরণ করিতে করিতে চলিয়াছেন।

রোমে বালকবালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়া হইত যে সূর্য্য আপলোদেবের (Apollo) রথচক্র মাত্র। প্রাতঃকালে এই দেবতা পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া চতুরশ্বযোজিত যান আরোহণে স্বর্গ ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন করেন। রাত্রিতে একখানি সুবর্ণ নির্ম্মিত নৌকায় তিনি নিদ্রা যান এবং এই নৌকাখানি পৃথিবীর উত্তর সীমানা দিয়া পূর্ব্বে সমুদ্রে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দেয়। চন্দ্র আপলোর ভগিনীরূপে আখ্যাত।

তখন লোকে ভাবিত গ্রহগণের পরিভ্রমণ সময়ে গীতধ্বনি হয় কিন্তু ইহা এত স্বর্গীয় যে মনুষ্যগণের অপবিত্র কর্ণে ইহা ধ্বনিত হয় না। বস্তুতঃ সেক্সপীর, মিলটনের অনেক স্থলে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

পৃথিবী যে গোলাকার এবং চন্দ্র যে সূর্য্য হইতে রশ্মি গ্রহণ করে, তাহা খৃষ্টজন্মের ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে থেলিস নামক গ্রীকজ্যোতির্ব্বিদই প্রথম প্রচার করেন। আনাক্সাগোরাস নামক অন্য একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ চন্দ্রগ্রহণ স্বাভাবিক কারণেই হইয়া থাকে এইরূপ প্রচার করাতে তিনি ও তাঁহার সকল আত্মীয় স্বজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার আদেশ পান। তাঁহার বন্ধু পেরিক্লিস তখন আথেন্সের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন,

কিন্তু তত্রাপি তিনি অতি কষ্টেও সকলকে নির্ব্বাসন দণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

খৃষ্টজন্মের চারি শত বৎসর পূর্ব্বে পিথাগোরাস জন্ম গ্রহণ করেন। প্রবাদ এই, গ্রহ সকল যে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে তিনিই তাহার প্রথম প্রচার করেন। কোপারনিকাস যখন বহু বৎসর পরে এই কথা পুনর্ব্বার জনসাধারণের সমক্ষে আনেন তখন তাঁহাকে পৌত্তলিক আখ্যা দেওয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টজন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইয়ুরোপে বর্ত্তমান জ্যোতিষের প্রচার হয়। এই সময়েই আলেকজান্দ্রিয়া নগরে ইউক্লিড,ইয়াটস্থিনিস্ হিপার্কাস, এবং টলেমীর আবির্ভাব,—আর তাহার কত পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষের লোকে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে বুৎপন্ন।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমাদের দেশে কুসংস্কারের অভাব নাই, কিন্তু সভ্য ইউরোপেও ইহার প্রভাব বড় কম নহে। সে দেশে অমাবস্যার পরেই যদি কেহ কাহারও দক্ষিণ স্কন্ধের উপর দিয়া চন্দ্র দেখেন তবে তাহা সৌভাগ্য জ্ঞাপক,—কাহারও বাম স্কন্ধের উপর হইতে চন্দ্র দেখা বিপত্তিসূচক। সমতলভূমিতে চন্দ্রের বৃদ্ধির সময় আর নিম্নভূমিতে চন্দ্রের হ্রাসের সময় শস্য লাগান সুফলপ্রদ; এই প্রকার কত সংস্কার এখনও সুসভ্য ইউরোপে প্রচলিত,—তাহার বিস্তারিত তালিকা দিতে হইলে ভারতীর পৃষ্ঠায় স্থান সঙ্কুলান হয় না।

জাপানে কুসংস্কার।

জাপানী ডাক্তার ইয়ামাদা লিখিত "জাপানে কুসংস্কার" নামক গ্রন্থ পাঠে দেখা যায় জাপানীদের সহিত আমাদের কুসংস্কারের আশ্চর্য্যরূপ সাদৃশ্য। দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সাধারণতঃ কোন জাপানী স্থান পরিত্যাগ করে না। অনেক সময় দৈব কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট স্থলে যদি যথেষ্ট যায়গা না থাকে তাহা হইলে প্রথমত সেই "শুভস্থলে" অস্থায়ী ভাবে কষ্টশ্রষ্ঠে কয়েকদিন থাকিয়া পরে অন্য স্থলে যায়। নূতন স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে হইলেও তাহারা দৈবজ্ঞের পরামর্শ লইয়া থাকে। নূতন বাটীর সদর, দরজা, গবাক্ষ, পাকশালা প্রভৃতিও দৈবজ্ঞের নির্দ্দেশ মতই নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

যখন যে ডাক্তার "শুভস্থলে" বাস করে, তাহাকেই চিকিৎসার্থ আহ্বান করা হয়। সে ডাক্তার অশিক্ষিত হইলেও আসে যায় না। কোন স্থলে যাত্রা করিবার সময়ও তাহারা আমাদের ন্যায় দিনক্ষণ দেখিয়া যাত্রা করে। যদি শুভদিন না থাকে তবে যাত্রা বন্ধ রাখে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডাক্তার মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, যে এক ব্যক্তি পিতার অসুখের সংবাদ টেলিগ্রামে অবগত হইয়া দৈবজ্ঞের নিকট গমন করায় দৈবজ্ঞ বলিলেন—তিন চারি দিনের মধ্যে যাত্রার শুভদিন নাই। কাজেই যাত্রায় তাহার বিলম্ব হইয়া পড়িল। ফলে দাঁড়াইল এই, বাটী পৌঁছিয়া সে দেখিল যে, ঠিক পূর্ব্ব দিন তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। অনেক সময় স্কুলের ছাত্রেরা যে বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী সেই বিষয়েও ভাল পরীক্ষা দিতে পারে না—কারণ দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন পরীক্ষার সময়টি শুভ নহে। একদিন ডাক্তার মহাশয় কোন গল্প-লেখককে পরিহাসচ্ছলে বলেন যে, শীঘ্রই তিনি একটি আঘাত পাইবেন। এই কথা শুনিবামাত্র গল্পলেখক এমন বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন যে, ডাক্তার তখন কথাটা রহস্যমাত্র বারংবার ইহা বলিয়াও তাহার সে বিশ্বাস দূর করিতে পারিলেন না। গল্পলেখক দিনদিন শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন। ডাক্তার মহা প্রমাদ গণিয়া অবশেষে আশাকুসা নগরীর মন্দির হইতে মাদুলি আনাইয়া এবং মাদুলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গল্প-লেখককে উহা ধারণ করিতে দিলেন। মাদুলি ধারণের পর হইতেই গল্পলেখক ক্রমশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

উক্ত প্রবন্ধে কুসংস্কারের আর একটী বেশ মজার

গল্প লিখিত হইয়াছে। টকিও নগরীর এক দেবমন্দিরের সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত কোন কারিকর চূড়া হইতে দেখিল যে, মন্দিরের পাশে একজন মজুর মন্দিরেরই একটী মুরগী শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়া একটী খালি থলিয়ার মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। কারিকর তাহার সহযোগীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া মুরগীটি লইয়া সকলে মিলিয়া আহার করিলেন। এবং তৎপরিবর্ত্তে থলির মধ্যে এক দেবতার প্রতিকৃতি রাখিয়া দিলেন। দেবতা মুরগীকে দেবমূর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছেন,—দেখিয়া মজুর বেচারা ইহা তৎপ্রতি দেবতার শাপজ্ঞানে মৃতবৎ হইয়া পড়িল। ইহা শুনিয়া কারিকর মজুরের নিকট উপস্থিত হইয়া আমূল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয়,—সে কথা শুনিবার কয়েক দিনের মধ্যেই মজুর পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ হইয়া উঠিল।

শ্রীযঃ

পৃথিবীর পরিণাম।

কিছুদিন পূর্ব্বে অধ্যাপক ল্যাঙ্গলে (Langley) বলিয়াছিলেন যে আমাদের এ সৌরজগত শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সূর্য্যের উত্তাপ দিন দিন কমিয়া আসিবে এবং অসম্ভব ঠাণ্ডায় প্রাণিগণ প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু শীঘ্র হইলেও সূর্য্যের সেরূপ ভাবে উত্তাপহীন হইতে এখনও ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ বৎসর। সম্প্রতি ল্যাঙ্গলে মহাশয় আমাদিগের অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্তির আর এক ভয় দেখাইয়াছেন।

চন্দ্রের প্রভাবে যে জোয়ার ভাঁটা হয় তাহার ফলে পৃথিবীর দিবাভাগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন অবশ্য এতই সামান্য যে আজও পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার পরিমাণ ধরিতে পারা যায় নাই। কিন্তু ব্যাপারটা যে সত্য সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বাষ্পীয় শক্তির অবিশ্রাম প্রয়োগ না থাকিলে রেলের গাড়ী ছুটিতে ছুটিতে যেমন রেলের ঘর্ষণে ক্রমে ক্রমে গতিহীন হইয়া পড়ে ইহাও সেইরূপ।

চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীর জল যে পরিমাণে স্ফীত হয় তাহা নানাদেশে বিভক্ত হইয়া নানাপ্রকার ফল উৎপন্ন করে সত্য, কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে এই জলস্ফীতির ফলে পৃথিবীর গতি মন্দীভূত হইতেছে। তিন ফুট উচ্চ একটা তরঙ্গ পৃথিবীর গতির বিরুদ্ধপথে অবিরাম ছুটিলে তাহার গতি যেটুকু প্রতিহত হওয়া সম্ভব এ স্থলেও তাহাই হইতেছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন যে চন্দ্রলোকেও এইরূপ জলস্ফীতির হেতু তাহার দিবসের সংখ্যা প্রায় ২৮ দিন কমিয়া গিয়াছে।

আমাদের পৃথিবীর গতি যত কমিয়া আসিবে দিবসের দৈর্ঘ্য ততই বাড়িবে। এবং রাত্রিগুলা তখন এত অধিক ঠাণ্ডা হইবে যে রাত্রিকালের সেই সুভীষণ শীত, এবং দিবসের প্রচণ্ড উত্তাপ প্রাণিগণের সমানই প্রাণসংহারক হইবে। কিন্তু পৃথিবীর সেরূপ অবস্থা আসিতে এখনও লক্ষ লক্ষ বৎসর।

পৃথিবীর ধ্বংসের আর এক কারণ তাহার ক্ষয়। পৃথিবীর স্থলভাগের অবিরামই ক্ষয় হইতেছে। ওয়ালেস সাহেব গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে প্রতি তিন সহস্র বৎসরে এক ফুট করিয়া পৃথিবীর স্থলভাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রগর্ভে যাইতেছে। এ হিসাবে দশ লক্ষ বৎসরে তিন শত ফুট ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। ইয়ুরোপের সাধারণ উচ্চতা ৬৭১ ফুট এবং আমেরিকার উচ্চতা ৭৪৮ ফুট। সুতরাং এইরূপভাবে পৃথিবীর ক্ষয় যদি চলিতে থাকে তাহা হইলে বিশ লক্ষ বৎসরের পর ইয়োরোপ ধৌত হইয়া সমুদ্র গর্ভে যাইবে এবং আমেরিকা ত্রিশ লক্ষ বৎসরে তুল্যদশা প্রাপ্ত হইবে। তাহার পর আমাদের অদৃষ্টে যে কি আছে তাহা আমরা কেহই জানি না।

আশ্চর্য্য টেলিফোন্।

মিষ্টার এস্. জি, ব্রাউন (S. G. Brown) নামে এক ইংরাজ একটি অদ্ভুত টেলিফোন্ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। সাধারণ টেলিফোন যন্ত্রের অপেক্ষা ইহা দ্বারা শব্দের গতির দূরত্ব অভূতপূর্ব্ব ভাবে বর্দ্ধিত হইবে।

ইংলণ্ডের এক বিজ্ঞান সমিতিতে ব্রাউন সাহেব

তাঁহার এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্র সম্বন্ধে সেদিন এক বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ আমরা নিম্নে সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

মনুষ্য কণ্ঠস্বরের বা অন্য যাবতীয় শব্দের কম্পন টেলিফোনের তারের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার কারণ এই যে, সেই তারের মধ্য দিয়া যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলিতে থাকে,উক্ত কম্পন সকল সেই বৈদ্যুতিক গতিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া সেই বিক্ষেপের সাহায্যে যথাস্থানে আপনাদিগকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। টেলিফোনে যে ব্যক্তি শব্দ শ্রবণ করে, যথার্থপক্ষে সে সেই বৈদ্যুতিক প্রবাহের গতি বিক্ষেপ শ্রবণ করে মাত্র। বর্ত্তমান অবস্থায় কিন্তু তাড়িৎপ্রবাহে বিক্ষেপ ঘটাইবার এবং সেইগুলিকে দূর পথে লইয়া যাইবার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে আমাদের কর্ণে যেমন অতি তীব্র ও অতি মৃদু শব্দ আসিয়া আঘাত করে, টেলিফোনেও সেইরূপ এত মৃদু শব্দ আসিয়া উপস্থিত হয়, যে অনেক সময় তাহা অনুভব পর্য্যন্ত করা সম্ভব হয়না। ব্রাউন সাহেবের টেলিফোন্ একপভাবে নির্ম্মিত যে ইহার সাহায্যে এই সকল মৃদু শব্দ পর্য্যন্ত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইবে। ব্রাউন সাহেবের কৌশলটী আর কিছুই নহে। তিনি প্রবাহবাহী তারের একস্থানে এক অতি ক্ষুদ্র ছেদ রাখিয়াছেন মাত্র। এই ছেদের ফলে দুইটি সংযোগ সীমার মধ্যের দূরত্ব প্রবাহের দ্বারা আপনিই রক্ষিত হয়। ছেদের দুইটি মুখে Asmiumiridium নামক কঠিনতম ধাতুর দুইটি টিপ লাগান আছে।

এইরূপ যন্ত্রের সাহায্যে কিছু কালের মধ্যেই কলিকাতায় বসিয়া লাহোরে কোন বন্ধুর সহিত আলাপ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তদ্ভিন্ন টেলিফোনের তারগুলি এখনকার ন্যায় অধিক মোটা করিবার আর আবশ্যক হইবে না। সামান্য সরু তারেই সহস্র মাইল দূরে শব্দ প্রবাহিত হইবে। সুতরাং ব্যয়ও অনেক লাঘব হইবে সন্দেহ নাই।

এই আবিষ্ক্রিয়ায় আর একটি উপকার সাধিত হইবে। আজকাল তারবিহীন টেলিগ্রাফে যে সকল সংবাদ প্রেরণ করা হয়, সেগুলি অধিক দূরের হইলে আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। এই যন্ত্রের দ্বারা সেগুলি খুব স্পষ্ট রূপেই শুনা যাইবে। আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত তারবিহীন টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণ করিলে এক্ষণে তাহা অনায়াসেই শুনিতে পাওয়া সম্ভব হইবে।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে ত এই গেল। কিন্তু বিজ্ঞানের আরও এক দিকে এই যন্ত্র যুগান্তর উপস্থিত করিবে বলিয়া মনে হয়। ষ্টেথোস্কোপ (stethoscope) যন্ত্রের নাম অনেকেই জানেন। ডাক্তারেরা এই যন্ত্রের সাহায্যে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের শব্দ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ব্রাউন সাহেব তাঁহার এই নবাবিষ্কৃত উপায়ে এক অতি সূক্ষ্মশক্তি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক ষ্টেথোসকোপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অর্থাৎ যন্ত্রটি এখনকার ন্যায় ভেঁপুর আকার না হইয়া, একটি সূক্ষ্ম টেলিফোন্ দাঁড়াইবে। ভবিষ্যতে চিকিৎসকগণ রোগীর হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসের অতি সামান্য শব্দও এতদ্দ্বারা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। আরও এক নূতন ব্যাপার হইবে। রোগীর বুকের উপর যন্ত্র বসাইয়া তাহা টেলিফোনের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে চিকিৎসক বহুযোজন দূরে বসিয়াই তাহা শুনিতে পাইবেন এবং আবশ্যক মত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। লণ্ডনে বসিয়া ওয়াইট দ্বীপ হইতে এই প্রকারে হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনা গিয়াছে। বিজ্ঞান দিনে দিনে কি অসম্ভবকেই না সম্ভব করিয়া তুলিতেছে।

শ্রীসুঃ

বন্দী।

১১

ফিরিয়া দুই হাতে মাথা রাখিয়া আমি শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। প্রাণটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল—এই পাষাণ দেয়ালের প্রত্যেক কথাটি জানিবার জন্য এক বিরাট আগ্রহ!

অন্ধকারে দেয়াল হাতড়াইতে লাগিলাম! মাকড়সার জালে হাত জড়াইয়া গেল। জাল মুক্ত করিয়া শয্যার উপর বসিলাম! ঘুমে চোখ ভরিয়া আসিতেছিল। নিদ্রা-ভঙ্গে দেখি, কক্ষে অস্পষ্ট আলো আসিয়াছে। আবার সেই পাষাণ দেয়ালের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। দেয়ালের কোণে চারিটি নাম লেখা,— দাঁতো, ১৮১৫; পুলেঁ ১৮১৮; জিন মার্টিন ১৮২১, কাস্তের্গ ১৮২৩। নামগুলার সহিত কি এক ভীষণ স্মৃতি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল!

দাঁতো ভ্রাতৃহন্তা, পিশাচ পুলেঁ তার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছিল, জিন মার্টিন বন্দুকের গুলিতে বৃদ্ধ পিতার মাথা উড়াইয়া দিয়াছে, আর কাস্তের্গ—ডাক্তার কাস্তের্গ তার বন্ধুকে বিষ দিয়াছিল।

আমার সমস্ত প্রাণখানা শিহরিয়া উঠিল। তাহাদেরি শেষ নিশ্বাসে এ গৃহের বায়ু এখনো যেন ভরিয়া রহিয়াছে! এই শয্যার উপর তারা তাদের রক্তমাথা হৃদয়ের শেষ কথা, শেষ চিন্তাটুকু ঢালিয়া দিয়াছে! এই ঘরের মধ্যেই তারা চলা-ফেরা করিয়াছে! আজো তাদের দীর্ঘশ্বাস এ ক্ষুদ্র ঘরটিকে উষ্ণ রাখিয়াছে—শীতল হইবার অবকাশটুকুও দান করে নাই!

তার পর, আমি তাদেরি পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি! তারা যেন চারিধার হইতে হাত নাড়িয়া আমাকে ডাকিতেছে—ঐ না তাদের কণ্ঠস্বর শুনা যায়! আমি চক্ষু মুদিলাম। তাদের মূর্ত্তি যেন আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিল!

এ সত্য, না স্বপ্ন, না মতিভ্রম! খানিকটা জল পায়ে লাগিল—কি, এ! মাকড়সা—বড় একটা মাকড়সাকে আমি পা দিয়া চাপিয়া মারিয়াছি—ইহারই জাল আমার হস্তস্পর্শে ছিঁড়িয়া গিয়াছে! আমার চেতনা হইল—এতক্ষণ যেন মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম! কি সব ছায়ামূর্ত্তি আমার চারিধারে ঘুরিতেছে!

না, না! মনকে সুস্থ সবল করিতে হইবে। পলে পলে মৃত্যু যন্ত্রণা! ইহার গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইতেই হইবে। দাঁতো পুলেঁর দল কবরের নীচে নিদ্রা যাইতেছে—তারা এখানে আসিবে না, কখনো না—বৃথা তাদের চিন্তায় কেন অবশ হইয়া পড়ি! এ কারাগৃহ হইতে পলায়ন বরং সম্ভব, কিন্তু মাটির নিম্নে, কবর ভেদ করিয়া বাহির হওয়া একেবারে অসম্ভব! তবে, কেন, আমি মিছা ভয়ে সারা হই?

১২

উজ্জ্বল, প্রশস্ত দিবালোক। কারার চারিধার হইতে একটা কোলাহলের ধ্বনি আসিতেছিল। প্রকাণ্ড ভারী দ্বারগুলা মুক্ত ও বদ্ধ করিবার শব্দে, চাবীর ঝন্‌-ঝন্‌ আওয়াজে, চীৎকার-ধ্বনিতে চারিধার মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল! এই নীরস, কঠিন পাষাণ

গৃহ আজ কি উল্লাস-সঙ্গীতে সহসা ভরিয়া উঠিল! চারিধারে আনন্দ, কোলাহল, সজীবতা, তাহার মধ্যে নিরানন্দ উদাস, শুধু, আমি!

দ্বারের পাশ দিয়া একটা প্রহরী চলিয়া গেল। তাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত গোলমাল, কেন? এত আহ্লাদ কিসের?"

প্রহরীটা উত্তর দিল, "ওঃ, আজ যে কয়েদীগুলার পায়ে বেড়ি দেওয়া হচ্ছে—কাল ওরা তুলোঁয় যাবে, তুমি দেখিবে না কি?"

সন্ন্যাসীর মত, এই বৈচিত্র্যহীন, অপ্রসন্ন, নিঃসঙ্গ জীবন, ত, আর বহা যায় না! আমি দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

প্রহরী আমাকে অতিরিক্ত সতর্কভাবে একটা ঘরে লইয়া চলিল। ঘরটায় বসিবার জন্য একখানি আসনও ছিল না, শুধু একটা প্রকাণ্ড জানালা ছিল! মুক্ত জানালা! তাহারি গরাদের মধ্য দিয়া, আজ, কতদিন পরে অনেকখানি আকাশ দেখিয়া বাঁচিলাম!

প্রহরীটা কহিল, "এখান হইতে দেখিতে পাইবে! রাজার মত বসিয়া দেখ, কাহারো ঘেঁস সহিতে হইবে না!"

কথাটা শেষ করিয়া বিরাট শব্দে সে দ্বারে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেল!

জানালা দিয়া বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ-ভূমি দেখা যাইতেছিল! প্রাঙ্গণের সীমা উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা! পায়রার খোপের মত জানালা-ভরা প্রকাণ্ড দালান, তারি মাঝে মাঝে দেয়াল! জানালাগুলা অসংখ্য নরশিরে ভরিয়া গিয়াছে! সকলেই কৌতুক দেখিতে দাঁড়াইয়া! মুখে-চোখে একটা আগ্রহের চিহ্ন—কৌতূহলের বিরাট রেখা! নরকের প্রেতগুলা, যেন, একটু ফাঁক পাইয়া, আজ বাহিরের মুক্ত বায়ু ও আলো দেখিয়া, আনন্দে মত্তোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে! প্রাঙ্গণের দিকেই সকলে চাহিয়াছিল। আর কিছু দেখিবার কাহারো অবসর ছিল না।

বারোটা বাজিল। কোণের ফটক খুলিয়া গেল। কত নূতন মূর্ত্তি আসিয়া রঙ্গস্থলে দেখা দিল। নিমেষে যেন সেই মূক, মৌন কারাগৃহ বিচিত্র কলরবে চঞ্চল হইয়া উঠিল। চারিদিকে একটা জীবনের স্পন্দন দেখা দিল। উচ্চ হাস্য ও চীৎকার, মুহূর্ত্তেই স্থানটীকে আনন্দ-পরিপূর্ণ ক্রীড়া-ভূমিতে পরিণত করিল। যেন, দৈত্যের দল, আজ, ছুটি পাইয়া, আনন্দে সাড়া দিয়া উঠিয়াছে।

বন্দীদলের নতদৃষ্টি, প্রহরীগুলার বীর-দাপ সমস্ত মিলিয়া একটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বন্দীদিগের নাম-ডাক হইল। কি তাদের অপরাধ, দণ্ডের পরিমাণই বা কি? যাদের দণ্ডের পরিমাণ অধিক, তাদের নাম-ডাকের সহিত উচ্চ জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল। উৎসুক উদ্‌গ্রীব দর্শকের দল মনের আবেগ যেন ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না! বন্দীর দল, যেন, সৈন্যের মত, আজ যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিয়াছে, তাই এ বিরাট উল্লাসের উন্মাদ চীৎকার! দুই একজন দর্শক আনন্দে ডিগবাজী খাইয়া ফেলিল!

তার পর, বন্দীর দলে পরস্পরে আলাপ পরিচয় আছে কি না, তাহারি সন্ধান হইতেছিল! যদি থাকে, তবে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র

করিয়া দাও, একসঙ্গে রাখিও না! দণ্ডের কঠিনতা তাহাতে হ্রাস হইয়া যাইবে! এবং তাহা হইলে, তাহারা দিব্য আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাইয়া দিবে।

চারিদিকের এই বিচিত্র কলরব আমার কাছে এক অখণ্ড রাগিণীর ঝঙ্কারের মত ভাসিয়া আসিতেছিল। যেন কোন্ মায়া-লোকের বিচিত্র সঙ্গীতধ্বনি! কিন্তু অর্থহীন, লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন রাগিণী! মৃদু বায়ু আমার তপ্ত ললাটে আসিয়া লাগিতেছিল—রৌদ্রের মধ্য দিয়া স্নিগ্ধ আশার রশ্মি যেন ছড়াইয়া পড়িতেছিল। মনে হইতেছিল, ইহাই ত জীবন! এই রৌদ্রকিরণ, মুক্ত বায়ু, উদার আকাশ,—এ সব হইতে দূরে থাকা—সে ত মৃত্যু!

রৌদ্রটা যেন বায়ুর মতই সরিয়া গেল! কে যেন তার উপর দিয়া একটা সূক্ষ্ম কালো পরদা টানিয়া দিল—বিহঙ্গ পক্ষের মত, লঘু মেঘ, পৃথিবী ও রৌদ্রের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিল। স্বপ্নের কুহকজালেরি মত, ঈষন্নিবিড় ছায়া আসিয়া আলোটুকুর সম্মুখে দাঁড়াইল। সহসা দুই এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল! প্রাঙ্গণ হইতে দর্শকের দল সরিয়া পড়িল। নীড়-হারা পাখীর মত, অসহায়ভাবে বন্দীগুলা ভিজিতে লাগিল! দু-একজন কাঁপিয়া উঠিতেছিল! তবু নিস্তার নাই! কারণ, তারা বন্দী, তাদের আবার আরাম-স্বস্তি কি!

বৃষ্টি থামিলে প্রহরীরা শৃঙ্খল টানিয়া আনিল! পিছনে কামারের দল! বন্দীগুলাকে বসাইয়া দেওয়া হইলে, শৃঙ্খল আঁটিয়া কামার তাহাতে মুগুরের ঘা দিল। কি পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা! কেহ ভূমে লুটাইল, কেহ কাঁদিয়া উঠিল—প্রহরী-দলের গুঁতায় আদবকায়দা তখনি রক্ষা পাইল! নিশ্চল পাষাণের মত, আমি দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। তার পর, ডাক্তারের পরীক্ষা!

তখন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। আবার সূর্য্যের আলো ফুটিয়াছে! কালো পরদাখানি কে যেন দুইহাতে সরাইয়া লইয়াছে! ভিতর হইতে বন্দীর দলে, কেহ শিষ দিল—কেহ-বা একছত্র গান গাহিয়া উঠিল!

তার পর সারি দিয়া সকলে বসিয়া গেল! এবার ভোজনের পালা। আহার আসিল, সঙ্গে বড় বড় বাল্‌তি—তাহার মধ্যে সবুজ রঙের কি একটা জলীয় পদার্থ! এগুলাতে স্বাদ নাই, গন্ধ নাই, যাহারা ভুক্তভোগী তাহারা জানে, কি এ ভয়ঙ্কর জিনিস!

তবু তারা—বেচারা ক্ষুধিতের দল—তৃপ্তির সহিত, তাহারি সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত!

আগ্রহের সহিত আমি সব দেখিতে ছিলাম, কোন জ্ঞান ছিল না! কি একটা করুণায় আমার সমগ্র চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল। চোখে জল আসিয়াছিল।

সহসা একটা উচ্চ চীৎকার ধ্বনি-শুনিলাম, "ওঠ, চল—"। বন্দীর দলে কোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সকলে চলিতে আরম্ভ করিল!

আমারি জানালার পাশ দিয়া তাহারা চলিতেছিল! আমাকে দেখিয়া একবার দাঁড়াইল! আমার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! আমি কি পশুশালার পশু যে, এমন করিয়া আমাকে দেখিতে দাঁড়াইবে!

একজন কহিল, "ফাঁসির লোক দেখ—

ফাঁসি হবে এর।" চারিধারে একটা হাসির ধূম পড়িয়া গেল! বর্ব্বর!

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল! মনে হইতে-ছিল, আমি যেন শূন্যে ঝুলিতেছি, ভূমির উপর দাঁড়াইয়া নাই! কি করিয়া ইহারা জানিল যে, আমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়া গিয়াছে!

"বিদায়, বিদায়, বন্ধু", নির্লজ্জভাবে তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল! একজন কহিল, "আমার চেয়ে ভালো—শীঘ্র ছুটি মিলিবে! আমি চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া জেলে পচিব।"

আমার কোন চেতনা ছিল না! নড়িবার শক্তিটুকু অবধি না! আমার চোখের সম্মুখ দিয়া, জলের স্রোতের মত, বন্দীর দল চলিয়া গেল!

সহসা চেতনা ফিরিলে আমি শিহরিয়া উঠিলাম, ভাবিলাম, এই জানালার বাহিরে কত আলো, কত আনন্দ,—আর ভিতরে বায়ু, আলো, প্রাণ সকলই রুদ্ধ। যদি এই গরাদগুলা না থাকিত—আঃ—গরাদ ধরিয়া প্রাণপণ বলে একবার নাড়া দিলাম! একটুও সে নড়িল না। আমিই আঘাত পাইলাম। কি এক অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম! রাগে, ক্ষোভে, আমার অন্তরখানা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল!

দূর হইতে কোলাহলের একটা অস্পষ্ট ধ্বনি শুনা যাইতেছিল—আমি জানালার গরাদ ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম। দূরের কোলাহল ক্রমে আমার কর্ণে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল—আলোটুকুর উপর কে যেন আবরণ টানিয়া দিতেছিল—একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া আমি মূর্চ্ছিত হইলাম!

(ক্রমশঃ)

ডিরোজিয়োর কবিতা।

বাল বিধবা।

আমার স্বপন, সুখের স্বপন,
নিমেষে ফুরাল,—এই সে ক্লেশ;
ইন্দ্র ধনুর ভঙ্গুর তনু
অস্ত রবির কিরণে শেষ।

রিক্ত শাখার রক্তিম পাতা,
বাতাসে হতাশে কাঁপিয়া মরি,
নিঠুর জগতে আছি কোনো মতে,
জানি না কখন পড়িব ঝরি'।

গঙ্গার ধারা যতদূর যায়
ওগো দয়াময়! তাহারো পারে
লয়ে যেয়ো এই সুখ-বঞ্চিত
চিরলাঞ্ছিত ভগ্ন ভারে।

"বৌ-দিদি।"

বৌদিদি চাস্? বোন্‌টি আমার,
বৌদিদি তোর চাই?
তারার হাটে খুঁজব এবার
দেখ্‌ব যদি পাই!

তুই যে মোদের পুণ্যপ্রভা,—
ঠাকুর ঘরের দীপ ;
তোর মতোটিই আন্‌তে হ'বে
পুণ্য হোমের টিপ্।

স্বপ্ন-দেবীর পাখা দু'খান্
ধার ক'রে-না-নিয়ে,
ঝড়ের রাতে বেরিয়ে যাব
কারেও না জানিয়ে ;
ধরব গিয়ে ঝড়ের বেগে
রামধনুকের ডোর,
রামধনুকের একটি রেখা
বৌদি' হ'বে তোর !

ডুব্‌ব সোজা সাগর জলে
সূর্য্যালোকের মত,
প্রবাল গুহায় অপ্সরীরা
নাইতে যেথায় রত,
পরীরাণীর মুকুটমণি,
আন্‌ব সাথে মোর ;
সেই মুকুটের মধ্যখনি
বৌদি' হ'বে তোর !

পক্ষীরাজের পিঠেতে সাজ
মুখে লাগাম দিয়ে,
যাত্-জানা পাগল্-পানা
কল্পনাকে নিয়ে,
সটান্ গিয়ে কল্পলোকের
আন্‌ব সে মন্দার,
বৌদি' তোমার সেই তো হ'বে ;
বোন্‌টি গো আমার।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রলোভন।

(ফরাসী গল্প)

"কে ? পল ! খুব লোক ভাই তুমি ! সাড়ে ছটার সময় তোমার আসবার কথা—এলে ৭৷৷৹টায়, ঠিক একটি ঘণ্টা দেরী ! খাবারগুলো সব জমে যেন বরফ হয়ে গেছে। আবার আজ দোকানে যেতে হবে। সন্তাণরে একটা জ্যাকেট না কিনলে নয়। আজ 'সেলে'র শেষ দিন—তাও বুঝি ভুলে গিয়েছ ?"

এইরূপে পত্নী স্বামীকে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। দম্পতির আজ চারি বৎসর বিবাহ হইয়াছে। যুবক পেরীর মহাসভার সভ্য। এককালে তাঁহার ভাল দিন ছিল কিন্তু ভাগ্য বিপর্য্যয়ে আজ তাঁহাকে বাৎসরিক ১০ পাউণ্ডে পেরীর একটী ক্ষুদ্র অজানা পল্লীতে পাঁচতলার উপর কক্ষ ভাড়া করিয়া বাস করিতে হইতেছে। ঘরে আসবাব পত্র অতি সামান্যই—একখানি ডেস্ক, দুজনের জন্য দুখানি চেয়ার এবং আহারের জন্য ছোট একটি টেবিল। ঘরের কোণে স্তূপাকার "ব্লু" বুক অর্থাৎ মহাসভাসম্বন্ধীয় পুস্তক। ডাইনিং টেবিলের চাদরটাতেও ছিদ্রের অভাব নাই। দেওয়ালে একখানি ছবি ও একখানি দর্পণ। মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতেই গৃহবাসীর অর্থকষ্টের যথেষ্ট

প্রমাণ পাওয়া যায়। যুবকের বেশভূষাতেও ব্যয়বাহুল্যের লক্ষণ কিছুমাত্র নাই।

চারি বৎসরের অভাব ও হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে যুবতীকে কিন্তু সৌন্দর্য্যহীনা করিতে পারে নাই। তাহার পরিধেয় বসন অল্প মূল্যের হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—মাথার চুলগুলি সুবিন্যস্ত, মুখখানি প্রফুল্লতা মাখান। ক্ষুদ্র টেবিলে আহারের পাত্রগুলি সাজাইয়া সহাস্য বদনে তিনি স্বামীকে বলিলেন "আসতে আজ্ঞা হউক—ডেপুটী মহাশয়। পেরীর মহানগরীর মহাসভার ডেপুটীর যোগ্য আহার্য্য প্রস্তুত।" যুবকও হাসিতে হাসিতে টেবিলে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ কি রেঁধেছ?"

"কেন? ঢের!—সুপ আছে, মাংস হয়েছে তার উপর একটু চাটনিও আছে।" সঙ্গে সঙ্গে একটী দীর্ঘ নিশ্বাসও পড়িল। যুবক এ নিশ্বাসের অর্থ বুঝিলেন, কহিলেন, "প্রিয়তমে, তোমার জন্যই বেঁচে আছি। আজ সারাদিন বজেটের তর্কবিতর্কে কোটী কোটী মুদ্রার কথা আলোচনা করেছি—আর আমার ঘরে—" যুবতী বাধা দিয়া বলিলেন "যাও—ও সব ভেবে কি হবে? একদিন না একদিন ভগবান দিন দেবেনই। এখন রান্না কেমন হয়েছে বল দেখি?" এক প্লেট সুপ নিঃশেষ করিয়া যুবক বলিলেন "বেশ হয়েছে। আর একটু দাও। সত্যি বলছি পেরী নগরীতে তোমার চেয়ে পাকা রাঁধুনী আর নেই।" তা'র পর দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন "এই রাত্রে কষ্ট করে যে তোমাকে সস্তা জ্যাকেট কিনতে যেতে হবে একথা কখনও ভাবিনি।"

"আবার ঐ কথা?" যুবতী অন্য কথায় প্রবৃত্ত হইলেন।

আহারাদির পর স্বামীকে এক পেয়েলা কফি, ও অতি স্বল্পমূল্যের একটী চুরুট দিয়া গৃহিণী বহির্গমনে প্রস্তুত হইলেন। যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি সঙ্গে যাব"? উত্তর হইল "না—আমি এক্ষুণি আসছি। এখন বাইরে গেলে প্রবন্ধটা শেষ করবে কখন? কালই ত ওটা চাই।"

(২)

এত দুঃখের মধ্যে এত কষ্ট সহ্য করিয়াও আমাদের ডেপুটী মহাশয় সুখী। কেবল, যখন তিনি তাঁর স্ত্রীর কষ্টের কথা মনে করেন তখন আর তাঁর জ্ঞান থাকে না, বুক ফাটিয়া ওঠে। এই মহাসভা আরও এক বৎসর বসিবে,—কিন্তু নূতন অধিবেশনে তাঁহার নির্ব্বাচিত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। তিনি সুবক্তা নহেন—তিনি দরিদ্র সুতরাং তাঁহাকে আর কে সাহায্য করিবে? সত্য—তাঁর কলমের জোর আছে কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা ত নিজ স্বার্থ ছাড়িয়া তাঁহার স্বার্থ দেখিবে না। ডেপুটী পীড়িত অবসন্ন হৃদয়ে উঠিয়া প্রবন্ধ লিখিবার জন্য ডেস্কের নিকট বসিলেন। হঠাৎ তাঁহার দ্বারে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—এবং দ্বার খুলিবামাত্র সান্ধ্যবেশ পরিহিত একটী অপরিচিত ব্যক্তি—"ক্ষমা করিবেন—আপনিই বোধ হয় ডেপুটী মহাশয়?" এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন। "আজ্ঞা হাঁ আমিই তাই বটে। আসন গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক।" "অবশ্য! অবশ্য! বড় অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।

আপনার কক্ষে আর কেহ আছেন কি?" "না আমার পত্নী এইমাত্র বাহিরে গেলেন।

অপরিচিত আসন গ্রহণ করিয়া একবার কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আমার নাম জিন লিক্রিয়ার। আমি বিশেষ প্রয়োজনেই আপনাকে বিরক্ত করিতে সাহসী হইয়াছি। ফ্রেঞ্চ-মিডল্যাণ্ড লাইন নির্ম্মাণ প্রস্তাবে মহাসভা যে কমিটি গঠিত করিয়াছেন আপনি ঐ কমিটির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন শুনিয়াছি। এই রেল নির্ম্মাণে ফরাসী জাতির যে যথেষ্ট আর্থিক লাভ হইবে এই বিষয় বলিতে ও মহাশয়ের মতামত জানিবার জন্য আসিয়াছি। কাগজ পত্রাদি সকলই আমার সঙ্গে আছে—আমার দৃঢ় বিশ্বাস এগুলি দেখিলে আপনি নিশ্চয়ই রেল নির্ম্মাণের পক্ষে মত দিবেন।" ডেপুটী উত্তর করিলেন "ক্ষমা করিবেন! আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে এ রেল নির্ম্মাণে আমাদের যথেষ্ট লোকসান এবং সেইজন্য আমি ইহার বিরুদ্ধেই মত দিব।" "যদি কিছু মনে না করেন, তবে এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু কাগজ পত্র দেখাইতে পারি কি?" "তাহাতে ক্ষতি কি?" ডেপুটী কাগজ দেখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে দরজায় অতি জোরে ঘণ্টা বাজিতে লাগিল।

ডেপুটী দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন যে, বাড়ীওয়ালার লোক বাড়ীভাড়ার তাগাদার জন্য আসিয়াছে। গত তিন মাসের ভাড়া বাকী পড়িয়াছে। 'আগামী কল্য ভাড়া দেওয়া যাইবে' একথার উত্তরে দরোয়ান মুখের উপরই বলিয়া ফেলিল যে, "ইঁহারা আইন প্রণয়নকার অথচ নিজের আইন মানেন না।" অতি কষ্টে দরোয়ানকে ফিরাইয়া দিয়া ডেপুটী অন্যমনস্ক ভাবে পুনর্ব্বার কাগজ উল্টাইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন "এ কি? এ ৫০,০০০ হাজার ফ্রাঙ্কের চেক এখানে কে রাখিল?"

মৃদুহাস্য করিয়া জিন লিক্রিয়ার বলিলেন "আপনার ভোট আমাদের একান্ত আবশ্যক। কমিটির ছয় জন সদস্যের মধ্যে তিন জন আমাদেরই পক্ষ ভুক্ত। বক্রী তিনজন আমাদের বিপক্ষ সুতরাং তাহারা যে আমাদের বিরুদ্ধে ভোট দিবে ইহা অবশ্যম্ভাবী। আপনি কোন পক্ষভুক্তই নহেন—ইহাতে আপনার ব্যক্তিগত লাভ লোকসান কিছুই নাই। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের পক্ষে ভোট দিতে স্বীকৃত হন, তবে আমাদেরই জয় হইবে।" ডেপুটী নির্ব্বাক—তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে—কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিয়াছে—তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন। চেকখানি এখনও হাতে আছে দেখিয়া জিন লিক্রিয়ার বলিতে লাগিলেন "রাজনীতিতেই আপনাকে নিঃস্ব করিয়াছে। আপনি কি ভাবে দিনপাত করিতেছেন একবার তাহাই বিবেচনা করুন। আপনার প্রিয়তমা পত্নীর কথা মনে করুন—এই রাত্রিকালে দুর্য্যোগে তাঁহাকে "সেলে"সস্তা জ্যাকেট কিনিতে যাইতে হইল।" লিক্রিয়ার উত্তর প্রত্যাশায় ডেপুটীর মুখের দিকে চাহিলেন। ডেপুটী এখনও নির্ব্বাক। লিক্রিয়ার বলিতে লাগিলেন "৫০ সহস্র ফ্রাঙ্ক। ইহা দ্বারা আপনি আপনার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। নূতন নির্ব্বাচনে ইহার কিয়দংশ ব্যয় করিলেই আপনার নির্ব্বাচন কেহই

প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। আপনার স্ত্রীকে সুখী করিতে পারিবেন—দুচার খানি গহনাও দিতে পারিবেন। আপনার কি লজ্জাবোধ হয় না যে ঐ সুন্দর অঙ্গুলিতে আপনি এই চারি বৎসরেও একটি আংটি পরাইতে পারেন নাই—একটি ভাল পোষাক দিতে পারেন নাই! খাটিতে খাটিতে বেচারীর সোনার বর্ণ কালি হইয়া গেল—তাহা কি আপনি দেখিয়াও দেখেন না?"

ডেপুটীও ঠিক তাহাই ভাবিতেছিলেন—"কি ছিল! কি হইয়াছে। মেরির খাটিতে খাটিতে হাত দুখানি শক্ত হইয়া গিয়াছে। এত কষ্ট! এত দারিদ্র্য! বাড়ীওয়ালার দরোয়ানের কাছে অপমান—দুধওয়ালার জোগান বন্ধ—মুদীর তাগিদপত্র। অর্থ কষ্ট, মনোকষ্ট, শারীরিক কষ্ট, অনাহার সবই একদিকে—কিন্তু অপর দিকে ধর্ম্ম সাধুতা সুনাম। কি করি?" লিক্রিয়ার আবার স্মরণ করিয়া দিলেন "ম্যাডাম ক্রুণোকে আপনি সুখী করিতে কি চান না?"

"ম্যাডাম ক্রুণোর কথা কে বলিতেছেন।" মেরি গৃহপ্রবেশ করিয়া নিজনাম অপরিচিতের মুখে শুনিয়া, ও স্বামীর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ম্যাডাম ক্রুণোর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?" ডেপুটীর প্রাণে এক নূতন বল সঞ্চারিত হইল। "মেরি! আমাকে রক্ষা কর।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য সুন্দররূপে মেরিকে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ডেপুটীর কণ্ঠে যেন তখন সরস্বতীর আবির্ভাব হইল!—তাঁহার অনর্গল কথা শুনিয়া জিন লিক্রিয়ার মনে মনে বলিতে লাগিলেন, মহাসভায় যদি এই ভাবে ডেপুটী বক্তৃতা করিতে পারেন তাহা হইলে আর তাঁহার কোন কষ্ট থাকে না। ডেপুটী বক্তব্য শেষ করিয়া চেকখানি মেরিকে দিয়া বলিলেন "ধর্ম্ম দিয়া অর্থ কিনিব বা অর্থ ছাড়িয়া ধর্ম্ম রাখিব—তুমিই এখন তাহা স্থির কর মেরি।" মেরি চেকখানি ফেরৎ দিয়া বলিলেন, "আত্মসম্মান এখানে বিক্রয় হয় না। আপনি অন্য পথ দেখুন।" এই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। ডেপুটী মেরীকে চুম্বন করিয়া বলিলেন "৫০০০০ হাজার ফ্রাঙ্ক! তোমার নরম হাত দুখানি যে লাল,"—

"লাল কিন্তু অকলঙ্ক।"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

ভারতের নূতন সম্রাট।

স্বর্গগত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স এলবার্ট জর্জ্জ, পঞ্চম জর্জ্জ উপাধি গ্রহণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। ১৮৬৫ সালের ৩রা জুন প্রিন্স জর্জ্জ জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে রাজার জ্যেষ্ঠ-পুত্রই পিতৃসিংহাসন লাভ করেন এবং যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রিন্স জর্জ্জকে রাজপুত্রোচিত শিক্ষাদান করিয়া নৌবিভাগে নিযুক্ত করা হয়। এই বিভাগে তিনি



সম্রাজ্ঞী মেরি।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ।

১৯ বৎসর বিশেষ দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করেন। রাজপুত্র হইলেও তাঁহার অন্তর এতই উদার ও অমায়িক ছিল যে তিনি তদীয় বিভাগের কোন কর্ম্মচারীকে তাঁহার প্রতি রাজসম্মান প্রদর্শন করিতে দেখিলে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইতেন; এমন কি তাঁহাকে রাজপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতে পর্য্যন্ত তিনি নিষেধ করিতেন। আহার বিহার আনন্দে সকলের সহিত সমভাবে যোগদান করিয়া সর্ব্বদা সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় কালাতিপাত করাতেই তিনি আনন্দবোধ করিতেন। পৃথকের মধ্যে তাঁহার নিজের লেখাপড়ার জন্য জাহাজের মধ্যে একটি কামরা থাকিত মাত্র। যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তিনি "নাবিক প্রিন্স" নামেই সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন।

১৮৯১ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টরের সহিত প্রিন্সেস্ মে অফ্ টেকের বিবাহ স্থির হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার একমাস পরেই যুবরাজের মৃত্যু হয়। সুতরাং সেই শোকের মধ্যেই প্রিন্স জর্জ্জ যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এবং দুই বৎসর পরে জ্যেষ্ঠের মনোনীত প্রিন্সেস্ মের সহিত যুবরাজের বিবাহ হইল।

যুবরাজ জর্জ্জ সম্রাট জর্জ্জ হইয়া কিরূপে রাজ্যশাসন করিবেন এই বিষয় লইয়া আজকাল বিলাতের প্রায় সকল সংবাদ পত্রেই আলোচনা চলিতেছে। এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা কাহারও পক্ষেই ঠিক নিরাপদ নহে। যৌবরাজ্য হইতে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব স্কন্ধে লইলে মনুষ্য যে কতদূর পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব, তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত আমরা স্বর্গগত সম্রাটেই দেখিয়াছি। তবে আপাততঃ ইংলণ্ডের লোক এইরূপ কল্পনা করেন যে, আমাদের নূতন সম্রাট তাঁহার স্বর্গগত পিতার ন্যায় ইতর ভদ্র সর্ব্বসাধারণের প্রিয় হইবেন কি না তাহা সন্দেহ। ইঁহার স্বর্গীয় পিতা লোকের মনোহরণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সঙ্গে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে পঞ্চম জর্জ্জ দেশের শক্তিবান মন্ত্রীসমাজের ক্রীড়াপুত্তলি হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে। রাজনৈতিক হইতে সামাজিক পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের সকল বিষয়েই তাঁহার নিজেই একটা নির্দ্দিষ্ট মত আছে এবং তাহা প্রকাশ করিতেও তিনি কোন দিনই কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এ সকল বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞান অসাধারণ। দেশে যখনই কোনও বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে যুবরাজ জর্জ্জ সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার সকল দিক জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দিনের পর দিন তিনি পার্লামেণ্টে যাইয়া দেশের সকল সম্প্রদায়ের মতামত মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। সাম্রাজ্য সম্বন্ধেও তাঁহার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। নৌবিভাগে থাকিয়া তিনি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যেরূপ ভ্রমণ করিয়াছেন, সেরূপ কোনও ভাবীরাজার অদৃষ্টেই সচরাচর ঘটে না। এক সময়ে বক্তৃতাকালে তিনি বলিয়াছিলেন—"যদি আপনাদিগকে এ কথা বলি যে এখানে এমন কোন ব্যক্তিই উপস্থিত নাই যিনি আমার ন্যায় বিভিন্ন ব্রিটিশ রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছেন, তাহা হইলে সেটা বোধ হয় আমার পক্ষে খুব অন্যায় গর্ব্ব হইবে না। এত ভ্রমণের



সাম্রাজ্য লাভের পর সম্রাট এডওয়ার্ডের সপরিবার চিত্র।

পরেও যদি আমি পৃথিবীব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া থাকি বা সাম্রাজ্যের উন্নতি ও মঙ্গলের প্রতি মনোযোগী না হই, তাহা হইলে ব্যাপারটা খুব বিস্ময়কর হইবে সন্দেহ নাই।" আর এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন—"ইংলণ্ড বলিতে আমি কেবল পশ্চিম সমুদ্রের এই দ্বীপপুঞ্জকে বুঝি না, আমার ইংলণ্ড পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে।"

যুবরাজ জর্জ্জ যখন যেখানে গমন করিয়াছেন, তাঁহার ব্যবহারে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বুঝিয়াছেন যে তাঁহাদের শ্রীসমৃদ্ধির জন্য যুবরাজ অন্তরের সহিত ব্যগ্র ও সচেষ্ট। অপরের অবস্থার প্রতি সহানুভূতির ফলে তিনি সকল দেশেই সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব সূত্রে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। তিনি ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া ভারতের ইংরাজ কর্ম্মচারীকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন—আমাদের শাসন প্রণালী মধ্যে আমরা সহানুভূতিকে অধিকতর প্রসার দান করিলে, ভারত শাসন আরও সহজ ও সুখকর হইয়া উঠে।" পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিই যে রাজা প্রজার সম্বন্ধ বন্ধনের মূল তাহা যুবরাজ বিস্মৃত হন নাই।

সম্রাট জর্জ্জ অনেক সদ্গুণে ভূষিত। তাঁহার প্রকৃতি সরল, অকপট, বিনয়ী,—পরদুঃখকাতর, সংযমী, ও ধর্ম্মভীরু। কোনও প্রকারের কাপট্য বা বঞ্চনাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। তিনি নিজের প্রতি নিতান্তই কঠোর। আহার বিহারে তাঁহার ন্যায় সংযমী পুরুষ খুব অল্পই দেখা যায়। সকল সময়েই তিনি আপনাকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখেন। পুস্তক পাঠ করা তাঁহার একটি বিশেষ প্রিয় কর্ম্ম। সম্রাটের "গৃহজীবন ইংলণ্ডের আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী উভয়ে পরস্পরের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। পিতামাতা উভয়ে সন্তানগুলিকে লইয়া সর্ব্বদা কালাতিপাত করেন। তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রের প্রতি কেহ ইঙ্গিতেও কোনো দোষারোপ করিতে সাহস করে নাই। জুয়াখেলা, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি ব্যসনকে তিনি ঘৃণা করেন। শিকারই তাঁহার একমাত্র আনন্দদায়ক ক্রীড়া। আমাদের নূতন সম্রাজ্ঞীও বিশেষ গুণবতী রমণী। তাঁহার বিচক্ষণ বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি এবং স্বাভাবিক সদাশয়তার গুণে তিনি পতির কঠোর কর্ম্মে যথার্থ সহধর্ম্মিণী হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

রাজ্য গ্রহণ করিয়াই তিনি ভারতবাসীকে তাঁহার পিতৃশোকে সহানুভূতি প্রকাশের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া যে আশ্বাস বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে আশা হয় যে তাঁহার স্বর্গীয় পিতা ও পিতামহীর পদানুসরণ করিয়া, তিনিও ভারতের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে এবং প্রজার অসন্তোষ ও অশান্তি দূর করিতে যত্নবান হইবেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি,—আমাদের এ আশা সফল হউক এবং নূতন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী যথার্থ রাজধর্ম্ম পালন করিয়া অক্ষয়-কীর্ত্তি লাভ করুন।

ধূমকেতুর পুচ্ছ কি।

ধূমকেতুর পুচ্ছ কি? এ সম্বন্ধে ভারতীতে আলোচনা হইতেছে দেখিলাম।

"ধূমকেতু কাচসদৃশ স্বচ্ছ বস্তুর শূন্যগর্ভ গোলক বা প্রতিগোলক বা গোলকাভাস মাত্র;"—Proctor এর সময় এ মত প্রকাশ তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহাতে আকাশে কোন শূন্যগর্ভ গোলকের অবস্থিতি তাঁহারা কল্পনা করিতে পারেন না। যেরূপে গ্রহগণের উদ্ভব কল্পনা করা হইয়া থাকে তাহাতে শূন্যগর্ভ কোন গোলক আকাশে উৎপন্ন হইতে পারে না। ধূমকেতু যেরূপ বিপুলকায় এবং যেরূপ প্রবলবেগে ভ্রমণ করিতেছে তাহা দেখিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে বাষ্পময় কল্পনা করিতেও সাহসী হন না। এমন কি কিছুদিন পরে হয়ত ধূমকেতুর চন্দ্রও নিজ কক্ষে আবর্ত্তন পর্য্যন্ত পণ্ডিতেরা দেখিতে পাইবেন। বর্ত্তমান হেলির ধূমকেতুর (Halley's Comet) পার্শ্বে এবং অন্য দুই একটী ধূমকেতুর পার্শ্বে ছোট ছোট ধূমকেতু পণ্ডিতেরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। কিছুদিন পরে হয়ত দেখা যাইবে এগুলি বাস্তবিক তাহাদের চারিদিকে ভ্রমণ করে। যদিও সাধারণ চক্ষে ধূমকেতুর পুচ্ছ একটী মাত্র দেখা যায় কিন্তু বাস্তবিক সব সময় তাহা একটী নয়।*

২৬শে এপ্রেল কোদাই কেনাল মান-মন্দিরে যে ফোটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে হেলির ধূমকেতুর পুচ্ছ সংখ্যা সাতটীর কম নয়। ইহার ব্যাখ্যা কিরূপে করা যাইতে পারে। ধূমকেতুর পুচ্ছ ভিন্ন ইহার চারিপার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত একটী আলোকময় আবরণ থাকে। ইহা ব্যতীত সূর্য্যের শুধু বিপরীত দিকে নয় সূর্য্যের দিকেও পুচ্ছ দেখা যায়। আবার কখন কখন দেখা যায় যে যখন দূরে থাকে তখন পুচ্ছ সূর্য্যের দিকে কিন্তু নিকটে আসিলে তাহা সূর্য্যের বিপরীত দিকে চলিয়া যায়। ইহার কারণ কি? শুধু যে পুচ্ছ দিক পরিবর্ত্তন করে তাহাও নয়, কখনও কখনও দেখা যায় পুচ্ছের ঔজ্জ্বল্য হঠাৎ কমিয়া যায়, পুচ্ছ কম্পিত ও তরঙ্গায়িত হইতে থাকে; এবং পুচ্ছের দৈর্ঘ্য হঠাৎ কমিয়া যায় বা বাড়িয়া উঠে। এ সমস্তের কি কারণ দর্শান যাইতে পারে? এতৎ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবিনয়ভূষণ রায় দাস।

---

* Chamber's, Hand Book of Astronomy, page 411 :—

"In five instances when the Comet has more than one tail the second has extended more or less towards the sun. This was the case with the Comet of 1823, 1831 (iv) 1877, (ii); 1880 (vi)"

"Although Comets usually have but one tail yet two is by no means an uncommon number." (dunlop)

ভূত দেখা।

১

ভূত আছে কি না, তাহা লইয়াই তর্ক চলিতেছিল।

তর্কের মাত্রা অতিরিক্ত চড়িয়াছিল। উমেশ ভায়া প্রাণপণ বলে বলিয়া উঠিল, "চাক্ষুষ প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস না করলে ত, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না!"

যতীশ কহিল, "আমি নিজে না দেখে থাকি, অপরে ত তাঁকে দেখেছে, তার পর টাকা ও টিকিটের উপর মুখের ছবি, ফ'টোগ্রাফ—এ সবেও ত তাঁর অস্তিত্ব দস্তুরমত প্রমাণ হচ্ছে!"

উমেশ উচ্চ হাস্যের সহিত কহিল, "পথে এসো, দাদা—তেমনি ভূতও অনেকে দেখেছে—এবং এখানে না হলেও, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে তার ফ'টো পাওয়া যাচ্ছে!"

সত্য! কথাটা উড়াইবার উপায় ছিল না। যতীশ কোম্পানি নিজেদের ফাঁদে আপনা হইতেই ধরা দিল। শ্যাম এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তর্ক থামিতে সে কহিল, "আমি একটা চাক্ষুষ প্রমাণের কথা জানি।"

সকলে সাগ্রহে কহিল, "কি রকম?"

"ও সব নিয়ে বাজে তর্ক করলে চলবে, কেন?" বলিয়া সূক্ষ্ম শরীর, অ্যাষ্ট্রাল প্লেন প্রভৃতি, কতকগুলা দুর্ব্বোধ্য প্রকাণ্ড কথা, উমেশ এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল।

আমরা শ্যামকে চাপিয়া ধরিলাম, "কি রকম ব্যাপারটা হে?"

শ্যাম কহিল, "তবে শোন!"

২

শ্যাম আরম্ভ করিল, "সে আজ প্রায় আঠারো বৎসরের কথা! তখন প্রেসিডেন্সিতে বি, এ পড়ি। মাঘ মাস। মন্মথর বিবাহের ধূমে হোষ্টেলে কাহারো কাজকর্ম্ম ছিল না। বর্দ্ধমানে বিবাহ হইবে—ট্রেণের সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ করা হইয়াছিল। 'সহর বর্দ্ধমান কখনো দেখি নাই, দেখিব; তাহার উপর, হাবড়া হইতে বর্দ্ধমান অবধি সেকেণ্ড ক্লাশে লগেজ-নারী বিবর্জ্জিত অবস্থায় ভ্রমণে, বন্ধুবান্ধবে মিলিয়া হাসি গল্প-গানে সারাপথ নিশ্চিন্ত আরামে কাটাইয়া দিব—ইহারি আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিলাম।

বিবাহের দিন, সজ্জিত বেশে সকলে বাহির হইলাম। মন্মথ যাইয়া বরবেশে ফার্ষ্ট ক্লাশে উঠিল—আমরা, বরযাত্রীর দল, সেকেণ্ড ক্লাশের রিজার্ভ কক্ষ অধিকার করিলাম। আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল—একজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "ধন্য রাজা পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ"! কথাটা আমাদের মোটেই ভাল লাগে নাই। কারণ, শাল দোশালা পাম্প-সু ভিজিয়া মাটি হইয়া যাইলে, 'রাজার পুণ্য দেশের জয়' গাহিবার প্রবৃত্তিই হইবে না! ট্রেণ শ্রীরামপুর ষ্টেশন ছাড়িলে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এবং শীতটিও প্রচণ্ডভাব ধারণ করিল! আমাদের আনন্দের স্রোত, তখন, বরফের মত, জমিয়া আসিতেছিল।

কায়ক্লেশে বর্দ্ধমানে কন্যাপক্ষের বাটী

পৌঁছিলাম। আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। বরযাত্রীদিগের রাত্রিবাসের জন্য তাঁহারা সম্মুখের একটি বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। নৃত্যগীতেরও ব্যবস্থা ছিল—বৃষ্টিতে আসর তেমন জমিতে পারিল না। আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রাম-বাটিতে গেলাম। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। মাঝে-মাঝে মেঘের গর্জ্জন ও বিদ্যুতের চমক উৎসবানন্দের পরিবর্ত্তে বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছিল। আমাদিগের অপরিচিত একটি যুবক,—বোধ হয়, কন্যাপক্ষীয়,—বলিয়া উঠিল, "কি দুর্য্যোগ! ভূতপ্রেতেই এ দুর্য্যোগে শুধু বাহির হয় মানুষে পারে না! নিমন্ত্রণের জন্যও না।"

হল ঘরের কোণে বসিয়া একটি ভদ্র লোক তামাকু সেবন করিতেছিলেন—দাড়ী, গোঁফে তাঁর মুখটাকে একেবারে ঢাকিয়া রাখিয়া ছিল। মাথায় প্রকাণ্ড চুল—অর্থাৎ দেখিলে তাঁহাকে থিয়সফিষ্ট কিম্বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের লোক বলিয়া মনে হয়। তাঁর নামটা, বুঝি, রতনবাবু,—পরিচয়ে জানিয়া ছিলাম—রতন বাবু বলিলেন, "বলেন কি মশায়—! ভূতগুলার কি কাণ্ডজ্ঞান নাই যে,এই দুর্য্যোগে মরিবার জন্য বাহির হইবে।"

কক্ষমধ্যে হাস্যের তরঙ্গ উঠিল! আমি কহিলাম, "ভূতেরও মরিবার ভয় আছে নাকি?"

রতন বাবু বলিলেন, "তারা এ দুর্য্যোগে বাহির হয় না—জ্যোৎস্নারাত্রিটারই তারা পক্ষপাতী!"

অপরিচিত যুবকটি কহিলেন, "আপনার সঙ্গে তাদের কথাবার্ত্তা হয়েছিল, বুঝি?"

রতনবাবু কহিলেন, "নিশ্চয়—!"

অপরিচিত যুবকটি কহিলেন, "ভূত! যার অস্তিত্বই নাই—তাই দেখিয়াছেন! আশ্চর্য্য!"

রতনবাবু কহিলেন, "ও বয়সে সবই আশ্চর্য্য বলে মনে হয়! যদি আপনাকে দেখাইতে পারি—?"

অপরিচিত যুবকটি বাধা দিয়া কহিলেন, "আর, যদি না পারেন?"

"না পারি?" রতনবাবু পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া কহিলেন, "আমার নিকট নোটে-টাকায় আটচল্লিশ টাকা আছে, আমি এগুলি আপনাকে দিব।"

আমাদের দলের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "রীতিমত বাজি!"

অপরিচিত যুবকটি হাসিয়া কহিল, "আমার কাছে অত কিছু নাই—আসিয়াছি, বিবাহের নিমন্ত্রণে—সঙ্গে তিন-চারিটি টাকা ত মোটে আছে।"

রতনবাবু কহিলেন, "তবে আর মিছা বাজি রাখিয়া কি হইবে?" হোষ্টেলের দল মাতিয়া উঠিল। আমরা কহিলাম, "দেখান্ ভূত—আমরা চাঁদা দিয়া বাজি রাখিব!"

রতনবাবু হুঁকা নামাইয়া, হাসিয়া কহিলেন, "যখন বাজির কথাই হল, তখন টাকা বাহির করুন! তা ছাড়া, তর্কটা ওঁর সঙ্গেই হচ্ছে, যখন—"

"বেশ!" বলিয়া সকলে পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিলাম। চাঁদায় পঞ্চাশ টাকা উঠিল। অপরিচিত যুবকের হাতে দিয়া কহিলাম,"রাখুন মশায়,টাকা,আপনিই রাখুন! যদি উনি ভূত দেখাইতে পারেন ত, সব উনি লইবেন, আর যদি না পারেন ত, উঁহার আটচল্লিশ টাকা আমরা ভাগ করিয়া লইব!"

রতনবাবু কহিলেন, "খুব ভাল কথা !"

আমরা কহিলাম, "তা হলে, এখনি ভূত দেখাইবেন ত ?"

দলের মধ্যে একজন ছিল—যাদব মিত্র, এখন সে ব্যারিষ্টার—তার ভূতের ভয় ছিল। সে কহিল, "তোমরা কি ঘুমাতে দেবে না ? ভূতের হাঙ্গামা বাধাইয়া তুলিলে !"

আমরা তখন উৎসাহে মত্ত--বেচারার কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলাম না।

রতনবাবু কহিলেন, "ওঁর যখন ভয় আছে, তখন এখানে ও সব হাঙ্গামা না করাই ভালো, শেষে—"

আমরা কহিলাম, "কোথায়, তবে যাব, এই জলে, কাদায় ?"

কন্যাপক্ষীয় একটি ভদ্রলোক আমাদিগের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন,—তিনি কহিলেন,—"দু রশিটাক দূরে বাঙলা স্কুল আছে, সেখানে গেলে হয় না ?"

"খুব ভালো হয়—" বলিয়া রতনবাবু অগ্রসর হইলেন। আমরাও পশ্চাতে চলিলাম। কাদা বা জলের জন্য, তখন আর এতটুকু দ্বিধা ছিল না। বিবাহবাটী হইতে গীতধ্বনি শুনা যাইতেছিল।

বাঙলা স্কুল খুলাইয়া কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকটি, দালানে, বেঞ্চ টানিয়া আমাদিগকে, বসাইলেন।

অপরিচিত যুবকটিকে লইয়া রতনবাবু পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। জানালা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই চেয়ারে বসুন !" তিনি চেয়ারে বসিলে, রতনবাবু বাহিরে আসিলেন, কহিলেন, "আমরা বাহিরেই থাকিব—ঘরটি বাহির হইতে বন্ধ থাক্—"

বাহিরের খোলা জানালা দিয়া হু হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছিল—আমাদিগের হাড় অবধি কাঁপাইয়া তুলিতেছিল ! কিন্তু সে দিকে আমাদিগের লক্ষ্যও ছিল না। ঘরের মধ্যে কি হয়, দালানের জানালা দিয়া, আমরা তাহাই দেখিতেছিলাম। রতনবাবু বলিলেন, "আপনি বসিয়াছেন ত ! কোন ভয় করিতেছে না ?"

তিনি কহিলেন, "আপনার ও সব বুজরুকি গৎ রাখিয়া, চাক্ষুষ প্রমাণ দেখান, দেখি।"

রতনবাবু বলিলেন, "বেশ ! বাহিরের জানালার দিকে চাহিয়া দেখুন—কি দেখিতেছেন ?"

তিনি কহিলেন, "বিদ্যুতের চমক—আর অস্পষ্ট গাছপালা—"

আমরা হাসিয়া উঠিলাম।

"বেশ—বাহিরের দিকেই চাহিয়া থাকুন" —বলিয়া রতনবাবু ক্ষিপ্র সুরে খানিকটা ছড়া বলিয়া গেলেন ! "জঙ্গল ফুঁড়ে,আয়রে উড়ে—" ধরণের প্রকাণ্ড এক ছড়া !

ছড়া শেষ হইলে রতনবাবু কহিলেন, কি দেখিতেছেন ?"

ভিতর হইতে তিনি কহিলেন, "বাহিরে, জানালার ধারে খানিকটা ধোঁয়া— !"

আমরা উদ্গ্রীবভাবে সেদিকে লক্ষ্য করিলাম—কিছু দেখিতে পাইলাম না। কহিলাম, "কই মশায়, কিছুই দেখিতেছি না ত।" রতনবাবু গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "চুপ !" তার পর কহিলেন, "আচ্ছা ! আপনার ভয় হইতেছে ?"

"ধোঁয়া দেখিয়া, ভয় ?"

রতনবাবু আবার খানিকটা ছড়া বলিয়া কহিলেন, "এবার কি দেখিতেছেন ?"

"ধোঁয়াটা উপরে উঠিয়া কুণ্ডলী পাকাইতেছে—তাহা হইতে একটা মানুষের মূর্ত্তি! এ কি, এ যে আমার এক বন্ধু—"

রতনবাবু কহিলেন, "বন্ধু ? ইনি জীবিত আছেন ?"

"না,—আজ তিন বৎসর হইল—বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়াছেন।" আমরা আশ্চর্য্য হইলাম।

রতনবাবু কহিলেন, "এখন আপনার ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস হইতেছে ?"

"বলেন কি, এট আমার দৃষ্টিবিভ্রমও ত হইতে পারে।"

আমরা অস্থির হইয়া উঠিতেছিলাম। এত বড় অবিশ্বাসী লোক ! ভূত দেখিতেছে, তবু মানিবে না ! আর আমরা চাঁদা দিয়া মোটে দেখিতেই পাইলাম না ! গা-টা ছম্ ছম্ করিতেছিল—থাকিয়া-থাকিয়া দেহে রোমাঞ্চ হইতেছিল !

"দৃষ্টিবিভ্রম ! বেশ ! তবে আর একটু দেখুন", বলিয়া, রতনবাবু আবার ছড়া সুরু করিলেন, কহিলেন, "এখন কি দেখিতেছেন ?"

"লোকটার কেমন ছায়ার শরীর—আমার দিকে আসিতেছে,—আমার পাশে দাঁড়াইয়াছে,—হাত তুলিতেছে—আমার গায়ের দিকে—ভারী ঠাণ্ডা হাত—উঃ,যেন ছুঁচ বিঁধিতেছে—বাবারে !" অপরিচিত যুবকটি মূর্চ্ছিত হইয়া সশব্দে ভূমিতে পড়িয়া গেল !

আমরা তাড়াতাড়ি ভিতরে যাইলাম ! 'জল, জল' শব্দে স্থানটা মুখরিত হইয়া উঠিল ! রতনবাবু বলিলেন, "দু পাতা ইংরাজী পড়িয়া ভূত মানেন না—দেবতা মানেন না—ধরাকে সরা জ্ঞান করেন—এ রোগের ঔষধ কি ? তা যাক্, বাজি জিতিয়াছি—আমার টাকার প্রয়োজন নাই—উঁহার যে শিক্ষা হইয়াছে, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ! আপনারা নব্যের দল,—আপনারাও ত চক্ষে দেখিলেন !"

আমরা তখন মূর্চ্ছিতকে লইয়া ব্যস্ত হইলাম। জ্ঞান-সঞ্চার হইতেই, অপরিচিত যুবকটি কহিলেন, "কোথায় গেল, সে বেটা ! ভণ্ড, বুজরুক। উঃ, আমার প্রাণটাই গিয়াছিল—আমি তাকে পুলিশে দিব, এখনি থানায় টানিয়া লইয়া যাইব,—বেটা—"

কথাটা বলিতে বলিতে তিনি বাহিরের দিকে ছুটিলেন।

আমরা সকলে মিলিয়া চেয়ার-টেবিলগুলা তুলিয়া, বাতি জ্বালিয়া বাসার দিকে চলিলাম ! কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকটি কহিলেন, "তাই ত, ব্যাপারটা ভালো, বুঝা গেল না ত !"

বাসায় আসিয়া দেখি, যাদব মিত্র আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। আমরা ফিরিতেই সে কহিল, "কি দেখিলে ?"

আমরা কহিলাম, "আশ্চর্য্য কাণ্ড ! যথার্থই ভূত আছে ! তিন বৎসর পূর্ব্বে যে লোক মারা গিয়াছে, সে একেবারে আজ সশরীরে উপস্থিত।"

যাদব কহিল, "স্বচক্ষে দেখিলে ?"

আমরা কহিলাম, "স্বচক্ষে ঠিক নয়—তবে, হাঁ, একরকম স্বচক্ষু বই কি ! সেই যে ভদ্রলোকটি যিনি তর্ক করছিলেন, তিনি দেখিয়া ভয়ে মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন !"

যাদব কহিল, "মূর্চ্ছা ভাঙিয়াছে ?"

আমরা কহিলাম, "হাঁ !"

"কোথায় তিনি ?"

"এখানে ফিরিয়া আসেন নাই ?"

"না !"

"রতনবাবুও এখানে ফিরেন নাই ?"

"কই না !"

"তবে বুঝি বিবাহবাড়ীতে গিয়াছেন ! সে ভদ্রলোকটিত এমনি চটিয়া উঠিয়াছেন, যে ভয় দেখানোর জন্ত, রতনবাবুকে পুলিশে দিবেন বলিয়া শাসাইয়া তাঁহারি সন্ধানে গিয়াছেন !"

৩

গল্পে-গুজবে সময় কাটাইবার পর, শেষ রাত্রে আমাদিগের নিদ্রা আসিল। প্রভাতে, নিদ্রাভঙ্গে রতনবাবুদের সন্ধান লইলাম—তাঁহাদের চিহ্নও নাই ! ব্যাপার কি !

চা-মিষ্টান্ন প্রভৃতি লইয়া কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকটি আসিয়া কহিলেন, "আপনাদের দলের তাঁরা কোথা গেলেন ! সেই ভূত ! তাঁদের দেখিতেছি না ত !"

আমরা কহিলাম, "কই এখানে ত, আসেন নাই ! আঃ তাঁরা ত আমাদের দলের নন ! কন্যাযাত্রী, না ?"

"না ! তাঁরা আপনাদিগের আসিবার পূর্ব্বেই আসিয়া সন্ধান লইয়াছিলেন, বরযাত্রীর দল আসিয়াছে কি না—বরযাত্রী বলিয়াই ত পরিচয় দিয়াছিলেন !"

আমরা আকাশ হইতে পড়িলাম। তবে কি ! ভালো কথা, আমরা চাঁদা করিয়া পঞ্চাশটি টাকা যে সেই অপরিচিত যুবকটির হাতে রাখিয়াছিলাম !

রীতিমত গোলমাল বাধিয়া গেল। থানায়, ষ্টেশনে লোক ছুটিল। সংবাদ আসিল, রাত্রে কুলির দল গোঁফ-দাড়ী সমাচ্ছন্ন একটি লোককে সঙ্গীসহ, ষ্টেশনে, প্ল্যাটফর্ম্মের বেঞ্চে, বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, তার পর যে, তাহারা কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ষোল আনা বাঙ্গালীর নিজস্ব ; বাঙ্গালীর উৎসাহ ও আবেগে স্থাপিত এবং ততোধিক উৎসাহে তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত। এদেশের অন্যান্য অর্থাৎ রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সমিতি ও সম্মিলনের তুলনায় এই সম্মিলনের বিশেষত্ব এই যে এখানকার চেষ্টা ও উদ্যম শুধু আলোচনায় ও বক্তৃতাতেই পর্য্যবসিত হয় না। এখানে যাঁহারা আলোচনা বা বক্তৃতা করেন, তাঁহাদেরই কায করিতে হয়। "আত্মবশই সুখ"। এই মহাবাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম নব্য বাঙ্গালী ঠিক্ কোন্ সময়ে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন বলিতে পারি না। তবে ইহা নিশ্চিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ্-সংস্থাপন এই সত্যটীর উপলব্ধির একটা প্রথম ও প্রধান ফল।

বৎসর বৎসরই সরস্বতী পূজা দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু বিগত বাসন্তী পঞ্চমীর সময়ে ভাগলপুরের সাহিত্য সম্মিলন ক্ষেত্রে যে মূর্ত্তিতে মা দেখা দিয়াছিলেন তাহা বস্তুতঃই প্রাণোন্মাদ কারিণী।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রত্নতত্ত্ববিৎ শরচ্চন্দ্র দাস ও ইতিহাসাচার্য

যদুনাথ সরকার প্রভৃতি মহারথী হইতে আমাদের ন্যায় সামান্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুজন মাতৃচরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান মানসে জ্ঞানপিপাসী বৌদ্ধ শ্রমণ পদরেণুপূত প্রাচীন অঙ্গদেশের প্রধান নগরীতে সমবেত হইয়াছিলেন। সকলেই কর্ম্মী, মাতৃভাষার দারিদ্র্য বিমোচনে ব্রতী।

সম্মিলনের দ্বিতীয় দিবস প্রাতে আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার ওজস্বিনী ও প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় বর্ণনা করিলেন, সাহিত্য সম্পদে আমরা কত দরিদ্র! আমাদের ইতিহাস, আমাদের সমাজতত্ত্ব, আমাদের ভূমি ও বৃক্ষাদির গুণাগুণ বিচার এখনও বার আনা বিদেশীয়ের চিন্তা ও গবেষণার বিষয়ীভূত। যাহাতে এই শোচনীয় অবস্থা অধিককাল না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্তই তিন বৎসর যাবৎ সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত। এই দৈন্য মোচনার্থে মায়ের কৃতিসন্তানগণ দৃঢ়সংকল্প। দেখিলাম, পূর্ব্ববর্ত্তী রাজসাহী সম্মিলনীতে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সেইগুলি বহুল পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র মন্থন করিয়া বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন করিতেছেন; কেহ বা স্বদেশের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে কেহ এতদ্দেশীয় প্রাচীন রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিশ্লেষণে নিযুক্ত, কেহ কেহ মস্তকের আকার ও গঠনাদি পরীক্ষা দ্বারা জাতিতত্ত্বানুসন্ধানে ব্যস্ত। এতদ্ব্যতীত ভাগলপুরবাসীদের যত্নে তথায় একটী কৌতুকাগার খোলা হইয়াছিল। তাহাতে প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রা, শিলালিপি, প্রস্তরমূর্ত্তি, মন্দিরাদির চিত্র প্রভৃতি ইতিহাসের উপকরণ এবং বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যালয়ে নির্ম্মিত বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি দর্শকবৃন্দের জ্ঞানভাণ্ডার প্রসারণার্থ উন্মুক্ত ছিল। সম্মিলনী সঙ্কল্প করিয়াছেন অচিরে কলিকাতায় একটী মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইহাও আমাদের একটী জাতীয় সম্পত্তি হইবে। এতদ্ব্যতীত পরিষদ শিল্পশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন।

ইহাতে কাহার মনে আশার সঞ্চার না হয়? সুধীবর বক্‌ল্ (Buckle) তদীয় সুবিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ফরাসি জাতির স্বাধীন চিন্তা প্রবাহের যে একখানি সুন্দর, উজ্জ্বল আলেখ্য প্রদান করিয়াছেন, মনে হয়, এদেশের ইতিহাসেও অনতিকাল মধ্যেই তদ্রূপ অথবা তদপেক্ষাও উজ্জ্বলতর অথচ শান্তিপ্রদ একখানি চিত্র দেখিতে পাইব। অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হয় নাই একদিন বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাস সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—যে সমস্তগুণে জাতি গঠিত হয় বাঙ্গালীর সেই সবগুণ কখনও ছিল না। কিন্তু–

"যখন বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালীই তজ্জন্য আলস্য, সুখ তুচ্ছবোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে। * *

'যদি এই বেগবৎ অভিলাষ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জন্মিবে।

'বাঙ্গালীর এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে।"

ভাগলপুরের বিগত সাহিত্য সম্মিলন যিনি দেখিয়াছেন—তিনিই বলিবেন—বঙ্কিবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস।

সমালোচনা ও প্রাপ্তি স্বীকার।

নকুড়বাবু। (নূতন নক্সা) শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পশুপতি প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত। কলিকাতা—বহুবাজার ৭নং পঞ্চাননতলা লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। গ্রন্থকার 'ভূমিকা'তে লিখিয়াছেন, 'এ বহি নাটক নহে, নক্সা মাত্র'। এবং

আরো বলিয়াছেন যে তিনি 'সখ্' করিয়া আমোদের জন্ম এই বহি লেখেন নাই। বড়ই 'মনঃকষ্টে' লিখিয়াছেন। তাঁহার মনোকষ্ট বাড়াইবার আশঙ্কায় আমরা ইহার সমালোচনা হইতে বিরত হইলাম। তবে একটি কথা বলিয়া রাখি, পল্লীগ্রামে বাস করিলেই দেবচরিত্র এবং সহরে বাস করিলেই পশুচরিত্র হয়—এমন অদ্ভুত ও বীভৎস ধারণা সমর্থন যোগ্য নহে। এই কুসংস্কার লইয়া বিস্তর গ্রন্থকার মাথা ঘামাইতেছেন দেখিয়া, প্রকৃতই দুঃখ হয়।

দময়ন্তী। (কথাগ্রন্থ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিবৃত। প্রাপ্তিস্থান চাটার্জ্জি ব্রাদার্স, ১৪৪নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন আনা মাত্র। বালিকাদিগের জন্য এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু। এ শ্রেণীর গ্রন্থের বহুলপ্রচার সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। লেখক বেশ হৃদয় দিয়া কাহিনীটি লিখিয়াছেন। তবে ভাষা তেমন সরল হয় নাই। আরো একটি কথা, এ শ্রেণীর গ্রন্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতি একটু নয়নাভিরাম হইলে পাঠকপাঠিকাদিগের পক্ষে অধিকতর আদরণীয় হয়। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার ছোটখাট ত্রুটিগুলির সংস্কার করিবেন।

ঋণ-পরিশোধ। (উপন্যাস) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম-এ প্রণীত। সিটিবুক সোসাইটি, ৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। উপন্যাসখানি ৩৮০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য ভাবমুগ্ধ ধনী ঘনশ্যাম—পল্লীযুবকের সহিত বিবাহিতা বালিকা কন্যার বিবাহ নামঞ্জুর করিয়া পিতার মৃত্যুর পর কন্যাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন ও পাশ্চাত্যধরণে তাহার চরিত্রগঠনের চেষ্টা করেন। এমন কি, কন্যার আবার বিবাহ দিবারও আয়োজন করেন। পরে, ঘটনাচক্রে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইলে, তিনি কন্যাকে জামাতার হস্তে প্রদান করেন। গ্রন্থকারের ফেনাইয়া বলিবার ক্ষমতা আছে। এত বড় উপন্যাসখানি অসামঞ্জস্য ও অস্বাভাবিকতার দোষে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাষাটুকু মন্দ নহে। কয়েকটি বিষম ত্রুটির উল্লেখ করিতেছি। গ্রন্থকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিত, সুতরাং আমাদিগের আশা তিনি সেগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। প্রথমতঃ, ছোঁয়াছুঁয়ি লইয়া পশ্চিমে সন্ন্যাসীদ্বয়ের ছুঁৎমার্গটুকু মানিয়া লইলেও, কলিকাতার এই আইন-পুলিশের দিনে আনন্দাশ্রমের বীভৎস অবতারণা একান্ত উদ্ভট ও অস্বাভাবিক। 'গুপ্তকথার' যুগ গিয়াছে, সে কথাটি গ্রন্থকার বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন এলাহাবাদের মত বড় ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে সাহেবী পরিচ্ছদধারী এবং প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ঘনশ্যাম ও বিলাত-প্রত্যাগত কিরণের সম্মুখেই নব্যবেশধারিণী ঘনশ্যাম-কন্যা গৌরী (ওরফে, এমা) ও তৎসহচরী রঙ্গিণীর প্রতি মাতাল গার্ডের অপমান-সূচক বিদ্রূপাদির অবতারণা নিতান্তই সৃষ্টিছাড়া। উপন্যাসখানিতে এই আতিশয্য-দোষ একাধিক স্থানেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। গোঁড়ামি সকল বিষয়েই, বিশেষতঃ, কলা-সাহিত্যে সর্ব্বনাশের কারণ। আরো দুইট ত্রুটি, অতিরিক্ত ইংরাজী কথাবার্ত্তা (তার অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও) এবং গদা-ভৃত্যের সুদীর্ঘ প্রাদেশিক বক্তৃতা—ইহাতে বহুস্থলেই রসভঙ্গ হইয়াছে। গ্রন্থকার ভবিষ্যতে চরিত্র-চিত্রাঙ্কনে সংযম অবলম্বন করিবেন—সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে স্থষ্ট চরিত্রগুলি মাটি হইয়া যায়, এটুকু মনে রাখিয়া উপন্যাস রচনা করিবেন। উপন্যাসবর্ণিত কয়েকটি চরিত্রের আদর্শ উচ্চ কিন্তু গ্রন্থকারের একদেশদর্শিতা-বশতঃ তাহা নিতান্তই ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে।

সরল চণ্ডী। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম-এ ও শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত। বঙ্গীয় সাহিত্য-প্রচার সমিতি হইতে শ্রীত্রিপুরানন্দ সেন বি, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা মাত্র। গ্রন্থখানি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সরল ও সহজ সংস্করণ। গ্রন্থখানির ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি উৎকৃষ্ট এবং ইহাতে পনেরোখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অধিকাংশ চিত্রই বেশ নয়নাভিরাম। বালকবালিকাদিগের জন্য রূপকথার ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিত। এই

ধর্ম্মের বহু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকারদ্বয় সমগ্র দেশের ধন্যবাদার্হ। তবে তাঁহাদিগের একটি ত্রুটি—ত যায় অত্যধিক প্রাদেশিকতা। বাঁধাই ছাপা প্রভৃতির তুলনায়, পুস্তকের মূল্য সুলভ হইয়াছে।

খোকাখুকুর খেলা। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত। কলিকাতা ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্‌ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥৵০ দশ আনা। বহি খানিতে ছেলেমেয়েদের উপযোগী কতকগুলি কবিতা ও ছড়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বহুবিধ রঙীন্‌ চিত্রে ও সুন্দর কাগজে পরিষ্কার ছাপা এই বহিখানি পাইয়া ছেলেমেয়েরা যে আনন্দে উৎফুল্ল হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ছড়া গুলির ভাষা আরও একটু সহজ সরল হইলে ভাল হইত।

চিত্ররেখা। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা, ৫৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, বাণী প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট। মূল্য আ'ট আনা। চিত্ররেখা, ছয়টি গল্পের সমষ্টি! সেগুলি ছোট এবং সুন্দর। সেগুলির মধ্যে কোন আড়ম্বর নাই. অস্বাভাবিকতা নাই। বাঙালীর ঘরের সুখ দুঃখের নিখুঁত ছবি, ভাষা সুন্দর প্রাঞ্জল। ছোট গল্পের রচনায় সুধীন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। বর্ণিত চিত্রগুলি যেন সজীব। "পরিণাম" ও "পিতা ও পুত্র" গল্প দুইটির মত উৎকৃষ্ট গল্প বহুদিন পাঠ করি নাই। গ্রন্থের ছাপা—মলাট সুন্দর, নয়নাভিরাম; —আকারেও অভিনবত্ব আছে, পকেটে অনায়াসে রক্ষা করা যায়।

বিনিময়। (নাটক) মহাকবি সেক্সপীয়রের measure for measure নামক নাটকের গল্পাংশের ছায়া অবলম্বনে। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকার যদি মহাকবির কণ্ঠ চাপিয়া হত্যা করিতেন তাহা হইলেও অধিকতর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইত না।

রাবেয়া। (নাটক) শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীবিনোদবিহারী বিশ্বাস, নদীয়া। মূল্য এক টাকামাত্র। গ্রন্থকার মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, রাবেয়া ঐতিহাসিক মহিলা। তবে তাঁহার বর্ত্তমান নাটকের সহিত ইতিহাসসম্বন্ধ অতিঅল্প। লেখকের গদ্যভাষাটুকু মিষ্ট—সরস, নাটক রচনার উপযোগী। ঘটনাটি সুকৌশলে গ্রথিত, তাহাতে একটু বৈচিত্র্য আছে। তবে চরিত্রগুলি সম্যক বিকাশ লাভ করে নাই। কোনটি পুঁথিগত আদর্শের প্রতিচ্ছায়ায় অর্থাৎ সদগুণের টিকিট মারা মাটির পুতুল—কোনটি বা আতিশয্য দোষে মাটি। সুদীর্ঘ বক্তৃতায় এবং অনাবশ্যক দৃশ্য যোজনায় স্থানে স্থানে রসভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। অথচ প্লটটুকু মন্দ নহে। মোটের উপর রচনাভঙ্গি আশাপ্রদ। লেখক কবিতা ছাড়িয়া গদ্যেরই সাধনা করুন। ছাপা ও কাগজ পরিপাটি।

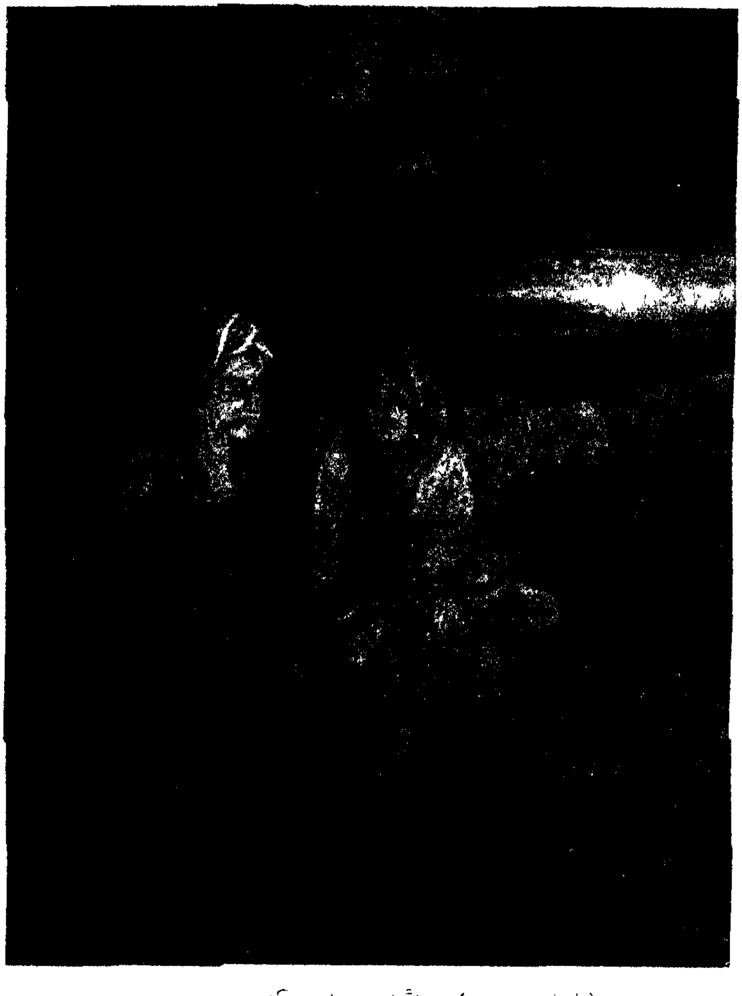
সাবিত্রী। (নাটক) শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন প্রণীত। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীমহেন্দ্রমোহন সেন, সদর ঘাট, চট্টগ্রাম। মূল্য বাঁধাই ১॥০ আবাঁধাই ১।০। নাটক খানিতে লেখকের কবিত্ব শক্তি ও মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরাণিককাহিনী হিসাবেও এখানি সুখপাঠ্য। কিন্তু অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা ও সুদীর্ঘ একঘেয়ে বক্তৃতায় বহুস্থলেই রসভঙ্গ হইয়াছে। সর্ব্বত্রই লেখকের একটা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দিবার ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষিত হয়।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা ধন্যবাদসহকারে কবিরাজ শ্রীযুক্ত এস, পি, সেনের এক শিশি সুরমা তৈল এবং দুই শিশি সেণ্টের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। দেশের প্রস্তুত এই সকল সুগন্ধি দ্রব্য দেখিলে স্বতঃই আনন্দ জন্মে। সুরমা তৈল বিলাতী উৎকৃষ্ট গন্ধতৈল হইতে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। সেণ্ট দুইটিও মনোহর গন্ধযুক্ত।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



রাজকুমার ও [illegible]— নদীতীরে ([illegible])

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্র হইতে

ইউ, রায় কর্তৃক ব্লক] [কার্ত্তিক প্রেসে মুদ্রিত

ধরণের বহু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকারদ্বয় সমগ্র দেশের ধন্যবাদার্হ। তবে উঁহাদিগের একটি ত্রুটি—ভাষায় অত্যধিক প্রাদেশিকতা। বাঁধাই ছাপা প্রভৃতির তুলনায়, পুস্তকের মূল্য সুলভ হইয়াছে।

খোকাখুকুর খেলা। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত। কলিকাতা ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ দশ আনা। বহি খানিতে ছেলেমেয়েদের উপযোগী কতকগুলি কবিতা ও ছড়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বহুবিধ রঙ্গীন্ চিত্রে ও সুন্দর কাগজে পরিষ্কার ছাপা এই বহিখানি পাইয়া ছেলেমেয়েরা যে আনন্দে উৎফুল্ল হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ছড়া গুলির ভাষা আরও একটু সহজ সরল হইলে ভাল হইত।

চিত্ররেখা। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা, ৪৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, বাণী প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট। মূল্য আট আনা। চিত্ররেখা, ছয়টি গল্পের সমষ্টি! সেগুলি ছোট এবং সুন্দর। সেগুলির মধ্যে কোন আড়ম্বর নাই, অস্বাভাবিকতা নাই। বাঙালীর ঘরের সুখ দুঃখের নিখুঁত ছবি, ভাষা সুন্দর প্রাঞ্জল। ছোট গল্পের রচনায় সুধীন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। বর্ণিত চিত্রগুলি যেন সজীব। "পরিণাম" ও "পিতা ও পুত্র" গল্প দুইটির মত উৎকৃষ্ট গল্প বহুদিন পাঠ করি নাই। গ্রন্থের ছাপা—মলাট সুন্দর, নয়নাভিরাম; —আকারেও অভিনবত্ব আছে, পকেটে অনায়াসে রক্ষা করা যায়।

বিনিময়। (নাটক) মহাকবি সেক্সপীয়রের measure for measure নামক নাটকের গল্পাংশের ছায়া অবলম্বনে। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকার যদি মহাকবির কণ্ঠ চাপিয়া হত্যা করিতেন তাহা হইলেও অধিকতর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইত না।

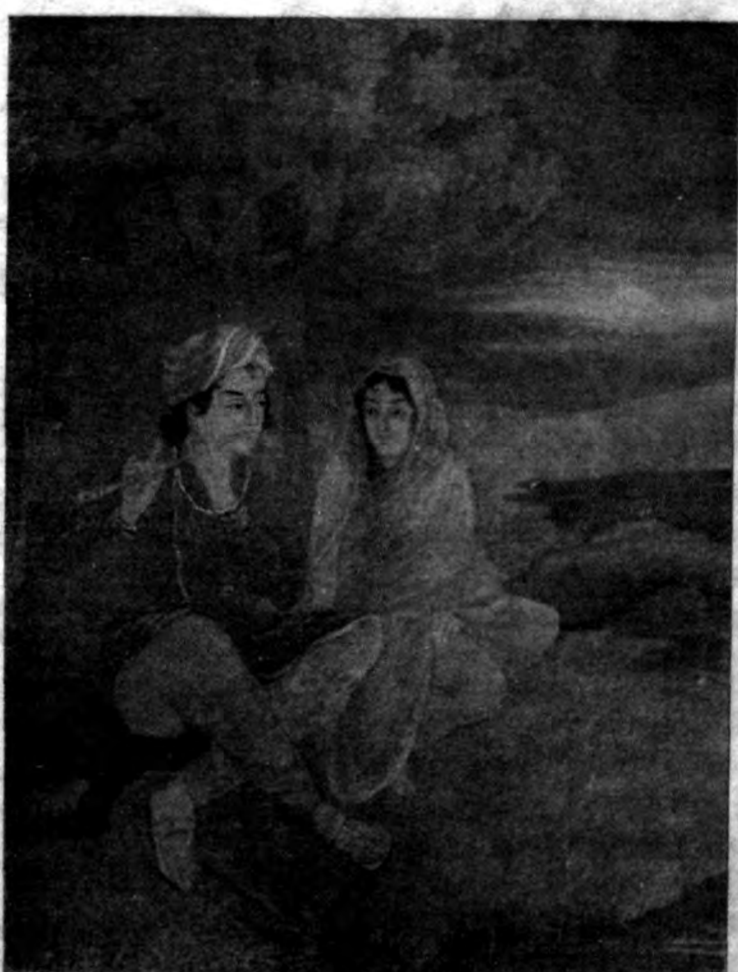
রাবেয়া। (নাটক) শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীবিনোদবিহারী বিশ্বাস, নদীয়া। মূল্য এক টাকামাত্র। গ্রন্থকার মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, রাবেয়া ঐতিহাসিক মহিলা। তবে তাঁহার বর্ত্তমান নাটকের সহিত ইতিহাসসম্বন্ধ অতিঅল্প। লেখকের গদ্যভাষাটুকু মিষ্ট—সরস, নাটক রচনার উপযোগী। ঘটনাটি সুকৌশলে গ্রথিত, তাহাতে একটু বৈচিত্র্য আছে। তবে চরিত্রগুলি সম্যক বিকাশ লাভ করে নাই। কোনটি পুঁথিগত আদর্শের প্রতিচ্ছায়ায় অর্থাৎ সদগুণের টিকিট-মারা মাটির পুতুল—কোনটি বা আতিশয্য দোষে মাটি। সুদীর্ঘ বক্তৃতায় এবং অনাবশ্যক দৃশ্য যোজনার স্থানে স্থানে রসভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। অথচ প্লটটুকু মন্দ নহে। মোটের উপর রচনাভঙ্গি আশাপ্রদ। লেখক কবিতা ছাড়িয়া গদ্যেরই সাধনা করুন। ছাপা ও কাগজ পরিপাটি।

সাবিত্রী। (নাটক) শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন প্রণীত। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীমহেন্দ্রমোহন সেন, সদর ঘাট, চট্টগ্রাম। মূল্য বাঁধাই ১॥০ আবাঁধাই ১৷০। নাটক খানিতে লেখকের কবিত্ব শক্তি ও মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরাণিককাহিনী হিসাবেও এখানি সুখপাঠ্য। কিন্তু অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা ও সুদীর্ঘ একঘেয়ে বক্তৃতায় বহুস্থলেই রসভঙ্গ হইয়াছে। সর্ব্বত্রই লেখকের একটা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দিবার ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষিত হয়। শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা ধন্যবাদসহকারে কবিরাজ শ্রীযুক্ত এস, পি, সেনের এক শিশি সুরমা তৈল এবং দুই শিশি সেণ্টের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। দেশের প্রস্তুত এই সকল সুগন্ধি দ্রব্য দেখিলে বস্তুতঃই আনন্দ জন্মে। সুরমা তৈল বিলাতী উৎকৃষ্ট গন্ধতৈল হইতে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। সেণ্ট দুইটিও মনোহর গন্ধযুক্ত।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



রাজকুমার ও শক্তিময়ী—নদীতীরে (ফুলের মালা)

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্র হইতে

ইউ, রায় কর্ত্তৃক ব্লক]　　[কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত

ভারতী

৩৪শ বর্ষ]   শ্রাবণ, ১৩১৭   [৪র্থ সংখ্যা

ভারত ও বিলাত।

বিলাতপ্রবাসীর পত্র।

১

দশ বৎসর পরে।

এ আমার প্রথম বিলাত-প্রবাস নহে। দশ বৎসর পূর্ব্বে, আর একবার এদেশে দুই বৎসরকাল কাটাইয়া গিয়াছি। কিন্তু সেকালে আর একালে বিস্তর প্রভেদ। আমার ভিতরে কত প্রভেদ, এদের বাহিরেই বা কত প্রভেদ!

এক দিন, সে নিতান্ত বহুদিনের কথাও নয়—ইংরেজি-নবিশ ভারতবাসীর নিকট বিলাত পুণ্যভূমি ছিল। আমরা তখন নিজে-দের সাহেব ক'রে তুলিবার জন্য ও ভারতকে বিলাতে পরিণত করিবার জন্য নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলাম। তখন বিলাতের সবই আমাদের চক্ষে ভাল ছিল, আর আমাদের সকলই মন্দ ছিল। ইংরেজের সমকক্ষ হইবার আশায় তখন আমরা বাঙলা বুলি ভুলিয়া ইংরেজি স্ল্যাঙ শিখিতে লাগিলাম, কুশাসন, গালিচা, সতরঞ্চ ছাড়িয়া টেবিল-চেয়ার ধরিলাম; ধুতি চাদর ছাড়িয়া হাট কোট পরিলাম; গৃহিণীকে গাউন পরাইয়া ঘরের বাহির করিলাম; সর্ব্ববিষয়ে ইংরেজ সাজিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। পোষাকে ও বুলিতে, চাল ও চলনে যে কালো সাদা হয় না, জীত বিজেতা হয় না, দাস প্রভু হয় না, এ জ্ঞান তখনো জন্মায় নাই। যখন ইংরেজের কৃপায় সে জ্ঞান জন্মাইল, তখন আমরা একেবারে উল্টা সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিলাম। এক সময় যেমন বিলাতের সবই ভাল ও স্বদেশের সবই মন্দ ছিল, এখন তেমনি স্বদেশের সবই ভাল, আর বিলাতের সবই মন্দ হইয়া উঠিল। অজ্ঞ ইংরেজ ভারতবর্ষকে যে চক্ষে দেখে, এখন বিজ্ঞতাভিমানী ভারতবাসীও ইংলণ্ডকে সেইভাবে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরেজের চক্ষে আমাদের সদাচার অশ্লীলতা, আমাদের সভ্যতা বর্ব্বরতা, আমাদের সৌজন্য কাপুরুষতা, আমাদের ভক্তি অতিশয়োক্তি, আমাদের ধর্ম্ম কুসংস্কার, আমাদের দেশচর্য্যা বিদ্রোহ। প্রতিক্রিয়ার মুখে, ভারতবাসীও ইংরেজের সকল বিষয়ই এইরূপ মন্দ চক্ষে দেখিতে লাগিল। সে ভাব এখনো নষ্ট হয় নাই; কত দিনে যে নষ্ট হইবে, কত দিনে যে ইংরেজ ও ভারতবাসী পরস্পরে পরস্পরকে সত্যভাবে দেখিতে ও বুঝিতে পারিবে, ভগবান জানেন!

২। দাঁড়ি-পাল্লা।

কোনো জিনিষের ওজন করিতে গেলে, সকলের আগে দাঁড়িপাল্লাটা ঠিক করিয়া লইতে হয়। অজ্ঞ ইংরেজ কখনো সাচ্চা দাঁড়িপাল্লা দিয়া ভারতের সভ্যতা ও সাধনার ওজন করিতে চায় নাই। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নিজস্ব মাপকাটী আছে। ইংরেজ আমাদের মাপকাটী দিয়া আমাদের মাপ করিতে পারে নাই, তাই পদে পদে ভুল করিয়াছে। আমরাও এ পর্য্যন্ত তার নিজের মাপকাটী দিয়া ইংরেজের সভ্যতা ও সাধনার ওজন করিতে যাই নাই, তাই পদে পদে ভুল বুঝিয়াছি। ভাল বা মন্দ এ দুনিয়ায় কারোই একচেটিয়া নয়। সর্ব্বত্রই ভালোর সঙ্গে মন্দ ও মন্দর সঙ্গে ভাল মাখামাখি হইয়া আছে। আলো ও আঁধারের খেলা, ভালমন্দ, উৎকর্ষাপকর্ষ, দুনিয়া জুড়িয়া রহিয়াছে। অকৃতবুদ্ধি লোকে ইহা তলাইয়া দেখে না। যারা ইহা দেখে ও বোঝে, তারাই সত্য দেখে ও সত্য বোঝে। ইংরেজ আপনার ফুট-ইঞ্চির সরু ফিতা হাতে লইয়া, ভারতের বিশাল সভ্যতা ও সাধনার কালি করিতে যায়, তাই ভারতের ভালকেও ধরিতে পারে না, মন্দকেও বুঝিতে পারে না। আর আমরাও ভারতের তুলাদণ্ডে ইংরেজের তোল করিতে যাইয়া, তারই মত ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আমরা যে দুই স্বতন্ত্র জাতি, দুই আলাহিদা ছাঁচে গড়া, দুই বিভিন্ন সভ্যতা ও সাধনার উত্তরাধিকারী, এ মোটা কথাটা ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন?

৩। হিন্দুর জাতি বিচার।

হিন্দু কখনো ইতিপূর্ব্বে এ মোটা কথাটা ভুলিয়া যায় নাই। আজই যে হিন্দু দুনিয়ার মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন নয়। প্রাচীনকালে, আধুনিক সভ্যতা ও সাধনার জন্মের বহু যুগ পূর্ব্বে, হিন্দু বহু দেশের, বহু জাতির বহুবিধ সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শে আসিয়াছিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য স্রোতস্বিনী যেমন গঙ্গা যমুনার স্রোতে আপনাকে মিশাইয়া দিয়া, অনন্ত সাগরোদ্দেশে গিয়াছে; সেইরূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, পরিণত ও অপরিণত, বহু সাধনা ও বহু সভ্যতা, হিন্দুর বিশাল সভ্যতা ও সাধনার অঙ্গীভূত হইয়া, হিন্দুর সনাতন লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। তখন হিন্দু আপনাকে চিনিত, আর আপনাকে চিনিত বলিয়াই, অপরকেও চিনিতে পারিত। এ জন্য হিন্দু চিরদিনই জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী। এমন কি হিন্দুর প্রচলিত জাতিভেদের মূলেও এই প্রাচীন পক্ষপাতিত্বই বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু আজিকার দুর্দ্দিনে এ জাতিভেদ যে সংকীর্ণ সংস্কারে পরিণত হইয়াছে, এক দিন তাহা হয় নাই। এজন্যই, হিন্দু আপনার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও, আপনার বিশাল অঙ্কে বহু জাতির, বহু বর্ণের, বহু সমাজের, বহু সভ্যতার সমাবেশ করিতে পারিয়াছিল। তাই হিন্দু সমাজে বহু সমাজের স্থান হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মে বহু ধর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছে। হিন্দু সাধনায় বহু পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এমন সার্ব্বভৌমিক জাতীয় আদর্শ জগতের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইংরেজি শিক্ষার কুহকে পড়িয়া

এই সনাতন হিন্দুত্বভ্রষ্ট হইয়া, আমরা মাঝে কিছু দিনের জন্য, এই জাতিতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বৈষম্যেই যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা, এ মহাসত্য মনে ছিল না। তাই আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ইংরেজের সমান হইবার লালসায় নিজেদের ইংরেজের মাপে মাপিতে ও ইংরেজের ছাঁচে গড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আবার, ইংরেজ নিজে যখন আমাদের এ সাধে বাদ সাধিতে আরম্ভ করিল, তখন হতাশের তীব্র বিরক্তি সহকারে, সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, নিজেদের মাপকাটিতে ইংরেজের সভ্যতা ও সাধনার পরিমাণ করিতে যাইয়া, তার অযথা নিন্দাবাদে নিরত হইয়াছিলাম।

৪। জাতিত্ব ও মনুষ্যত্ব।

একদিন আমরা মনুষ্যত্বের নামে,জাতিত্বের প্রতিবাদ আরম্ভ করি। সকলেই মানুষ, তখন আর এ জাতি, ও জাতি, এ অলীক ভেদবিচার কেন? মানুষের ভূমিতে এ অভেদবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা, হিন্দু সাধনায় পাওয়া যায় না। আমরা অভেদ বলিতে সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি বুঝিয়া থাকি। "সর্ব্বংখলু ব্রহ্মময়ং ইদং জগৎ"—এই নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়, ইহাই আমাদের অভেদজ্ঞানের মূল সূত্র। "ঈশাবাস্যং ইদং সর্ব্বং -যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ"—ঈশোপনিষদের এই সনাতন শ্রুতি আমাদের অভেদ-সাধনার মূল মন্ত্র। এ অভেদ পারমার্থিক, ব্যবহারিক নহে। এ অভেদের অর্থ সকলেই মানুষ, অতএব সমান ইহা নহে; কিন্তু সকলই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম দৃষ্টি যেমন অভেদ, মনুষ্য দৃষ্টিতে তেমনি ভেদ, উভয়ই সত্য। ব্যবহারিক জগতে, ব্যবহারিক জ্ঞানে, ভেদই সত্য; এখানে অভেদ কোথায়? ইন্দ্রিয়গ্রাম অভেদ নয়, নিত্য ভেদই প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। বর্ণ ও আকার, ভেদ চক্ষুর প্রাণ। এ ভেদ না থাকিলে রূপের জ্ঞান অসম্ভব হইত। সুর ও লয়ভেদ কর্ণের প্রাণ, এ ভেদ না থাকিলে শ্রবণ অসম্ভব হইত। শীতোষ্ণভেদে স্পর্শের প্রতিষ্ঠা। তিক্ত কষায়াদি ভেদেই আস্বাদনের প্রতিষ্ঠা। সকল ইন্দ্রিয়ই ভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অভেদএকাকারে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য রুদ্ধ, ইন্দ্রিয়ের সহায় বিনা বিষয়জ্ঞান লাভ অসাধ্য। এই বিষয়জ্ঞানেই ব্যবহারিক জগতের প্রতিষ্ঠা। *এরাজ্যে ভেদই প্রবল।* ভেদই এ রাজ্যের স্বভাব। এখানে অভেদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, শূন্যে সুবিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণের ন্যায় অলীক কল্পনা মাত্র। অথচ য়ুরোপীয় সাধক এই একান্ত অসম্ভব সাধনায় নিযুক্ত হইয়াই ব্যবহারিক জগতে এক অলীক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে বসিয়াছে। আর এই অলীক সাম্যবাদই কাল্পত মনুষ্যত্বের নামে, জাতিত্বের বা জাতীয়তার প্রত্যক্ষ সত্যকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে।

৫।

য়ুরোপীয় সাম্যবাদ।

য়ুরোপীয়েরা আমাদের সমাজে ছোটবড়র বিষম বৈষম্যে পীড়িত হইয়া, ইতর জনকে অভিজাতবর্গের, দরিদ্রকে ধনীর, প্রজা-সাধারণকে রাজপুরুষদিগের স্বেচ্ছাচার শাসন ও পীড়ন হইতে মুক্ত করিবার জন্য সাম্য,

মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ইহাই ফরাসাস-বিপ্লবের মূল আদর্শ। এই আদর্শের সঙ্গে ফরাসাস্ সমাজ ও ফরাসাস্ রাষ্ট্রতন্ত্রের একটা সত্য ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ ছিল। য়ুরোপীয় সমাজের শ্রেষ্ঠজনেরা ইতর সাধারণের সঙ্গে যে অমানুষিক ব্যবহার করিতেন, তাহারই প্রতিবাদ স্বরূপ এই সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। নানা কারণে, বহুদিন হইতে, য়ুরোপীয় মনুষ্যত্বের সম্মান ও সমাদর নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ল্যাটিন প্রচারক ও পুরোহিতদিগের প্রভাবে খৃষ্টধর্ম্ম মধ্যযুগে যে আকার ধারণ করে, তাহাতে মানুষকে বড়ই হীন করিয়া ফেলে। পাপ-পুণ্যগ্রথিত এই প্রকৃতি, সুখদুঃখময় এই মানবজীবন, প্রথম নরদম্পতির পাপের ফল, পাপেই মানুষের জন্ম। পাপেই মানুষের স্থিতি। পাপেই সহজ মানুষের বৃদ্ধি ও পরিণতি। মানব প্রকৃতিকে এরূপ চক্ষে যাঁরা দেখে, মানবের প্রতি, মানব বলিয়া যে সম্মান ও সমাদর, তাহাদের চিত্তে ও চরিত্রে, ইহার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। রোগীকে সুস্থলোকে যেমন অনুকম্পা করে, সাধুজনেরা প্রাকৃতজনকে সেরূপ অনুকম্পা করিতে পারেন। আর্ত্তের দুঃখমোচনের জন্য মানব-চিত্তে যে স্বাভাবিক সহানুভূতির উদ্রেক হয়, এক্ষেত্রে সে সহানুভূতি ও সে লোক-হিতৈষারও উদ্ভব সম্ভব—কিন্তু মানুষকে মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা ও সম্মান করা অসম্ভব। ঈশ্বরের নরদেহ ধারণ ও অবতার স্বীকার করিয়াও, ল্যাটীন্ খৃষ্টবাদ, এজন্য য়ুরোপে মানুষের মানুষ বলিয়াই যে শ্রদ্ধা ও সম্মান, কখনো ইহা সমাজের আচার ব্যবহারে, জনমণ্ডলীর চিত্তে ও চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। এজন্য য়ুরোপে অভিজাতবর্গ ইতর জনমণ্ডলীকে সর্ব্বদা পশুর মত ব্যবহার করিয়াছে। সামাজিক পদমর্য্যাদার স্বাভাবিক বৈষম্য হইতে, সামাজিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের উৎপত্তি হইয়াছে। জনমণ্ডলী যখন এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের হস্ত হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইল, তখন মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিল। সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায়, য়ুরোপ ধনীর ধন লুণ্ঠন করিতে লাগিল, অভিজাতের মর্য্যাদা হরণ করিতে লাগিল, জ্ঞানীর জ্ঞানকে, ধার্ম্মিকের ধর্ম্মকে, জগতে যেখানে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু উচ্চ, যা কিছু অসাধারণ, তৎসমুদয়কে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিতে চাহিল। এরূপ সাম্য অসত্য, অস্বাভাবিক। এসাম্যের প্রতিষ্ঠা দুর্নিবার অসম্ভব! ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম লোকক্ষয়, সমাজের উচ্ছেদ-অরাজকতা। বৈষম্য, ইতর বিশেষ, ছোটবড়, দুর্ব্বল সবল,—জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ, ব্যবহারিক জগতে স্বতঃ সিদ্ধ। এ বৈষম্যের উচ্ছেদ অসম্ভব ও অসাধ্য। হিন্দু এ অসাধ্য সাধনে কখনো নিযুক্ত হয় নাই।

৬। হিন্দুর সাম্যবাদ।

অথচ হিন্দু সাম্যবাদী। হিন্দুর সাম্য-বাদ প্রাচীন বস্তু। যেদিন হিন্দু বহুর মধ্যে এককে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে দিন হিন্দু এই মহান একত্বের সন্ধান পাইয়া,

একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি—

বলিয়া জগতের বহুদেববাদকে নিঃশেষ নিরস্ত করিয়াছিল, সেই দিনই এই উদার সাম্য-বাদের সূচনা হয়। যেদিন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি, "শ্বেতকেতো তত্ত্বমসি" বলিয়া, জীবব্রহ্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই দিনই এই সাম্যবাদ হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু এই সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া, এই এক মূল তত্ত্বেরই সাধনা করিতেছে। হিন্দুর এই সাম্যবাদ ব্যবহারিক জগতের অপরিহার্য্য বৈষম্যকে বিনাশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পরন্তু এই বৈষম্যকে স্বীকার করিয়া, এই বৈষম্যকে মান্য করিয়া, এই বৈষম্যকে অধ্যাত্মশক্তিকে অতিক্রম করিয়া, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন, ত্রিসন্ধ্যাকালে, এই সাম্যের সাধনা করেন।

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি
ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি
নিত্যমুক্ত স্বভাববান্॥

আমি দেবতা, অন্য কেহ নই; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিত্যমুক্ত স্বভাববান্। এ কেবল ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেই যে সত্য, তাহা নহে। পরমার্থতঃ ব্রাহ্মণ সমুদ্রের ভেদ নাই। পরমার্থ দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল সকলেই সমান।

বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

আত্মদর্শী পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তি, কুক্কুর এবং চণ্ডালকে সমভাবে দর্শন করেন।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

যোগযুক্ত হইয়া যিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি লাভ করেন, তিনি আমাকে সর্ব্বভূতে, ও সর্ব্ব-ভূতকে আত্মাতে অবস্থিত দর্শন করেন। যিনি আমাকে সকলে প্রত্যক্ষ করেন, ও সকলকে আমাতে প্রত্যক্ষ করেন, আমি কখনো তাঁহার অদৃশ্য হই না, তিনিও কখনো আমার অদৃশ্য হয়েন না।

এই পারমার্থিক আত্মতত্ত্বের উপরেই হিন্দুর সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত। এজন্য হিন্দু সর্ব্বপ্রকারের ব্যবহারিক ও সামাজিক ভেদ গ্রাহ্য করিয়াও, কখনো জীবের প্রতি, মানুষের প্রতি, একান্ত অশ্রদ্ধাবান হইতে পারে নাই। মানুষকে মানুষ বলিয়া নহে, মানুষকে দেবতা বলিয়া, হিন্দু সর্ব্বদাই সম্মান করিয়াছে।

৭। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা।

যেমন য়ুরোপের সাম্য, হিন্দুর সাম্য নহে; সেইরূপ য়ুরোপের মৈত্রীও আমাদের মৈত্রী নহে। য়ুরোপের স্বাধীনতা বা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ও আমাদের স্বাধীনতা নহে। ফলতঃ ফরাসী বিপ্লবের ফ্রেটার্নিটিকে ভারতের সনাতন মৈত্রী বলিয়া প্রচার করা নিতান্তই অসঙ্গত। মৈত্রী সর্ব্বভূতে স্নেহ, সর্ব্বজীবে আত্মবোধ। ফ্রেটর্নিটী ভ্রাতৃভাব বা ভ্রাতৃত্ব। কিন্তু ইহাও আমাদের ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ নহে। আমাদের ভ্রাতৃ-সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ভেদ আছে। একদিকে স্নেহ, অন্যদিকে ভক্তির উপরে এ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। বিলাতী সাম্যে বা ইকুয়ালিটীতে ব্যষ্টিভাব বা ইণ্ডিভিডুয়ালিজ্‌মই (individualism) প্রবল। এই সাম্য মানুষকে

একান্ত একাকিত্বে স্থাপিত করে। ব্যক্তিগত অধিকারের উপর এই সাম্য বা ইকুয়ালিটী প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের এই বিচ্ছিন্নতাকে সংযত করিয়া সমষ্টির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ স্থাপনই য়ুরোপীয় ফ্রেটরনিটীর উদ্দেশ্য। য়ুরোপের এই কল্পিত ফ্রেটনিটী আমাদের সনাতন মৈত্রী নহে। আর য়ুরোপের লিবার্টি এবং আমাদের স্বাধীনতায়ও আকাশপাতাল প্রভেদ। লিবার্টি, ফ্রিডম, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স—(liberty, freedom independence) এ সকলই মূলতঃ অভাবাত্মক। স্বাধীনতা ভাবাত্মক। লিবার্টি, অনধীনতা মাত্র। ফ্রিডমে বাধার, ইণ্ডিপেণ্ডেন্সে আনুগত্যের অভাব বোঝায়। এ সকলই অভাবাত্মক। স্বাধীনতা ভাবাত্মক। স্বাধীনতায় অধীনতার একান্ত অভাব বোঝায় না, কিন্তু "স্ব"এর অধীনতা বোঝায়। আমাদের "স্ব" অহং, পর ইদং। আর এই "স্ব", এই অহং বস্তু যে কত বড়, ইহা হিন্দু যেমন বুঝিয়াছিল এমন আর কেহ বোঝে নাই।

এই "স্ব" বস্তু তত্ত্ব-বস্তু। ইহা পরমার্থ পর্য্যায়ভুক্ত। এই "স্ব"এর সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা রহিয়াছে। ইহা কেবল আমার "স্ব" বা তোমার "স্ব" নহে, ইহা বিশ্বের "স্ব", বিশ্বজনীন বস্তু। ইহা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, পরম তত্ত্ব। এই তত্ত্বে আমাদের সাম্য, আমাদের মৈত্রী, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের তৃপ্তি ও মুক্তি সকলই প্রতিষ্ঠিত। ব্যবহারিক জগতে সাম্য অসাধ্য। ব্যবহারিক জগতে বিরোধ নিত্য। আর যেখানে দ্বন্দ্ব, সেখানে সত্য স্বাধীনতাই বা কোথায়? আমাদের সভ্যতা ও সাধনায়, সাম্য স্বাধীনতা, মৈত্রী, এ সকল পারমার্থিক আদর্শ। য়ুরোপে এ সকল ব্যবহারিক আদর্শ। য়ুরোপের অর্থে, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—আমাদের ছিল না, নাই, হইবে কিনা, জানি না। কিন্তু আমাদের নিজেদের অর্থে, সাম্যও ছিল, মৈত্রীও ছিল, স্বাধীনতাও ছিল। ইহা আমাদের সভ্যতা ও সাধনার অস্থিমজ্জাগত। ইহাই আমাদের লক্ষ্য। ইহাই আমাদের গতি।

৮। য়ুরোপ ও ভারতবর্ষ।

এক সময়ে আমরা একথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তখন আমরা য়ুরোপের মাপে নিজেদের মাপিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু এ মোহ বেশী দিন টিকে নাই। সত্বরেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। তখন আমরা ঠিক বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিলাম। য়ুরোপের মাপে আমাদের না মাপিয়া, আমাদের মাপে তখন য়ুরোপকে মাপিতে লাগিলাম। এক সময় যেমন য়ুরোপের আদর্শে ভারতের সনাতন সভ্যতা ও সাধনাকে বিচার করিতে যাইয়া, ভারতের সবই লঘু ও হীনতর বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, এখন সেইরূপ ভারতের আদর্শে য়ুরোপের সমাজ ও সভ্যতার ওজন করিতে যাইয়া, য়ুরোপের সকল বিষয়ই মন্দ, এই স্থূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। কিন্তু এই উভয় সিদ্ধান্তেরই মূলে ভুল। এ জ্ঞান ক্রমে স্ফুটতর হইতেছে।

এখন আর আমরা য়ুরোপের ওজনে নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার ওজন করিতে যাই না। আমাদের আদর্শেই আমাদের বিচার করি। য়ুরোপের তুলনায় আমরা হীন, এ ভাব আমাদের নাই। এ ক্ষোভ একেবারে

ঘুচিয়াছে। আমরা এক সময়ে বড় ছিলাম, এখন ছোট হইয়াছি। এ ভাবও যাইতেছে। এ ভাবের মূলেও বিদেশের মোহ প্রচ্ছন্ন ছিল। আমরা য়ুরোপ অপেক্ষা হীন এ জ্ঞান যতই আমাদের আত্মসম্মানে আঘাত করিতেছিল, ততই সে সম্মানকে সজীব রাখিবার চেষ্টায় আমরা প্রবলতর বেগে আমাদের গত বৈভব ও লুপ্ত গৌরবের প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হই। "তোমরা যখন পর্ব্বতগুহায় বাস করিতে, আম মাংস ভক্ষণ করিতে, প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিতে,—তখন আমরা জগতের বরণীয় ছিলাম"—এই বলিয়া বর্ত্তমানের হীনতাকে অতীতের স্মৃতি দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করি। ফলতঃ যতই বর্ত্তমানের হীনতার দুঃসহ জ্ঞান আমাদিগকে চাপিয়া ধরিত, ততই আমরা উৎসাহসহকারে অতীতের স্মৃতিভস্ম মাখিয়া আস্ফালন করিতাম। ইহাতে যে এই হীনতাকে আরো উজ্জ্বল করিয়া দিত, এ জ্ঞান তখনো জন্মে নাই। এ জ্ঞান এখন জন্মিয়াছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের আদর্শে নিজেদের বিচার করিবার প্রবৃত্তিও প্রবল হইয়াছে।

হীনতাবোধ ব্যতিরেকে উন্নতির চেষ্টা হয় না। আমরা যে হীন, এ জ্ঞান ক্রমশঃই উজ্জ্বলতর হইতেছে। মধ্যযুগের প্রতিক্রিয়ায় ইহা একরূপ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এরূপ হীনতার জ্ঞান নূতন ভাবের। পূর্ব্বে য়ুরোপের তুলনায় নিজেদের হীন ভাবিতাম। আজ য়ুরোপের তুলনায় আর নিজেদের কোনো বিষয়ে হীন ভাবি না। দুনিয়ার এখনো যে আমরা অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—শ্রেষ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজনের সমকক্ষ,—য়ুরোপ—আমেরিকার সমক্ষে যে আমরা উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান হইতে পারি,—এ জ্ঞান এ গৌরব ক্রমশই বাড়িতেছে। এ গৌরবেই আমাদের জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের নিজস্ব আদর্শের তুলনায় আমরা যে অতি হীন, এ জ্ঞানও উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে। আর এই স্বাভাবিক হীনতাবোধের উপরেই আমাদের সর্ব্ববিধ জাতীয় চেষ্টার প্রতিষ্ঠা। এখানেই আমাদের শক্তি এখানেই আমাদের আশা ও ভরসা।

আজ আমরা ভারতকে আর বিলাতের তৌলদণ্ডে তুলিয়া ধরি না; বিলাতকেও ভারতের তুলাদণ্ডে তুলিতে যাই না। এখন আমরা বুঝিয়াছি—

"যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।"

কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুলিয়া যাই নাই যে—

"তটস্থ হইয়া বিচারিলে, আছে তর-তম।"

ভারতের সনাতন সার্ব্বজনীন আদর্শে, তটস্থ হইয়া বিচার করিলে, উচ্চনীচ, ভালমন্দ, সকলেরই স্থান আছে। বিলাতকে ভারতের ওজনে এখন আর মাপিতে যাই না, বিলাতকে বিলাতের ওজনেই মাপিতে আরম্ভ করিয়াছি। এজন্য বিলাত সম্বন্ধে আমাদের মতামতও বিচারসিদ্ধান্ত, পূর্ব্বাপেক্ষা সত্যোপেত ও নিরপেক্ষ হইতেছে, সন্দেহ নাই।

৯। সাম্য ও বৈষম্য।

বিলাতের সাম্য ও আমাদের সাম্যে একটা বিশেষ প্রভেদ এই যে, বিলাতী সাম্য বৈষম্যকে বিনাশ করিয়া বৈষম্যের সমাধি-

মন্দিরে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছে। ভারতের সাম্য বৈষম্যকে বিনাশ না করিয়া, বৈষম্যকে অতিক্রম করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। আমাদের সাম্য পারমার্থিক। বিলাতী সাম্য ব্যবহারিক। আমাদের সাম্যের আদর্শ একান্ত আধ্যাত্মিক। বিলাতী সাম্যের আদর্শ সামাজিক। সামাজিক সাম্যের পন্থা আত্মপ্রতিষ্ঠা; পারমার্থিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা আত্মসংযমে ও আত্মবিলোপে। আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে সাম্যের সন্ধান করিলে, দলাদলি, বোঝাবোঝি, হিংসাদ্বেষ, এ সকল বিষ উদ্গীর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। মানব প্রকৃতিতে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ শক্তি আছে। যে যেমন লোক, সচরাচর অপরলোকের সহিত আলাপে আত্মীয়তায় সে আপনার প্রকৃতির অনুরূপ ভাবই তাহাদের মধ্যে জাগাইয়া থাকে। যে পশু হইয়া আমার সম্মুখীন হয় সে অলক্ষিতে আমার অন্তর্নিহিত পশুত্বকে জাগাইয়া তোলে। যে মানুষ হইয়া আমার নিকট আসে, সে আমার মনুষ্যত্বকে প্রবুদ্ধ করে। যে দেবতা হইয়া আসিতে পারে, সে তাহার পবিত্র সংস্পর্শে আমাকে দেবতা করিয়া তোলে। মানবসম্বন্ধের এই অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে, আত্মপ্রতিষ্ঠা দ্বারা যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে যায়, সে সমাজে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? অভিমান অভিমানকে জাগায়, হিংসা হিংসাকে জাগায়, খলতা খলতাকে বাড়াইয়া তোলে। বিলাতী সাম্যবাদে সমাজে এই বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়াছে। এখানে সকলেই আপনাকে বাড়াইয়া বড় হইতে চাহে। যে নির্ধন সে ধনী হইয়া ধনীর সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র। যে ছোটঘরে জন্মিয়াছে, বড় ঘরের সমকক্ষ হইতে তাহার বাসনা; —ইহাই এখানকার সমাজ যন্ত্রের মূল চালক শক্তি। এই বলবতী বাসনার তাড়নায় সমাজ অবিরত ঘুরিতেছে। যে সমতা ভারতের সনাতন আদর্শ, এ সমাজে তাহার আদর কথঞ্চিৎ হইলেও, স্থান আদৌ নাই।

নির্দ্বন্দ্বঃ নিত্য সত্যস্থ নির্যোগক্ষেম আত্মবান্—

এ চরিত্র এখানে দুর্লভ কেবল নহে—সর্ব্বত্রই ইহা অতি দুর্লভ, —কিন্তু এখানে একেবারে অসম্ভব। এদেশের লোকে ইহার মাহাত্ম্য কল্পনাতেও গ্রহণ করিতে পারে না। দ্বন্দ্ব নাই, চেষ্টা নাই আক্ষেপ নাই, গতি নাই,—এ অবস্থা এদেশে মৃত্যুর চিহ্ন, জীবিতের লক্ষণ নহে। এক অর্থে ইহা মৃত্যুরই লক্ষণ সন্দেহ নাই। নিশ্চেষ্টতা ও নির্দ্বন্দ্বতা জীবিতের চিহ্ন নয়, সত্য। আমরা সচরাচর যাহাকে জীবন বলি, সেখানে চেষ্টা, দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম এসকলের নিত্যলীলাই প্রবল। কিন্তু আমরা যাহাকে সচরাচর জীবন বলি, তার উপরেও জীবন আছে। ইচ্ছা হয়, তাহাকে "অতিজীবন" বল। শাস্ত্রে ইহাকে জীবনমুক্ত বলে। য়ুরোপীয় চিন্তাও ক্রমে এই "অতিজীবনের" সন্ধান পাইতেছে। য়ুরোপীয়েরা এখন প্রাকৃত মানুষের উপরে শ্রেষ্ঠতর "অতি মানুষ" বা সুপারম্যানের (Super-man) কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রসাহিত্যে যাঁহাদিগকে অত্মবান বলিয়াছে, তাহাই য়ুরোপীয়দের "সুপারম্যান" বা অতি-মানুষ। কিন্তু এ আদর্শ এখনো ভাল করিয়া ফোটে

নাই; কতদিনে যে ফুটিবার পূর্ণ অবসর প্রাপ্ত হইবে, তাহাও এখন বলা কঠিন। এখন সমাজ সাধারণ মনুষ্যের দ্বন্দ্ব কোলাহল লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছে।

সুতরাং সাম্যের আদর্শ সমাজে শান্তি স্থাপন না করিয়া, জনগণের দ্বন্দ্ব কোলাহলই বাড়াইয়া দিতেছে। আমরা যে সাম্যের কথা জানি, আমাদের সাধনায় যে সাম্যের গুণবর্ণনা পাঠ করি—গীতা যে সাম্যের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥
—৫-১৯।

—এ সাম্যের সন্ধান আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনায় এখনো পাওয়া যায় নাই। এখানকার সাম্য এজন্য সমাজের সংগ্রাম কোলাহলই বাড়াইয়া দিতেছে। এ সংগ্রামের নিবৃত্তি কোথায় কে জানে?

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

সমালোচক।

এম, এ পাশ করিয়া ল ক্লাসে ভর্ত্তি হইলাম। প্রভাতে উঠিয়া চা পান করিয়া খবরের কাগজ উল্টাইতে উল্টাইতে কলেজের সময় হইয়া আসিত। নয়টা হইতে ক্লাস্ আরম্ভ হইত কোন প্রকারে সাড়ে নয়টা অথবা পৌনে দশটার সময় কলেজে পৌছিয়া বাকি সময়টুকু কলেজের কেরাণীর সহিত বচসা করিয়া বা বন্ধুবান্ধবদের সহিত গল্প করিয়া কাটাইয়া দিতাম। ঘণ্টা বাজিলে দ্বারদেশ হইতে উচ্চস্বরে একবার Present Sir বলিয়া আফিস গমনোন্মুখ বিরাট কেরাণী স্রোত ঠেলিয়া গৃহে ফিরিতাম।

আমাদের কলেজের কেরাণী নিরীহ-প্রকৃতির লোক ছিলেন; তিনি ত আমাদের উৎপীড়নে মধ্যে মধ্যে অধীর হইয়া উঠিতেন। যত প্রকার অন্যায় এবং অদ্ভুত প্রস্তাব হইতে পারে আমরা তাঁহার নিকট নিয়ত উপস্থিত করিতাম।

আমরা শুনিয়াছি তিনি তাঁহার কোনও বন্ধুর নিকট দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন "ভাই যদি কোন প্রকারে ভগবানের সহিত দেখা হয় ত' বলি, প্রভু পরজন্মে আমাকে Law Class এর কেরাণী করিয়া সংসারে পাঠাইও না।"

দ্বিপ্রহরের অধিকাংশ আমার বঙ্গসাহিত্য আলোচনায় কাটিত। বাল্যকাল হইতেই আমার প্রবল অভিলাষ ছিল যে কবি হইব—কিন্তু আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। ভাগ্যক্রমে কেমন করিয়া তাহা ঠিক বুঝিতে পারিনা ক্রমশঃ কবি না হইয়া অলক্ষ্যে কবির শত্রু-সমালোচক হইয়া পড়িলাম। অদৃষ্ট যখন সর্ব্বপ্রথম তাহার বিচিত্র দণ্ড আমার মস্তকোপরি ঘুরাইয়া আমাকে সমালোচক করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল তখনকার একটী ঘটনা মনে পড়িলে আজও হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না।

তখন এনট্রান্স পড়িতাম। আমার জনৈক বন্ধু সুশীলচন্দ্র বাংলা কবিতা লিখিত।

এবং আমারই দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাকে রসগ্রাহী স্থির করিয়া প্রত্যহ নব নব রচিত কবিতা শুনাইতে আসিত এবং আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করিত। ভাল লাগিলেও আমি প্রকাশ করিতাম না এবং কবিতাগুলি বিবিধ প্রকারে সংশোধিত করিয়া দিতাম। কোনও স্থানে ছন্দ ভঙ্গ, কোনও স্থানে অর্থবিভ্রাট, কোনও স্থানে ব্যাকরণ অশুদ্ধি এবং কিছু না পাইলে শ্রুতিকটু হইয়াছে বলিতাম। ক্রমশ: সুশীলচন্দ্রের আমার সমালোচনায় সন্দেহ জন্মিল। কয়েক দিন আর কবিতা শুনাইতে আসিল না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি আমার পড়িবার ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে সহসা সুশীল আসিয়া উপস্থিত। পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল "ভাই অনেকদিন পরে একটা কবিতা লিখেছি কেমন হয়েছে দেখ।"

আমারও অনেকদিন সমালোচনা না করিয়া সমালোচনার প্রবৃত্তি সাতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সোৎসুকে তাহার হস্ত হইতে কবিতাটি লইয়া সংশোধন কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কবিতাটি অনুমান বিশ ছত্রের হইবে। অন্যূন চল্লিশটি সংশোধন করিয়া সুশীলের হস্তে দিয়া বলিলাম "তেমন সুবিধা হয় নাই।"

চাহিয়া দেখিলাম সুশীলের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সে কোনও কথা না কহিয়া পকেটের মধ্য হইতে নীরবে একখানি ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন পুস্তক বাহির করিল।

লক্ষ্মীছাড়া আমাকে মজাইবার জন্য রবিবাবুর কোনও প্রসিদ্ধ কবিতা হইতে কয়েক লাইন লিখিয়া আনিয়াছিল আমি তাহারই উপর অবাধে কলম চালাইয়াছি!! অসংলগ্ন ভাষায় কৈফিয়ৎ প্রদান করিবার চেষ্টায় যাহা বলিলাম তাহা নিতান্ত নির্ব্বোধের উক্তির ন্যায় শুনিতে হইল। আমার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া সুশীলের বোধহয় দয়া হইল, সে বাড়ি চলিয়া গেল।

এইখান হইতেই সমালোচকের পথ পরিত্যাগ করিলে বোধহয় মন্দ হইত না। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডন করে! ক্রমশঃ আমি রীতিমত সমালোচক হইয়া দাঁড়াইলাম। নিয়মিতভাবে আমার সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

চেষ্টা করিয়াও কবি হইতে পারি নাই বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক কবি ও কবিতার প্রতি আমার কিঞ্চিৎ খরদৃষ্টি আছে—আক্রোশ বলিলেও বোধহয় নিতান্ত অত্যুক্তি হইবে না। আমি জানি, আমার নির্ম্মম সমালোচনার তাড়নায় কয়েকটী নূতন কবি শান্ত ছেলের মত বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছে।

কিন্তু সম্প্রতি একটি নূতন কবিকে লইয়া আমি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। প্রায় বিগত ছয় মাস হইতে "সন্ধ্যাকাশ" নামক মাসিকপত্রে প্রতি মাসে ধারানুক্রমিক ভাবে শ্রীমতী তরুবালা দেবী স্বাক্ষরিত কোন মহিলার কবিতাবলী প্রকাশিত হইতেছে। কবিতাগুলি সাধারণতঃ মাসিকপত্রে প্রকাশিত কবিতার ন্যায়ই ভাবগৌরববর্জ্জিত ছন্দোবদ্ধ কোমল বাক্যসমষ্টি। অন্ততঃ আমার তাহাই ধারণা।

চারি পাঁচটি কবিতা প্রকাশিত হইবার

পর "অবসর চিন্তা" পত্রিকায় আমি কবিতা গুলির কিঞ্চিৎ তীব্র সমালোচনা করিলাম, যথা,—"এক সময় অবশ্য ছিল যখন মহিলা-মাত্রেরই রচনা অতিরিক্ত এবং অনেক সময়ে অযথা প্রশংসা লাভ করিত। কিন্তু সে সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান কালে বঙ্গ-ভাষায় সুলেখিকার সংখ্যা অল্প নহে এবং সাধারণ লেখিকা প্রচুর। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান লেখিকাকে আমরা অকারণ উৎসাহ দিতে ইচ্ছা করি না। জীবনের মধ্যে কবিতা রচনাই চরম সফলতা নহে। অপরও বহুবিধ কর্ত্তব্য আছে যাহা পালন করিয়া আমরা জীবন সার্থক করিতে পারি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহিত না হইয়া শ্রীমতী তরুবালা সন্ধ্যা-কাশের পরসংখ্যায় আরও দুই তিনটি কবিতা প্রকাশিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি কবিতা কিছু বিদ্রূপাত্মক, এবং বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে মনে হয় যে বিদ্রূপ যেন আমারই প্রতি বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এমন চতুরতার সহিত প্রচ্ছন্ন যে সহজে কাহারও তাহা বোধগম্য হইবার নহে।

তীব্রতর সমালোচনা করিলাম। বহু-প্রকারে তিরস্কার ও নিন্দা করিয়া পরিশেষে লিখিলাম,—ভগবান কাহাকেও কাব্য রচনা করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, কাহাকেও কাব্য উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন,—সকলকে কাব্যরচনা করিবার ক্ষমতা কেন দেন নাই সে রহস্য তিনিই শুধু জানেন। কিন্তু যাহাকে শক্তি দেন নাই—তাহাকে লালসা কেন দিয়াছেন তাহা আরও রহস্যপূর্ণ!

সমালোচনা সমাপ্ত হইলে চাহিয়া দেখিলাম ঘড়িতে উভয় কাঁটাই ১২টার ঘরে একত্র হইয়াছে। সুইচ্ টিপিয়া দিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম। শুইয়া ভাবিয়া দেখিলাম প্রকৃত পক্ষে তরুবালার কবিতার নিরপেক্ষ সমা-লোচনা করি নাই। দোষটুকু দেখাইবার পক্ষে কোন ত্রুটি করি নাই কিন্তু যাহা প্রশংসার যোগ্য তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌন থাকি-য়াছি। দীপহীন কক্ষের ঘন অন্ধকারের মধ্যে কাল্পনিক তরুবালার কাতর মুখমণ্ডল আমার চক্ষের সম্মুখে যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। অন্ধকারে স্নিগ্ধ হইয়াই হউক বা যে কারণেই হউক মমতায় মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অজ্ঞাত কুঞ্জবনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পুষ্প তাহার যতটুকু সাধ্য সুগন্ধ প্রেরণ করিতেছে আমি কেন অকারণ তাহাকে ছিন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত হই। স্থির করিলাম সমালোচনা পরি-বর্ত্তিত না করিয়া পাঠাইব না।

প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম ঘর আলোকে উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে, রাত্রে অন্ধকারের নিবিড়তায় যাহা স্থির করিয়াছিলাম দিনের আলোকে তাহা অতি সহজে লুপ্ত হইয়া গেল। সমালোচনা একটা খামে মুড়িয়া "অবসর চিন্তা" সম্পাদকের নামে পাঠাইয়া দিয়া মিঃ মুখার্জির গৃহে চা পান করিবার জন্য বাহির হইলাম। মিঃ মুখার্জি ব্যারিষ্টার, এবং আমা-দের ল' প্রোফেসার। তাঁহার পুত্র সুবোধ আমার বন্ধু।

সেদিন রবিবার ছিল। প্রতি রবিবার আমি নিয়মিত ভাবে মিঃ মুখার্জির গৃহে চা পান করিবার জন্য উপস্থিত হইতাম। মিঃ মুখার্জির পুত্র সুবোধ ইংলণ্ডে সিভিল্ সার্ভিস্

পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এবং তাঁহার রুগ্না পত্নী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য দার্জিলিংএ অবস্থান করিতেছেন। কেবল মাত্র কন্যা নিরুপমা পিতার পরিচর্য্যার জন্য কলিকাতায় আছেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বারাণ্ডায় চা-টেবিলের পার্শ্বে মিঃ মুখার্জি তাঁহার কন্যা ও জনৈক বন্ধু সহ, আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

মিঃ মুখার্জি তাঁহার বন্ধুর সহিত গল্প করিতে লাগিলেন নিরুপমা আমায় বলিলেন "প্রকাশ বাবু, এবারকার "সন্ধ্যাকাশে" আবার তরুবালার কয়েকটা কবিতা বের হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন ?"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ, দেখেছি বই কি, কাল রাত্রেই তার সমালোচনাও করে ফেলেছি —আজ সকালে "অবসর চিন্তায়" পাঠিয়ে দিয়েছি। এবার বোধ হয় তরুকে মরুতে মারা পড়তে হবে !"

শুনিয়া নিরুপমা হাসিতে লাগিল।

অবসর চিন্তায় আমি নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সমালোচনা প্রকাশ করিতাম। সে কথা কেবল নিরুপমাই জানিতেন। বাঙ্গলা কাব্য সম্বন্ধে নিরুপমার সহিত আমার সম্পূর্ণ মতৈক্য হইত—বিশেষতঃ তরুবালার কবিতা সম্বন্ধে। তরুবালার কবিতা নিরুপমার আদৌ পছন্দ হইত না। বাঙ্গালা সাহিত্যে নিরুপমার বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। কারণ মিঃ মুখার্জি ইংরাজি শিক্ষার প্রতি তত দৃষ্টি না দিয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গলা সাহিত্যে নিরুপমাকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।—নিরুপমা ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন "আপনি কি খুব তীব্র সমালোচনা করেছেন ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"বোধ হয় একটু অতিরিক্ত কঠিন হয়েছে। কিন্তু তার কারণ আছে। "ক্ষমা" কবিতাটা ভাল করে পড়ে দেখেছেন ?" নিরুপমা হাসিয়া বলিলেন, "দেখেছি সেটা আপনাকে লক্ষ্য করে লেখা —তা বেশ বোঝা যায়।" আমি বলিলাম,— "হ্যাঁ সেই জন্য "ক্ষমার" লেখিকাকে আমি ক্ষমা করতে পারলাম না"। নিরুপমা বলিলেন, "বেশ করেছেন—স্ত্রীলোক হয়ে এত কিসের গর্ব্ব। দেখছি—যা ইচ্ছা তাই লিখচে !"

আমি বলিলাম—"আর কিছুই নয়, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। আপনাদের মত শিক্ষিতা মেয়েরা যদি বাঙ্গলা লেখেন তা হলে উৎকৃষ্ট জিনিস উৎপন্ন হতে পারে। আপনি এত ভাল বাঙ্গলা জানেন একটু একটু লিখতে আরম্ভ করুন না।"

নিরুপমা হাসিয়া বলিলেন "কেন? তা হলে কি আপনি তরুবালাকে ত্যাগ করে নিরুপমার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন?"—"না আপনি যদি কবিতা লেখেন তা' হলে আমার কলম থেকে অন্য প্রকার সমালোচনা বের হবে।"

"এরূপ পক্ষপাতী সমালোচক পেলে কবিতা লিখতে প্রলোভন হয় বটে—কিন্তু প্রকাশ বাবু, পক্ষপাতিতা সমালোচকের পক্ষে একটা মস্ত দোষ।"

আমি ঈষৎ রঙ্গচ্ছলে বলিলাম—"তা নিশ্চয়ই কিন্তু—আমি যদি আপনার পক্ষপাতী না হই তা হলে সেটা আমার পক্ষে শুধু দোষ নয়, পাপ হবে।" নিরুপমার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল।—"কিন্তু বেচারী তরুবালা আপনার কাছে এমন কি অপরাধ করেছে যে

আপনি তার এমন ঘোরতর বিপক্ষ হয়ে উঠেচেন ?”

আমি কিন্তু অপ্রতিভ হইলাম। বলিলাম “তা বলতে পারিনে—কিন্তু তার উপর আমার বড় রাগ হয়।” ঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তার পর গৃহে ফিরিলাম।

প্রায় মাসাবধি পরে একদিন সন্ধ্যাকালে মিঃ মুখার্জির drawing roomএ বসিয়া দার্জিলিঙ্গ হইতে সদ্যপ্রত্যাগতা মুখার্জি পত্নীর সহিত গল্প করিতেছিলাম—এবং নিকটে বসিয়া নিরুপমা এলবামে দার্জিলিঙ্গ হইতে সংগৃহীত ফার্ণ সাজাইতেছিলেন।

মুখার্জি পত্নী বলিলেন—“প্রকাশ প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত ভাবে তোমার পত্র পেতাম বলে দার্জিলিঙ্গে অনেকটা সুস্থচিত্তে কাটাতে পেরেছিলাম। তোমার পরীক্ষার সুফল সেখানে জান্‌তে পেরে মনে অতিশয় আনন্দ বোধ হয়েছিল। বিএল পরীক্ষায় তুমি যে সর্ব্বপ্রথম হবে—তাহা আমরা বরাবরি আশা করতাম। কর্ত্তা ত সর্ব্বদাই তোমার সুখ্যাতি করতেন যে ক্লাসের মধ্যে তুমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র।”

একজন ভৃত্য আসিয়া টেবিলের উপর একটা কাগজ রাখিয়া গেল। দেখিলাম সন্ধ্যাকাশ। খুলিয়া দেখিলাম “তরু” স্বাক্ষরিত সমালোচকনামে একটী ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশিত। বলা বাহুল্য আমাকেই আক্রমণ করা হইয়াছে। কবিতার মর্ম্ম এইরূপ:—কোন এক চিত্রকর একটি সুন্দরী রমণীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। চিত্রটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। কিন্তু এক মূর্খ সমালোচক সেটিকে উল্টা করিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল “ইহাতে বর্ণের বাহুল্য আছে, তুলিকার চাতুর্য্য আছে কিন্তু অত্যন্ত ভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; কারণ এই চিত্রটিতে সুন্দরীর পদদ্বয় উর্দ্ধদিকে এবং মস্তক নিম্নদিকে অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতে চিত্রটি সর্ব্বতোভাবে অস্বাভাবিক হইয়াছে।

কবিতা পাঠ করিয়া আমার আপাদমস্তক রাগে জ্বলিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম, গৃহিণী স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন—এবং নিরুপমা ফার্ণ সাজাইতে ব্যস্ত।

রুক্ষস্বরে আমি বলিলাম, “সন্ধ্যাকাশ” এসেছে।”

নিরুপমা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন “এবার বোধ হয় তরুবালার তিরোভাব!”

আমি বলিলাম “না—অতিশয় অভদ্র ভাবে আবির্ভাব। এই নিন্ পড়ুন।”

অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত আমার হাত হইতে সন্ধ্যাকাশ লইয়া নিরুপমা পড়িলেন। পড়িয়া বলিলেন—“অন্যায়, ভারি অন্যায়! প্রকাশ বাবু আপনি এর একটা প্রতিকার করুন। অত্যন্ত কড়া করে এর একটা উত্তর দিতে হবে। স্ত্রীলোকের এতটা অভদ্রতা অত্যন্ত অগৌরবের কথা!”

আমি দেখিলাম নিরুপমা সত্যই বিচলিত, বলিলাম—“না এ ব্যাপারটাকে আমি একেবারে লঘু করে দিতে চাই। এ জঘন্য কবিতার উত্তর দিলে নিজেকেই ছোট হতে হবে। কিন্তু আমার মনে হচ্চে যে তরুবালা স্ত্রীলোক নয়—কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের নাম দিয়ে এসকল লিখছে। স্ত্রীলোক এতটা নির্লজ্জ হতে পারে আমার মনে হয় না।”

অন্যমনস্ক ভাবে নিরুপমা বলিল “তা

হবে।" চারি পাঁচ দিন পরে মিঃ মুখার্জির এক পত্র পাইলাম। পত্রে নিরুপমার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব।

পত্র পাঠ করিয়া বিশেষ বিস্মিত হইলাম না। কারণ আমার কতকটা ধারণা ছিল যে একদিন সম্ভবতঃ এ প্রস্তাব আসিবে। কিন্তু আনন্দিত হইলাম। অমিশ্রিত আনন্দ কাহাকে বলে তাহা সেদিন বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

মিঃ মুখার্জির ভৃত্যের হস্তেই উত্তর লিখিয়া পাঠাইলাম। সংক্ষেপে লিখিলাম—"আপনার স্নেহসিক্ত প্রস্তাব অদ্য আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। এ বিষয়ে অধিক কথা লিখিয়া আমাকে অপ্রতিভ করিয়াছেন মাত্র। আশীর্ব্বাদ স্বরূপ আপনার শুভ-ইচ্ছা আমি ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়াছি। তবে আমার মনে হয় এ বিষয়ে একবার আপনার কন্যার অভিমত লওয়াও আবশ্যক।"

বৈকালে মিঃ মুখার্জির পত্র পাইলাম, সন্ধ্যার পর চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম মিঃ মুখার্জি পত্নীসহ বেড়াইতে গিয়াছেন। গৃহে আমার জন্য নিরুপমা অপেক্ষা করিতেছেন। উদ্দেশ্য বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু দুই একটা কথা বার্ত্তার পর বুঝিতে পারিলাম যে নিরুপমা একথা এখনো জানেন না।

নিরুপমা বলিলেন—"প্রকাশ বাবু চা খেয়েই পালাতে পারবেন না। মা বলে গেছেন তাঁদের ফেরা পর্য্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

আমি বলিলাম—"তাহলে চিনির সঙ্গে একটু নুন মিশিয়ে দিন—তাহলে আর নিমকহারামী কর্‌তে পার্‌বো না।"

নিরুপমা হাসিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ এমন অনেক লোক আছে যাদের বাধ্য করতে হলে শুধু মিষ্ট রসে হয় না, অন্য প্রকার রসেরও প্রয়োজন।"

ভৃত্য একটা ট্রে করিয়া চায়ের জল দুগ্ধ ও চিনি রাখিয়া গেল। নিরুপমা আমার জন্য চা তৈয়ারি করিতে ব্যস্ত হইলেন। এবং আমিও একবার ভাল করিয়া নিরুপমাকে দেখিয়া লইতে ব্যস্ত হইলাম। ভাল করিয়া অর্থাৎ নূতন ভাবে নূতন চক্ষে। মিঃ মুখার্জির প্রস্তাব নিরুপমাকে আমার নিকট আজ নূতন করিয়া দিয়াছে। জানি আজ প্রভাত হইতে আমার চক্ষে এক নবজ্যোতির সঞ্চার হইয়াছে যাহাতে সমগ্র বিশ্ব আমার নিকট নবপ্রভায় উদ্ভাসিত মনে হইতেছে—কিন্তু নিরুপমা যে এত সুন্দরী তাহাত জানিতাম না! মৃদু সঞ্চালনে নিরুপমার কর্ণলগ্ন হীরকখণ্ড পর্য্যন্ত নির্ম্মল পুণ্যের ন্যায় ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছিল কি সুন্দর! হীরকের উপর নূতন করিয়া আমার শ্রদ্ধা হইল!

চা'র পেয়ালা আমার সম্মুখে রাখিয়া নিরুপমা বলিলেন—"প্রকাশ বাবু, খান। আপনি আবার গরম না হলে খেতে পারেন না।"

হায় মুগ্ধে, প্রকাশ বাবু তখন যে সুধাপান করিতেছিলেন তাহার নিকট চা অত্যন্ত তুচ্ছ। এবং দ্রুত রক্ত সঞ্চালনে শরীর এত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে গরম খাইবার পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না।

"নিরু!" কণ্ঠস্বর কিছু অস্বাভাবিক ভাবে বিকৃত হইয়া গেল।

নিরুপমা বিস্মিত হইয়া আমার মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। কতকটা সামলাইয়া

বলিলাম,—"আমরা আর আপনি বলে সম্বোধন করবনা কি বলেন?" বোধ হয় আমার দেহ হইতে তাহার দেহেও তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল। নিরুপমা নীরব। "'আপনি' শব্দটা বড় কর্কশ, দুজনের মধ্যে তাতে কেমন একটা ব্যবধান রেখে দেয়। তুমি শব্দ পরস্পরকে নিকটে আনে। নিরুপমা, তোমার কাছে আমার একটা আবেদন আছে।"

নিরুপমা উপবেশন করিল। পকেট হইতে মিঃ মুখার্জির পত্রখানা বাহির করিয়া নিরুপমার হস্তে দিয়া বলিলাম "এই আমার আবেদন।"

নিরুপমা ধীরে ধীরে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়া আমাকে ফিরাইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। আমি বলিলাম তোমার কোনও আপত্তি আছে। নিরুপমা একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

"লজ্জা কোরোনা নিরুপমা, এ লজ্জার সময় নয়। তোমার যদি কোন প্রকার আপত্তি থাকে তা হলে আমি কথনই তোমাকে বিবাহ করে তোমার কষ্টের কারণ হব না।"

"আমার একটা কথা আছে।"

"কি কথা, বল।"

নিরুপমা একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া—একটু হাসিয়া বলিলেন—"আমিই তরুবালা!"

কি সর্ব্বনাশ! একি রহস্য! মনে হইল মা পৃথিবী তুমি দুফাঁক হও আমি তোমার মধ্যে লুকাই!

* * *

তথাপি আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।

নিরুপমা আমার পত্নী হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কবিতা লিখিতেছেন। কিন্তু আমি সমালোচনা ছাড়িয়া দিয়াছি। নিরুপমা মাঝে মাঝে আমাকে সমালোচনা লিখিতে অনুরোধ করেন বোধ হয় পরিহাস করিয়া। কিন্তু আমি শপথ করিয়াছি আর বেলতলায় যাইব না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বরলিপি।

কাফী—আড়াঠেকা।

(টপ্পা)

কত* গয়ী প্রাণ-পিয়ারী, আনিয়ে হো মেরে।
চন্দ্র বিন যোন। চকোর ন জীয়ে,
জল বিন মীন দুখিয়ারে, আনিয়ে হো মেরে॥

বিখ্যাত টপ্পা রচয়িতা হম্‌দম্‌ কৃত।

১ ২ ৩
সা II সা রা রা মজ্ঞা। -া সরা মা মা I পা -া -া মমা। -পধা -ণর্সা -ণধা -ণা।
ক ত গ য়ীঁ প্রা ০ ০ ণ পি য়া ০ ০ রীঁ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

                II   ১   ২
। -া ধা পধপা মগা।   মা -জ্ঞা -রা রা I   রজ্ঞা -মপা -মজ্ঞা রমা।
 • আ নি • য়ে৹   হো • • মে   বে৹ •• •• ৹৹

৩
। জ্ঞমা -জ্ঞরা -সণ্ া সা II
 ৹৹ •৹ ৹৹"ক"

         ১   ২´   ৩   ০
মা II -া পা -া ধা। না -া -া -র্সা। ধনা -র্সা র্সা -া। -া -া -া র্সনা।
চ   • ল্ল • বি   ন ৹ ৹ •   ৹ ৹ যোন৹   • • ৹ চ•

১   ২´   ৩   ০
। র্সা র্রা র্রা -া। র্রজ্ঞা -র্মমা -জ্ঞর্রা -র্সণা। র্সর্বা -র্সণা -ধপা -মমা। -া পা র্সনা র্সা।
কো র, ন • ভো৹ •• ৹• ৹৹ য়ে৹ •৹ ৹৹ ৹৹ ৹জ ল বি

১   ২´   ৩   ০
। র্সা র্সা ণর্সা ণধণা। ধা পা -া মা। পধা -ণর্সা -ণধা -ণা। -া ধা পধপা মগা।
ন মী ন•৹৹৹   হু থি ৹য়া   রে৹ •• ৹৹ •   ৹ আ নি ৹ য়ে ৹

১   ২´   ৩
। মা জ্ঞা রা রা I রজ্ঞা -মপা মজ্ঞা -রমা। জ্ঞমা -জ্ঞরা -সণ্ া সা IIII
হো৹ ৹ মে   রে• ৹• ৹৹ ৹৹   •৹ ৹• ৹৹"ক"

             ২´   ৩
(১) তান I সরা -মপা -ধণা-র্সণা। ধপা -মগা -মা সা I
          আ৹ ৹৹ ৹•   আ৹ •• • "ক"

             ২´   ৩
(২) তান I র্সর্সা -ণধা -পমা -গমা। পমা -জ্ঞরা -সণ্ া সা I
          আ৹ •• ৹৹ ••   আ৹ ৹• •৹"ক"

             ২´   ৩
(৩) তান I ণ্ সা -রমা -পর্সা -ণধা। পমা -জ্ঞরা -সণ্ া সা I
          আ৹ ৹৹ ৹৹ ৹•   আ৹ ৹৹ ৹•"ক"

             ২´
(৪) তান I র্রর্রা -র্সণা -ধপা -মপা। মজ্ঞা -রসা -ণ্ া সা I
          আ৹ ৹• •৹ ৹•   আ৹ •• •"ক"

"কত গয়ী প্রাণ পি"—এই অংশ পর্য্যন্ত গাইয়া তান সকল ধরিতে হইবে।

সঙ্গীত-বিদ্যার্ণব
শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

* কত=কোথায়।

† যোন=যেমন।



সুরদাস ও কৃষ্ণ

শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ অঙ্কিত চিত্র হইতে

প্রভাতে।

কেন হে রজনি। পোহালে?
কেন আজি এই বিষাদ মাখান
দিবস আমারে জাগালে?
এ চেতনা চেয়ে ভাল ছিল ঘুম
বিস্মৃতি তিমিরে ঢাকা,
শতগুণে ভাল ছিল স্বপনের
কোলেতে লুকায়ে থাকা;
প্রেমময়ী লতা বক্ষ বিজড়িয়া
চাহিল মুখের পানে,
কত সুধাধারা বহিল মুহূর্ত্তে
উভয়ের প্রাণে প্রাণে।
কেন হে রজনি। পোহা'লে?
দগ্ধস্মৃতি ঘেরা এ দিবস কেন,
আমারে আবার জাগা'লে?
তাহার যাকিছু স্মৃতি নিদর্শন
এগৃহের সবঠাঁই,
তোমার আঁধারে ছিল যে ডুবিয়া
আবার দেখিতে পাই,
বড় ভাল হ'ত যদি নিশি তুমি
না ভাঙ্গিতে ঘুমঘোর,
হরিয়া লইতে প্রাণটা আমার
করিতে দুঃখের ভোর।

সন্ধ্যায়।

আজি কেন এলে সন্ধ্যা! দীনের কুটির দ্বারে।
সে যে নাই, সে যে নাই, খুঁজিতেছ তুমি যারে;
কে লবে জ্বালিয়া দীপ তোমারে আদরে বরি,'
কে আজি তোমার প্রাণ ধূপগন্ধে দিবে ভরি'?
উঠানে পড়েনি ঝাঁট, দুয়ারে পড়েনি জল,
শুধু মোর আঁখিনীরে ভিজিতেছে গৃহতল।
তুলসীর বেদীমূলে জ্বলেনি প্রদীপ আজি,
উঠে নাই ধূপধুম, শোভেনি ফুলের সাজি।
গলবস্ত্রে নমি আজি ভক্তিভরে পদে তার,
ঢালে নাই কেহ বারি—প্রীতিমাখা প্রেমধার।
আজি কেন এলে সন্ধ্যা; দীনের কুটির দ্বারে?
সে যে নাই, সে যে নাই খুঁজিতেছ তুমি যারে।
আঁচল হইতে তব কে তুলিবে যুঁই বেলা,
কে গাঁথিবে বিনাসূতে সন্ধ্যামণি ফুলমালা।
মধুর হাসিতে তব মিশাইয়া সুধা হাসি,
কে আজি পরাবে মালা মোর গলে ছুটি আসি।
ওই হের আলুথালু বিছানা বালিশ পড়ি,
ওই হের শিশু তার ধরাতলে গড়াগড়ি।
এই দেখ মোর প্রাণে উঠিছে কি হাহাকার,
জ্বলিতেছে বুক যুড়ি কি ভীষণ চিতাহার।
আজি কেন এলে সন্ধ্যা। দীনের কুটির দ্বারে?
সে যে নাই, সে যে নাই, খুঁজিতেছ তুমি যারে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পোষ্যপুত্র।

২৭

শরীর ভাল নাই বলিয়া বসুমতী সেদিন স্নানের পর নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। মোক্ষদা আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া ধমক খাইয়া গিয়াছে, আর কেহ ডাকিতে সাহস করে নাই। সুপ্রকাশ সকালে উঠিয়া, দিদি চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া পর্য্যন্ত, এমনি হাঙ্গামা বাধাইয়া তুলিয়াছে যে কেহই তাহাকে শান্ত করিতে পারিতেছে না। "দিদি যে তাহার চেয়ে হেমবাবুকেই বেশি ভালবাসে সে বিষয়ে সে আজ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে এবং আর কক্ষণও সে দিদির কথায় বিশ্বাস করিবে না, এ বিষয়ে সে সরকারমশাই হইতে

রজনীনাথ পর্য্যন্ত সকলকে সাক্ষী রাখিয়াই পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিল।

ইণ্ডিয়ার মানচিত্রে কোন একটি নগরের অস্তিত্ব লইয়া গুরুশিষ্যে সেদিন ভারী মনোমালিন্য চলিতেছিল। ছাত্র জলভরা চোখ ও কম্পিত অধরে ভৃত্যের দ্বারা আনীত হইয়া ঘরে ঢুকিবামাত্র মাষ্টার মহাশয় তাহার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুমাত্র কৌতূহলী না হইয়া একেবারে ম্যাপ খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে একটা সৃষ্টি ছাড়া অনাবশ্যক দেশের নাম খুঁজিয়া বাহির করিতে আদেশ করিলেন। এবিষয়ে তাহার অনুরাগের কথা জানা ছিল বলিয়াই তিনি তাহাকে ভুলাইবার জন্যই এই ফন্দি আঁটিয়া ছিলেন কিন্তু ইহাতে আজ হিতে বিপরীত হইল। কলম্বস যখন প্রথম আমেরিকার উপকূলে দাঁড়াইয়া তাহা নিজের আবিষ্কৃত নূতন জগৎ বলিয়া জানিতে পারিলেন তখন তাঁহার যে প্রকার মনোভাব হইয়াছিল, বিচিত্র বর্ণের ভূগোল চিত্র হইতে ক্ষুদ্র অক্ষরে ছাপান নূতন নূতন দেশের নাম আবিষ্কার করিয়া সে সেই রকমই একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। কিন্তু আজ তাহার মনের সে অবস্থা নয়। দুএকবার চিত্রের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সে রাগিয়া গেল। পুস্তক হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া গম্ভীর মুখে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল, মাষ্টার তাহাকে চিনিতেন,—বুঝিলেন বিপদ সামান্য নয়।

রজনীনাথের জুতার শব্দে সুকু অন্য দিন শান্তমূর্ত্তিতে ফিরিয়া আসে—আজও একবার সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেভাব সামলাইয়া লইয়া আরও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। মাষ্টারের উত্তেজিত স্বর বিমনা রজনীনাথকে অনেকক্ষণ পরে যখন সেঘরে টানিয়া আনিল তখনও তাঁহার কাপড় ছাড়া হয় নাই। রজনীনাথ কি হইয়াছে জানিতে চাহিলেন না, পুত্রের কাছে আসিয়া তাহার কুঞ্চিত কেশের উপর ডান হাতটি রাখিয়া বামহস্তে তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া একবার গম্ভীর বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সুকুর ঠোঁট কাঁপিতেছিল, চোখের জল এতক্ষণ জেদ করিয়া চাপিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু আর সে নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিল না; ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রজনীনাথ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া মাষ্টারের দিকে ফিরিয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "সুকুর আজ শরীর ভাল নেই অবাধ্যতার জন্য আপনাকে প্রণাম করে মাপ চাইলে কি ওকে আজ ছুটী দেবেন?"

মাষ্টার চলিয়া গেলে গভীর স্নেহে পুত্রকে বুকে টানিয়া লইয়া রজনীনাথ তাহার ললাটে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেকখানি স্নেহ ঢালিয়া চুম্বন করিলেন। বালক সেদিনকার অপবাদের সামান্য শাস্তির পরেই এতখানি আদরের মর্ম্ম ঠিক তাঁহার সজল গম্ভীর মুখে খুঁজিয়া না পাইলেও আপনা আপনিই কেবলি তাহার চোখে জল আসিতে লাগিল। পিতার প্রতি অভিমান ভুলিয়া গিয়া তাঁহার উপর কেমন যেন একটা প্রবল সহানুভূতি আসিয়া পড়িল, মনে হইতে লাগিল, "বাবা কেন আজ এমন করে চাইচেন, বোধ হয় বাবাও মনে করচেন দিদি এখন বাবাকে সে রকম ভালবাসে না। দিদি কেন এমন হলো!"

রজনীনাথ অনেক রাত্রে শয়ন করিতে গেলেন। নিঃশব্দে দিনরাত্রি কাটিয়া গেল।

তার পর আরো একটা দিন আসিল এবং চলিয়া গেল। ডাকের পিয়নটা দুইতিন দফায় সংবাদপত্র ও চিঠিতে রজনীনাথের পড়িবার ঘরের বড় টেবিলটা ভরাইয়া দিয়া গেল! কিন্তু কোন একখানাতেও প্রত্যাশিত অক্ষরের ছাপ নজরে পড়িল না। সংসারটা কেবলি কার্য্যের জন্য সৃষ্ট মনের কোন অবস্থাতেই কার্য্য পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই, রজনীনাথ সমাগত মক্কেলদের কাজ দেখিতে উঠিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাদের সহিত মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত কথা বার্ত্তায় কাটাইয়া তাহারা বিদায় হইলে জোর করিয়া উঠিয়া পড়িবার ঘরে আসিয়া মোটামোটা আইনের বই খুলিয়া বসিলেন। কিন্তু যতই বেশি আগ্রহের সহিত সেগুলাকে নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন তাহাদের মধ্যকার ছাপার অক্ষরগুলা ততই তাঁহার মনের মধ্যে দুর্বোধ্য ও জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে পিনালকোডের ধারার উপর একখানা সকরুণ মুখচ্ছবি কেবলি অঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে মুখের নেগেটিভ খানা যে তাঁহারি বুকের মাঝখানে বসান রহিয়াছে, অশ্রুজলে অস্পষ্ট সে সুন্দর বর্ষাধৌত জুঁই-ফুলের মতন ক্ষুদ্র মুখখানা যে তাঁহারি আদরিণী অপরাধিনী কন্যার! পিতার পক্ষে সে চিন্তা যেন অসহ্য হইয়া উঠিল।

২৮

সেদিনও মেঘপূত্র আকাশখানা জলভারের গৌরবে বজ্র বিদ্যুৎ বক্ষে বহিয়া আনিয়া স্তব্ধ হইয়াছিল। নদীর এপারে ওপারে যেখানে সেখানে আকাশখানা হেলিয়া পড়িয়া সবুজ গাছগুলার মাথাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে; সর্ব্বত্রই যেন কালী ঢালা। কালো আকাশের নীচে সবুজ গাছের শ্রেণী আবার সেই সবুজ ঝোপের মধ্যে মধ্যে কোথাও একটা গাছভরা রাঙ্গা ছাতিম ফুল কোথাও বা গোটাকতক কদম্বফুটিয়া গাছ আলো করিয়া রহিয়াছে। আসন্ন বৃষ্টির ভয়ে বক চিল ও পাখীগুলা ঝাঁক বাঁধিয়া উচ্চ আকাশের কোল দিয়া কৃষ্ণতারকা শ্রেণীর মত ক্ষুদ্রাকারে উড়িয়া যাইতেছিল; কেবল কাকগুলা তখনও পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সহিত গাছের ডালে ও প্রাচীরের ধারে বসিয়া স্বর অভ্যাস করিতেছিল। আসন্ন বিপদের ভাবনায় তাহারা বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নহে।

জানালার নিকটে আরাম কেদারাখানায় পড়িয়া শ্যামাকান্ত চৌধুরী বিশ্রাম করিতেছিলেন, নিকটে একটা ছোট টেবিলের উপর চশমার খাপ ও একখানা বাংলা সংবাদ পত্র পড়িয়া রহিয়াছে সেখানার এখনও ভাঁজ খোলা হয় নাই। একই সময়ে নিজের অন্তরের সঙ্গে ও বাহিরের সহিত তাঁহার যে সংগ্রাম বাধিয়া উঠিয়াছিল তাহা হইতে আত্মরক্ষা করা শ্যামাকান্তের পক্ষে প্রায় অসাধ্য। কৃত কর্ম্মের অনুশোচনা ও অকৃত কার্য্যের ফলভোগ তাঁহার পক্ষে এখন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। মনের দৃঢ়তা বহুপূর্ব্বেই যে গিয়াছিল,—কেমন করিয়া এত বড় বড় আঘাতগুলা সহ্য করিয়া চারিদিককার বিরোধকে শান্ত করিয়া সামঞ্জস্য করিয়া চালাইয়া যাইবেন সেকথা মনে করিবার মতন একটা বলও তো সেই চিন্তাজীর্ণ বক্ষের ভিতর নাই। অবসাদের ক্লান্তিতে শুভ্র মস্তক ভারি হইয়া আসে, স্তিমিত চক্ষু কেবলি মুদিয়া আসিতে থাকে; উপায় ও চেষ্টা মনের

মধ্যে ধরা দেয় না। তবে একটা আশা তিনি সকল সময়ই ছাড়িতে পারেন না তাই মনের এমন সঙ্কট অবস্থাতেও নিকটবর্ত্তী সমস্যাটার অপেক্ষা দূরস্থ সঙ্কটের কথাই তাঁহার মনে লৌহদণ্ডের মতন আঘাত করে। বেদনার চেয়ে সময়ে সময়ে এই ব্লিষ্টারের জ্বালা আরও ভয়ানক। মনের এ অবস্থাকে ছাড়াইয়া চলিবার আর যেন কোন দিক দিয়া পথ পাওয়া যাইতেছিল না। চারিদিক হইতে সব দ্বারগুলা একে একে রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে, অন্ধকার ক্রমে ঘন ও ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, অন্ধকারে যে ক্ষুদ্র শুকতারাটি আপনার সবটুকু স্নিগ্ধ আলোক ঢালিয়া দিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল সেও সহসা এই নিবিড় অন্ধকার রাশির মধ্যে ক্ষুদ্র বিন্দুটির মতন লুপ্ত হইয়া গেল। এখন এই গভীরতম অন্ধকারে এই চারিদিককার রুদ্ধদ্বার দুর্গকারার নির্জ্জন পথে দৃষ্টিহীন অন্ধকে কে হাত ধরিয়া পথ চিনাইয়া এখান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে? অন্ধকারে ভীত বালক যেমন নির্ভরতার সহিত মাতৃবক্ষে মুখ লুকাইয়া নিজেকে ঢাকিতে চায় তেমনি করিয়া শ্যামাকান্ত ব্যাকুল ভাবে মা বলিয়া একখানি স্নেহ বক্ষের ছায়াতলে আত্ম সমর্পণ করিতে গিয়া স্বপ্ন দৃষ্টের মতন চমকিয়া ফিরিয়া আসিলেন। হায় মাতৃহারা! কোথায় আজি সে কোথায়? কোথা মা কোথা মা মাগো তুই ফিরে আয়!

শ্যামাকান্ত সবচেয়ে আপনাকেই বেশি তিরস্কার করিতেছিলেন। যে সময় পূর্ব্বকালের লোকেরা সংসারাশ্রমকে পরিত্যক্ত বস্ত্র খণ্ডের মতন অনায়াসে অবহেলার সহিত পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া পারলৌকিক চিন্তায় মনঃসংযোগ করিতেন,—আর তিনি কিনা ঠিক সেই সময় একটি শিশুর স্নেহে অন্ধ হইয়া তাহাকে কোলে পাইবার জন্য যে কোন উপায় খুঁজিয়া উন্মাদের মতন বেড়াইতেছেন! তাঁহার কি একথাও ভাবা উচিত ছিল না যে, তাঁহার খেয়ালের দায়ে তিনি যাহাকে কাছে টানিতেছেন তাহার জীবন কেবল মাত্র তাঁহাকে খেলার সুখদান করিবার জন্যই সৃষ্ট হয় নাই। রেশমে সোনায় হীরায় সাজাইয়া কাচের দেরাজে সাজাইয়া রাখাতেই তাহার জীবনের চরমসুখ ও পরিণতি নয়। এখন তাঁহার ঘরের দুষ্ট শিশু যদি তাঁহাকে ঠেলিয়া তাঁহার সে যত্নের প্রতিমা সিংহাসন চ্যুত করিয়া ডাকের সাজ খুলিয়া কাদামাটি মাখাইয়া ফেলিয়া দেয় তিনি তাহাকে কেমন করিয়াই বা রক্ষা করিবেন? যে মূর্ত্তিউপাসক নয় তাহার সাক্ষাতে দেবতার স্থাপনা করিতে যাওয়াই যে প্রথমে বিড়ম্বনা হইয়া ছিল! যে প্রতিমায় সাধক মহাশক্তির পূর্ণমূর্ত্তি ভক্তির চক্ষে দেখিতে পায় অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে সে মাটি খড়ের জড় শরীর লইয়া প্রকাশ পায় মাত্র, চিন্ময়ীরূপে আবির্ভূতা হয় না। এই সোজা কথাটা বুঝিতেই কি সবচেয়ে দেরি হইল! রজনীনাথের মেয়ে তাঁহার হৃদয়ে যে অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিল তাহা লইয়া খুসী থাকিলেই তো চলিতে পারিত; মানসমন্দিরেই ত দেবী পূজার ফল অধিক। রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন "কাঠ খড় আর মাটির গঠন কাজ কি রে তোর সে গঠনে, আয় মনোময়ী প্রতিমা গড়ি পূজা করি সঙ্গোপনে"।

সেদিন শ্যামাকান্তের বিশ্রাম অবসর ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল ভৃত্য প্রবেশ করিয়া জানাইল—"বাবু এসেচেন।"

"কে বাবু?" এই প্রশ্ন উঠিবার পূর্ব্বেই রজনীনাথ গৃহে প্রবেশ করিলেন। "এ্যাঁ রজনী! আশ্চর্য্য হইয়া শ্যামাকান্ত উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন "এসো এসো আমি তোমার কাছেই লোক পাঠাব ভাবছিলুম। বসো, সব ভালতো?" শেষের স্বরটা কাঁপিয়া আসিল। রজনীনাথ বেহাইকে প্রণাম করিয়া ভৃত্যের দেওয়া কেদারাখানা শ্যামাকান্তের আসনের দিকে একটু সরাইয়া লইয়া বসিতে বসিতে উত্তর করিলেন "আপনার আশীর্ব্বাদে সব এক রকম চলচে"—মানুষ খুব বেশি রকম একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া উঠিলে প্রথম যে মুহূর্ত্তে সেটাকে অবাস্তব বলিয়া জানিতে পারে সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মনে প্রাণে যে রকম একটা গভীর শান্তি ও মুক্তির আনন্দ জাগিয়া উঠে রজনীনাথের আগমনে শ্যামাকান্তও ঠিক সেই রকম একটা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ আরাম অনুভব করিতে লাগিলেন। বুকের মধ্যে যে যন্ত্রণার শূল ব্যথাটা কণ্ঠ অবধি ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল মন্ত্র চিকিৎসার অব্যর্থ প্রয়োগের ন্যায় তাহা মুহূর্ত্তে নিবৃত্ত হইয়া গিয়া শরীরে যেন নূতন আশা ও বলের সৃষ্টি করিল। পরিত্যক্ত আলবোলার নলটা তুলিয়া লইয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কেউ এসেছে?" রজনীনাথ শ্যামাকান্তের মুখের পাণ্ডুতা লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে মৃদুস্বরে কহিলেন "না মেঘ করল সেজন্য একাই এলেম, আপনি ভাল আছেন তো?

হতাশভাবে শ্যাকাকান্ত কেদারার পৃষ্ঠে মস্তক নিক্ষেপ করিয়া অধীর কণ্ঠে উত্তর করিলেন "আর ভাল, মৃত্যু ভুলে গিয়েছে তাই বেঁচে থাকা,—না হলে মরণের সময় তো হয়েছে।"

এই কথা কয়টা রজনীনাথকে এমন প্রবলভাবে আঘাত করিল যে তিনি ব্যথিত ও লজ্জিত মস্তক নীরবে হেঁট করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শ্যামাকান্ত আর কোন কথাই কহিলেন না, রজনীনাথও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, বক্তব্য বিষয়টিকে বেশ করিয়া গুছাইয়া সহজ করিয়া লইতে আজ তাঁহার অত্যধিক বিলম্ব ঘটিতেছিল। ক্রমে স্তব্ধ গাছপালা দোলাইয়া, নাড়া দিয়া একটা সর্ সর্ শব্দ উঠিল ও কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। তখনও ঝাঁক বাঁধিয়া পাখীগুলা ওপারের আশ্রয়াভিমুখে নদীর উপর দিয়া সাঁ সাঁ করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে; এপারের ছায়াময় ঘাটের পথে পল্লীবধূগণের মলের ও চুড়ির শব্দ মুখর হইয়া উঠিল। সঙ্কোচ কুণ্ঠিত ভাবে রজনীনাথ সহসা বলিয়া ফেলিলেন—

"আপনি বোধহয় তাদের ক্ষমা করেছেন? সে এরকম ব্যবহার করবে তা"—শ্যামাকান্ত প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাদের ক্ষমা করেছি?" আবার রজনীনাথ ইতস্তত করিতে লাগিলেন; একটু থামিয়া বলিলেন "যারা আপনার কাছে অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী,—হেম বড় অন্যায় করেছে কিন্তু তার চেয়ে—"

যে নামটা তাঁহার জিহ্বা অপরাধী শ্রেণীর সহিত সংযুক্ত করিতে জড়াইয়া আসিতেছিল সেটা তাঁহাকে জোর করিয়া উচ্চারণ করিবার

প্রয়োজন হইল না। শ্যামাকান্ত বাধা দিয়া কহিয়া উঠিলেন "ক্ষমা,—আমিতো রাগ করিনি ক্ষমা কিসের জন্য? বরং ধরতে গেলে তার কাছে আমিই অপরাধী—"

বৃদ্ধ যেন ধরা ছোঁয়া দিতে রাজি নহেন, রজনীনাথ হতাশ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

এই সময় বড় রকম একটা ঝড়ো হাওয়া উঠিয়া ঘরের কাগজপত্র ওলোট পালট করিয়া দিয়া রজনীনাথকে একটা কাজ আনিয়া দিল ও পরক্ষণে গর্জ্জন শব্দে মেঘ ডাকিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে তাঁহাকে জানালা বন্ধ করিবার জন্য উঠিতে হইল। ফিরিবার সময় রজনীনাথ একখানা সংবাদপত্র টেবিলের উপর হইতে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন কিন্তু শোকাতুর বৃদ্ধের অভিমানাহত চিত্তের রুদ্ধ হতাশা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ভিতরে ভিতরে আঘাত করিতে ছাড়িল না।

সেদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শিবানী ভিজা চুলগুলা পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া নিজের শোবার ঘরে নদীর উপরকার জানালাটার কাছে বসিয়া ছিল। এখানে অমূল্যর কোন ভারই তাহাকে লইতে হয় না, দাসী চাকরও আত্মীয় আশ্রিতদের কোলে কোলে ঘুরিতেই তাহার মাটিতে পা দিবার সময় থাকে না। শিবানীর হাতে কোন বিশেষ একটা কাজও নাই। সংসারের ছোট বড় শত কার্য্য শত দিকে ছড়ান রহিয়াছে। কত দিকে কত বিশৃঙ্খলা কত অপব্যয়, কিন্তু তাহার জন্য একটিও কাজ খালি ছিল না। সে যে কাজে হাত দিতে যায় চারিদিক হইতে মাসী পিসি দিদির দল বাঘিনীর মতন ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরে এবং শুষ্কচক্ষে জল আনিয়া জিব কাটিয়া কান্নারসুরে বিনাইয়া বলিতে থাকে, "ওমা তুমি কি দুঃখে কুটনো কুটবে মা, ওমা আমার বিনুরবৌ, আমি থাকতে পানসেজে হাত ময়লা করবে আর আমি তাই পোড়া চক্ষে বসে দেখব? ও আমার অভাগ্যির দশা!" শিবানীর আর কাজের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকে না; সে মুহূর্ত্তে হাতের কাজ হাত হইতে নামাইয়া দ্রুতপদে নিজের ঘরে চলিয়া যায়। পরদিন আর কাজে হাত দিতে তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ জন্মায় না। এমনি করিয়া কোন একটা জায়গায় সে আপনার বিপর্য্যস্ত হৃদয়কে আবদ্ধ করিবার অবসর বা সাহায্য পর্য্যন্ত পাইতেছিল না। যেটাকে সে কাছে টানিতে যায় সেইটেই যেন নদীস্রোতের বিপরীত মুখে চলিয়া গিয়া তাহাকে উপহাসের সঙ্গে চাহিয়া দেখে। কাজের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া দিয়া যে একটি আত্মতৃপ্তি সে এতদিন বরাবর উপভোগ করিয়া আসিয়াছিল, পূর্ব্বের কর্ম্মশ্রান্ত শরীরের মধ্যাহ্ন ও রজনীর বিরাম অবসরটুকু বেদনায়, কল্পনায় প্রতীক্ষায় ও নিরাশায় যেমন একটি বাঞ্ছনার বিষয় ছিল, সেটুকু তাহার এই নূতন অবস্থা জোর করিয়া তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। বন্ধনহীন দীর্ঘাবকাশের স্মৃতির দাহের কাছে সেই স্বল্পাবসরের চিন্তাটুকু কত লোভনীয় শিবানী এখন তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল।

বৃষ্টি থামার পর হইতে মেঘ কাটিয়া যাইতেছে। মহাজনী নৌকা ইঁট ও খড়

বোঝাই হইয়া অনিচ্ছুক গতিতে ও খেয়াব নৌকা দ্রুতগমনে গন্তব্য পথে চলিয়াছে। তাহাদের দাঁড়ের উত্থানপতনের শব্দ ও তটপ্রান্তে নিপতিত ভগ্নতরঙ্গের অস্ফুট আর্ত্তনাদে গৃহস্থ গৃহের সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি মিলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার বাতাস নদীতীরের বাঁধাঘাট হইতে হুহু করিয়া ছুটিয়া আসিল। সেই সাড়ায় চমকিয়া শিবানী একবার মুখ তুলিল, সম্মুখের দেওয়ালে চওড়া ফ্রেমে আঁটা বিনোদ কুমারের অপরিচিত বালক মূর্ত্তি অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া আসিয়াছে। হাঁফ ছাড়িয়া সে আবার মুখ ফিরাইয়া লইল। এখন আর সন্ধ্যা তাহাকে চকিত করিয়া প্রদীপের কাছে টানিয়া আনে না, সন্ধ্যাশঙ্খ অভিমানে মৌন পড়িয়া থাকে।

এমন সময়ে দীপহস্তে সিদ্ধেশ্বরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "ঢের ঢের বেহায়া দেখেছি বাবা, এমন ধারা কিন্তু আমার বাপ চোদ্দপুরুষে কখনও দেখেনি! মিনষে কোন মুখ নিয়ে আবার ওকেলতি করতে এলো গা?"

শিবানী যেন ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল, হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল "কে মা?" কন্যার এই অনুসন্ধিৎসায় সিদ্ধেশ্বরী হঠাৎ খুব উৎসাহিত হইয়া প্রসন্নভাবে বলিয়া উঠিলেন—"হেমার শ্বশুর মিনসে এসেচে যে তা জানিস্‌নে? সেই অবধি বেইএর কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে, ওঠবার নামটি পর্য্যন্ত নেই। কি যে সলাচ্চেন কলাচ্চেন তা কেষ্ট জানেন। একে তো বুড়র তাদের ওপোরেই সাতটা প্রাণ—আমার গুঁড়োটুকু যেন ওর"—শিবানী বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত মুহূর্ত্তে ফিরিয়া বলিল "তিনি কি একলা এসেছেন মা?" সিদ্ধেশ্বরী সাদা পাথরের টেবিলে তৈলদাপটা নামাইয়া রাখিয়া একটুখানি মুখ বাঁকাইয়া অপ্রসন্ন স্বরে উত্তর করিলেন "আপাতক একলাই বটে, তা বেশিক্ষণ আর একলা থাকচে না! মিন্‌ষে আমাদের শত্রুর ছিল, তা দেখমা শিবু, একটা কাজ কর দেখিন্ সকল দিকেই ভাল হবে। তোর শ্বশুরকে বল্ আমি ওদের সঙ্গে থাকতে পারব না—থাকতে হয় ওরা অন্য কোথাও থাকুক—"

দীপ্ত সূর্য্যালোকের উপর মেঘ আসিয়া পড়িলে তাহা যেমন এক মুহূর্ত্তেই ম্লান হইয়া যায়। শিবানীর মুখ তেমনি মুহূর্ত্তে অন্ধকার হইয়া আসিল। সে একটুখানি মুখ ফিরাইয়া বক্ষের আঘাতটা সামাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। মার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ফিরিয়া উদ্ধতভাবে বলিল 'না'। তাহার মুখের উপর ঘন লাল রংয়ের একটা তপ্ত শোণিতের উচ্ছ্বাস স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল দীপের আলোকেও তাহা সিদ্ধেশ্বরীর অগোচর রহিল না। তিনি মনে মনে একটু ভয় পাইয়া গেলেও হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন, অথচ কন্যার এই আসন্ন ঝড়ের মতন স্তব্ধ মুখের দিকে চাহিয়া—তাহাকে তাহার জেদের বিরুদ্ধে লওয়াতে চেষ্টা করা যে কতখানি অসাধ্য ব্যাপার তাহা বুঝিলেন। তাহা নাজানা ছিল এমনও নয়। মনে মনে জ্বলিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহা আর কখনও ঘটিতে দেখা যায় না আজ তাহাই ঘটিল। এক মুহূর্ত্ত পরেই শিবানীর মুখের রং বদলাইয়া গেল ও সে চমকিত

হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "রজনীবাবুর খাবার বন্দোবস্ত করতে হবেতো মা, তাঁকে বোধহয় খাওয়ান হয়নি?"

"কে জানে বাছা আমার অত সাত-কুটুমের খপর রাখবার অবসর নেই, যাদের রস পড়েচে তারা করুক গিয়ে। আমি নিজের জ্বালায় নিজেই জ্বলে মরচি—নেহাৎই সন্ধ্যাবেলায় 'বাড়ি বন্ধনের' তুকটি না করলে নয় তাই এই শরীল নিয়েও মরতে মরতে আসি। বলি কোনদিন আবার চোরডাকাতে সব্বসিৎ লুটে নে যাবে।—থাকগে—যদ্দিন আছি কেউ বুঝুক না বুঝুক আমার কম্মতো আমি করি,—তাপর যার কপালের যা লেখন আছে সে ভুগ্‌বে। হরি হে দীনবন্ধু!"

সিদ্ধেশ্বরী গলায় অঞ্চলের প্রান্ত দিয়া নদীর দিকে মুখ করিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নদীতীরস্থ সন্ধ্যাদেবীকে প্রণাম করিতে করিতে দেখিলেন, শিবানী চলিয়া যাইতেছে। এক মুহূর্ত্তে সিদ্ধেশ্বরীর পায়ের তলা হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত রাগে ঝাঁ ঝাঁ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হতভাগা মেয়ে তাঁহার একটা পরামর্শ লইবে না আবার উল্‌টিয়া বিশেষ করিয়াই যেন তাঁহার শত্রু পক্ষের সঙ্গেই মেলা মেশা আদর আপ্যায়িত করিবে। এ পেটের শত্রুরই তাঁহার সবচেয়ে যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে। এক বাবু বুঝি যদি নিজের ভাল মন্দ নিজে দেখ। তা যখন পারবে না তখন মায়ের চেয়ে তো আর কেউ সংসারে আপন হবে না তা সেই মাকেই তোর লাভ লোক-সান ভাববার ভার দিয়ে যা বলি তা চুপকরে মেনে যা—তা নয়! যেটিতে নিজের ক্ষতি হবে সেইটিই যেন বিশেষ করেই করবে? প্রকাশ্যে বিরক্ত কণ্ঠে তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "শোন্ শিবানী! তোর ভাল যদি চাস্ এখনো বুঝে চল, ওদের এ বাড়িতে ঢোক্‌বার পথ বন্ধ কর। না হলে এখানে তোর জায়গা হবে না তা কিন্তু আমি এই দিব্যি করে বলে দিলুম,—দেখে নিস্"—শিবানী যাইতে যাইতে বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত—সে কঠিন স্বরে বলিল, "নাই বা হলো আমি এ বাড়িতে জায়গা চাইনে!"—

সিদ্ধেশ্বরী আজন্ম ধরিয়া তাহাকে চিনিয়া আসিলেও তাহার আজিকার এই কয়টা কথায় অত্যন্ত চমকিত হইলেন। এই বাড়ি, এই দাসী চাকর, এই বাগান বাগিচা, সোনাদানা, রাজ ঐশ্বর্য্য সে এসব চাহে না? শিবানী বলে কি? সে পাগল হইয়াছে! বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সত্যি কি তুই তাদের জন্যে পেটের ছেলেটাকে সুদ্ধ ফাঁকি দিতে চাস্ নাকি?" সংসারে যে এরকম অনাসৃষ্টি বুদ্ধি থাকিতে পারে সে কথা যেন তিনি তাঁহার এই এতখানি বয়সের মধ্যে এই প্রথম জানিতে পারিলেন। শিবানী দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল "হাঁ"। সিদ্ধেশ্বরী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গালে হাত দিলেন, এ মতের বিরুদ্ধে কোন প্রকার যুক্তি তর্ক প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া তখন আর তাঁহার মনে হইল না। শিবানী নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। মুখে যত খান দেখাক্ ভিতরে ভিতরে শত্রু নিপাতে যে সেও খুসী না হইয়া থাকিতে পারে নাই এমন বিশ্বাস সিদ্ধেশ্বর

এতদিন নিঃসন্দেহ রূপে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ তাহার সংশয় দূর হইল। সে যে জুয়াচোর রজনীনাথের জালে সম্পূর্ণরূপ জড়াইয়া একেবারেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে, এই বাড়ি এই ঘর সমুদয় চুলচেরা করিয়া পোষ্যপুত্র হেমেন্দ্র তাহার অসহায় দুধের শিশুর সহিত ভাগ করিয়া লইয়া এখানে আসিয়া বসিবে, তাহা তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। আর তখন যে সে এক-দিন কোনও ছুতায় শিশুকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া তাহার গলাটি টিপিয়া মারিয়া আম বাগানে ঐ ভাঙ্গা পাতকুয়াটার মধ্যে ফেলিয়া দিবে না তাই বা কে বলিতে পারে। আর যদি বা তা নাও দেয় তবুও এই কাঁড়ি কাঁড়ি পিতলকাঁসার বাসন, সিন্দুক সিন্দুক সাল দোসালা, রূপাসোনার বস্তু এসবই তো তাঁহার নিকট হইতে অর্দ্ধাঅর্দ্ধি ছিনাইয়া লইবে! এমন কি রান্নাঘরের পিঁড়িগুলি পর্য্যন্ত ভাগের হাত এড়াইতে পারিবে না! এ অত্যাচার অসহ্য! হে ঠাকুর! যে হতভাগারা মিনি অপরাধে এমন করিয়া তাঁহার গরু মারিতে কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তাহাদের কি কখনও ভাল হওয়া উচিত? না ভাল হইবে?

সিদ্ধেশ্বরী রাগে গস গস করিতে করিতে নীচে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, শিবানী রান্নাঘরে গিয়া কাহারও নিষেধ না মানিয়া নিজের হাতে মাছের কালিয়া রাঁধিতে বসিয়া গিয়াছে। মাসিমা কহিলেন, "এত করে বারণ করলুম কিছুতেই বৌমা শুনলেন না। দেখদেখি কি রকম সাহস—এই গরম!" সিদ্ধেশ্বরীর মুখ কালো হইয়া উঠিয়াছিল ঝঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "মরুকগে; পোড়ামেয়ে যাদের বাঁদিগিরি করতে জন্মেচেন তাদের সেবা করে মরুন! নেহাৎ মায়ের প্রাণ তাই ওর জন্যে শরীর পাত করে মরি,—থাকতে পারিনে তাই বলি,—কুপুত্ত্র হলেও তো কুমাতা হবার যো নেই। তা অধম্মি মেয়েটা একবার সেটা ভাবে!" মাসিমা হরি নামের মালা ফিরাইতে ফিরাইতে একটু সহানুভূতির স্বরে কহিলেন "ওকথা আর বলো কেন বোন, ঐ দুঃখেই মরে আছি! আমার মনটা বড়ই নরম কিনা, কারু কষ্ট দেখলে চোখের জল সামলাতে পারিনে। ওইযে কথায় বলে "আপন দুঃখ অসম্বরি, পরের দুঃখ সইতে নারি"—আমার হয়েচে ঠিক তাই। তা বোন ভাল কথা, আমায় আজ তোমার সেই জল পড়াটি শিখ্‌য়ে দাও না ভাই। বিধুর ছোট মেয়েটা বিকেল থেকে পেট কামড়ে খুন হয়ে যাচ্চে। অমন গুণ তো কোন জ্যান্ত ওষুধেরও দেখতে পাইনে! সেদিন কেষ্টা ছোঁড়াটার কি কান্নাই থামিয়ে দিলে!"

সিদ্ধেশ্বরীর মনের অবস্থা তখন মন্ত্রদানের ঠিক উপযোগী না হইলেও মন্ত্র মাহাত্ম্য শ্রবণে তাঁহার মনটা হঠাৎ গলিয়া পড়িল! খুসী হইয়া কহিলেন "তা তোমায় শেখাতে পারি বোন। কিন্তু যেন দু'কান না হয়ে যায়; তাহলে আর ওতে কাজ হবে না। এ মন্তর কি ওমনি পেয়েচি! আমার পিস শাশুড়ির ননদের 'মা' কত সাধ্যি সাধনায় তবে মরবার সময়ে আমায় দিয়ে গ্যাছে! এ আর কেউ জানে না এই তুমিই বা আজ শুনে নিলে। শোন বলি তবে; কানের কাছে চুপি চুপি বলতে হবে কেউ কোথা দিয়ে না শুনে ফেলে—

"রাম লক্ষ্মণ সীতে যান কিষ্কিন্দার পথে;
সাথে নিলে হনুমান আর সুগ্রীব মিতে;
সুগ্রীব বলেন মিতে আমি মন্তর এক জানি,
পেটের ব্যথায় অব্যথা হয়ে যায় প্রাণী।"

তিনবার মন্তর বলে জলে তিনটি ফুঁদিয়ে ছেঁৎতেলায় দাঁড়িয়ে খাওয়াতে হবে। এ অব্যর্থ বোন অব্যর্থ।"

উৎকলের শৈল-শিল্প।

উৎকলের শিল্প-ভাণ্ডার বিশাল-অতলস্পর্শ! সাগর-তটে, লোকালয়ে, অরণ্যে এবং পর্ব্বতে, এই অসাধারণ শিল্প-কীর্ত্তি-মালার, কত ক্ষুদ্র-বৃহৎ চিহ্ন যে বর্ত্তমান আছে, তাহার সকলগুলির সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলন করা একান্ত কঠিন,—এমন কি অসম্ভব। আজও পর্য্যন্ত কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এ বিষয়ে সফল কাম হইতে পারেন নাই। পরন্তু, কাল-প্রভাবে প্রাচ্য-শিল্পের কত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ধ্বংস কবল-গত হইয়াছে, তাহাও জানিবার উপায় নাই। এবং অনেক শিল্প-কীর্ত্তি, হয়ত' আজও পর্য্যন্ত নব-দৃষ্টির অন্তরালে অরণ্যচারী শ্বাপদের নিরাপদ বিরাম-নিকেতন হইয়া আছে।

এই উৎকলেই সম্রাট ধর্ম্মাশোকের প্রসিদ্ধ অনুশাসনলিপি, শৈলাঙ্গে উৎকীর্ণ হইয়া সর্ব্বজীবে অহিংসা, সাম্য ও মৈত্রী প্রচার করিতেছে। এই উৎকলেই বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তিম-নিশ্বাস হিন্দুধর্ম্মের সহিত একীভূত হইয়া গিয়া সর্ব্বলোক নমস্য জগন্নাথের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং নীচের প্রতি উচ্চের অত্যাচার, শূন্যগর্ভ আভিজাত্যবাদ ও তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক ভেদ নীতি ঘুচাইয়া, নিখিলের এক-ই আসন নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিল। এবং এই উৎকলেই প্রাচ্য-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-মালা অদ্যাপি বিদ্যমান। পুস্তক-বদ্ধ ইতিহাস সর্ব্বস্থলে দুষ্প্রাপ্য। উৎকলের শিল্পের সহিত বহু বিচিত্র ইতিহাসের উপকরণ বর্ত্তমান। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে যোগ্যতর ব্যক্তি তাহা সংগ্রহের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন।

উৎকলের অধিকাংশ স্থান এক শৈল-শৃঙ্খলে বেষ্টিত। স্থানে স্থানে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। যেখানে যেখানে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সেইখানেই একই শৈলের বিভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন মুণ্ডক, মহা-বিনায়ক, কপিলাশ, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, রত্নগিরি, ললিতগিরি, নীলগিরি ও ধবলাগিরি প্রভৃতি। খণ্ডগিরির একাংশকে উদয়গিরি বলা হয়। তদ্ভিন্ন আর এক উদয়গিরি আছে। তাহা বিরূপা নদীর তটে অবস্থিত। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, এই উদয়গিরিকেই তাঁহার "সীতারামে"র সেই প্রসিদ্ধ বর্ণনায় স্থানদান করিয়াছেন।

আমরা সেই উজ্জ্বল বর্ণনা এখানে উদ্ধার না করিয়া পারিলাম না। ইহাতে আমাদের বক্তব্য বিষয় আরো প্রস্ফুট হইবে।:—

"এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপানদী, * * *

উদয়গিরি বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ, আর মৃত্তিকা প্রোথিত ভগ্নগৃহাদিশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের সঙ্গে থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। * * সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। * * চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া কে পালিশ করিয়াছিল, সেকি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনাবন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর মূর্ত্তিসকল যে খোদিয়াছিল,—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণ-ভূষিত বিকম্পিত চেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান সংমিলন স্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি, যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমগর্ব্ব সৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা, পীবর যৌবন ভারাবনতদেহা—

তন্বীশ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী

মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ—

এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। * * সেই ললিতগিরির * * হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। * * গুহা * আর নাই।* কিন্তু গুহা বড় সুন্দর ছিল। পর্ব্বতাঙ্গ হইতে খোদিত স্তম্ভপ্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল। চারিদিকে অপূর্ব্ব প্রস্তরে খোদিত নরমূর্ত্তি সকল শোভা করিত। তাহারই দুই চারিটি আজিও আছে। কিন্তু ছাতা পড়িয়াছে, রঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে। পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়া আছে। কিন্তু গুহার এ দশা আজকাল হইয়াছে।"*

মহাবিনায়ক পর্ব্বত ব্রাহ্মণীনদীর তটে অবস্থিত। উহার উপরে গণপতির মন্দির আছে। মন্দির, সাতশত বৎসরের প্রাচীন। রত্নগিরি কেলুনো শাখার উত্তর দিকের তীরে বিরাজিত। কপিলাশ শৈল দু'হাজার ফুট উচ্চ। নীলগিরি একটী সুদীর্ঘ শৈল,—কিন্তু ইহার উচ্চতাও অধিক নয়, এবং এখানে আজ অবধি কোন প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। নীলগিরি, শিকারের জন্য প্রসিদ্ধ। ধবলগিরি বা ধৌলি পর্ব্বত, উৎকলের খুর্দ্দা বিভাগের অন্তর্গত। এখানেই সম্রাট অশোকের পালিভাষার অনুশাসনলিপি আছে। আমরা, এই ধবলগিরি হইতেই আমাদের প্রবন্ধ আরম্ভ করিব। কিন্তু তাহার আগে, উৎকলের ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্য আলোচনার আবশ্যক। প্রাচীন উৎকলের ইতিহাস পৃষ্ঠায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, কি অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য দেখা যায়!

উৎকলের রাজনীতিক্ষেত্রের উপর দিয়া, কত বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন বংশের পরাক্রান্ত নেতাগণের পরস্পর সংঘর্ষণের জন্য তুমুল ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, যে ভাবিয়া দেখিলে অবাক হইতে হয়! প্রাচীন উৎকলে কত জাতির উত্থান-পতন হইয়া গিয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার একটী তালিকা দিলাম :—

রাজবংশ	কল্যব্দ
১ আর্য্য-রাজত্ব	১—২৭৮২
২ বৌদ্ধ রাজত্ব	২৭৮৩—৩৫৭৩
৩ কেশরীবংশ	৩৫৭৪—৪২৩০
৪ গঙ্গাবংশ	৪২৩১—৪৬৩৪
৫ রাজপুত রাজত্ব	৪৬৩৪—৪৬৫৭
৬ পাঠান রাজত্ব	৪৬৫৮—৪৭১০
৭ মোগল রাজত্ব	৪৭১১—৪৮৫০

* সীতারাম—৭৪—৭৭

৮ মহারাষ্ট্রীয় রাজত্ব ৪৮৫১—৪৯০৩
৯ ইংরাজ রাজত্ব ৪৯০৪—

উৎকলের শিল্পযুগ, বলিতে গেলে, গঙ্গাবংশের পরেই একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া যায়। এবং এই শিল্পযুগের আরম্ভ হইয়াছিল বৌদ্ধ-রাজত্বে। তাহার পর, মোগল পাঠানের হস্তে উৎকলীয় শিল্পের অশেষ দুর্দ্দশা হইয়াছে। এই অত্যাচারী পরধর্ম্মদ্বেষিগণের হস্তে উৎকল শিল্পের উৎকৃষ্ট ভাগ বিধ্বংস স্তূপে পরিণত হইয়াছে। কণারকে, জগন্নাথে ও ভুবনেশ্বরে ইহার সংখ্যাধিক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এই অত্যাচারের পরিবর্ত্তে, মুসলমান-গণও উৎকলে কয়েকটী শিল্পসৌন্দর্য্য দান করিয়া গিয়াছে। ভিন্ন প্রবন্ধে, যথাসময়ে তাহা লিখিত হইবে।

ধবল-গিরি।—১৮৩৮ খৃঃ অব্দে, মার্কহাম কিটো, এই স্থান পরিদর্শন করেন। এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ইহার কাহিনী সকলের গোচরীভূত করেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্নালে, তিনি এই স্থানের যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাতে জানা যায়,—তাঁহার পরে, ধবলগিরির শিল্প ভাণ্ডারের বহু পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার বর্ণনা হইতে স্থলবিশেষ উদ্ধার করিলাম:—

"ধবলগিরির তিনটী শৈল, সমতল-ভূমি হইতে উঠিয়াছে। ইহারা পাঁচ ফারলং স্থান অধিকার করিয়া আছে। নিকটে, আট দশ মাইলের ভিতরে আর কোন শৈল নাই। উত্তরদিকের শৈলের উচ্চতা ২৫০ ফুট হইবে। পূর্ব্বদিকের শৈলে, মহাদেবের একটী ধ্বংস-ভগ্ন মন্দির আছে। এবং অন্যান্যদিকে কয়েকটী ক্ষুদ্র গুম্ফা আছে। পরন্তু অনেক গুম্ফার ভগ্নাবশেষও দেখা যায়।" (Journal of Asiatic Society. vol. VII. pp. 436.

ধবলগিরির উপরে, "কোশল-গঙ্গা" নামে একটী প্রসিদ্ধ বাপী আছে। এই বাপী সম্বন্ধে একটী কাহিনী আছে। কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু তাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন না। এইখানেই ধর্ম্মাশোকের অনুশাসনলিপি আছে।

দশ ফুট চওড়া ও আঠারো ফুট লম্বা, একটী স্থান উত্তমরূপে পালিশ করা হইয়াছে। তাহার উপরেই অনুশাসনের অক্ষরগুলি খোদিত হইয়াছে। খোদিত স্থানটী চারি ভাগে বিভক্ত। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন,—

প্রথম অংশটী, অপর ভাগত্রয়ের সঙ্গেই খোদিত হয় নাই। তাহা ভিন্নকালে খোদিত।"

An iquities of Orissa. Vol. I. p.p. 55.

এই অনুশাসনের কাছেই একটী চাতাল আছে। তাহার পরিমাপ, লম্বে ১৬ ফুট ও চওড়ায় ১৪ ফুট। চাতালের দক্ষিণ দিকে একটী হস্তীর পূর্ব্বার্দ্ধভাগ বর্ত্তমান আছে। তাহার উচ্চতা চার ফুট। হাতিটীর অঙ্গের ডৌল ও গঠন, শিল্পীর নিপুণতার পরিচায়ক। ডাঃ হাণ্টার বলেন:—

"সর্ব্ব প্রাচীন অনুশাসন-লিপির খোদনকাল, খৃঃ পূঃ ২৫০ বৎসর। বুদ্ধের বৃহৎ মূর্ত্তিও এখানে পাওয়া গিয়াছে।"

(Hunter's "Orissa',—Vol. I., p.p. 178-9)

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাঃ উইলসন ও মহাত্মা প্রিন্‌সেপ অশোকের অনুশাসন অনুবাদ করিয়াছেন। প্রিন্সেপের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমেই এই অমূল্য অনুশাসন আবিষ্কৃত হয়। তাহার অনুবাদ এখানে দেওয়া অসম্ভব। আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এখানে প্রকটিত করিয়া দিলাম:—

"আপনার উদর পূরণ অথবা যজ্ঞের নিমিত্ত পশু পক্ষী বিনাশ করিও না।

"কি মানব এবং কি পশু, সকলের জন্যই চিকিৎসালয় স্থাপন করিও। আতপতাপ ও তৃষ্ণার্ত্তের জন্য পথিপার্শ্বে তরুরোপণ ও বাপি-খনন করিও।

"পঞ্চম-বৎসরান্তে ধর্ম্ম-বিষয়ক আদেশ প্রচার করিও।

"বিগত ও বিদ্যমান রাজার শাসনের তুলনা করিও।

"স্বদেশীয় ও বিদেশীয়ের নিমিত্ত প্রচারক নিযুক্ত করিও।

"প্রজাগণের উন্নতি ও শিক্ষাবিধানের জন্য লোক-নিযুক্ত করিও।

"ধর্ম্মবেষিতা পরিহার করিও।

"বিগত রাজাগণের ইন্দ্রিয় বিলাস ও রাজশাসনের পবিত্র সুখ—উভয়ের সম্বন্ধ পৃথক।

"ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশদানের তুল্য অমূল্য দান আর নাই।

"বিশ্বাস হীনকে উপদেশ দেওয়া উচিত।

"ধর্ম্মই প্রকৃত সুখের নিয়ন্তা। পবিত্র-কর্ম্মে ইচ্ছা প্রদাতা ধর্ম্ম।—ধার্ম্মিক হইতে হইলে পূতঃ অনুষ্ঠানের আবশ্যক। এবং পর-হিতৈষিতা, ও সত্যবাদিতা, বদান্যতা ও করুণা প্রভৃতির তুল্য পবিত্র অনুষ্ঠান কোথায়?"

বৌদ্ধযতিগণের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য এই সকল সদুপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহারা, এই উপদেশ অনুসারেই কার্য্য করিতেন। এবং যতদিন তাঁহারা এই উপদেশ বিস্মৃত হন নাই ততদিন বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমিক প্রসার হইয়াছিল।

রত্ন-গিরি।—উৎকল শৈল-শিল্পের এই একমাত্র স্থানের আবিষ্কর্ত্তা একজন বাঙালী। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী। সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই।

পাহাড়ের শীর্ষে মহাকালীর এক মন্দির আছে। মন্দিরের সম্মুখভাগ পশ্চিমদিকে। মন্দিরটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক; অন্ততঃ দেখিলে, এইরূপ বোধহয়। দ্বারপথের নিকটে বিভিন্ন ভঙ্গিমার অনেকগুলি প্রস্তর মুরত আছে। তাহাদের কোনটীর উচ্চতা একফুট মাত্র এবং কোনো কোনোটী সাড়ে তিন ফুট। সম্ভবতঃ, অদ্যাপি অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি এখানে প্রোথিত আছে। ইতিমধ্যেই, তাহার কতকগুলি খননপূর্ব্বক উদ্ধার করা হইয়াছে।

পাহাড়ের উচ্চাংশে একটী ইষ্টক-বাঁধ (Brick mound) দেখা যায়। বোধহয়, উহা কোন প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংস সাক্ষ্যস্বরূপ। খননের ফলে, কতকগুলি ভগ্নমূর্ত্তির মস্তক পাওয়া গিয়াছিল। স্থির হইয়াছে, মস্তকগুলি বুদ্ধের। মুখগুলির ঠোঁঠ পুরু,—কাফ্রিদের মত। নাসিকা চ্যাপটা। পাহাড়ের ইতস্তত অনেক খণ্ড প্রস্তর বিক্ষিপ্ত আছে। তাহাতে পশু ও লতাপাতার খোদনচিত্র দেখা যায়।

"এখানকার মন্দির রাজা বাসুকল্প কেশরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ললিতগিরির শিল্পকার্য্য ইঁহারই কৃত।" (List of Ancient Monuments of Bengal."

রত্নগিরি সম্বন্ধে, ইতিহাসে আর বেশী কিছু কথা পাওয়া যায় না। তবে, ইহার প্রাকৃতিক শোভা বিচিত্র। দূরে তৃণ শ্যামলিতা ভূমি, বিহগের কল-বিরাব, মধুপের গুঞ্জন-গীতি। যেন একখানি সুলিখিত চিত্র। যেন একটী মূর্ত্তিমান সঙ্গীত।

উদয়গিরি।—আগেই বলিয়াছি, বিরূপার তীরে, উদয়গিরি অবস্থিত। বৎসরের অন্যান্য কালে বিরূপা নদী তেমন ভয়ানক নয়, কিন্তু বর্ষাকালে ইহার শ্রী ফিরিয়া যায়।

চারিদিকের শোভা অপূর্ব্ব। কোথাও দূর-প্রসার বালুকা প্রান্তর, কোথাও নবচবিৎ ধান্য ভূমির মাধুরিমা, কোথাও কুসুমিত বনকুঞ্জের রাঙিমা, কোথাও মেঘচ্ছায়া সুপ্ত বনান্তের শ্যামলিমা, উপরে আকাশের নবঘন নীলিমা এবং মধ্যে পরমা শান্তির নিভৃত তপোবন প্রতিম উদয় ও ললিত গিরির শাশ্বত শিল্প মহিমা!

এই পাহাড়ের উদয়গিরি নাম হইবার কারণ আছে। সমগ্র উড়িষ্যার মধ্যে এই স্থান হইতেই প্রাচী'র তোরণে ভাস্করের মুকুটচ্ছটা সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অপর নাম আলতিগিরি। অনেকে বলেন, এই পাহাড়ের তলদেশ দিয়া আগে সাগরের তরঙ্গ-ভীষণ ফেনান্বিত বিশাল বারি-রাশি বহিয়া যাইত। পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে এখনো সাগর-তট পর্য্যন্ত এক বৃহৎ বালুকা ভূমি দেখা যায়।

উদয়গিরির প্রধান মন্দিরটী বুদ্ধদেবের। ইহা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে বুদ্ধের একটী বৃহৎ প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী এখন আ-বক্ষ প্রোথিত। ইহা মূল হইতে উচ্চতায় দশ ফুট। ইহার সম্মুখে, একটী চাঁদনী ছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখা যায়; ১৮৭০খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইহা বর্ত্তমান ছিল। কতকগুলি সমভুজ (rectangular) স্তম্ভ ইহার ভার-বহন করিত। মন্দিরের শেষভাগে একটী ইষ্টকপ্রাচীর এবং পূর্ব্বমুখী একটী দ্বারপথ ছিল। এখন একটী বাঁধ, তাহাদের শেষচিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। মন্দিরের উত্তরদিকে বোধিসত্ত্বের দুটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিদ্বয়ের কার্য্য নিপুণভাবে সম্পাদিত। আশেপাশে আরো কতকগুলি ক্ষুদ্রতর মূর্ত্তি। তাহার ভিতরে, একটীর উচ্চতা চারিহাত। কিছু উত্তরে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত আরো দুটী মূর্ত্তি। তন্মধ্যে একটী পুরাতন ইষ্টকরাশির ভিতর হইতে তোলা হইয়াছিল, এবং অপরটী জঙ্গল পরিষ্কার করিবার সময়ে দৃষ্টিপথে পড়িয়া যায়। উভয়মূর্ত্তিই বোধিসত্ত্বের এবং উভয়েরই উচ্চতা এক,—ছয় ফুট। পশ্চিমদিকে, শৈলাঙ্গে একটী বৃহৎ বাপী। সেটি চতুর্দ্দিকে ২৩ ফুট এবং গভীরতায় ২৮ ফুট। খণ্ডগিরির 'আকাশগঙ্গা' এত বড় না হইলেও—তাহার গভীরতা ইহার অপেক্ষা অধিক। ইহার চারিপাশে একটী পাথরের চাতাল। ৯৪২ ফুট লম্বা ও ৩৯ ফুট চওড়া। চাতালে যাইবার পথে দুটি ভগ্ন স্তম্ভ আছে। ইহার কিছু দূরে একটী সোপান,—তাহার ৩০টী ধাপ। ধাপগুলি পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডের জলের দিকে নামিয়া গিয়াছে। সকলের নীচের ধাপ ও প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, শৈলাঙ্গ খিলানের আকারে কর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার উপরে লিখিত আছে, "স্বস্তি বালক শ্রীব্রজনাগস্ত বাপী।" ইহা দ্বারা জানা যায় শ্রীব্রজনাগ নামা কোন ব্যক্তির দ্বারা এই কুণ্ড খনিত হইয়াছিল।

প্রবেশপথে দ্বিহস্ত পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের একটী প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী দণ্ডায়মান। উচ্চে আট ফুট। মিঃ জে বিম্‌স্ সি এস, এসিয়াটীক সোসাইটীর মাসিকপত্রে ইহাকে আট ফুটই বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—

"এই মূর্ত্তির অর্দ্ধাংশ জঙ্গল দ্বারা আবৃত, এবং আর এক অংশ ভূমধ্যে প্রোথিত। ইহার সম্পূর্ণ উচ্চতা নয় ফুট। এবং জানু হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সাত ফুট।"

Journal of Asiatic Society. xxxix. p p. 164.)

ইহাই উদয়গিরির বর্ত্তমান অবস্থা। উপরিউক্ত বিবরণপাঠে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন,—এমন কোন দর্শনযোগ্য বিষয় উদয়গিরিতে নাই,—যাহার জন্ম কাহারো লুব্ধচিত্ত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এখন কেবল ধ্বংসের পর ধ্বংসস্তূপ—এখানে একটা মূর্ত্তি গড়াগড়ি যাইতেছে, ওখানে উচ্চছাদ কঙ্করে পরিণত হইয়াছে, পাথরের শিল্পকার্য্য, সেই কারুকর্ত্তিত লতাপাতা, সুগ্রীব অশ্ব, সুগঠন হস্তী, তাহাদের সতেজ ভঙ্গিমা,—মনোহারিভাব লইয়া—পাথরের গায়েই মিলাইয়া গিয়াছে, কুণ্ডের জলে পানা ধরিয়াছে, সমস্তই যেন বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যের মত,—যে দেখিবে, সেই চোখের জল রাখিতে পারিবে না।

ললিতগিরি। ইহার অপর নাম নাল্‌তিগিরি। ইহার দুইটী অসমোচ্চ শিখর আছে। মধ্যে একটী পথ। যে পাহাড়ের শীর্ষ, অন্যটীর অপেক্ষা ছোট,—তাহারই উপরে প্রধান ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত মধ্যবর্ত্তীপথের উপরে একটী ছোটখাটো মন্দির আছে। সেই মন্দিরের নাম, গুরু বাসুলী ঠাকুরাণী। মন্দিরটী আধুনিক, সন্দেহ নাই,—কিন্তু মালমসলা পুরাতন। চাঁদনীর ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। একস্থানে, পাঁচটী মূর্ত্তি ছিল। সেগুলি ঊর্দ্ধমুখে, ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেছে। মূর্ত্তিগুলির উচ্চতা পাঁচ ফুট। মূর্ত্তিগুলি দেখিতে বেশ। একটী মূর্ত্তি, সমৃণাল-পদ্মপাণি।

আরো উর্দ্ধে, আর একটী ছোট মন্দির। তাহাও ভগ্ন,—ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। আরো উপরের ভূমি সমতল এবং স্থানচ্যুত ইষ্টকাদির চূর্ণে পূর্ণ। সেই চূর্ণরাশির ভিতরে নানা আকৃতির কারুকার্য্যকম বঙ্কিম ও সুদর্শন প্রস্তরখণ্ডও আছে। এককালে, সেগুলি কোন মন্দির বা প্রাসাদের শোভাবৃদ্ধি করিত। এবং এইস্থানে আগে যে খুব চমৎকার কোন প্রাসাদ ছিল, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায়। এখন, সে সকল কথা, একাধিক সহস্র রজনীর মত উপকথায় পরিণত হইয়াছে। এ উপকথাও আর বেশিদিন থাকিবে না।

জানা গিয়াছে, উক্ত প্রাসাদ রাজা বাসুকল্প কেশরীর ছিল। ইষ্টক ও প্রস্তর চূর্ণে পূর্ণ স্থানটীর একপ্রান্তে এখন একটী ছোট চন্দন গাছ আছে। এখানকার ধ্বংসস্তূপ খনন করা হইয়াছিল। ফলে, দুইটী মূর্ত্তি উত্তোলিত হইয়াছে। তাহার উচ্চতা যথাক্রমে আট ও ছয় ফুট। সম্ভবতঃ, এখানে এখনো অনেক মরকত প্রোথিত আছে।

অপর পাহাড়ের শিখর নিম্ন সমতল। সেই স্থানের পরিমাপ, দৈর্ঘ্যে ৩৪০ ও প্রস্থে ২২০ ফুট। শুনা যায়, আগে এখানে রাজার অশ্ব ও হস্তিশালা এবং কর্ম্মচারিগণের নিবাসগৃহ ছিল। পাহাড়টীর শেষ অংশে আটটী প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার কোনোটীর অর্দ্ধাংশ মৃত্তিকাগুপ্ত, কোনটী মস্তকহীন হইয়া শায়িত,—কোন কোনটী অদ্যাপি দণ্ডায়মান। সকলের হাতে

একটী করিয়া পদ্ম। উক্ত অষ্টমূর্ত্তির মধ্যে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি। শিখরের সর্ব্বোচ্চ স্থানে চাতাল-করা খানিকটা যায়গা। দেখিলে, মনে হয়, এখানে আগে কোন মন্দির অথবা প্রহরিগণের গৃহ ছিল। এই যায়গাটির পশ্চাতে একটী অমুক্ত-অলকা রমণীমূর্ত্তি। শিল্পীর বাটালির মুখে, তাহার ভাবভঙ্গি বড় চমৎকাররূপে খোদিত হইয়াছে।

পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ নজরে পড়ে। তাহার নাম ছিল, অমরাবতী। দুর্গের প্রাচীর চতুষ্কোণবিশিষ্ট। পূর্ব্বদিকে, একটীমাত্র প্রস্তরের প্রবেশ-পথ। একদিকে, একটী ভগ্নস্তম্ভবিশিষ্ট উচ্চস্থান (platform) রহিয়াছে। তাহা, শুনা যায়, আগে রাজার অন্তঃপুর ছিল। না জানি, কোন অনির্দ্ধারিত মধুর অতীতযুগে, এইস্থানে ভ্রূভঙ্গিবিলাসের কত লীলাচঞ্চল অভিনয় হইয়া গিয়াছে! সে যুগ নাই,—এবং সেই কটাক্ষচকিতনেত্রা, রত্নালঙ্কাররম্যা তম্বঙ্গিগণও আর নাই। আছে কি? স্মৃতি। তাহাও আর কতদিন!

আর একটী ক্ষুদ্রতম মঞ্চের উপরে একটী মন্দির ছিল। সম্প্রতি তাহা যাদুকরকালের কুহকদণ্ডস্পর্শে অদৃশ্য। এখানে, দেবরাজ ইন্দ্র এবং সুররাজপত্নী ইন্দ্রাণীর প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। দুটী মূর্ত্তিই ভঙ্গিবঙ্কিমা এবং চারু-শিল্প-কমা।

কেশরীরাজবংশের পাঁচটী প্রধান কটক ছিল। তন্মধ্যে আমাদের আলোচ্য অমরাবতীও একটী। পশ্চিমদিকে একটী গুহা। আকৃতিতে ছোট। বারান্দা আছে। এই গুহা জৈনগণের হস্তে খোদিত।

(List of Ancient Monuments of Bengal.)

বাস্তবিক, ললিতগিরি দ্রষ্টব্য স্থান।—কিন্তু সকলের জন্য নয়। যাঁহারা সুদূর অতীতের স্মৃতি ভালবাসেন এবং সেই বিষয় লইয়া চিন্তা করিয়া সুখী হন, তাঁহারা ললিতগিরিতে আসুন,—তৃপ্ত হইবেন। এই ভগ্নাবশেষ,—এখানে কোন পরাক্রান্ত রাজার আবাস ছিল, এবং সেই রাজা বড় দরিদ্রও ছিলেন না,—এই জনবিরল পর্ব্বতের উপরে তাঁহার দুর্গ ছিল,—প্রাসাদ ছিল, অন্তঃপুর ছিল, হস্তিশালা, অশ্বশালা ছিল, প্রহরীর জন্য নির্দ্ধারিত স্থান ছিল, আরাধনার জন্য মন্দির ছিল এবং কর্ম্মচারী থাকিবার জন্য গৃহ ছিল, এস্থানে তিনি যেন একটী ছোট খাটো সহর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পরন্তু, বলিতে কি—ইহাও সুনিশ্চয় যে আমাদের এই রাজাটী কঠিন রাজকর্ম্মজীবী হইলেও কবির মতন পেলব প্রাণবিশিষ্ট ছিলেন! এমন মুক্ত আলো, এমন অনাহত প্রশান্ত অম্বর, এবং এমন তট-তাল-তমাল-তল-সুপ্ত ভানু-প্রস্রোত-রম্য তটিনী! এই সুনির্জন স্তব্ধতা ও এই অমল-মলয়-পরিমল বায়ু কবি না হইলে উপভোগ করিতে জানেন না। অকবির প্রাণ এখানে এক মুহূর্ত্তের জন্য তিষ্ঠিতে পারে না। যে দেশের রাজার প্রাণ এমন কোমল, সে দেশের শিল্প, সর্ব্বলোকের বিস্ময়ের কারণ না হইবে কেন? যে শিল্পকীর্ত্তিগুলির কথা বলিলাম, তন্মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ ধৌলির পর্ব্বত ভিন্ন সকলগুলিই প্রাচীন হিন্দুরাজত্ব-কালে, নির্ম্মিত। কোনগুলিই এক সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই। এবং নির্ম্মাণকাল সম্বন্ধে

সঠিক মন্তব্য প্রকাশ করাও কঠিন। কারণ, নির্ম্মাতাগণ সে বিষয় জানিবার জন্ম কোনো সুবিধা করিয়া রাখিয়া যান নাই। কোনো কোনো স্থানে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েরই হস্তের শিল্প পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বোধ হয়, আগে বৌদ্ধগণ উদয় এবং ললিতগিরি প্রভৃতি স্থানে কিছু কিছু শিল্পকার্য্য রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং পরে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন সাগর পারে নির্ব্বাসিত হইল, তখন নব জাগ্রত ব্রহ্মণ্য-শক্তিও ঐ সকল স্থানে আপনাদের চিহ্ন রাখিয়া যায়। এই শেষোক্ত মতই সম্ভবতঃ সত্য, এবং ডাঃ হাণ্টারও এই কথা বলেন। (Vide Hunters' Orissa: Vol I. P.P. 178—9.)

উৎকলে, আরো কয়েকটী শৈল-শিল্প আছে। কিন্তু সেগুলির আলোচনা আজ আর আবশ্যক নাই। আমরা প্রবীন কয়েকটীর উল্লেখ ও সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও করিলাম। উৎকল-শিল্পের বিশালতা ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। পরিশেষে, বলা কর্ত্তব্য যে, যদিও স্থাপত্যে উৎকল অদ্বিতীয়, তথাপি শৈল-শিল্পে উৎকল তেমন উন্নত নয়। সে বিষয়ে দক্ষিণ প্রদেশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। উৎকলে শৈলশিল্প সুপ্রাচীন এবং সেই জন্যই তাহা আলোচ্য। প্রাচীন মন্দ হইলেও, তাহার আলোচনায় গৌরব আছে। কারণ, তাহা স্মৃতির তীর্থভূমি।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

করুণার দাবী।

শাক্য-সিংহ পরম ধীমান,
রাজপুত্র করুণা নিদান,
 দয়ার শরীর।
দেবদত্ত—পিতৃব্য কুমার,
জীবহিংসা ব্যবসায় তা'র,—
 হস্তে ধনু তীর;
ব্যোমচারী হংস বক্ষোপরে
বিঁধিলেন তীব্র-তীক্ষ্ণ শরে,—
 —স্নেহ-লেশ হীন।
হংস শিশু দ্রুত অগোচরে
পড়িল সে শাক্য সিংহ ক্রোড়ে,
 —স্পন্দন বিহীন।
দেবদত্ত কহে, "এ শাবক,
প্রাপ্য, মোর, আমি হন্তারক,
 দেহ হংস মোরে!"

শাক্য সিংহ কহিলেন, "নয়,
এ মরাল আমার নিশ্চয়,
 চাহ কোন জোরে?
নিষ্ঠুরতা, অধিকার-হীন,
করুণার দাবী চিরদিন
 বেশী তাহা হ'তে;
মারে যে, জীবের পরে তার
বিন্দুমাত্র নাহি অধিকার
 প্রেমের জগতে।
আপনারে করি তুচ্ছজ্ঞান
যে জন রক্ষয়ে জীব-প্রাণ,
 —জেন ইহা সার;
বিপুল এ বিশ্ব-ভূমণ্ডল
তা'র দাবী মানিবে কেবল,
 সহিবে বিচার।"

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাপানের সভাসমিতি।

জাপানে সভাসমিতির অন্ত নাই। স্কুল-কলেজের ছেলেদের, মেয়েদের ভদ্র অভদ্র সকল লোকের কত সমিতি রহিয়াছে ইয়ত্তা করা যায় না। কৃষক, ধোপা, নাপিত, দুধওয়ালা, তরকারিওয়ালা, দরজি, কামার, চামার প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়ীরই বা কত সমিতি। কলেজে আমাদের এক শ্রেণীতেই কতগুলি সমিতি বসিত শুনিলে এখানকার লোকে আশ্চর্য্য হইবেন। আমাদের বি, এ ক্লাশে যেমন কেহ এ কোর্স, কেহ বি, কোর্স, কেহ বিশেষ বিষয়ে অনার কোর্স লইয়া থাকে, তেমনি তথাকার একশ্রেণীরই ছাত্র কেহ কেহ রসায়ন বিদ্যা কেহ কেহ উদ্ভিদবিদ্যা, কেহ বা ধনবিদ্যা, কেহ বা কৃষিবিদ্যা কেহ কেহ ভূতত্ত্ব, কেহ পশুচিকিৎসা, কেহ রেশম কৃষি, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকে। ঐ ঐ বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের ভিন্ন ভিন্ন সমিতি, তারপর এক কলেজে এবং এক-শ্রেণীতে ভিন্ন জেলার যে সকল ছাত্র আছে তাহাদের পৃথক পৃথক জেলা সমিতি। অধ্যাপকগণ আপন আপন জেলা এবং আপন আপন বিষয়ের সমিতিতে যোগদান করিয়া ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের অনেক সভাতেই অনুরোধ করিয়া বক্তাকে উঠাইতে হয়। জাপানের সভাসমিতিতে দেখিয়াছি এক বক্তা বক্তৃতা শেষ করিতে না করিতেই অপর বক্তা উঠিয়া দাঁড়ান। প্রত্যেকেই বলিবার জন্য যেন উদ্‌গ্রীব, কোন দিনই সময়ে সঙ্কুলান হইয়া উঠে না। কিন্তু স্কুল কলেজের সভা-সমিতির ন্যায় সাধারণ ভদ্র লোকের সভা-সমিতিতে বক্তৃতার ছড়াছড়ি অতি বিরল। পরস্পর মেলামেশা, আলাপ প্রসঙ্গ, গীতবাদ্য খাওয়াদাওয়াই অধিকাংশ সভার প্রধান কাজ। অনেকটা আমাদের দেশের নিমন্ত্রণ সম্মিলনের মত। সভাসমিতি হইলেই বুঝিতে হইবে যে তথায় ভোজের বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য চাঁদা দিতেই হইবে। পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকদেরও অসংখ্য সভাসমিতি। আবার স্ত্রীপুরুষে পরিচালিত সভাসমিতিরও অভাব নাই, জাপানের বিখ্যাত রেডক্রশ সোসাইটী স্ত্রীপুরুষ পরিচালিত।

গত যুদ্ধে এই সোসাইটীর কার্য্যাবলী জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছে। অনেক রাজ-কুমারী এই সোসাইটির মেম্বর। প্রধান সেনা-পতি মার্শাল ওইয়ামার পত্নী প্রিন্সেস ওইয়ামা (তৎকালে মার্সিওনেস্ ওইয়ামা) তাঁহার যুদ্ধ বিবরণীতে লিখিয়াছেন "যে সকল রাজকন্যা রুমালের চেয়ে ভারী জিনিষ কখনও বহন করেন নাই, যাঁহারা ২।৩ জন পরিচারিকা ব্যতিরেকে কখনও ঘরের বাহির হন নাই, যাঁহারা দুধ সর, নবনী ভোজনেও অনিচ্ছা-প্রকাশ করিতেন, আজ সেই সকল রাজকন্যা একাকিনী ব্যাগ হস্তে অনশনে, অনিদ্রায় বিজন অরণ্যে বা পার্ব্বত্য দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আহত সৈন্যদের সেবাশুশ্রূষায় নিয়োজিতা।"

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে জাপানের রেডক্রশ সোসাইটীর প্রথম সূত্রপাত হয়। এই সময়কার গৃহ বিবাদে অনেক লোক হত এবং আহত হওয়াতেই তখন একটী সমিতির আবশ্যক উপলব্ধি হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জাপানের এই সমিতি জেনেভা কন্‌ফারেন্সে যোগ দেয় এবং এই সময় হইতে রেড্‌ক্রশ

সোসাইটি নাম ধারণ করে। উক্ত সোসাইটি কারলশ্রুর চতুর্থ অন্তর্জাতিক সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ১৮৯৪-৯৫ চীন জাপান যুদ্ধে এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দের বক্সার যুদ্ধে জাপানের রেড্‌ক্রশ সোসাইটীর নাম ও সুযশ জগৎ-বিখ্যাত হইয়া উঠে।

জাপানের রেড্‌ক্রশ সোসাইটীর একটী প্রধান আফিস এবং ৪৮টী শাখা আফিস আছে, প্রধান আফিসের সংশ্লিষ্ট হাঁসপাতালে নার্শ (পরিচারিকা) দিগকে তিন বৎসর এবং শাখা হাঁসপাতাল সমূহে নার্শদিগকে দুই বৎসর পুস্তকগত এবং কার্য্যকরী বিদ্যায় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ৪৩৫৫ জন লোক এই সোসাইটীর হাসপাতালে কার্য্য করিতেছিল। উপরিউক্ত সংখ্যার ৬ জন ম্যানেজার, ৩৮০ জন ডাক্তার ১৮০ জন কম্পাউণ্ডার, ১৫৪ জন কেরাণী, ২৩৮ জন প্রধান নার্শ, ২৪৯০ জন সাধারণ নার্শ, ১০১৮ জন চাকর, পাচক, পরিচারক ইত্যাদি এবং ১৪৩ শিবিকা বাহক ছিল। রুস-জাপান যুদ্ধের সময় উহার সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছিল, এবং পূর্ব্বে দুই খানা জাহাজে সোসাইটীর কাজ চলিত; ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে চারি খানা জাহাজ সোসাইটীর কায করিত। যুদ্ধের সময় সোসাইটীর কার্য্যে ৭৫৩৮২৮১৲ টাকা খরচ হয়, কিন্তু ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় ইহা সত্বেও তহবিলে ৯,৮৪৩,৭৫০৲ টাকা মজুত। গত যুদ্ধে সোসাইটীর তিন জন ডাক্তার, ৩ জন কমপাউণ্ডার, ২ জন কেরাণী, ২৫ জন নার্শ, ৩৫ জন সহকারী নার্শ এবং ১০ জন শিবিকা বাহকের মৃত্যু হইয়াছে। এবং সোসাইটী ১০১৫২২৯ জন জাপানী এবং ২৮৩৭৯ জন রুসিয়ান আহত ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে। সোসাইটীর জাহাজ ঐ যুদ্ধে ৬১৪ বার আহত ব্যক্তির জন্য নানা স্থানে চালিত হইয়াছিল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সোসাইটীর মেম্বর সংখ্যা ১১০৩৭২১ জন ছিল; দুই বৎসর পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা ১৩৩০০০০ জনে পরিণত হইয়াছে। সমিতির মহদুদ্দেশ্যে যাহার যেমন সাধ্য সাহায্য করিতেছেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মোট ৪৬১১৬০৭৭, টাকা চাঁদা উঠিয়াছে কিন্তু ঐ বৎসর খরচের বরাদ্দ মোট ২৮৮৯৫০২৲ টাকা মাত্র ছিল।

আমাদের রামও নাই রহিমও নাই। প্রায় সকল সদনুষ্ঠানই কিছুদিন পরে অর্থ এবং উৎসাহী লোকের অভাবে মৃত বা মুমূর্ষু হইয়া পড়ে। কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন আমাদের মহিলাগণ নিপীড়িত, বিপন্ন এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীর সাহায্য কল্পে কলিকাতা লাহোর প্রভৃতি স্থানে সমিতি স্থাপন করেন তখন আমার জাপান-মহিলা সমিতির কথা মনে পড়িল। সকল কার্য্যেই দশ জনের সমবায় চেষ্টা এবং সহানুভূতির দরকার। দুই একজনে হাবুডুবু খাইলে কি হইবে? এত অসুবিধার মধ্যেও আমাদের কারাগারে আবদ্ধ মেয়েরা যাহা কিছু করিতেছেন তাহাই তাঁহাদের পক্ষে বাহাদুরী বলিতে হইবে।

সার্ব্বজনীন হিতকর কার্য্যে জাপানী মেয়েরা কত পন্থাই অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহাদের কন্‌সার্ট পার্টি, থিয়েটার এবং প্রদর্শনীর যেন অবধি নাই। কার্য্যনির্ব্বাহক

এবং অভ্যর্থনা সমিতির গঠন, স্বেচ্ছাসেবিকা দলের নিয়োগ প্রভৃতি মেয়েরা নিজেই করিয়া থাকেন। রাজপরিবারের মেয়েরাও সানন্দে এই সকল কাযে যোগ দেন।

গত যুদ্ধের পর যখন সেনাপতি এবং সৈন্যগণ জয়মাল্যে ভূষিত হইয়া মাঞ্চুরিয়া হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন পুরুষদের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন সমিতির চিহ্নধারিণী রমণীগণও সারি সারি জাতীয় নিশান হাতে লইয়া এবং তালে তালে নাচিয়া জয়গীতি গাহিতে গাহিতে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। আমার মনে হয় অন্ধকারে আবদ্ধ কূপমণ্ডূকপ্রায় ভারতনারী বলিয়া কেন —সুসভ্য দেশেও এরূপ উজ্জ্বলদৃশ্য বিরল।

জাপানে অন্ধ আতুর প্রভৃতির জন্য, মাতৃপিতৃহীন শিশুদের জন্য, দুষ্টের সংস্কার প্রভৃতির জন্য বিস্তর সমিতি আছে। তন্মধ্যে ৭:টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক সমিতি সংশ্লিষ্ট একটি করিয়া আশ্রম আছে। প্রত্যেক আশ্রমের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল এবং কার্য্যক্ষম ব্যক্তিদের জন্য নানারূপ কাজের বন্দোবস্ত রহিয়াছে। বোবা ও বধির দের জন্য ন্যূন সংখ্যায় ২৭টী স্কুল এবং বোর্ডিং হাউস আছে।

মহিলাদের শত শত সমিতি আছে। আজ উহার একটি বিশেষ সমিতির বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। দেখিতে দেখিতে "দাই নিপ্পন জো্যা কাই (জাপান মহিলাসমিতি) সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইংরাজীতে উহার নাম The Japan women's league। এই সমিতির সাত আট বৎসরের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে নব্য উদ্বুদ্ধ জাপানের বীর্য্যবতী মেয়েদের সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞান জন্মিতে পারে।

বক্সার যুদ্ধের পর ১৯০০ অব্দে চীনের উত্তর প্রদেশে জনসাধারণের ভিতর দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, গৃহবিবাদ প্রভৃতি নানারূপ উপদ্রব উপস্থিত হয়। ঐ সকল উপদ্রবের নিরাকরণ মানসে জাপানের হিগাশি হোঙ্গান ধর্ম্মমন্দির হইতে কতিপয় ব্যক্তি উত্তর চীনে গমন করেন। ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে বৃদ্ধা মহিলা ওকুমুরা একজন। এই বৃদ্ধা মহিলা কর্তৃকই জাপানের বিখ্যাত মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি চীনের স্বদেশ প্রেম এবং পরস্পর সহানুভূতি ও একতার অভাবে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি পরিলক্ষণে, জাপানী সৈনিক বিভাগের সুবন্দোবস্ত এবং উহাদের স্বদেশ প্রেম ও কার্য্যতৎপরতাই জাতীয় সুখ শান্তির মূল এবং সাধারণের সুখশান্তিই জাতীয় শক্তির মূল বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন। জাপানী সেনা বিভাগের এই স্বদেশ প্রেম এবং কার্য্য তৎপরতার বীজ সমগ্র জাতির মধ্যে উপ্ত হইয়া যাহাতে দেশকে উন্নতির চরমশিখরে দাঁড় করাইতে পারে তজ্জন্য তিনি মহিলাসমিতি সংস্থাপনে কৃতসঙ্কল্পা হয়েন। দেশে ফিরিয়া তিনি জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার অভিপ্রেত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, প্রিন্স কোণোয়ে তাঁহার পোষকতা করিতে লাগিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারীমাসে সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। অথচ এই অল্প সময়ের মধ্যে অন্যূন পাঁচলক্ষ মহিলা এই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। স্বয়ং সম্রাজ্ঞী প্রধান উৎসাহদায়িনী। তিনি প্রতি বৎসর দুই সহস্র ইয়েন

অর্থাৎ তিন সহস্রাধিক টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে সমিতির মজুত তহবিল ছিল ৭১৪০৬২৷৷০ টাকা, উহা এখন দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। সমিতির প্রত্যেক মহিলা বার্ষিক ৩৵০ তিন টাকা দুই আনা হারে চাঁদা দিয়া থাকেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বহির্দ্দেশ হইতে এই সমিতি ৭৮১২৫৲ টাকা অর্থ সাহায্য পাইয়াছে। জনৈক চীন অধিবাসী ১৫৬২৫৲ টাকা পাঠাইয়াছিলেন।

বৃদ্ধা ওকুমুরার মিতব্যয়িতা সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় অনেক মহিলা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কবরী- ভূষণ ও রুমালের ব্যয় সংক্ষেপ করেন। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ দ্বারাই সমিতির ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। যুদ্ধে নিহত স্বামীপুত্র শোকাতুরা কত শত অসহায়া আজ এই সমিতির সাহায্যে প্রতিপালিত। একবার সমিতির বার্ষিক উৎসব দেখিয়াছি। এক ময়দানে লক্ষাধিক মহিলার সমাগম হইয়াছিল। তখন বৃদ্ধা মহিলার কি অপার আনন্দ!

আজকাল সম্রাট পরিবারের প্রিন্সেস খান্নিন ঐ সমিতির পেট্রন, প্রিন্সেস ইওয়াকুরা প্রেসিডেণ্ট এবং ইচিজো, তোকুগাওয়া, কোণোয়ে, শিমাজু, দাওয়াগার, প্রিন্সেস মোরি, ওইয়ামা প্রভৃতি প্রিন্সেসগণ ম্যানেজার অর্থাৎ পরিচালিকা এবং বৃদ্ধা মহিলা ওকুমুরা য়্যাড্‌-ভাইসার—পরামর্শদাতা।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

চয়ন।

যবদ্বীপে।

বুধবার—৪ ডিসেম্বর

বৎসরের এই সময়ে, ভ্রমণে বাহির হইতে হইলে, খুব সকালে ছাড়িতে হয়। কেননা, এখন বর্ষাকাল। প্রাতঃকালে আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকে, কিন্তু প্রায়ই দশটার সময়, মেঘগুলা সমুদ্র হইতে উঠিয়া জমিতে থাকে এবং সমস্ত আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মধ্যাহ্ন সময়ে ঝড় উঠে; প্রায়ই অপরাহ্নে, প্রবল বেগে জল বর্ষণ হয়; ঠিক্‌ মনে হয় রাস্তার উপর দিয়া নদী বহিয়া যাইতেছে।

আমার ভৃত্যকে ৪৷৷০ টার সময় আমাকে জাগাইয়া দিতে হুকুম দিয়াছিলাম। পাছে হুকুমের ব্যত্যয় হয়, সে আমাকে এক ঘণ্টা আগে জাগাইয়া দিয়াছে। উদ্যানের দ্বারদেশে একটা "কাহার" আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে: এই "কাহার" একটা ছোট গাড়ী, —তিনটা ঘোড়ায় টানে; গাড়ীর উপর সমান্তরালে দুইটি কাষ্ঠাসন; একটি গাড়োয়া-নের জন্য, আর একটি আরোহীর জন্য। আমরা ৪৷৷-টার সময় ছাড়িলাম। অন্ধকার রাত্রি। দিনমানে খুব গরম ছিল, এখন আবার প্রায় শীতকালের মত ঠাণ্ডা। আমার সাদা পরিচ্ছদের উপর একটা বড় শাল জড়াইয়া লইলাম।

দিনের আরম্ভেই, আমার গাড়ী একটা সরু পথ ধরিয়া খুব দ্রুত চলিতে লাগিল। পথের দুই ধারে, সরু সরু উচ্চ গাছ; কোথাও কোথাও হরিৎ তৃণপুঞ্জ। লণ্ডনের "ন্যাশানাল

গ্যালারি" নামক চিত্রশালার চিত্রকর (Hobbema) হবেমার বিরচিত যে-একটি ভূখণ্ডের চিত্র দেখিয়াছিলাম, এই সরু পথটি সেই চিত্রখানি স্মরণ করাইয়া দিল; কি-একটা অদ্ভুত সাদৃশ্যের ভাব আমার মনে আনিয়া দিল। যাবা-দেশের একটি পথ, একজন ফরাসীকে স্মরণ করাইয়া দিল কি?—না, ইংলণ্ডে প্রশংসিত একটি ওলন্দাজি চিত্র! ইহাতে কি প্রমাণ হয় না,—আমাদের সভ্যতা ইহার মধ্যেই আন্তর্জাতিক ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; আমাদের মনে, প্রকৃত বিশ্বনাগরিক ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে?

আমাদের পথটা পর্য্যায়ক্রমে ধান্যক্ষেত্র ও গ্রামসমূহের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। জলপ্লাবিত ধান্য-ক্ষেত্রের কাদার মধ্যে, খালি-পায়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা ধানের তরুণ শিষগুলা তুলিয়া লইতেছে। গ্রামগুলি জীবন উদ্যমে পূর্ণ। সময়ে সময়ে হাট বসে। হাটে মাছ, চাউল, ফল, পান, কাপড়—এই সব বিক্রী হয়।

এই পথ দিয়া, লোকেরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছে। কুলিরা, একটা বাঁশের দুই প্রান্তে, তাহাদের বোঝা ঝুলাইয়া, ছুটিয়া চলিয়াছে, কিংবা একটা বাঁশ দিয়া, ছোট ছোট শকট ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। সকলেই খুব নম্রভাবে প্রণতি করে; রাস্তার ধারের রথ্যা-গর্ত্তের মধ্যে নামিয়া, তাহাদের বোঝা নামাইয়া, তাহাদের প্রকাণ্ড খড়ের টোপা মাথা হইতে খুলিয়া লয়। অনেকেই,—আমরা নিকটে যাইবার বহু পূর্ব্বেই, এমন কি, দূরে ক্ষেতের কাজ করিতে করিতেই, আমাদের দেখিবামাত্র, এইরূপে তাহাদের টোপা খোলে। স্ত্রীলোকেরা, মুখ ফিরাইয়া, ছাতা নামাইয়া, প্রণাম করে। উহাদের এই ছাতাগুলা চ্যাপ্টা,—অদ্ভুত ধরণের; ছাতার রংও খুব উজ্জ্বল। ছোট ছোট মেয়ে ও বৃদ্ধারা হাঁটু গাড়িয়া প্রণাম করে; একজন স্ত্রীলোক, দুষ্ট য়ুরোপীয় হইতে যেন আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহার শিশুটিকে বুকে জাপটাইয়া ধরিয়া রাস্তার ধারের রথ্যার উপর বসিয়া পড়িয়াছে ...দেশীয় লোকদের এইরূপ অতিনম্র বিনীত ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সেদিন, একজন প্রধান রাজপুরুষের নিকট হইতে পত্র আনিয়া আমার হাতে দিবার সময়, একজন দেশীয় লোক আমার সম্মুখে নতজানু হইল। একটা সমগ্র জাতির এইরূপ হীন দাসত্বের ভাব দেখিয়া মনে কেমন একটা কষ্ট হয়। বেশ বুঝা যায়,—শত শত বৎসরের দারুণ উৎপীড়ন অত্যাচার, এই জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে—উহাদিগকে একেবারে নত করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে, এই বশ্যতার ভাবভঙ্গিগুলি যেন উহাদের স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয়, ভাবভঙ্গীগুলির মত উহাদের হৃদয়ও দাস্যপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে। আমি শুনিলাম, যে য়ুরোপীয় এই সকল দেশীয় লোকের নিকটে যাইতে চেষ্টা করে, এই দুই জাতির মধ্যে ব্যবধান কমাইতে প্রয়াস পায়, সেই য়ুরোপীয়কে এই দেশীয় লোকেরাই অবজ্ঞা করে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইহা তীব্র অত্যাচার-সমন্বিত শাসনতন্ত্রেরই ফল বলিতে হইবে। জোর-জবরদস্তির শাসন-নীতি এই সকল দুর্ব্বল লোকের অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া, উহাদিগকে একেবারে পিষিয়া ফেলিয়াছে। "দাসত্ব, মানুষকে এতটা অধঃপাতে লইয়া যায়, যে মানুষ অবশেষে

দাসত্বকেই ভালবাসে।" দাসের এতটা অধোগতি হয় যে, যাহারা তাহাদের প্রতি দাসবৎ ব্যবহার না করে, দাসেরা তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে।

তিজ্‌ভেরোপান গ্রামে গাড়ী ছাড়িয়া এইবার অশ্বারোহণ করিতে হইবে। এইখান হইতে আগ্নেয়গিরিতে উঠিতে হইবে। এখানকার পান্থশালায়, দুইজন তরুণবয়স্ক ওলন্দাজের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারা সুমাত্রায় কেরোসিন্-তৈল-খনির ইঞ্জিনিয়ার। দুজনেই বিশুদ্ধরূপে অনর্গল ফরাসী বলেন। আমরা এখন সবাই একসঙ্গে ভ্রমণ করিতেছি।

আমরা ঘোড়ায় চড়িয়া পর্ব্বতে উঠিতেছি, আমাদের দেশীয় পথপ্রদর্শক আমাদের পিছনে পিছনে চলিতেছে।

প্রথমে আমরা কুইনিন্ ও কাফির ক্ষেত পার হইলাম। ঘোর সবুজ কাফিগাছের পাতাগুলা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে—মধ্যে মধ্যে খুব উচ্চ ফিকা-সবুজ বাঁশগাছের ঝাড়। তাহার পর একটা সুরম্য সরুপথ, তাহার দুইধারে একরকম গাছ—তাহাতে লম্বা ঘণ্টার মত সাদা-সাদা ফুল ধরিয়াছে। তার পরেই অরণ্যের আরম্ভ। দুর্ভেদ্য ঘননিবিড় অরণ্য। ইহার মধ্য দিয়া মানুষ কি করিয়া পথ করিল, ইহাই আশ্চর্য্য। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ণ-তরু (Fern), নানাপ্রকার অজানা বৃক্ষ,—খুব উচ্চ,খুব বিশাল;—সমস্তই লতাগাছে আচ্ছন্ন। এই অরণ্যের অসীমতার মধ্যে মানুষ যেন আপনাকে অতিক্ষুদ্র, নগণ্য, বিলুপ্তপ্রায় বলিয়া অনুভব করে। এই উদ্ভিজ্জের প্রাচুর্য্য —এখানকার অতিউর্ব্বরা ও আর্দ্র মৃত্তিকারই ফল। তাছাড়া, এখানে সৌরতাপের যেরূপ প্রখরতা এরূপ আর কোথাও নাই। অজস্র বৃষ্টিধারায় এখানকার মাটি নিয়মিতরূপে আর্দ্র হয় বলিয়া, গাছপালায় সমস্তভূমি আচ্ছন্ন। অগ্নিময় প্রখর সূর্য্যের সহিত আর্দ্র বায়ুর চিরআলিঙ্গন বশত, এই সব গাছপালা ক্রমাগত প্রসারিত হইতে চেষ্টা করে, যতদূর পারে উর্দ্ধে উঠিতে সচেষ্ট হয়। প্রকৃতির এই অসীম শক্তির সমক্ষে, কল্পনাতীত এই সব প্রাকৃতিক ব্যাপারের সমক্ষে, মানুষের মন একেবারে বিহ্বল ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে।

গভীর অরণ্যের মধ্যে উপনীত হইতে এক ঘণ্টা লাগিল। তাহার পর গাছগুলা ক্রমেই নীচু হইয়া আসিল, সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল, কমিয়া আসিল। পরে একেবারেই অদৃশ্য হইল। এখন কেবল কতকগুলি ক্ষুদ্র পর্ণ-তরু ও কতকগুলি রডোডেন্‌ড্রন্ গাছ মাত্র অবশিষ্ট। পথটা ভস্মরাশিতে একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে;—ধাতব পদার্থে, ও ফোঁপ্‌রা প্রস্তরখণ্ডে আচ্ছন্ন। ক্রমাগত উপরে উঠিয়া অবশেষে আগ্নেয়গিরির একেবারে কেন্দ্রদেশে উপনীত হইলাম।

আগ্নেয়গিরির এই কেন্দ্রস্থল পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে অবস্থিত। কেবল একদিক্ হইতে ধূসর-বর্ণ পাথরের একটা দেয়াল খাড়া হইয়া আছে। লোকে ইহার এইরূপ হেতুনির্দ্দেশ করে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই পন্দয়ন আগ্নেয়গিরির যে অগ্নিস্ফোটন হইয়াছিল, সেই অগ্নি-স্ফোটনে অগ্নি-গহ্বরের দেয়ালের একটা সমস্ত পাশ উড়াইয়া লইয়া যায় এবং উহাতে করিয়া একটা পথ উন্মুক্ত হয়,—এখন এই পথ

দিয়া একেবারে জলন্ত অগ্নির প্রদেশে যাওয়া যায়।

অগ্নিস্ফোটনের পর হইতে এই আগ্নেয়-গিরির তাপ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। আমরা এখন ঘোড়াদের বাঁধিয়া রাখিয়া, এই অপূর্ব্ব অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে, পদব্রজে বেড়াইতে লাগিলাম। আমাদের পথপ্রদর্শক আগে আগে চলিয়াছে। পথপ্রদর্শক এখানকার পথ ও মাটি বেশ চিনে;—যেখানে তাপ কম, যেখানে জুতা পুড়িয়া যায় না,—এইরূপ পথ দিয়া আমাদিগকে লইয়া গেল। ধূসরবর্ণ ভস্ম-ক্ষেত্র; হরিদ্রাবর্ণ গন্ধক-ক্ষেত্র; ছোট ছোট কুণ্ডে জল ফুটিতেছে। রহস্যময় ভীষণ বিবরসমূহ হইতে, প্রচণ্ডবেগে পীতবর্ণ ধূমধারা নিঃসৃত হইতেছে; দেখিলে মনে হয়, কে যেন 'বয়লারের' ছিদ্র-পথের ঢাকাটা খুলিয়া দিয়াছে। কি ভীষণ গর্জ্জন! উহার নিকটে গেলে কেহ কাহারও কথা শুনিতে পায় না। আকাশ ধূমাচ্ছন্ন। গন্ধকের এরূপ তীব্র গন্ধ, যে চোখ দিয়া জল পড়ে, ক্রমাগত কাসিতে হয়; আমাদের ঘড়ীর রূপালী চেন্ একেবারে হলদে হইয়া গেল।

ভ্রমণ শেষ হইলে, আমরা তাড়াতাড়ি আহার করিয়া লইলাম। ওলন্দাজ যুবকদ্বয়, আমাদের নিকট সুমাত্রার ভীষণ অরণ্যের বর্ণনা করিলেন, ঐ দেশের প্রভূত প্রশংসা করিলেন; বলিলেন—যবদ্বীপ অপেক্ষা সুমাত্রা আরও আদিম-ধরণের এবং আরও সুদৃশ্য। আমি তাঁহাদের নিকট ভারতের কথা বলিলাম, নব-জিলণ্ডের কথা বলিলাম। তারপর আমরা আবার ঘোড়ায় চড়িলাম। বোধহয় আরোহণ অপেক্ষা অবরোহণের সময়ে, এখানকার এই চমৎকার আরণ্য-দৃশ্য, চিত্তকে আরও মুগ্ধ করে; অবরোহণের সময়েই তরুগণের উচ্চতা, তৃণরাশির প্রাচুর্য্য, তরুলতার শোভন নমনীয়তা যেন আরও বেশী হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

গ্রামে গিয়া আবার আমাদের 'কাহার' (গাড়ী) পাইলাম। এখন অত্যন্ত গরম হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এখন ঘোড়া ছুটাইয়া যাওয়া বড়ই ক্লান্তিজনক।

গ্যারোয়েটে আসিয়া আহার করিলাম। ভ্রমণে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া অপরাহ্নের কাকনিদ্রা বেশ উপভোগ করা গেল। বাহিরে ঝড় উঠিয়াছে—কৃষ্ণ মেঘ-সমাচ্ছন্ন আকাশ হইতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে।

বৃহস্পতিবার, ৬ ডিসেম্বর।

গ্যারোয়েট হইতে ছাড়িবার পূর্ব্বে আজ প্রাতে, ছায়াময় পথ দিয়া, Sitae Bagendit পর্য্যন্ত গাড়ি করিয়া বেড়াইয়া আসিলাম। ইহা ধীবরদিগের একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। আমি একটা ডোঙ্গায় উঠিলাম,—ডোঙ্গাটী গাছের গুঁড়ি খুদিয়া নির্ম্মিত; আমি ডোঙ্গার এক-প্রান্তে বসিলাম, মাঝি ডোঙ্গার অপর প্রান্তে বসিল। একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র দাঁড় দিয়া মাঝি একহাতে দাঁড় বাহিতে লাগিল। ডোঙ্গাটী প্রশান্ত জলরাশি ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কমুদিনীর বৃহৎ পত্র সমূহে হ্রদের জল আচ্ছন্ন। এই সুন্দর জলজগাছ,-গুলি ডোঙ্গায় ঠেকিয়া, তাহার ঘর্ষণে একটি মধুর শব্দ নিঃসৃত হইতে লাগিল; তাহার পর, হ্রদের সবুজ জল, আর চমৎকার নিস্তব্ধতা; আমরা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে গিয়া উঠিলাম। সেখানে একটা পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের

চূড়াদেশে আরোহণ করিলাম। তাহার উপর হইতে, সমস্ত দৃশ্য আমাদের নেত্রসমক্ষে প্রসারিত হইল।

এই রমণীয় কুমুদিনী-হ্রদকে ঘিরিয়া, চারিদিক হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কঠোরদর্শন আগ্নেয়গিরি মাথা তুলিয়া রহিয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুর্শিদাবাদের প্রাচীন-কাহিনী।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই মহারাষ্ট্রীয়গণ পুনরায় বঙ্গদেশে আসিয়া দেখা দিল। এবারে রঘুজি স্বয়ং 'চৌথ' আদায় করিবার জন্য এবং গতবারের পরাজয়ের প্রতিশোধ নগরের উপর লইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে না করিতেই পুনার মহারাষ্ট্র-অধিপতি বল্লজি-রাও দিল্লী সম্রাটের আদেশক্রমে আলিবর্দ্দীর নিকট হইতে একাদশ লক্ষ মুদ্রা গ্রহণ করিতে আগমন করিলেন। এই দুইজন মহারাষ্ট্র নায়কের মধ্যে লেশমাত্রও সদ্ভাব ছিল না। উভয়েই 'পেশওয়া' অর্থাৎ রাজপদ প্রার্থী বলিয়া উভয়ের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর শত্রুতা ছিল। নবাব আলিবর্দ্দীও উভয়ের মধ্যে এই মনোভাবের সুযোগগ্রহণ করিতে বিলম্ব করিলেন না। তিনি তাঁহাদের দুইজনকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া স্বয়ং উভয়েরই হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের সংকল্প করিলেন। তদনুসারে তিনি ভাগীরথীর পরপারে যাইয়া বল্লজির সৈন্যের সহিত যোগদান করিয়া উভয়ে একত্রে বর্দ্ধমানের দিকে যাত্রা করিলেন। রঘুজির অধীনস্থ বেরার মহারাষ্ট্রগণ বর্দ্ধমানেই শিবিরস্থাপন করিয়াছিল। বল্লজি কিন্তু কিছুদূর যাইয়াই আলিবর্দ্দীকে ত্যাগ করিয়া একাকীই শত্রুবিষয়ে অগ্রসর হইলেন এবং রঘুজিকে বঙ্গদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এই কর্ম্মের জন্য তিনি নবাবের বিপুল অর্থ গ্রহণ করিয়া পুনা যাত্রা করিলেন। এই বিচিত্র সংগ্রামে দেশের চতুর্দ্দিক শ্মশানে পরিণত হইল। এই নিষ্ঠুর দস্যুগণ যেখানে লোকালয় দেখিত তৎক্ষণাৎ তাহা ধ্বংস বা ভস্মসাৎ করিত। স্ত্রীলোক ও বালকও তাহাদের হস্তে পরিত্রাণ লাভ করিত না, এমন কি মাতার ক্রোড়স্থ শিশুকে পর্য্যন্ত হত্যা করিতে তাহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিত না। তাহাদের এ দানবীয় অত্যাচার দেশবাসীর অন্তরে এরূপ শঙ্কার উদ্রেক করিয়াছিল যে আজও পর্য্যন্ত দুষ্ট বালকবালিকাকে শাসিত করিবার জন্য লোকে সেই নিষ্ঠুর দস্যুদলপতিগণের নাম করিয়া থাকে।

রঘুজি কিন্তু এ পরাজয় শান্তভাবে গ্রহণ করিবার লোক ছিলেন না। বার বার পরাজয়ে তাঁহার প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভাস্করকে কাটোয়া নগরে শিবির স্থাপন করিতে আদেশ দিয়া পুনরায় এদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

এতদিনের অভিজ্ঞতায় মহারাষ্ট্রীয়েরা নবাবের বাহুবলের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন। সুতরাং এবারে রঘুজি গোপনে ভাস্করকে বলিয়া দিলেন যে নবাব অর্থদানে অগ্রসর হইলেই যেন তিনি সন্ধিস্থাপনে বিরত না হন। এদিকে আলিবর্দ্দীও মহারাষ্ট্রের বার বার আক্রমণে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনিও এবারে বলপ্রয়োগ না করিয়া ছল বা কৌশলে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। অর্থ পাইলেই সন্ধি করিবার উপদেশের কথা গোপনে জানিতে পারিয়া আলিবর্দ্দী তাঁহার সচিব প্রধান রাজা জানকীরামকে ভাস্করের নিকটে প্রেরণ করিলেন; এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন তিনি যেন ধীরে ধীরে ক্রমে ঈপ্সিত অর্থদানেই সম্মতি প্রদর্শন করেন এবং কৌশলে ভাস্করকে রাজধানী হইতে দ্বাদশ ক্রোশ দূরে তাঁহার শিবিরে আনয়ন করেন।

রাজা জানকীরামের কৌশলে প্রতারিত হইয়া ভাস্কর নিঃশঙ্কচিত্তে সামান্য অনুচর সমভিব্যাহারে শিবির সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবাবের কর্ম্মচারীগণ মহাসমারোহে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে নবাবের শিবিরাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন।

ভাস্কর ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র নবাব বাহু-প্রসারিত করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভাস্কর কোন্ ব্যক্তি। ভাস্করকে দেখাইয়া দিবামাত্র নবাব বলিয়া উঠিলেন "বিধর্ম্মীর শিরশ্ছেদন কর।" তৎক্ষণাৎ যবনিকার অন্তরাল হইতে লুকায়িত কয়েকজন ব্যক্তি বেগে অগ্রসর হইয়া তরবারিদ্বারা আগন্তুকগণের সকলকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। নবাবের সৈন্যগণও আদিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ বহিঃস্থিত মহারাষ্ট্র সৈনিকগণকে আক্রমণ করিয়া কাটোয়া অভিমুখে বিদূরিত করিয়া দিল। ভাস্করের হত্যা নবাবের বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিজামৎ সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ পাইবামাত্র কাটোয়াস্থিত সমগ্র মহারাষ্ট্রবাহিনী অবিলম্বে শিবির উত্তোলিত করিয়া বেরারাভিমুখে পলায়ন করিল। এই সময়কার এইরূপ একটি গল্প আছে, মহারাষ্ট্রদিগকে আক্রমণ করিবামাত্র শিবিরে মহাকোলাহল ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় নবাবের একজন অনুচর তাঁহাকে হস্তীতে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিতে পরামর্শ দেন। নবাবের একটি পাদুকা হারাইয়া যাওয়ায় তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত নবাব শিবির ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। তাঁহার সচিব উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "পাদুকা অন্বেষণ করিবার কি এই সময়?" নবাব উত্তর করিলেন, "না, তাহা নহে সত্য। কিন্তু এখন যদি আমি পাদুকা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করি, পরে লোকে বলিবে—আলিবর্দ্দী খাঁ প্রাণ লইয়া পলাইবার জন্য এতই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন যে পাদুকা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন।"

ভাস্করের হত্যার পর যুদ্ধক্লান্ত নবাবসৈন্য বিশ্রাম পাইতে না পাইতে তাহাদের ভাগ্যে আবার এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। নবাব সৈন্যের একজন সেনাপতি সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। নবাব যুদ্ধকালে জয়ী সেনাপতিগণকে বিশেষ পারিতোষিক দানে প্রতিশ্রুত হইতেন। মুস্তাফা খাঁ নামে একজন সেনাপতি বেহারে সহকারী শাসনকর্ত্তার পদ পাইবার আশায় ছিলেন। নবাব কিন্তু উক্তপদ সাউকৎ জঙ্গ নামে একজন শ্রেষ্ঠ শাসননীতিজ্ঞ ব্যক্তিকে দান করিয়াছিলেন। নবাবের এই ব্যবহারে মুস্তাফা নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া বিদ্রোহের অবসর খুঁজিতেছিলেন। এক্ষণে সুযোগলাভ করিয়া নবাব-সৈন্যকে স্বদলে আনিয়া তিনি আলিবর্দ্দীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং নাজিম পদ অধিকার করিয়া বসিলেন। নবাব মুস্তাফাকে অন্তরের সহিত স্নেহ করিতেন। সেইজন্য তাঁহার এ দুষ্কৃতি সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রচুর ধনসম্পত্তি দান করিয়া সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। বহুদিন ধরিয়া উভয়ের মধ্যে এই মনোমালিন্য চলিতে লাগিল এবং একটা বিশেষ ঘটনা উপস্থিত না হইলে আরও অনেক দিন এইরূপ চলিত বলিয়াই বোধ হয়। একজন ইতিহাসিক এই ব্যাপারের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

একদিন মুস্তাফা খাঁ নবাবের সাক্ষাৎ প্রার্থনায় তাঁহার দুইটি প্রধান কর্ম্মচারীকে নবাবের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব কিনা, তাহাই স্থির করা তাঁহার উদ্দেশ্য। বিদ্রোহের পর হইতে তিনি সর্ব্বদাই সাবধানে কর্ম্ম করিতেন। কর্ম্মচারীদ্বয় নবাবকে অভিবাদন করিয়া সেনাপতির অপেক্ষায় উপবেশন করিলেন। কিন্তু সেনাপতির আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইবামাত্র অন্তঃপুর হইতে এক ভৃত্য আসিয়া নবাবকে সংবাদ দিল—যে তাঁহার একজন বেগম সহসা পীড়িতা হইয়াছেন এবং তাঁহাকে দেখিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। নবাব সেনাপতির কর্ম্মচারীদ্বয়কে তাঁহার ক্ষণিক অনুপস্থিতির কারণ তাহাদিগের প্রভুকে বুঝাইয়া

বলিতে অনুরোধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার গমনের পরই অন্তঃপুর পথে দ্রুত পদশব্দ ও অস্ত্রমর্ম্মর ধ্বনি শ্রুত হইল। সেনাপতির কর্ম্মচারীবৃন্দ সর্ব্বদাই বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ে ভীত, সুতরাং তাঁহারা এই শব্দ শুনিয়া মনে করিলেন তাঁহাদের প্রভুকে হত্যা করিবার জন্য বোধহয় অস্ত্রধারী পুরুষ লুক্কায়িত রাখা হইতেছে এবং নবাবের শিবির ত্যাগে তাঁহাদিগের এ সন্দেহ বদ্ধমূল হওয়াতে তাঁহারা ছুটিয়া গিয়া অশ্বাবতীর্ণ মুস্তাফাকে তাঁহাদের সন্দেহের কথা বলিলেন। পাপচিত্ত সেনাপতি সহজেই ভীত হইয়া পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া আপন দুর্গাভিমুখে প্রাণপণে ছুটিলেন। নবাব তন্মুহূর্ত্তেই দরবার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সেনাপতির পলায়নবার্ত্তা শুনিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শাহামৎকে সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন যে তাঁহার এ অন্তর্ধানের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এবং যদি কোন বিশ্বাসঘাতকার ভয় তাঁহার মনে উত্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা নিতান্তই অমূলক। কিন্তু সন্দিগ্ধচিত্ত মুস্তাফা কোন-মতেই ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। কিছুকাল নগরে থাকিয়া তিনি কৌশলে আফগান সৈন্যের অন্তর জয় করিয়া স্বদলে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নবাবের নিকট এই সংবাদ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ সেনাপতিকে নগর ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। মুস্তাফা ক্রোধে ও অপমানে নগর ত্যাগ করিলেন এবং যাত্রাপথে রাজমহল লুণ্ঠন করিলেন। আজিমাবাদে উপস্থিত হইয়া নগর অধিকার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং তিনি মুঙ্গেরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর মুঙ্গেরের ভগ্ন দুর্গ মুস্তাফার করতল গত হইল। তথা হইতে তিনি পাটনার দিকে যাত্রা করিলেন। শাউকৎ জঙ্গ মুস্তাফার রাজদ্রোহিতার সংবাদ শুনিয়া সসৈন্যে আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু মুস্তাফার অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা বৃথা জানিয়া ধূর্ত্ত শাউকৎ বিদ্রোহীর নিকট দূত প্রেরণ করিয়া বলিলেন যে, যতক্ষণ তিনি নবাবের 'ফার্ম্মান' অর্থাৎ আদেশপত্র দেখাইতে না পারিবেন, ততক্ষণ তাঁহাকে তথা হইতে এক পদও অগ্রসর হইতে দিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। বিদ্রোহী মুস্তাফার পক্ষে রাজাদেশ প্রদর্শন করা অসম্ভব, কিন্তু শাউকৎকে তিনি যে উদ্ধত উত্তর দান করিয়াছিলেন তাহা আজিও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে। এক দীর্ঘপত্রের শেষে তিনি লিখিলেন—"যে দেশ জয় করে সে তাহার অধিকারী তবে আর নবাবের ফার্ম্মানের আবশ্যক কোথায়? আপনার লোকখ্যাত খুল্লতাত যখন সরফ্রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া রাজধানী আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার কয়খানা আদেশপত্র ছিল?"

এরূপ অপমান সহ্য করা শাউকতের প্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব। তিনি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া পঞ্চ সহস্রের অপেক্ষাও অল্প সৈন্য লইয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে শাউকৎ—যে সকল অশিক্ষিত নূতন লোককে সৈন্য দলভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলাইল। কেবল তাঁহার পুরাতন শিক্ষিত যোদ্ধৃগণ অজেয় ব্যূহরচনা করিয়া বীর রাজকুমারের রক্ষার জন্য প্রাণপর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া অবিরাম যুদ্ধ করিতে লাগিল। সকলেই বুঝিল যে, সেদিন শাউকতের পরাজয় অনিবার্য্য। এমন সময়ে সহসা সৌভাগ্যবশতঃ সামান্য এক কারণে শত্রুপক্ষ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। মুস্তাফার মাহুত যুদ্ধে হত হইবা মাত্র উত্তেজিত হস্তীটি চালকাভাবে সেনাপতিকে ভূপৃষ্ঠে ফেলিয়া দিল। মুস্তাফা কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শূন্যপৃষ্ঠ হস্তী দেখিয়া বিদ্রোহী সৈন্য ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। আট দিন উৎকণ্ঠিতচিত্তে সকলে মুস্তাফার সংবাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। পরে অষ্টম দিনে শুনা গেল যে মুস্তাফা সসৈন্যে বিহারের সীমান্ত দেশে যাত্রা করিতেছেন। এদিকে আলিবর্দ্দী অসংখ্য সৈন্য লইয়া পাটনার দিকে

যাত্রা করিতে ছিলেন। তিনি পথিমধ্যে মুস্তাফাকে বিপুলবেগে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া মুস্তাফা চুনারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় অযোধ্যার নরপতি নবাব সাফদর জঙ্গ বঙ্গের বীরনৃপতির প্রতি ঈর্ষাবশে তাঁহাকে আশ্রয় দান করিলেন।

ইলায়াস মেচনিকফ্। (Elias Metchnikoff)

(লণ্ডন ম্যাগাজিন হইতে)

বাইবেলে লেখা আছে মানুষের পরমায়ু ৭০ বৎসর। আমাদের মধ্যে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অতি অল্প লোকেরই সেরূপ পরমায়ু দেখা যায়। এবং সহস্রে এক জনকেও শত বৎসর বাঁচিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অতি পুরাকাল হইতেই মনুষ্য পরমায়ু বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কারণ পরজগতে আমাদের যতই বিশ্বাস ও নির্ভর থাক্ না কেন ইহজগতে যথাসম্ভব অধিক দিন অবস্থান করিবার জন্যই আমরা আকুল। এমন অল্প-লোকই আছেন যাঁহারা 'শেষের সে দিন"কে আতঙ্কের চক্ষে দেখেন না। সুতরাং প্রত্যেক যুগেই চিকিৎসক ও পণ্ডিতগণ যে জীবনের পরিমিত কালকে অপরিমিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এই কারণেই অতীতে যাঁহারা গুপ্তবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুঞ্জয় ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিতেন তাঁহারা বিলক্ষণ অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেন।

এই মৃত্যুঞ্জয় সুধা অন্বেষণের সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট চেষ্টা আমরা প্রথমে চীনদেশে দেখিতে পাই। তৃতীয় শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ চীন যাদুকর সু-চি (Su—chi) প্রচার করেন যে চীনদেশের পূর্ব্বভাগে "সুখদ্বীপ" (Happy Isles) নামে এক দ্বীপপুঞ্জ আছে, তথাকার অধিবাসীরা এমন এক পানীয় সুধা প্রস্তুত করিতে জানে যে তাহা পান করিলেই মনুষ্য অমর হইয়া যায়। চীন সম্রাট চি-হং-টি (Chi Hong Ti) এই কথা শুনিয়া এক বিরাট বাহিনী সঙ্গে লইয়া সেই মৃত্যুঞ্জয় সুধার অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন।

ইলায়াস মেচনিকফের জীবনের ইতিহাসে ঔপন্যাসিক কিছুই নাই। ১৮৪৫ সালের ১৫ই মে তারিখে তিনি রুষিয়ার এক সামান্য কৃষিজীবির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বালক কাল হইতেই মেচনিকফ্ অধ্যয়নশীল ছিলেন। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি তথায় অধ্যয়ন করেন। তাহার পরে তিন বৎসর তিনি সাগ্রহে প্রাণীতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। এই বিষয়ে তিনি এরূপ পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতা প্রকাশ করেন যে ১৮৭০ সালে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে ওডেসা (Odssa) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীতত্ত্বের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিলেন। ১৮৮৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। পরে নগরে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে গবর্মেণ্ট ওডেসাতে একটি বীজাণু পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়া মেচনিকফ্কে তাহার তত্ত্বাবধায়ক (Director) নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে ফরাসী বিজ্ঞানবিদ্ প্যাস্চরের (Pasteur) আবিষ্ক্রিয়ার প্রতি মেচনিকফের বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। এক গ্রীষ্মাবকাশে তিনি প্যারিস্ নগরে সেই প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি ওডেসার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্যাস্চর ইন্‌ষ্টিটিউটে যোগদান করিবার জন্য প্যারিসে গমন করেন। আজ পর্য্যন্ত তিনি এই স্থানেই আছেন। ১৯০৪ সালে ফরাসী গবর্মেণ্ট তাঁহাকে উক্তস্থানের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছেন।

মেচনিকফ্ প্রথম বয়সে যে সকল অনুশীলন ও

পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা হইতেই তিনি বীজাণু-নীতির সত্য সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে কতকগুলি রোগ বিশেষের বীজাণু পরীক্ষা দ্বারাই তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে সুপরিচিত হন। কিন্তু পরে 'ফ্যাগোসাইট্‌ (Phagocyte) নামে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব বস্তুর আবিষ্কার দ্বারাই জগৎবিখ্যাত হইয়াছেন। এ স্থলে 'ফ্যাগোসাইট্‌' বস্তুটা কি তাহা বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। ইহা আমাদের রক্তের মধ্যে শ্বেতবর্ণ সজীব এক প্রকার গুলিকা (Glo bule)। এই গুলিকা আমাদের দেহ মধ্যে এক অতি জটিল ও অত্যাবশ্যকীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে।

এই 'ফ্যাগোসাইট'গুলি মনুষ্য দেহে পুলিস প্রহরীর কার্য্য করে বলা যাইতে পারে। এই সজীব বীজাণুগুলি কুম্ভকর্ণের ন্যায় অতিভোজী এবং অত্যাশ্চর্য্য গতিশীল এবং দ্রুতকর্ম্মক্ষম। আমাদের দেহ মধ্যে অনিষ্টকর বীজগুলি সদাসর্ব্বদাই প্রবেশ ও জন্মলাভ করিতেছে। 'ফ্যাগোসাইট্‌ এই বীজাণুগুলিকে গ্রাস করিয়া নিয়তই নষ্ট করিতে থাকে। এই শ্বেতবর্ণ গুলিকাগুলির এরূপ অদ্ভুত প্রাণশক্তি যে শরীরের যেস্থানে অনিষ্টকর বীজাণুগুলি আছে তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং সেগুলিকে গ্রাস করিতে থাকে।

'ফ্যাগোসাইট্‌'গুলি এই সকল বীজাণুর উপরে বসিয়া একপ্রকার জীর্ণকর চিনির ন্যায় চূর্ণ বস্তু প্রসব করে এবং তাহা দ্বারা সেগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। আমাদের দেহের স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় এই 'ফ্যাগোসাইট'গুলি অনিষ্টকর বীজাণুগুলিকে সহজেই বশীভূত করিয়া ফেলে। শরীর যখন অসুস্থ হয়, তৎক্ষণাৎ সেই বীজাণুগুলি অসংখ্য হইয়া উঠে এবং 'ফ্যাগোসাইট' গুলিও অধিকতর কর্ম্ম তৎপর হইয়া উঠে। কিন্তু অবস্থাবিশেষে অনিষ্টকর বীজাণুগুলি এত অসংখ্য হইয়া উঠে যে 'ফ্যাগোসাইট্‌'গুলি আর কিছুই করিতে পারে না, অধিকন্তু নিজেরাই বীজাণুর নিকটে পরাভূত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

ম্যাচ্‌নিকফ্‌ সর্ব্বপ্রথম যখন 'ফ্যাগোসাইটের' অস্তিত্ব প্রমাণ করেন তখন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাহার প্রতি লেশমাত্রও মনোযোগ দেন নাই। উপরন্তু অনেকে তাঁহার 'ফ্যাগোসাইটের কথা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মেচনিকফ্‌এ আক্রমণে ভীত হইলেন না। পঁচিশ বৎসর ধরিয়া তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অদম্য অধ্যবসায়ে তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বের সত্য সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিত্য নুতন নূতন প্রমাণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বহুদিনের বাদানুবাদ, আক্রমণ ও সমালোচনার পরে আজ পৃথিবীর প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতই তাঁহার মতের সমর্থন করিতেছেন, কারণ এক্ষণে সে সত্য অস্বীকার করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

এইবার মেচনিকফের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের পরিচয় দিব। মেচনিকফ্‌ দেখিলেন যে, 'ফ্যাগোসাইট' গুলির সহিত রোগের বীজাণুগুলির অবিরাম দ্বন্দ্ব চলিতেছে। ইহা হইতে তাঁহার মনে হইল যে এই শ্বেতবর্ণ গুলিকাগুলির শক্তিবৃদ্ধি করিতে পারিলে এবং বীজাণুগুলির সহিত সংগ্রামে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিলে, মনুষ্যের রোগনিবারণ শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। আমাদের এই শক্তি যতই বৃদ্ধি পাইবে, আমরা ততই দেহকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব, দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারিব।

বহুদিন হইতে নানাবিধ জন্তুর পরীক্ষা করিয়া মেচনিকফ্‌ বুঝিলেন যে মনুষ্য তাহার স্বাভাবিক আয়ু হইতে বঞ্চিত। তাঁহার মতে আমরা যে অকালে জরাগ্রস্ত হই তাহার কারণ এই বিষাক্ত বীজাণুগুলি কোটি কোটি সংখ্যায় পুষ্ট হইয়া রাত্রিদিন ক্রমে ক্রমে শরীরকে নষ্ট করিতে থাকে ; তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের পাকাশয়ে বিশেষতঃ ঊর্দ্ধতন অন্ত্রস্থলে অবস্থান করে।

সর্ব্বপ্রকার অবস্থার মধ্যে এই বিষাক্ত বীজাণুগুলির ক্রিয়া অনুশীলন করিয়া এবং তাহাদের ধ্বংসকারী ক্রিয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া তিনি এরূপ কোন ক্ষতিপূরণকর বীজাণুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, যাহা রক্তের 'ফ্যাগোসাইটের সহিত সংযুক্ত

হইয়া সেই প্রাণহানিকারক বীজাণুগুলি নষ্ট করিতে পারে। ইহাদিগের মনুষ্যদেহের উপর ক্রিয়া প্রমাণ করিবার জন্য মেচনিকফ্ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য। জরাগ্রস্ত ও রুগ্ন ব্যক্তির মলাদি হইতে তিনি এই বীজাণু নির্গত করিয়া সেগুলিকে প্রথমে প্রবলরূপে উত্তেজক ও ক্রিয়াশীল করেন। পরে সেইগুলিকে কতকগুলি অল্পবয়স্ক বনমানুষ ও বানরের দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। ইহা দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই নিঃসন্দেহ ফল ফলিল। কিছুদিনের মধ্যেই সেই জন্তুগুলি রুগ্ন ও অকাল বৃদ্ধ হইয়া ক্রমশ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মেচনিকফ্ যে কেবল বনমানুষের দেহেই ইহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা নহে, অন্যান্য সকল প্রকার পশুর দেহেই এই বীজাণুর ফল পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে বার্দ্ধক্য বীজাণুর অস্তিত্ব ফল এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তিনি এই দেহক্ষয়কর পদার্থের ক্রিয়াকে নষ্ট করিতে পারে এরূপ কোন বস্তু আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক দিন হইতেই তিনি দুগ্ধের পচন হইতে রক্ষা করিবার আশ্চর্য্য শক্তি লক্ষ্য করিয়া আসিতে ছিলেন। অনেক উষ্ণপ্রধান দেশে কৃষকগণ মাংসকে দুগ্ধে এবং বিশেষতঃ ঘোল বা দধিতে ডুবাইয়া রাখিয়া বহুদিন তাহাকে স্বাভাবিক ভাবে রক্ষা করে। এই দেখিয়া তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিল—"দুগ্ধ যদি এ প্রকারে পচন নিবারণে সক্ষম হয় তাহা হইলে আমাদের পাকনালীতে অবিরাম যে পচন ক্রিয়া চলিতেছে, তাহাও নিবারণ করিতে অক্ষম হইবে কেন?"

তদ্ভিন্ন ইহা নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সকল জাতি প্রধানতঃ ছানার জল বা দধি খাইয়া জীবন ধারণ করে এবং যাহারা সচরাচর মাংস ভক্ষণ করেই না, তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অত্যধিক সংখ্যায় সুস্থ ও সবলদেহ বৃদ্ধ ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনি আরও দেখিলেন যে অনেক সবল বৃদ্ধ বহুদিন হইতে কেবল ছানার জল বা দধি পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। এই সকল লোকের মলমূত্রাদি অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সাধারণ বৃদ্ধদিগের অপেক্ষা তাহাতে ক্ষয়কর বীজাণু লক্ষাধিক গুণ কম রহিয়াছে।

সুতরাং অধ্যাপক মেচনিকফ্ দুগ্ধ লইয়াই নানা প্রকার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। নিজের ও অপরাপর প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদের পরীক্ষার ফল লক্ষ্য করিয়া তিনি তাঁহার নিজের ও বিদ্যালয়ের সহকারীদিগের উপর পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরীক্ষার পরই তিনি বুঝিলেন যে ঘোল বা দধি যতই উপকারী হউক না কেন, নানা কারণে কাঁচা দুধের প্রস্তুত দধি আহার করা অনিষ্টকর। কাঁচা দুগ্ধের সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যেই সহস্র সহস্র ক্ষতিকর বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়। মেচনিকফ্ দেখিলেন যে এই সকল খাদ্যের মধ্যে ক্ষয়কাশ, টাইফয়েড ও বিসূচিকার বীজাণু উপস্থিত থাকে। কাঁচা দুগ্ধের ঘোল বা দধির মধ্যে বিসূচিকার বীজ ৪৮ দিনেরও অধিক জীবিত থাকে। সুতরাং ছানার জল বা ঘোল হইতে যথার্থ উপকার লাভ করিতে হইলে সেগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করা আবশ্যক।*

এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া, পরে সে দুগ্ধ ফুটাইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহাকে শীতল করিলেন। এই দুগ্ধে তাঁহার প্রস্তুত বিশুদ্ধ বীজাণু প্রয়োগ করিলেন এবং সেগুলি তৎক্ষণাৎ দধি ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিল।

ইতিপূর্ব্বে নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা মেচনিকফ্ স্থির করিয়াছিলেন যে দুগ্ধে এমন এক প্রকার বীজাণু আছে যাহা সতেজ অম্ল (acid) প্রসব করিয়া দেহের পচন ক্রিয়া রোধ করে। তিনি ইহাও দেখিয়াছিলেন যে বুলগারিয়া (Bulgaria) দেশের কৃষকগণ

* আমাদের দেশে জ্বাল দেওয়া দুগ্ধেরই দহ, ঘোল, ছানা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সুতরাং আমাদের প্রণালী বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্মত সন্দেহ নাই। ভাঃ সঃ

যে এক প্রকার ঘোল পান করে তাহাতেই এই বীজাণু সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলভাবে অবস্থান করে। তাহাদের সেই ঘোল হইতে বীজাণু বহির্গত করিয়া তিনি বিশুদ্ধ বীজাণু প্রস্তুত করিলেন। এই বুলগেরিয়ান দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া মেচনিকফ্ তাহার fremnttin অর্থাৎ দধি ক্রিয়া করিলেন।

কতকগুলি শ্বেত ইন্দুরের দেহে বার্দ্ধক্যের বীজাণু প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদিগকে দুগ্ধ ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য দিয়া রাখা হইল। আর কয়েকটি ইন্দুরের শরীরে উক্ত বীজাণু প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদিগকে মেচনিকফের প্রস্তুত দধি ভোজন করাইয়া রাখা হইল। প্রথম দলের প্রত্যেকটিই জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু দ্বিতীয় দলের মধ্যে সে লক্ষণ কিছুই দেখা গেল না, তাহারা দিন দিন সবল সতেজ হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই পরীক্ষাতেই মেচনিকফ্ ক্ষান্ত হইলেন না। অপরাপর অনেক জন্তু লইয়া তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একটি বানরের দেহে বার্দ্ধক্যের বীজাণু প্রবিষ্ট করাইবার পর কয়েক সপ্তাহ পরেই বানরটি অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং তাহার বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর তাহাকে বুলগেরিয়ান বীজাণু-প্রস্তুত দধি ভক্ষণ করাইতে থাকায় ছয় মাসের মধ্যেই সে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল এবং পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল যে তাহার দেহে বার্দ্ধক্য বীজাণু আর নাই।

মেচনিকফ্ নিজে এই দুগ্ধ বীজাণু আট বৎসর সেবন করিয়া বিশেষ উপকার বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই ব্যবহার তাঁহার পরমায়ু বৃদ্ধি পাইতেছে। তাঁহার মতে আমাদের নিত্যই যে দধি ভক্ষণ আবশ্যক তাহা নহে, বিশুদ্ধ বুলগেরিয়ান বীজাণু নিত্য সেবন করিলেই যথেষ্ট। কিন্তু তাহার সঙ্গে অন্য কোন মিষ্ট দ্রব্য আহার করা আবশ্যক, নচেৎ বীজাণুগুলি অম্ল প্রসব করে না। দুগ্ধ-বীজাণুগুলি 'ফ্যাগোসাইটের সহিত মিশ্রিত হইলে আমাদের দেহক্ষয়কর বীজাণু-গুলিকে সহজেই নষ্ট করিতে পারে।

মেচনিকফ্ বলেন—"যদি আমাদের পাকাশয়ের বিশেষতঃ ঊর্দ্ধতন অন্ত্রস্থলের অসংখ্য দেহক্ষয়কর বীজাণুগুলি আমাদের বার্দ্ধক্য আনিয়া উপস্থিত করে ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে যে বীজাণুগুলি দ্বারা তাহা শক্তিহীন ও নষ্ট হয়, তাহার বার্দ্ধক্য ও জরারোধ করিবার শক্তি আছে ইহাও সত্য।"

মেচনিকফের মতে অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ ক্রমে চল্লিশ বৎসরের মনুষ্যের ন্যায় ক্ষিপ্রকর্ম্ম ও সবল মস্তিষ্ক হইতে পারে। পৃথিবীতে একদিন অশীতি বর্ষের মনুষ্য যুবা বলিয়া পরিগণিত হইবে। আমরা ততদিন বাঁচিব না ইহাই দুঃখ!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

"কাশী যাব কি মক্কা যাব ?"

পুরাতন গল্প।

এক ব্রাহ্মণ—পথিমধ্যে কোন অস্পৃশ্য বস্তু স্পর্শ করায় মনে মনে চিন্তা করিলেন যে পাপ হইল। এই জন্য তিনি গৃহে প্রবেশ না করিয়াই গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। সেখান হইতে গঙ্গা অনেক দূর। পথিমধ্যে সন্ধ্যা হইল; চারিদিকে মাঠ; অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নিকটে একটিমাত্র কুটীর; তাহা এক চর্ম্মকারের। ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিলেন ব্রাহ্মণ হইয়া চর্ম্মকারের বাটীতে কেমন করিয়া থাকি! কিন্তু ক্রমে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল; ঝড়ও আরম্ভ হইল, চারিদিক অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল—ঘন ঘন বজ্রপাত হইতে লাগিল। তখন ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, কোন রকমে রাতটা কাটানো বইত নয়, তাতে আর দোষ কি? এই ভাবিয়া তিনি

চর্ম্মকারের বাটীতে প্রবেশ করিলেন; চর্ম্মকার ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইল; ভক্তিভরে প্রণত হইয়া তাঁহাকে বসিবার আসন দিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন "বাপু, আমি তোমার ঘরে কোন জিনিস স্পর্শ করিব না; আমি কেবল একটু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই চাই—ঝড় বৃষ্টি কাটিয়া গেলে স্বস্থানে চলিয়া যাইব।" চর্ম্মকার কহিল "ঠাকুর সে কি হয়? আমার বাটীতে যখন পায়ের ধূলা পড়িয়াছে তখন পাক করিয়া খাইয়া না গেলে আমি ছাড়িব না।" ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—সর্ব্বনাশ! আমি অস্পৃশ্য বস্তু স্পর্শের পাপ ক্ষালন করিবার জন্য গঙ্গাস্নানে যাইতেছি; পথিমধ্যে এ কি বিপদ! চামারের অন্ন গ্রহণ করিতে হইবে! আমার চৌদ্দ পুরুষে এমন কাজ কখনো করে নাই! প্রকাশ্যে কহিলেন "না হে বাপু, আমি একাহারী রাত্রে কিছুই খাই না।" চর্ম্মকার কহিল "ঠাকুর! অপরাধ লইবেন না—আমার গৃহে অতিথি উপবাসী থাকিবে, এ পাপ আমি গ্রহণ করিতে পারিবনা—আপনি অন্যত্র আশ্রয় লউন।" তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে। ঘরের বাহির হয় কাহার সাধ্য! চর্ম্মকার কহিল, "যা হয় একটা কর—হয় খাও দাও ঘুমোও, নয় অন্য জায়গা খোঁজ ঠাকুর! দাঁড়িয়ে ভাবলে কি হবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "আচ্ছা, বাপু, তোর কথাই থাকৃ; তোর খুব পুণ্যবল! আমি রাঁধা বাড়া করিয়াই খাব; তবে নূতন পাত্র চাই।" চর্ম্মকার সেই দিবসই হাট হইতে নূতন রন্ধন-পাত্র আনিয়া রাখিয়াছিল; গৃহে চাল ডাল তৈল লবণ ইত্যাদি ছিল। চর্ম্মকার ব্রাহ্মণকে একটি পরিষ্কার ঘর দেখাইয়া দিল। ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় চর্ম্মকার-পত্নী তাহাতে পুনরায় গোময় লেপন করিয়া তাহা শুদ্ধ করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, স্বহস্তে সমস্ত দ্রব্যের আয়োজন করিয়া লইব তাহাতে বিশেষ দোষ ঘটিবে না। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া নূতন পাত্রে সিদ্ধ-পক্ক চড়াইয়া দিলেন। যথাসময়ে পাক সমাধা হইল। ব্রাহ্মণ এক কদলিপত্রে অন্ন রাখিয়া দেখিলেন যে জল ফুরাইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে পুনরায় জল আনিতে যাইতে হইবে। চর্ম্মকার কহিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে আলো লইয়া যাই-তেছি; অন্ধকারে অপরিচিত পথে যাইবেন না। ব্রাহ্মণ বলিলেন "চলত বাপু।" চর্ম্মকার আপনার পত্নীকে ডাকিয়া ব্রাহ্মণের ভাতের পাহারায় রাখিয়া দিয়া প্রদীপ লইয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্করিণীর ঘাটে গেল। যথাসময়ে উভয়ে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজন সমাধা করিয়া আপনার উত্তরীয়টি বিছাইয়া শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি শুনিতেছেন যে চর্ম্মকার তাহার পত্নীকে ভয়ানক প্রহার করিতেছে সে যন্ত্রণায় ঘোর চীৎকার করিতেছে। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া গিয়া চর্ম্মকারকে কহিলেন "হাঁ, হাঁ, কর কি কর কি; স্ত্রীহত্যা করবে না কি!" চর্ম্মকার কহিল "ঠাকুর মশায়, এ রকম স্ত্রীর মরণই ভাল; ওর মুখ দেখিতে নাই।"

ব্রাহ্মণ ব্যগ্র ভাবে কহিলেন—"কেন? কেন? কি হয়েচে,?"

চর্ম্মকার তখন ক্রোধে ফুলিতেছে; সে কহিল "দেখুন ত মশায়! চামারণির কাজ দেখেচেন, আমি সারাদিন খেটে খুটে রাত্রে

নিয়েচে, যে পেটই ভ'রল না।" ব্রাহ্মণ চর্ম্মকারপত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "কেন গো বাছা, চারটি চাল বেশি নিলেই ত হ'ত; ভাত যদি বেশি থাকতো' ভিজিয়ে রেখে খেতে!" চর্ম্মকারপত্নী তখন প্রহারের যন্ত্রণায় অস্থির। ব্রাহ্মণের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারিলে পাছে আরো প্রহার খাইতে হয় এই ভয়ে সে আসল কথা বলিয়া ফেলিল। সে বলিল "ঠাকুর মহাশয়, চাল ঠিকই নিয়েছিলাম; আপনার ভাতের কাছে যখন পাহারা দিচ্ছিলাম তখন ছেলেটা কেঁদে উঠল; ভাবলাম টপ্ ক'রে ছেলেটাকে বিছানা থেকে তুলে এনে কোলে করে আপনার ভাতের কাছে বসি। ছেলে আনতে গেছি, এর মধ্যে ঐ যে পোড়ারমুখো কুকুরটা দাওয়ায় শুয়ে আছে, আপনার ভাতের অর্দ্ধেক খেয়ে ফেল্লে। আমি ভাবলাম যে, যদি চামার জানতে পারে তবে, আমার ঘাড়ে মাথা রাখবে না। আমি তাড়াতাড়ি আমার হাঁড়ি থেকে ভাত বার করে এনে আপনার ভাতে মিশিয়ে দিলাম। ভাবলুম আমার ভাগটাই গেল, আমি না হয় রাত্রে উপোস করে থাকব। এখন দেখচি চামারেরও ভাত কম হয়ে গেছে। ঠাকুর মহাশয় এক দিন এক মুঠো কম খেলে কি আর চলেনা।" ব্রাহ্মণ অবাক্; অস্পৃশ্যস্পর্শজনিত পাপ মোচনের জন্য গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন; পথিমধ্যে আরো গুরুতর পাপ সঞ্চয় করিলেন। শুধু যে কুকুর-ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন আহার করিলেন তাহা নহে; চর্ম্মকার-রমণী-পক্ক অন্নও উদরস্থ করিলেন। হায়, হায়, এ পাপ মোচন করিতে গঙ্গাস্নানে গেলে তো চলিবে না—কাশী যাইতে হইবে।

পর দিবস প্রত্যূষে চর্ম্মকার-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ বারাণসী অভিমুখে চলিলেন। পথে এক ব্রাহ্মণ-কন্যার গৃহে অতিথি হইতে হইল। ব্রাহ্মণ-কন্যা নানা অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া অতি পরিতোষের সহিত তাঁহাকে খাওয়াইল। আহারান্তে ব্রাহ্মণ তামাকু সেবন করিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণ-কন্যা অবগুণ্ঠন টানিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণ কহিলেন "কি মা?" ব্রাহ্মণ-কন্যা কহিল "বাবা, আপনার কাছ থেকে একটা ব্যবস্থা নিতে এসেচি।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন—"কি ব্যবস্থা, মা?"

"বাবা, আমার ঐ যে ছেলেটি, ওটির বাপ ছিল একজন মুসলমান। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে; আমাকে সেই মুসলমানটা ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল। ঐ ছেলেটা যখন আমার গর্ভে তখন সেই মুসলমানটার মৃত্যু হয়। সেই অবধি আমি ব্রাহ্মণের মতই আছি। এখন ভাবচি ছেলেটা তো তার, তবে ওর পৈতে দিব কি ওকে মুসলমান করাব।"

ব্রাহ্মণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন; মুখ দিয়া কথা সরিল না। ব্রাহ্মণ-কন্যা ভাবিল যে,—সে কঠিন প্রশ্ন করিয়াছে কিনা, তাই ব্রাহ্মণকে ভাবিতে হইতেছে। অনেকক্ষণ ব্রাহ্মণকে নীরব দেখিয়া ব্রাহ্মণ-কন্যা আবার কহিল "বলুন না, কি ক'রব।" তখন ব্রাহ্মণ রাগিয়া কহিলেন "তুই যা জানিস তা ক'রগে। আমি ভাবচি, আমি কি ক'রব? আমি এখন কাশী যাব কি মক্কা যাব?"

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

স্পঞ্জসংগ্রহ ও নকল স্পঞ্জ উৎপন্ন প্রণালী।

স্পঞ্জ বা শোষণী সমুদ্র গর্ভজাত একরূপ সজীব পদার্থ। ঝিনুকের ন্যায় ডুবারীদিগের দ্বারাই ইহা উত্তোলিত হইয়া থাকে। স্পঞ্জের ব্যবসায় আমেরিকার যুক্তরাজ্যে অর্দ্ধ শতাব্দীর কিঞ্চিদধিক সময় হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তখন 'কি-ওয়েষ্ট' (Key west) নামক ক্ষুদ্র দ্বীপের চতুঃপার্শ্বস্থ সমুদ্র হইতে তৎস্থানের অধিবাসীগণ স্পঞ্জ সংগ্রহ করিত। ক্রমশঃ স্পঞ্জের কাটতি যত বাড়িতে লাগিল ততই নানাস্থান হইতে ইহার সংগ্রহ চলিতে লাগিল। আমরা এক্ষণে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সন্নিকটবর্ত্তী সাগর গর্ভের স্পঞ্জ সংগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ফ্লোরিডার পশ্চিম উপকূলে টারপান স্প্রীংস্ (Tarpan Springs) এবং কিউবা দ্বীপের দক্ষিণ দিক্‌বর্ত্তী বাটাবানো (Batabano) নামক স্থানে বহুপরিমাণে স্পঞ্জ উৎপন্ন হয়। যদিও এই দুইটি স্থান পরস্পর অতি সন্নিকটবর্ত্তী—এমন কি ইহার একস্থান হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে অপর স্থানে সহজেই পতিত হইতে পারে,—তথাপি উভয় স্থানের স্পঞ্জ সংগ্রহপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে পৃথক। ফ্লোরিডা উপকূলের স্পঞ্জ উত্তোলনপ্রণালী বর্ত্তমান জগতের কৌশল ও বিজ্ঞানানুমোদিত। কিন্তু কিউবা উপকূলে অতি প্রাচীনকালোপযোগী প্রথাতেই স্পঞ্জ সংগৃহীত হয়। কিউবা দ্বীপবাসীগণ ডোঙ্গার ন্যায় একপ্রকার নৌকাযোগে সমুদ্রমধ্যে গমন করে। সেই নৌকার 'পাটাতন' সুপ্রশস্ত। তাহারা এই নৌকাকে চালুপা (chalupa) বলিয়া থাকে। ডুবুরিগণ সমুদ্র মধ্যে সহজে যে প্রকার অস্ত্র চালিত হইতে পারে এমত অস্ত্র সঙ্গে লইয়া প্রথমে এই নৌকায় ওঠে। এই অস্ত্র আর কিছুই নহে—এক প্রকার "নগা"। প্রত্যেক ডুবুরিকে তিনখানি করিয়া এই "নগা" সঙ্গে লইতে হয়। এগুলি যথাক্রমে ৭, ২০ ও ৩৪ হস্ত দীর্ঘ। প্রত্যেকটির আগায় তিনটি করিয়া সূক্ষ্ম বক্রাকৃতি তীক্ষ্ণ ধার লৌহশলাকা সন্নিবিষ্ট থাকে। ঐ অস্ত্র তিমি প্রভৃতি ভয়াল হিংস্র জন্তু নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাকে হনন করিবার জন্য। উহা আমাদের দেশের অনেকটা বল্লমের অনুরূপ। এই অস্ত্র সঙ্গে লইবার প্রথা আর অধুনা দৃষ্ট হয় না। ডুবুরিগণ বহুদূর দৃষ্টিক্ষম চসমা পরিয়া চালুপার সাহায্যে ধীরে ধীরে সমুদ্রগর্ভে গমন করিতে থাকে। সার্সী যে গ্লাসের দ্বারা প্রস্তুত এই চসমাও অধিকাংশ সেই গ্লাসের প্রস্তুত। যে



পাত্রের মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না (Water-tight-cylinder) এমনতর উভয়

মুখ খোলা পাত্রের একদিকে এই গ্লাস উত্তমরূপে বসাইয়া দেওয়া হয় ও অপর মুখ চক্ষের উপরে স্থাপিত করা হয়। ডুবুরিগণ তাহাদের মস্তক ছবিনির্দ্দিষ্ট যন্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া সমুদ্রের তলদেশে গমন করিতে থাকে। তলদেশের ৩৪ হস্ত পরিমিত স্থান এই যন্ত্র সাহায্যে তাহারা পরিদর্শন করিতে পারে। গ্লাসের উপর তরঙ্গাঘাত হইলেও তাহাতে দর্শনের কোনপ্রকার বিঘ্ন সমুপস্থিত হয় না। সে নির্ব্বিঘ্নে তাহার দর্শনীয় দ্রব্যাদি অবলোকন করিয়া কার্য্যোদ্ধার করে। সমুদ্রের উপরিভাগে উর্ম্মিমালা যেমন প্রায় সততই নৃত্য করিতেছে তেমনি উহার তলদেশেও জোয়ার ভাঁটা ও নিম্নস্রোত আছে সুতরাং তথায়ও কাহারও নিরাপদে থাকিবার সুবিধা নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত প্রকার চসমা এবং একপ্রকার সামুদ্রিক দূরবীক্ষণের সাহায্যে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতঃ ধীবরেরা স্পঞ্জ দর্শনমাত্র একরূপ বঁড়সীর দ্বারা তাহা টানিয়া লয়। কিন্তু এবম্প্রকার পুরাতন প্রথানুসারে স্পঞ্জ সংগ্রহ নিতান্ত দুরূহ এবং অতীব সহিষ্ণুতার পরিচায়ক। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বেও এই পুরাতন প্রথানুসারে ফ্লোরিডা উপকূলে স্পঞ্জ সংগ্রহ হইত। তথাকার অধিবাসীগণের মধ্যে কেহ কেহ অদ্যাবধিও এই প্রকার প্রথানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। এই সমুদায় লোক দলবদ্ধ হইয়া দ্বিমাস্তলযুক্ত দ্রুতগামী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোত সঙ্গে লইয়া স্পঞ্জ সংগ্রহার্থে উক্ত স্থানের বন্দরসমূহে গমন করে। এই নৌকাকে আমেরিকায় "স্কুনার"(Schooner) বলে। প্রত্যেক নৌকায় নাবিক সংখ্যা ৬জন এবং একজন পাচক—সর্ব্বশুদ্ধ ৭ জন মাত্র। ইহার সঙ্গে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিঙ্গি থাকে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাহারা এই স্কুনার হইতে ডিঙ্গিতে করিয়া স্পঞ্জ সংগ্রহের স্থানে উপস্থিত হয়। ঐ ক্ষুদ্র ডিঙ্গিতে দুইজন করিয়া লোক থাকে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তিকে "হুকার" (Hooker) ও অপর ব্যক্তিকে "স্কালার" (Sculler) কহে। প্রথম ব্যক্তি নতজানু এবং নতমস্তক হইয়া সারাদিন সেই শুণ্ডাকৃতি যন্ত্রটি মুখোসের ন্যায় পরিধান করিয়া দূরবীন দিয়া একদৃষ্টে সমুদ্র গর্ভ নিরীক্ষণ করিতে থাকে। তখন তাহাকে দেখিলে করী-শিশু বলিয়া ভ্রম জন্মে। দ্বিতীয় ব্যক্তি অতি সন্তর্পণে নৌকাখানি বাহিতে থাকে। প্রথম ব্যক্তির ঐ প্রকার নাম প্রদান করিবার সার্থকতা এই যে, সে ঐ যন্ত্র সাহায্যে সমুদ্র মধ্যস্থিত ৩৪।৩ হস্ত দূরের দ্রব্য দর্শন করিয়া হস্তস্থিত সুদীর্ঘ হুক বা আকর্ষণীর দ্বারা সমুদ্র তলদেশস্থিত স্পঞ্জ টানিয়া আনে। সন্ধ্যা না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রকার কার্য্য সাধিত হয়। অবশেষে স্পঞ্জে নৌকা পূর্ণ করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র আড্ডা স্কুনারের নিকট লইয়া যায়। এইরূপে নৌকার গুদামে আট সপ্তাহ ধরিয়া স্পঞ্জ সংগৃহীত হইলে তাহা বন্দর উপকূলে আনীত হয়।

আমাদের দেশে যেমন বৃহৎ বৃহৎ কারখানায় বহু আয়াসসাধ্য ছুতারের কার্য্য চীনেদের দ্বারা সম্পাদিত হয় আমেরিকার ফ্লোরিডা উপকূলেও সেইরূপ গ্রীক ডুবুরী দ্বারা বহু আয়াসসাধ্য স্পঞ্জ উত্তোলন কার্য্য সম্পাদিত হয়। গ্রীকবাসী

ডুবুরীগণ পূর্ব্বে ভূমধ্য সাগর হইতে স্পঞ্জ সংগ্রহ করিত। পরে ইহারা সে স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া সুদূর আমেরিকার ফ্লোরিডা নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করতঃ স্পঞ্জ উত্তোলন কার্য্যে নিযুক্ত আছে। বহু বৎসর ধরিয়া তাহারা এই কার্য্য করায় এসম্বন্ধে তাহারা অদ্বিতীয় পারদর্শী। এই ডুবুরীগণের একপ্রকার পোষাক আছে তাহাকে "স্থাফ্যাণ্ডার" (Shafander) বলে। তাহারা এই পোষাকাবৃত হইয়া সুগভীর সমুদ্র তলদেশে গমনকরতঃ যে প্রকার স্পঞ্জ সংগ্রহ করে এবং সুগভীর সলিলাভ্যন্তরে স্পঞ্জ দেখিলেই ভালমন্দ যেরূপ বুঝিয়া লইতে পারে এমন আমেরিকাবাসী কোন ধীবর পারে না। এই পোষাক বর্ত্তমানকালের বিজ্ঞান সম্মত। কিন্তু পোষাকের অধিকাংশ স্থলই সিসা দ্বারা প্রস্তুত বলিয়া অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত;—এমন কি বিনামার তলদেশ ইংরাজিতে যাহাকে sole বলে তাহাও সিসার। ধীবরেরা সঙ্গে একএকটি প্রকাণ্ড জালের থলি লইয়া যায়। পর্ব্বত হইতে কমলালেবু সংগ্রহের জন্য যে প্রকার জালের ব্যাগ ব্যবহৃত হয় ইহাও তদ্রূপ, কিন্তু আকারে অনেক বড়। উক্ত ব্যাগ কোমরের সঙ্গে ঝুলান থাকে। স্পঞ্জ সংগ্রহ করিয়া তাহারা ঐ ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া দেয়। এবং তাহা স্পঞ্জপূর্ণ হইলে তাহার একদিকের রজ্জু ধরিয়া টানিয়া নৌকার লোক উপরে গ্রহণ করে—আবার শূন্য ব্যাগটি ডুবুরীগণ অপর পার্শ্বের রজ্জু ধরিয়া টানিয়া লইয়া থাকে। স্পঞ্জ সংগ্রহ কার্য্য উভয় হস্ত দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ডুবুরীগণের নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া যাহাতে সহজে সম্পন্ন হইতে পারে এমন একটি পম্প যন্ত্র ধীবরগণের নাসিকার সংযোগ করিয়া দেওয় হয়।

পূর্ব্বে যে পোষাকের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে বৈজ্ঞানিক দোষ না থাকিলেও উহাতে জীবনের আশঙ্কা দূর করিতে পাবে না। সমুদ্র মধ্যে হাঙ্গরের ভয়ই অধিক। যে সকল স্থানে স্পঞ্জের আধিক্য দৃষ্ট হয় তথায় ভয়ের কারণ বিলক্ষণ আছে। তথায় মনুষ্য-রক্ত পিপাসু বহু সামুদ্রিক জন্তু বাস করে। এই সমুদায় জন্তুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের আবশ্যক। অথচ এই ধীবরগণ কখনও সেরূপ কোনও অস্ত্র সঙ্গে লইয়া যায় না। ইহার কারণ কি? মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর এক স্থলে উক্ত আছে—শুম্ভ নিশুম্ভ বধ উদ্দেশ্যে দেবী কালীমূর্ত্তি ধারণ করতঃ রক্তবীজ বধ কালে দেখিলেন, অস্ত্রাঘাতে উক্ত অসুরের দেহ হইতে শোণিত ভূমিতলে নিপতিত হইবামাত্র শত সহস্র অসুর দেহধারী রক্তবীজের আবির্ভাব হইতে লাগিল। এই হাঙ্গরগণের বেলাও তাহাই হইয়া থাকে। আহত হাঙ্গরের এক বিন্দু শোণিত জলের সঙ্গে সংমিলিত হইবামাত্র শত শত হাঙ্গর আসিয়া তথায় উপস্থিত হয়। ইহারাও রক্তবীজের বংশধর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল কারণে ডুবুরীগণ কোন ক্রমেই অস্ত্র সঙ্গে লয় না। একটি হাঙ্গরের রক্তপাত করিয়া শত সহস্র হাঙ্গরের দ্বারা ভক্ষিত হইতে কে ইচ্ছা করে? হাঙ্গরের ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল। এই ধীবরগণের পোষাকের গুরুভার নিবন্ধন হাঙ্গরের হস্ত হইতে পলায়ন করিবারও কোনও উপায় নাই। তবে

হাঙ্গরের কবল হইতে রক্ষা পাইবার একটি মাত্র উপায় আছে। যগুপি কোন প্রবল পরাক্রান্ত নরমাংসভোজী হাঙ্গর ঘটনাক্রমে অভিনয় স্থলে সমুপস্থিত হয় তখন ডুবুরীকে মৃতের ন্যায় স্থির ভাবে সমুদ্রগর্ভে পড়িয়া থাকিতে হইবে; তাহাতেই তাহার প্রাণ বাঁচিয়া যাইতে পারে। কারণ হাঙ্গরেরা সিংহ ভল্লুকের ন্যায় মৃত প্রাণী ভক্ষণ করে না। কিন্তু একজন গ্রীক দেশীয় সুবিখ্যাত ও অভিজ্ঞ ডুবুরী এইরূপ বলিয়াছে, "দশম হস্ত পরিমিত একটি ক্ষুধার্ত্ত হাঙ্গরের সম্মুখে নিশ্চলভাবে বহুক্ষণ সমুদ্র গর্ভে মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকিতে মনুষ্যের পক্ষে অস্বাভাবিক স্নায়বিক শক্তির আবশ্যক। এই কার্য্যে অনেকেই অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া প্রাণ হারাইয়া থাকে। একটি প্রকাণ্ড হাঙ্গর যখন মনুষ্যটিকে ঘেরিয়া ফেলিয়া অবিশ্রান্ত লাঙ্গুলাঘাত করিতে থাকে তখন কাহার সাধ্য তথায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে পারে?"

সংগ্রহের পর স্পঞ্জগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা হইতে বড় জাহাজে তোলা হয়—এবং উহার অন্তর্গত দ্রব্যগুলি বাহির হইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত গুদাম-জাহাজের পাটাতনে সেগুলি পড়িয়া থাকে। এই স্পঞ্জরূপী জীবগুলির দেহ হইতে প্রথমে তীব্র য়্যামোনিয়ার (Ammonia) গন্ধ বহির্গত হইতে থাকে। এবং অল্পদিন পরে তাহা হইতে উত্থিত সামুদ্রিক বৃক্ষ বিশেষের ন্যায় অপেক্ষাকৃত সুমিষ্ট গন্ধে চারিদিক মুখরিত হইতে থাকে। অতঃপর স্পঞ্জবাহী জাহাজ উপকূলাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সেই মুমূর্ষু স্পঞ্জগুলিকে লৌহগরাদে দ্বারা প্রস্তুত খোঁয়াড়ের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। উক্ত খোঁয়াড়ে সমুদ্রের উপকূলস্থিত জল আসিয়া ক্রমাগত সেগুলিকে বিধৌত করিতে থাকে। এক সপ্তাহকাল ধৌত ক্রিয়ার পর স্পঞ্জগুলি ক্রমশঃ গুটাইয়া আইসে এবং আকারে ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে; তখন তাহার উপর দণ্ডের দ্বারা ক্রমাগত আঘাত করা হয়। এই প্রকারে তন্মধ্যস্থিত জীবন্ত দ্রব্যাদি সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর জাহাজ পূর্ণ হইয়া স্পঞ্জরাশি নিলামে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। তথা হইতে প্যাককারী এজেন্টগণ উহা ক্রয় করিয়া লইয়া যায় এবং বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করিয়া ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি করে। স্পঞ্জ প্যাক করিবার পূর্ব্বে উহা পুনরায় চূর্ণমিশ্রিত সামুদ্রিক জলে ধৌত করিতে হয়। যগ্যপি এই জলের মধ্যে চূণের অংশ অধিক হইয়া পড়ে তবে স্পঞ্জ অমসৃণ হইয়া পড়ে এবং সহজেই ছিন্ন করিতে পারা যায়। ইহা সত্ত্বেও বহু ব্যবসায়ী চূণের অংশ অধিক দিয়াই স্পঞ্জ ধৌত করে। কারণ অত্যধিক চূণ দ্বারা স্পঞ্জ ধৌত করিলে তাহার ভার অধিক হইয়া থাকে। এবং তাহা হইলেই উহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে।

বিভিন্নজাতীয় স্পঞ্জ

জগতে তুর্ক দেশীয় স্পঞ্জ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রায় অর্দ্ধসের তুর্কস্পঞ্জ এক শত ছাপান্ন টাকা চারি আনা (১৫৬।০ আনা) মূল্যে বিক্রয় হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্পঞ্জ উলের মত বলিয়া উহাকে মেষ-লোম জাতীয় স্পঞ্জ বলা হয়। মেষের লোমের পশমের ন্যায় ইহা অত্যন্ত কোমল ও মনোরম,

অথচ ইহার মূল্যও অতিরিক্ত নহে। এই জাতীয় স্পঞ্জ বেশ বিন্যাস করিবার টেবিলে রক্ষিত হইয়া থাকে। তুরস্ক দেশীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্পঞ্জ অপেক্ষা ইহার ব্যবহার অধিক,—কারণ ইহার মূল্য সুলভ। অতঃপর ভেলভেট ও পীত জাতীয় স্পঞ্জ এবং তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর ঘাসের স্থায় এক প্রকার স্পঞ্জ এবং অবশেষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ দস্তানাজাতীয় স্পঞ্জ। গুণানুসারেই স্পঞ্জের মূল্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে। তদনুসারেই আমরা উহার শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিলাম। ভেলভেট জাতীয় স্পঞ্জ ফ্লোরিডা উপকূলে অত্যল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উহার মূল্যও গুণানুসারে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে ঘাস ও দস্তানা জাতীয় স্পঞ্জের কথা বলিয়াছি তাহার প্রায় অর্দ্ধসের কয়েক সেণ্ট (আমেরিকা দেশীয় মুদ্রাবিশেষ) মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সেণ্টের ব্যবহার আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এবং মেক্সিকো ও আসিয়া মহাদেশের সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত আছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১০০ সেণ্টে (cent) এক ডলার (dollar) হয়। উহা রৌপ্য নির্ম্মিত। ঐ ডলারের মূল্য ২ শিলিং ২ পেন্স মাত্র। উহা আমাদের দেশের মূল্যানুসারে প্রায় তিন টাকা দুই আনা হয়। স্পঞ্জ উত্তম রূপে শুষ্ক হইলে তুলার ন্যায় হালকা হইয়া পড়ে। অর্দ্ধসের শুষ্ক স্পঞ্জ রাশিকৃত দেখায়।

স্পঞ্জের চাষ—

তুরস্ক দেশীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্পঞ্জ পৃথিবীর অপর স্থানে চাষ করিবার জন্য বহু গবেষণা চলিতেছে এবং আমেরিকার পণ্ডিতগণ উক্ত চেষ্টার ফলে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহারা তুরস্ক দেশের উপকূলবর্ত্তী সাগরগর্ভ হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীবিত স্পঞ্জ উত্তোলন করিয়া সুবৃহৎ চৌবাচ্চায় সামুদ্রিক লবনাক্ত জলপূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে "জিয়াইয়া" রাখিয়া ও সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা পূর্ণ দ্রব্য আমেরিকার উপকূলে লইয়া আসিয়া স্পঞ্জ উৎপন্নোপযোগী সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ বা রোপণ করিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছে। আমেরিকার বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তার এইচ, এফ্, মুর (Dr. H. F. Moore.) বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, স্পঞ্জের মূলোৎপাটিত হইলেও তন্মধ্যস্থিত জীবাণু ধ্বংস হয় না। তিনি মূলহীন স্পঞ্জের চাষ করিয়া বহু স্পঞ্জ উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন স্পঞ্জের মূলগুলি অতিসূক্ষ্ম এবং ক্ষণভঙ্গুর। স্পঞ্জে হস্ত স্পর্শ করিবামাত্র উহার মূলগুলি ভঙ্গ হইয়া যায়। আর স্বভাবজাত স্পঞ্জ অপেক্ষা এই প্রকার স্পঞ্জের স্থায়িত্ব অধিক। ডাক্তার মুরের স্পঞ্জ প্রস্তুত প্রক্রিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল :—দুই কিউবিক ইঞ্চি পরিমিত করিয়া মূলবিহীন জীবিত স্পঞ্জগুলি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিতে হইবে। কর্ত্তনকার্য্য সম্পন্ন হইলে উহাদের স্বাভাবিক গাত্র-চর্ম্মদ্বারা অন্ততঃ এক প্রান্ত আবৃত করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক টুকরা লম্বালম্বিভাবে এক ইঞ্চি গভীর রূপে চিরিয়া একটি তারের উপর স্থাপন পূর্ব্বক একটি অ্যালিউমিনিয়াম তার দ্বারা চির বদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। উক্ত তারটি কোনরূপ অপরিষ্কার

বা মরিচা ধরা না হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে স্পঞ্জ বৃদ্ধি হইয়া ঝুলান তারটি ঢাকিয়া যাইবে। লম্বা লম্বা তারের চারিদিক মালার আকারে গ্রন্থন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডীকৃত স্পঞ্জে চিব দিয়া নাতি সুগভীর সমুদ্রের তলদেশে ঐ তার ঝুলাইয়া দিতে হইবে। এইপ্রকার বহু দীর্ঘ তারের সঙ্গে স্পঞ্জের মালা সমুদ্রের মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। আঠার মাস এই অবস্থায় থাকিলে স্পঞ্জ পঁচিশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং উহার ভার ও তদনুরূপ বর্দ্ধিত হইবে। এইপ্রকারে যত্নপূর্ব্বক অস্বাভাবিক উপায়ে স্পঞ্জ উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিলে শতকরা ৯৫টি কর্ত্তিত স্পঞ্জ নষ্ট না হইয়া বর্দ্ধিতায়তন হইয়া থাকে। এই সকল স্পঞ্জ গোলাকার পিণ্ডবৎ অথবা কর্ত্তিত ডিম্বের ন্যায় আকার ধারণ করে। উহা কিন্তু হস্ত সংস্পর্শে নষ্ট হয় না বা উহার মূল ভাঙ্গিয়া যায় না। স্পঞ্জের মূলগুলি উহার মধ্যভাগে জন্মিয়া থাকে। এই প্রকার স্পঞ্জ মেষের উলের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং উহা বহুবৎসর স্থায়ী হয়। যতপ্রকার স্পঞ্জ দৃষ্ট হয় তাহার সকল প্রকারই এইরূপ অস্বাভাবিক উপায়ে উৎপন্ন হইতে পারে। স্পঞ্জ উত্তোলন কার্য্য সকল সময়ে এবং সকল ঋতুতে প্রচলিত রাখিয়া এই ব্যবসায় নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে। গ্রীক ডুবুরীগণ স্পঞ্জ উত্তোলন করিয়া স্পঞ্জবংশ একপ্রকার ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়া তুলিয়াছে। তজ্জন্য যুক্তরাজ্যের কংগ্রেসে এই বিষয় আলোচিত হইয়া একটি কঠোর আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। উহার মর্ম্ম এই—আর কেহ সকল ঋতুতে সমভাবে স্পঞ্জ উত্তোলন করিতে পারিবে না। উহা নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে তুলিতে হইবে। ধীবরগণ বৎসরের মধ্যে ১লা মে হইতে ১লা অক্টোবর পর্য্যন্ত স্পঞ্জ তুলিতে পারিবে না। অর্থাৎ সমুদ্রে ৩৪ হস্ত গভীর জল না থাকিলে আর তথায় কার্য্য করা চলিবে না। নব আইনের এই নিষেধবাণী প্রকৃতপক্ষে পালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য ফ্লোরিডা উপকূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজে রাজকর্ম্মচারীগণ গমনাগমন করেন। এই আইনদ্বারা কেবল যে স্পঞ্জ-বংশ রক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে। আমেরিকাবাসী যেসকল ধীবরগণ এই ব্যবসায়-লব্ধ অর্থ দ্বারা জীবনাতিবাহিত করিয়া থাকে তাহারাও রক্ষা পাইয়াছে। কারণ স্পঞ্জ ধ্বংস হইয়া গেলে তাহাদের বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। ফ্লোরিডা দ্বীপে গ্রীক ধীবরগণ অত্যধিক পরিমাণে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, তথাকার গ্রীক পল্লীগুলি দর্শন করিলে মনে হয় ইহা গ্রীসদেশের একটি অন্তর্ভুক্ত স্থান। তাহাদের চালচলন, পোষাকপরিচ্ছদ, ভাষা এবং 'টারপান' প্রবর্ত্তিত গ্রীক গৃহাদি গ্রীকদেশের ন্যায়। ডুবুরীগণের নৌকাখানি পর্য্যন্ত গ্রীসদেশ হইতে আনীত, গ্রীকগণের জাতীয় অবনতি সাধিত হইলেও তাহারা আজ পর্য্যন্ত জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা, পোষাকপরিচ্ছদ ত্যাগ করে নাই। ইহা তাহাদের বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

শ্রীগণপতি রায়।

ভাগ্য-চক্র।

(ইংরাজী হইতে)

১

নোটের তাড়া মাটীর উপর পড়িয়া ছিল! জন ধীরে ধীরে পা দিয়া চাপিয়া ধরিল। চারিধারে চাহিয়া ধীরে ধীরে তাড়াটি পকেটে ফেলিয়া সে চলিয়া গেল। তখন সন্ধ্যা। ব্যাঙ্কের ছুটি হইয়া গিয়াছে। বরাবর চলিয়া আসিয়া একটি আলোর ধারে ভাঁজ খুলিয়া জন দেখে দশ টাকা করিয়া দশখানি নোটে—একশত টাকা!

মৃদু হাসিয়া সেগুলি ওয়েষ্ট কোটের পকেটে রাখিয়া জন দ্রুতপদে চলিল।

১৮নং বাড়ীর সম্মুখে সে থামিল। অপর বাড়ীগুলা হইতে এবাড়ীর গঠনে কোন পার্থক্য ছিল না। কেবল তার সম্মুখে একটি লাল আলো জ্বলিতেছিল!

সিঁড়ি বাহিয়া উপরে গিয়া জন দরজায় ঘা দিল। দ্বার খুলিল!

টেবিলে প্রেমারা খেলা চলিতেছিল। বাজির পর বাজি! কাহারো মুখে উৎসাহের চিহ্ন কাহারো বা গভীর হতাশা।

একশ টাকা হারিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জন বাহিরে চলিয়া আসিল!

পথ ধরিয়া একেবারে সে ব্যাঙ্কের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। এইটিই তার গৃহে ফিরিবার পথ! তার মনটা খুবই বিষণ্ণ ছিল! একেবারে একশ' টাকাই হারিয়াছে! তাইত! হাজার হোক, অধর্ম্মের টাকা কিনা! থাকিবার নয়!

ব্যাঙ্কের সম্মুখে, সে চাহিয়া দেখে, অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া এক প্রৌঢ়া নারী! তার মুখখানিতে যেন কে বিষাদের কালি টানিয়া দিয়াছে! নারীটি যেন কিছুর সন্ধানে ব্যস্ত।

জন কহিল—"আপনি এসময়ে কি খুঁজিতেছেন! কিছু হারাইয়াছেন নাকি?"

নারী কহিল—"হঁা মশায় আমার লোক চেক ভাঙ্গাইতে আসিয়া নোট হারাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়াছে। আমি এখন জানিতে পারিয়া সন্ধানে ছুটিয়া আসিয়াছি।"

জন চারিধার চাহিয়া দেখিল। নিকটে কেহ ছিল না। সে কহিল, "কত টাকার নোট?"

"একশ টাকা! ওঃ, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! যদি কেহ পাইয়া থাকে সে কি আর মিলিবে?" তবু চারিধারে খুঁজিতেছি যদি পাই!"

"বৃথা চেষ্টা—আমি পাইয়াছিলাম"—

"আপনি? আঃ দিন্ দিন্—ধন্যবাদ আপনাকে! আমি পুরস্কার দিব। কই সে নোটগুলি?"

"নাই!"

"নাই? সে কি? কোথা গেল?"

"হারিয়াছি!"

"হারিয়াছেন? বলেন কি মশায়? কেমন করিয়া হারিলেন?"

"ক্ষমা করিবেন, আমাদের জীবনে হারজিৎ আছেই—কেবলি ঢেউয়ে উঠা নামা। কাল কি হয় আজ তা কে বলিতে পারে?

"ওসব কথা থাক্ মশায়! দিন্ সে নোটগুলি,নইলে আমি এখনি পুলিস ডাকিব।"

"কোন লাভ নাই তাতে! তবে শুনুন"—

"বলুন, কি বলতে চান—কোন সাফাই শুনিব না!"

"দেখুন আমি একজন ভদ্রলোক—কিছু সঙ্গতি যে নাই এমন নহে! এ জীবনটাই জুয়াখেলা ছাড়া আর কি? একঘণ্টা পূর্ব্বে আমি প্রেমারা খেলায় মাতিয়াছিলাম। তাহাতে জিতিবার সম্ভাবনা ছিল—কিন্তু জিতিলাম না—অদৃষ্ট মন্দ! একশ টাকাই হারিয়াছি!"

"বদমায়েস, জুয়াচোর—"

নারীর পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। জনের প্রাণ সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। সে আর্দ্রকণ্ঠে কহিল "দেখুন এর জন্ত আমিও দুঃখিত। তবে ইহা নিশ্চয় যে যদি জিতিতাম তাহা হইলে আপনাকেও তার অংশ দিতাম! কি করিব সবই আমার অদৃষ্ট! আর কারো হাতে সে নোট পড়িলে সে সংবাদও আপনার মিলিত না! এখন বলুন আমি কি করিতে পারি! যদি আপনার সাহায্য করিতে পারি তাহাতে আমি প্রস্তুত।"

দুঃখে নারীর হৃদয় জলিয়া উঠিয়াছিল! সে কহিল "সাহায্য করিবে তুমি! চোর কোথাকার—"

"যা ইচ্ছা হয় বলুন—প্রেমারা খেলার নেশা আমি ছাড়িতে পারি না—ভাগ্য পরীক্ষার এমন যন্ত্র আর নাই। আমার যদি শক্তি থাকিত তবে আবার খেলিয়া বাজি জিতিয়া আসিতাম।"

"তার অর্থ?"

"প্রেমারায় কখনো জিত কখনো হার। এ মুহূর্ত্তে হার পরমুহূর্ত্তে জিৎ। একনিমেষে নিশ্চয়! আপনার কাছে কি দশটা টাকাও নাই—তা যদি দিতে পারেন ত একবার চেষ্টা দেখিতে পারি।"

"দশ টাকা কাড়িয়া লইতেও তোমার লজ্জা নাই!"

"দেখুন, আমি জুয়াচোর নহি। আপনি আমাকে দশটাকা ধার দিন—এক ঘণ্টার জন্ত—আপনি এই খানেই প্রতীক্ষা করুন এখনি আপনার সব টাকা জিতিয়া আনিতেছি। এবার নিশ্চয় জিতিব!

"তুমি ফিরিয়া আসিবে?"

"নিশ্চয়। ভদ্রলোকের এক কথা।"

নারী পকেটে হাত দিয়া একখানি নোট দিয়া বলিল "এই আমার সম্বল।"

জন নোট লইয়া ১৮ নং বাড়ীর উদ্দেশে ছুটিল!

এক, দুই, তিন,—দশ বাজি খেলা চলিল! প্রতি বাজিতেই জিৎ! জন আট শত টাকা জিতিয়াছে। সকলে তার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "সাবাস, জন সাবাস।" জন উঠিয়া পড়িল। এই পড়তার মুখে সরিয়া পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ—কি জানি যদি আবার হার হয়!

২

নারীটি তখনো প্রতীক্ষা করিতেছিল। জন আসিয়া কহিল "এই নিন্ টাকা। জিতিয়া আনিয়াছি।" "জিতিয়াছেন! আঃ!"

নারী হাত পাতিল। জন কহিল "না, না, রাস্তার ধারে গণিবেন না চলুন একটু আড়ালে যাই।"

একটা গাছের তলায় গিয়া নোট গণিয়া নারী দেখিল আট শত টাকা। জন কহিল "আপনাকে কষ্ট দিবার জন্য ক্ষমা করিবেন। এ টাকা সবই আপনার—"

"আমার সব? সে কি?" বলিয়া নারী স্তম্ভিত ভাবে জনের মুখের দিকে চাহিল। জন কহিল "হাঁ, এ সবই আপনার। আপনার টাকাতেই ত জিতিয়াছি। টাকা ত আপনার—আমি উপলক্ষ মাত্র। হারিলে আপনারই যাইত!" "ও! মশায় ধন্যবাদ! শতসহস্র ধন্যবাদ আপনাকে! এত ভদ্রলোক আপনি! আমার রূঢ়তা ক্ষমা করিবেন। দশ টাকায় আটশ টাকা জিৎ! আশ্চর্য্য!"

"হাঁ, এইটুকুই খেলার আমোদ! রাজা ফকির হচ্ছে, ফকির রাজা হচ্ছে! এ'কেই বলে ভাগ্যচক্র।"

নারী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল "দশ টাকায় আটশ টাকা! অ্যাঁ দশ টাকায় আটশ টাকা! তবে এই নিন টাকা। আবার খেলুন। যা' মিলিবে তার মধ্যে হাজার টাকা আমার বাকী আপনার—"

"আবার খেলিব? হানি কি? বেশ, দিন্।" জন আটশ টাকার নোট পকেটে ফেলিয়া ছুট দিল। নারী আসিয়া আলোর ধারে দাঁড়াইল।

সময় আর কাটিতে চাহে না। প্রতি-মুহূর্ত্তেই অধীরতা বাড়িতেছিল। এখনো কেন আসিতেছে না! কত টাকা এবার পাওয়া যাইবে। দশ টাকায় যদি আটশত পাওয়া যায়, তবে আটশত টাকায়—অসংখ্য! আজিকার সন্ধ্যাটুকু কি সুন্দর! এত লাভ?

সহসা একটি বালক আসিয়া কহিল, "এইযে ১০৩ নম্বর আলো! আমি মিষ্টার জনের নিকট হইতে আসিতেছি আপনি কি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন!" "হাঁ, কি খপর?"

'চিঠি আছে!'

"কৈ? দাও শীঘ্র!" "এই নিন্!"

ব্যগ্র কৌতূহলে নারী খাম ছিঁড়িয়া ফেলিল; চিঠিখানি আলোর ধারে আনিয়া ধরিল,—স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে, "বাজি হারিয়াছি!"

শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

বিবিধ।

বীজাণু ও পরিপাক।

কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' (Daily Telegraph) পত্রে সার রে ল্যাঙ্কেষ্টার সাহেব (Sir Ray Lankester) আমাদের দেহে পরিপাক ক্রিয়ার উপর বীজাণুর ফলাফল সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

মনুষ্যদেহে এবং অন্যান্য যাবতীয় জীব ও উদ্ভিদ-দেহে নানাজাতীয় অসংখ্য বীজাণুর অবস্থিতি আবিষ্কৃত হওয়া অবধি বিজ্ঞানবিদগণের মনে ধারণা হইয়াছে যে মনুষ্যদেহ বিশেষতঃ তাহার খাদ্য প্রবাহী নালীটি অসংখ্যপ্রকার বীজাণুতে পরিপূর্ণ; এক জাতীয় বীজাণু অপর জাতীয় বীজাণুর সহিত আত্মরক্ষার জন্য অবিরাম

যুদ্ধে প্রবৃত্ত; এবং অবশেষে এই কঠোর সংগ্রামের ফলে ও মনুষ্যজাতিবিশেষের খাদ্য ও অবস্থাদির প্রভাবে এক এক জাতির দেহে বীজাণুর শ্রেণীবিশেষ অধিক পুষ্টি লাভ করে এবং কতকগুলি বীজাণু একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকারে জাতিবিশেষের খাদ্য ও অভ্যাসবিশেষের ফলে কতকগুলি বীজাণু এক এক জাতিতে অধিক প্রাধান্য লাভ করিতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় এই প্রাকৃতিক বিধানে হস্তক্ষেপ করা বিপজ্জনক না হইলেও নিতান্ত দুঃসাহসের কর্ম্ম সন্দেহ নাই। এইরূপ প্রাকৃতিক বিধানে হস্তক্ষেপ করিলে কোন বিষাক্ত বীজাণু অতিরিক্ত প্রাধান্য লাভ করিয়া দেহের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। মেচনিকফ্‌, মনুষ্যের অন্ত্রস্থলে ল্যাক্‌টিক্‌ বীজাণু প্রবিষ্ট করাইয়া বিষাক্ত বীজাণু নষ্ট করিবার প্রস্তাব করিয়া অসমসাহসের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহার মতে দেহস্থিত বীজাণুকে স্বাভাবিক ক্রিয়া ও গতি দিয়া আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে—উপরন্তু তাহাদিগকে খর্ব্ব ও নষ্ট করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। তিনি বলেন,—প্রথম অবস্থায় এই সকল বিষাক্ত বীজাণুকে আয়ত্তগত করিতে যাইয়া আমাদিগের অনেক ভুল ত্রুটি হওয়া সম্ভব সত্য, কিন্তু তাহা ভিন্ন কোন উন্নতিই কখনও লাভ করা সম্ভব হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে বলিয়াও আশা করা যায় না। ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া ব্যাধি ও মৃত্যুর অন্যায় পীড়ন নীরবে সহ্য করা মূর্খতা মাত্র।

অনেক কাল হইতে আমাদের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে, পচনক্রিয়াশীল বীজাণুগুলি আমাদের পাকস্থলীর খাদ্যকে চূর্ণ করিয়া পরিপাকে সহায়তা করে এবং সেই মিশ্রিত দ্রব খাদ্য হইতে দেহ তাহার আবশ্যকীয় রক্ত শোষণে সক্ষম হয়। উদ্ভিদের দেহ পুষ্টির ক্রিয়া লক্ষ্য করিলে এই মতই অনেকটা সত্য বলিয়া মনে হয়। ভূপৃষ্ঠে যে সকল মৃতদেহ এবং জীব ও উদ্ভিদের মলাদি পতিত হয়, তাহাই উদ্ভিদমাত্রেরই খাদ্য হইলেও বীজাণুবিশেষ তাহার উপর পতিত হইয়া রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা যতক্ষণ না তাহাকে নানাপ্রকার রাসায়নিক বস্তুতে বিশ্লেষিত করে, ততক্ষণ কোন উদ্ভিদই তাহা খাদ্যস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। ঐ সকল মৃতদেহ ও মলাদি রাসায়নিক রসে পরিণত হইলে পর তবে উদ্ভিদ তাহা আকর্ষণ করিয়া আপন দেহমধ্যে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। সেইরূপ আমাদিগের দেহমধ্যেও খাদ্যকে বিশ্লেষিত করিয়া পরিপাকের উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত পচনকারী বীজাণুর অবস্থিতি আবশ্যক ইহা আশ্চর্য্য নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌ (Schottelius) নবজাত কুক্কুটশাবক লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ডিম্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র বৈজ্ঞানিক উপায়দ্বারা তিনি তাহাদিগের খাদ্য ও বাসগৃহ বীজাণু বর্জ্জিত করিয়া দেখিলেন যে শাবকগুলি অল্পকালের মধ্যেই দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যুমুখে পড়িল। তাহাদের খাদ্যমধ্যে কতকগুলি বীজাণু মিশ্রিত করিয়া দিলেই তাহারা এমে সুস্থ ও সবল হইয়া পক্ষীতে পরিণত হইতে পারিত। ইহা হইতে তিনি মীমাংসা করিলেন যে, অন্ত্রমধ্যে বীজাণু ব্যতিরেকে প্রাণীগণের জীবন ধারণ একেবারে অসম্ভব।

দুই বৎসর পূর্ব্বে একজন রুষ বিজ্ঞানবিদ মাছির ডিম লইয়া এক অভিনব পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কতকগুলি ডিম লইয়া পরিচ্ছন্ন করিয়া এক বিশুদ্ধ মাংসখণ্ডের উপরে রাখিয়া দিলেন। ডিমগুলি ফুটিয়া সেই মাংস খাইতে লাগিল। অপর কতকগুলি বীজাণুপূর্ণ অবস্থায় থাকিয়া বিষাক্ত বীজাণুপূর্ণ পচা মাংস খাইতে লাগিল। আশ্চর্য্য এই যে শেষোক্তগুলিই পূর্ব্বদল অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন যে পচামাংসের বীজাণুগুলিই শেষোক্ত মাছিগুলির পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করে বলিয়াই তাহারা অত শীঘ্র পুষ্ট হইয়া উঠিল। এই স্থির করিয়া তিনি কতকগুলি পরিচ্ছন্ন মাছি লইয়া তাহাদিগকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পচান মাংস খাওয়াইতে লাগিলেন। তাহাতে তাহারা বেশ সবল ও পুষ্ট হইতে লাগিল। ইহা হইতে তিনি স্থির করিলেন যে পচনশীল বীজাণুগুলি এই সকল মাছির পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া মাংস পরিপাকে সহায়তা করে।

কিন্তু ইহার পরে অনেক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে অনেক জীবদেহ বীজাণুর সাহায্য ব্যতিরেকেও বেশ পুষ্টিলাভ করা সম্ভব। কিন্তু মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবের পক্ষে নহে। ম্যাডাম মেচনিকফ্ পরীক্ষাদ্বারা দেখিয়াছেন যে বেঙাচিদের পক্ষে বীজাণুব্যতিরেকে পুষ্টিলাভ করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং দেখা যাইতেছে মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবের পরিপাকক্রিয়ার সাহায্যের জন্য বীজাণুর অবস্থিতি আবশ্যক; অন্ততঃ পক্ষে যত দিন না তাহারা পূর্ণযৌবন লাভ করে ততদিন তাহাদের পরিপাক শক্তি এরূপ প্রবল হয় না যে তাহারা বীজাণুর সাহায্য অগ্রাহ্য করিতে পারে।

আমাদের খাদ্যপ্রবাহী নালীতে বীজাণু ক্রিয়া যথার্থরূপে স্থির করিবার জন্য অধ্যাপক মেচনিকফ্ বহুদিন হইতে এইরূপ একটি জীবের অনুসন্ধান করিতেছিলেন যাহার পাকযন্ত্রের মধ্যে বীজাণু একবারেই নাই বা তাহার সংখ্যা অতি সামান্য মাত্র। মনুষ্যের পাকযন্ত্রের মধ্যে যে অসংখ্যপ্রকার বীজাণু আছে তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে এখনও আমাদিগের বহুযুগের অনুসন্ধান ও পরীক্ষা আবশ্যক। তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃত রাসায়নিক ক্রিয়া কি এবং পরস্পরের প্রতি সমবেত ফল কিরূপ তাহা আমরা এক্ষণে কিছুই জানি না। আমাদের দেহের বৃহৎ অন্ত্র বা কোলন্ (Colon) অসংখ্য বীজাণুর আশ্রয়স্থল। এস্থলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, এই স্থলে আমাদের পরিপাকের কোনই ক্রিয়া হয় না বা যাহা কিছু হয় তাহা অতি সামান্য মাত্র। আন্ত্রিক বীজাণুবিরহিত জীবের অন্বেষণ করিতে যাইয়া মেচনিকফ্ স্থির করিলেন যে, যে সকল জীবের কোলন্ অতি ক্ষুদ্র বা একবারেই নাই তাহাদিগের মধ্যেই এরূপ জাতি মেলা সম্ভব। সুতরাং বাদুড়ের প্রতিই তাঁহার প্রথম দৃষ্টি পড়িল। প্রাচ্য দেশের ফলভুক্ বাদুড় লইয়া তিনি তাহাদের দেহস্থিত বীজাণুর প্রকৃতি ও ক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। সম্প্রতি তাঁহার পরীক্ষাফল প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল বাদুড়ের ক্ষুদ্র অথাৎ উর্দ্ধতন অন্ত্রস্থলে কোন প্রকার বীজাণু নাই বলিলেই হয়। যা দুই একটি আছে তাহাও তাহাদিগের খাদ্য হইতে দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদিগের মধ্যে যেমন স্বাভাবিকভাবে অসংখ্য বীজাণু পরিবার বৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ করিতেছে তাহাদিগের মধ্যে সেরূপ কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না।

মেচ্নিকফের এই পরীক্ষায় কতকগুলি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেবল মাত্র আমিষ ভোজনের উপর রাখিয়া তিনি দেখিলেন যে, বাদুর গুলির অন্ত্রস্থলে নানা প্রকার বীজাণুর উৎপত্তি হইয়া সেগুলি মরিয়া গেল। কিন্তু কেবলমাত্র কদলী ভোজন করাইয়া দেখা গেল যে তাহাদিগের অন্ত্রস্থলে দুই একটি সামান্য বীজাণু ব্যতীত আর কিছুই নাই। কিন্তু খরগোষ ও বানরকে বাদুড়ের ন্যায় নিরামিষ খাওয়াইয়া দেখা গেল যে তাহাদের অন্ত্রস্থলে অসংখ্য বীজাণুর উৎপত্তি হইল। অধ্যাপক মেচ্নিকফ্ বলেন যে, বাদুড় যে বীজাণুমুক্ত থাকে তাহার কারণ তাহার অন্ত্রস্থল এরূপ ভাবে গঠিত এবং কোলনের এক প্রকার অভাব বলিয়াই তথায় জীর্ণ বস্তু বহুক্ষণ থাকিয়া পচিতে পায় না। অন্যান্য জন্তুর দেহ কিন্তু সেরূপে গঠিত নহে। এক্ষণে সেই বৃহৎ অন্ত্রস্থলের আবশ্যকতা ও উপকারিতা স্থির করা প্রয়োজন। এই স্থলে আমাদের জীর্ণ খাদ্য জমিয়া পচিতে থাকে এবং অসংখ্য বীজাণু তাহাতে পুষ্টি লাভ করিয়া নানা প্রকার বিষাক্ত রস সৃষ্টি করে। এই সকল বিষাক্ত রস আমাদের দেহ মধ্যে শোষিত হয় এবং ইহার ফলে জীবন বিপন্ন হইলে এই অন্ত্র স্থলকে কাটিয়া বাহির করিয়া লইলে রোগীর ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হয় না। সুতরাং এই ভাগের উপকারিতা যে কি তাহা স্থির করিয়া বলা অতি কঠিন। বহুদিনের অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে কোন দিন এ সত্য আবিষ্কার হওয়া অসম্ভব নহে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে কোন কোন জন্তুর পরিণত বয়সে উর্দ্ধতন অন্ত্রস্থল এবং বীজাণুর সাহায্য ব্যতিরেকেও পরিপাক ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানে আর বেশী কিছু বলিতে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাহসিকতা হইয়া পড়ে।

ধূলিকণা।

রোগের বীজাণু সম্বন্ধে নানা প্রকার নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়া অবধি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই সকল বীজাণু কি প্রকারে ব্যাপ্তি লাভ করে তাহারই অনুসন্ধান করিতেছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে তাঁহারা দেখিয়াছেন যে ধূলিকণা না থাকিলে অধিকাংশ রোগের বীজাণুই মনুষ্যদেহে প্রবেশ করিতে পারিত না। আমাদের চতুর্দ্দিকের বায়ুমণ্ডল ধূলিকণায় পরিপূর্ণ তাহা আমরা সকলেই জানি। এই ধূলিকণাগুলি রোগের বীজাণুর বাহন স্বরূপ। এই বাহনের আশ্রয়ে রোগের বীজাণুগুলি রোগীর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুস্থ ব্যক্তির মুখ ও বুকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকেও আক্রমণ করে। পথের গাড়ী, সাধারণ বাড়ী বা সহরের পথের ধূলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়,—রোগের বীজাণুতে একেবারে পরিপূর্ণ। এই কারণেই আজকাল পরিচ্ছন্নতার একটা চেষ্টা পৃথিবীময় আরম্ভ হইয়াছে। পুরাতন ধরণের ঝাড়ন আজকাল বৈজ্ঞানিগণ অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করেন। কারণ তাহা দ্বারা ধূলি যথার্থ পক্ষে নষ্ট বা দূরীভূত হয় না। গৃহ পরিচ্ছন্ন করিবার পূর্ব্বে চতুর্দ্দিকে অল্প করিয়া জলসিঞ্চন আবশ্যক এবং বহিষ্কৃত আবর্জ্জনাগুলি দগ্ধ করা আবশ্যক। একটি ভিজা কাপড়ে করিয়া গৃহ মুছিয়া লইয়া পরে কাপড় খানিকে উত্তপ্ত জলে সিদ্ধ করাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। ধূলিকণা যে আমাদের কিরূপ পরম মিত্র ও চরম শত্রু তাহা আমরা অধ্যাপক সার্ভিসের (G. P. Serviss) প্রবন্ধ পাঠে বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। ধূলিকণা না থাকিলে পৃথিবীর অবস্থা যে কি হইত অধ্যাপক সার্ভিস তাঁহার প্রবন্ধে তাহার একটি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। কিন্তু এই আশ্চর্য্য ফলোৎপাদক ধূলিকণাগুলি মনুষ্য চক্ষের অদৃশ্য হইয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার কতক অংশ শুষ্ক ধূলিকণা এবং অবশিষ্টাংশ বায়ুস্রোতে ভাসমান তরল অবস্থাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ধূলি একেবারে না থাকিলে যে পৃথিবী থাকিত না তাহা নহে, তবে সে পৃথিবী বর্ত্তমান পৃথিবী হইতে এত আশ্চর্য্য স্বতন্ত্র প্রকৃতির হইত যে আমাদের পক্ষে তাহা নূতন লোক।

প্রায় সকল লোকেই মনে করেন যে কেবল সূর্য্য হইতেই আমরা দিবালোক পাইয়া থাকি। কিন্তু ইহা আমাদের এক মহাভ্রম। বায়ুমণ্ডল হইতে শুষ্ক ও তরল উভয় প্রকার ধূলিকণা দূর করিয়া দিলে এ পৃথিবী এক নূতন মায়ালোক বলিয়া বোধ হইবে। দিবা ও রাত্রিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার আর কোন শক্তিই থাকিবে না। যে স্থলে সূর্য্যকিরণ অবাধে আসিয়া পড়িবে সেই স্থানটিই আলোকিত হইয়া উঠিবে, কিন্তু যেখানে কোনও প্রকার অস্বচ্ছ বস্তু সম্মুখে পড়িবে তাহার অন্তরালে গভীর অন্ধকার আসিয়া অধিকার করিয়া বসিবে। প্রত্যেক বাটীর পশ্চাতে, প্রত্যেক প্রাচীরের অন্তরালে, উদ্যানের কুঞ্জপথে ছায়া শীতল তরুতলে, চিরাভ্যস্ত গৃহ মধ্যে অন্ধকারের আবরণ এতই নিবিড় হইয়া উঠিবে যে তাহা ভেদ করিয়া দেখিতে পাওয়া চর্ম্ম চক্ষে সম্ভব হইবে না। দিবাভাগ রাত্রেরই ন্যায় বোধ হইবে, প্রভেদের মধ্যে মাঝে মাঝে সূর্য্যালোক রশ্মি দেখিতে পাওয়া যাইবে মাত্র।

ইহার কারণ, বিশুদ্ধ ধূলিমুক্ত বায়ু আলোক রশ্মিকে ব্যাপ্ত করিতে অক্ষম। বৈজ্ঞানিক উপায়ে একটি কাচের গৃহকে ধূলিশূন্য করিয়া তাহার মধ্যের একটি ছিদ্র দ্বারা সূর্য্য রশ্মি প্রবেশ করিতে দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, যে স্থানটিতে আলোক রশ্মি গিয়া পড়িয়াছে ঠিক সেই স্থানটিই আলোকিত মাত্র; অন্যাংশ অন্ধকার। গৃহ মধ্যের চতুর্দ্দিক আমাদের কল্পনাতীত নিবিড় তিমিরে মগ্ন। কিন্তু গৃহ মধ্যে ধূলি থাকিলে ছিদ্র দ্বারা আলোক রশ্মি প্রবেশ করিবামাত্র গৃহটি আলোকিত হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমান গৃহে আলোক রশ্মির রেখাপথে চক্ষু না রাখিলে সেটিকে পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া সম্ভব নহে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল হইতে ধূলা বহির্গত করিয়া লইলে এই আলোক প্লাবিত পৃথিবীরও উক্তরূপ দশা হইবে। নীল আকাশ পর্য্যন্ত আর দেখা যাইবে না। ঊর্দ্ধে কেবল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক চন্দ্রাতপ—তাহার চতুর্দ্দিকেই নক্ষত্র এবং সকলগুলিই সূর্য্যের অতি নিকটে বলিয়া মনে হইবে। ক্ষুদ্র ধূলিকণার চতুর্দ্দিকে জলীয় বাষ্প জমিয়া সংলগ্ন হওয়াতেই বর্ত্তমান মেঘমালার সৃষ্টি। ফলতঃ তখন বৃষ্টি বলিয়াও আর কোন ব্যাপার থাকিবে না। বস্তুত আলোক বিকীর্ণ করিবার উপযুক্ত ধূলিকণা না থাকিলে পৃথিবীটা একটা খুব মজার স্থান হইত—চতুর্দ্দিক কালো কালো দাগে ও রেখায় পরিপূর্ণ—এই সকল দাগের মধ্যস্থিত কোন বস্তুই দেখা যাইত না। সুন্দর পুষ্পোদ্যানের মধ্যে যদি কোন অট্টালিকা থাকিত, তাহা হইলে তাহার পশ্চাতের আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইত না। পথে মোটর গাড়ী ঘোড়া মানুষ—সব ছুটিতেছে কিন্তু তাহার কিছুই দেখা যাইতেছে না। হত্যা করিয়া পলাইলে আর ধরিবার কোন সম্ভাবনাই থাকিত না। গৃহ মধ্যে বাতায়ন পথে যেদিকে আলোক প্রবেশ করে সেই স্থানটি ভিন্ন অপর কোন দিকে আলোক বিকীর্ণ হইতে পারিত না—অবশিষ্ট সমস্ত গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য আয়না রাখিলে গৃহটি আলোকিত হইতে পারিত।

ধূলিকণা না থাকিলে যে কেবল আলোকেরই অভাব হইত তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ধূলিকণা না থাকিলে মেঘ বা বৃষ্টি—কোন মতেই সম্ভব হইত না—তবে পৃথিবী শিশির সিক্ত হইত বটে। সূর্য্য এখনকারই ন্যায় সলিল আকর্ষণ করিয়া বাষ্পে পরিণত করিত এবং বায়ু সেই বাষ্প লইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিত। সুতরাং কঠিন পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়া সেই বাষ্প জমিয়া যাইত এবং সমস্ত বস্তুই সর্ব্বদা বাষ্পসিক্ত থাকিত। এই কারণে উদ্ভিদগণকে এখনকার ন্যায় বৃষ্টি হইতে রসগ্রহণ না করিয়া বায়ুস্থিত বাষ্প হইতেই রসগ্রহণ করিতে হইত। ছত্রের আর কোন আবশ্যকই থাকিত না, তবে চিরন্তন সিক্তবায় হইতে দেহ রক্ষার কোন নূতন উপায় আবিষ্কার করা আবশ্যক হইত। কিন্তু বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি মোটেই থাকিত না এবং বায়ুপ্রবাহের বিধানও অনেক পরিবর্ত্তিত হইত সন্দেহ নাই।

মেঘের ন্যায় কুয়াসাও থাকিত না। সেটা তত দুঃখের কারণ না হইলেও মেঘের অভাবটা বড়ই কষ্টপ্রদ হইত সন্দেহ নাই। বারমাস প্রখর সূর্য্যকিরণের উত্তাপ মধ্যে বাস করা বিশেষ প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইত বলিয়া মনে হয় না।

সম্ভবতঃ ধূলিকণা না থাকিলে বায়ুস্থিত তাড়িতেরও অস্তিত্ব থাকিত না। সেটাও আমাদের পক্ষে বিশেষ লোভনীয় বা কল্যাণকর নহে। বায়ুস্থিত তাড়িতের উপকারিতা আমরা দিন দিন বুঝিতেছি, ধূলির হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমরা তাহাকে হারাইতে চাহি না। ধূলি আমাদের শত্রু হইলেও সে যে আমাদের কতদূর মিত্র তাহা ভাবিয়া দেখিলে আর তাহাকে হারাইতে ইচ্ছা হয় না,—ধূলার শরীর লইয়া ধূলার মাঝে থাকাই শ্রেয় বলিয়া মনে হয়।

শ্রীসুখময়।

পোলোনিয়মের অদ্ভুত শক্তি।

এতদিন রেডিয়মই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বোধ্য বস্তু বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহা আবিষ্কৃত হওয়া অবধি অমিশ্র পদার্থ (element) সম্বন্ধে পুরাতন প্রচলিত মত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদেরা মনে করিতেন অমিশ্র পদার্থের পরমাণুগুলি এক একটি স্বতন্ত্র ও অবিভাজ্য কিন্তু রেডিয়াম আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেখা গেল যে ইহার পরমাণুগুলি অবিরামই অপর একটি স্বতন্ত্র অমিশ্র পদার্থে পরিণত হইবার চেষ্টা করিতেছে। রেডিয়মের স্বয়ম্ভূ অচিন্তনীয় শক্তিতে এবং ক্ষয়হীনতায় আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত ধ্বংসকারী শক্তি দেখিয়াও আমরা চমৎকৃত হইয়াছি।

কিন্তু এক্ষণে আবার নবাবিষ্কৃত পোলোনিয়মের নিকট রেডিয়মও পরাজিত হইয়াছে। অসাধারণ

বৈজ্ঞানিক প্রতিভাবতী ম্যাডাম কুরি (Mme Curie) পূর্ব্বে রেডিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ও লিপম্যান (C. Lipman) সাহেব বিশুদ্ধ পোলোনিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন। পোলোনিয়ম রেডিয়ম অপেক্ষা চারিশত গুণ অধিক শক্তিশালী এবং কতকগুলি নূতন গুণে ভূষিত। পোলোনিয়ম রেডিয়ম হইতেই উদ্ভূত। রেডিয়মের পরমাণুগুলি পোলোনিয়মে পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র।

ম্যাডাম কুরি পোলোনিয়মের শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আশা এখনও প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু অন্যান্ত বিজ্ঞানবিদগণ পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই নবাবিষ্কৃত পদার্থটি রেডিয়ম অপেক্ষা বহু সহস্রগুণ অধিক শক্তিশালী।

তবে এ স্থলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, উভয়ের মধ্যে এই শক্তির পার্থক্য প্রথমাবস্থাতেই থাকিবে, পরে দিন দিন উভয়েরই শক্তি হ্রাস পাইবে। আড়াই হাজার বৎসরে একটা নির্দ্দিষ্ট রেডিয়ম পিণ্ড তাহার অর্দ্ধেক শক্তি হারাইয়া ফেলিবে, কিন্তু পোলোনিয়ম ১৪০ দিনের মধ্যেই অর্দ্ধেক শক্তি হারাইয়া ফেলে। সুতরাং পোলোনিয়মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রথমাবস্থাতেই থাকে, স্থায়িত্ব হিসাবে রেডিয়মই অধিক শক্তিশালী।

কিন্তু তাহা হইলেও প্রথমাবস্থায় এই শক্তির পার্থক্যের অর্থ যে কি তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা না বুঝাইলে উপলব্ধি করা যায় না। নখের এক টিপ রেডিয়মের মধ্যে দশলক্ষ 'কেলরি' (Calories) অর্থাৎ উত্তাপের বীজ বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ১৫ গ্রেণ রেডিয়মে পঁচিশ কোটি গ্যালন জল দুই ডিগ্রি উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। সেই পরিমাণ পোলোনিয়ম লইলে দশ সহস্র কোটি গ্যালন জল সেই পরিমাণে উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে।

গণনার দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে এক আউন্স রেডিয়ম দুই কোটি পঁচাত্তর হাজার মণ একটা বস্তুকে পৃথিবী হইতে এক মাইল উর্দ্ধে তুলিবার শক্তি ধারণ করে, সুতরাং সেই হিসাবে পোলোনিয়মের শক্তি যে কি বিরাট তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই শক্তি ব্যবহারে লাগাইলে জাহাজ, রেলগাড়ী ইত্যাদি কিরূপ অনায়াস বেগে যাইতে পারে তাহা কল্পনা করিয়া দেখুন। বাইশ আউন্স পোলোনিয়মের যে চালক শক্তি ছয় কোটি সাতাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মণ কয়লার সে শক্তি নাই।

কি অপূর্ব্ব ব্যাপার। পৃথিবীর একটা কোন স্থানে সাড়ে সাতাশ মণ পোলোনিয়ম রাখিতে পারিলেই পৃথিবীর সমস্ত কল কারখানা, রেল, ট্রাম, মোটর, জাহাজ, আলোক, টেলিগ্রাম ইত্যাদি আপনিই চলিতে পারিবে।

এক আউন্স রেডিয়ম থাকিলেই আঠার লক্ষ আট চল্লিশ হাজার পাউণ্ডকে মিনিটে এক ফুট লইয়া যাইবার শক্তিসম্পন্ন একটী মোটর গাড়ী ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল গতিতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারে। এক আউন্স পোলোনিয়ম থাকিলে এইরূপ একটি গাড়ী পৃথিবীকে চারিশত বার প্রদক্ষিণ করিতে পারে। কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া পড়ে।

কিন্তু এই দুই বস্তুকে এইরূপে মনুষ্যের ব্যবহারে নিযুক্ত করিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। তবে ইহার মধ্যেই তাহাদের যথাসাধ্য ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। নিউ-ইয়র্ক কলেজে একটি রেডিয়মের ঘড়ি আজ তিন বৎসর ব্যবহৃত হইতেছে। ঘড়িটি বিনা দমে ত্রিশ সহস্র বৎসর চলিবে। ভবিষ্যতে আরও কত অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হইবে তাহা এক্ষণে আমাদের কল্পনাতীত। শ্রীভঃ

জুলু বাদ্যযন্ত্র।

রেভারেণ্ড ফাদার ফ্রান্স মের নামক একজন ধর্ম্মযাজক জুলু দেশীয় বাদ্যযন্ত্রাদির বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, জুলুগণের সঙ্গীতপ্রিয়তা এবং যথেষ্ট বাদ্যযন্ত্র থাকা সত্বেও দিন দিন সেখানে গ্রামোফোন ও বিলাতী স্বল্পমূল্যের বাদ্যযন্ত্রের এত আমদানী হইতেছে যে শীঘ্রই জুলুদিগের আবহমান প্রচলিত যন্ত্রাদি লোপ পাইবে। আমরা এই সংখ্যায় ভারতীতে জুলু-

দেশীয় প্রচলিত ছয়টী বাদ্যযন্ত্র ও তাহাদের বাদকের প্রতিকৃতি দিলাম। ধর্ম্মযাজক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে জুলুবাদ্য শুনিতে আদৌ মধুর নহে এবং যন্ত্রোথিত শব্দও অত্যন্ত ক্ষীণ। শ্রীবঃ



বন্দী।

১৩

যখন চোখ চাহিলাম তখন রাত্রি। নেপারের খাটে আমি শুইয়াছিলাম। আলো জ্বলিতেছিল—প্রকাণ্ড ঘর, বিছানার সারি! তখন বুঝিলাম, আমি হাঁসপাতালে আসিয়াছি। চারিধার নিস্তব্ধ।

কিছুক্ষণের জন্য আমার জ্ঞান ছিল না! আমি স্পষ্ট জাগিয়া আছি, কিন্তু চেতনা নাই, কিছু মনে পড়ে না! কিছুকাল পূর্ব্বে কারাগৃহের মধ্যে এই হাঁসপাতাল আমার নিকট কি ঘৃণার স্থান ছিল, কিন্তু আজ আর আমি সে লোক নহি! অপরিচ্ছন্ন মোটা চাদর, রোগের একটা তীব্র বিকট গন্ধ—চারিধারে যেন কি এক অশান্তি, কি এক বিভীষিকা! চক্ষু মুদিলাম—নিদ্রার শীতলস্পর্শে সকল জ্বালা জুড়াইল!

সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উজ্জ্বল দিবালোক! বাহির হইতে কোলাহল শুনা যাইতেছিল! জানালার ধারে আমার বিছানা ছিল। বিছানায় বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি, কয়েদীর দল কাজে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, তাহাদেরি পায়ের বেড়ির ঝনঝন শব্দে চারিধার মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে! শুনিলাম ভোরে একজনের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে—উৎসুক দর্শকের দল তাহা দেখিয়া আসিয়া গগনভেদী আনন্দধ্বনি তুলিতেছিল, এত কোলাহল তাহারি! নির্লজ্জ পাষণ্ড লোকগুলা, এই নিষ্ঠুর মৃত্যু দেখিয়া আনন্দে উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের মাথায় পড়িবার জন্য কি আকাশের বজ্র নাই!

১৪

আমি সুস্থ হইয়া উঠিলাম, এমনি আমার দুর্ভাগ্য। কাজেই হাঁসপাতাল ছাড়িতে হইল। আবার সেই বন্দীশালার রুদ্ধ কক্ষ, আমারি দীর্ঘনিশ্বাসে উত্তপ্ত বায়ু সে কক্ষ ভরিয়া রাখিবে, যাহার চারিদিকে নিরাশা, ও বিষাদের নিরানন্দ বিমর্ষভাব—সেই কক্ষে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তগুলা কাটিবে!

কোন অসুখ নাই! এই তরুণ, সুস্থ, সবল দেহ, রোগের গ্রাসেই বা তাহা জীর্ণ হইবে কেন? শিরার মধ্য দিয়া তপ্তরক্ত বহিয়া চলিয়াছে, এমন বুদ্ধি, এমন স্বাস্থ্য তবু মনটা কি ভীষণ কীটের দংশনে পলে পলে জ্বলিয়া যাইতেছে!

হাঁসপাতাল হইতে চলিয়া আসিবার পর, একটা কথা কেবলি মনে পড়িতেছে—সেখান হইতে পলায়নের সুযোগ ছিল; সে সুযোগ, মূর্খ আমি, কেন ছাড়িলাম! কি সহজ সুন্দর সুযোগটুকু! রাত্রের নিস্তব্ধ অন্ধকারে চুপি চুপি বাহির হইয়া পড়িলেই—কি সে মুক্ত স্বাধীনতার উদার রাজ্য! মাথার মধ্যে শিরাগুলা উত্তেজনায় দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল!

চারিধারটা চোখের সম্মুখে নীল গোলার মত ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল!

যদি পলাইতাম! আহা, তাহাতে ইহা-দেরই বা কি এমন ক্ষতি হইত! আপিলে যদি মুক্তিলাভ করি! কিন্তু সম্ভাবনাই বা কোথায়? সাক্ষীর দল হলপ্ করিয়া সকল কথা বলিয়াছে—শুনানির চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আপিলে কি লাভ হইবে? কিছু না! হায়, সকলি বৃথা! নাই, কোন আশা নাই! ফাঁসির রজ্জুই আমার শেষ নিশ্বাসবায়ুটুকু ছিনাইয়া লইবে। আপিলের ক্ষীণ আশাসূত্রটুকু—কোথায় তার বল!

যদি আজ ক্ষমা মিলিয়া যায়! ক্ষমা কিন্তু কেন মিলিবে! এই যে অসংখ্য হতভাগ্যের দল—মোট বহিয়া, বেড়ি টানিয়া জেলে দিনযাপন করিতেছে—কদর্য্য অন্নে ক্ষুধার শান্তি হই-তেছে, কোথায় তাহাদের স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু; কোথাই বা তাহাদের গৃহ! তাহারা এই যাতনা সমানে ভোগ করিবে আর আমি ক্ষমা লাভ করিয়া সানন্দে গৃহে ফিরিব! কেন, কি কারণে তাহারা আমাকে ক্ষমা করিবে? অন্যায় দৃষ্টান্তে দেশের লোকের বিপদ যে আসন্ন হইয়া উঠিবে! ক্ষমা নহে, ফাঁসি—ফাঁসিই আমার মুক্তির একমাত্র উপায়!

১৫

যদি পলাইতাম! সবুজ মাঠের উপর দিয়া, ছোট পাহাড় ঘুরিয়া বননদী অতিক্রম করিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিতাম! কাহারো মুখের দিকে চাহিব না, কাহারো দ্বারে আশ্রয় মাগিব না, এক মুষ্টি অন্নও না—গাছের ফলে ক্ষুধা, নদীর জলে তৃষ্ণা দূর—পাখীর গানে বিশ্রাম, তরুর তলে নিদ্রা—লোকালয়ে না—যদি কেহ সন্দেহ করে! আবার যদি ধরে! ছুটিব না—তাহাতে সন্দেহ জন্মাইতে পারে! মৃদু শান্ত পাদক্ষেপে কত গ্রামনগর অতিক্রম করিয়া যাইব, তাহার সংখ্যা নাই! একটী ছদ্মবেশ সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে! গ্রামের প্রান্তে একটী নিবিড় ঝোপ আছে—সেখানে গিয়া প্রথমে বিশ্রাম লইব! সেই ঝোপে কত শ্যাম সন্ধ্যা, কত শান্ত প্রভাত কাটাইয়া দিয়াছি! শৈশবে-লুকোচুরি খেলা, সঙ্গীর দলে কি সে আন-ন্দের হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত! আঃ কি সে সুখের দিন! আজ তাহারি একটি মুহূর্ত্ত, যদি নিমেষের জন্য কুড়াইয়া পাই!

আবার যখন আঁধার নামিবে, তখন পথে বাহির হইব! ভিক্সেনে যাইব! না! পথে নদী আছে, পার হইবার সময় বিঘ্ন ঘটিতে পারে! আর্পাজনে যাইব! বোধ হয়, সেণ্ট জার্মেণে যাইলেই ভালো হয়—সেখান হইতে হেভার, হেভার হইতে ইংলণ্ড! কিন্তু সে সময় যদি পুলিশে ধরিয়া ফেলে, সে যখন ছাড়পত্র চাহিবে! তবেই ত বিপদ!

হা রে হতভাগ্য, স্বপ্নভ্রান্ত জীব, এই তিনফুট মোটা দেয়ালটা অতিক্রম করাই যে দুঃসাধ্য ব্যাপার, অসম্ভব! তাহা হইলে, আর উপায় নাই,—মৃত্যু, মৃত্যুই আমার প্রিয়সুহৃদ!

সোণার শৈশবের কথা মনে পড়িতেছে! যখন বালক ছিলাম, তখন কতবার এই জেলের ধারে ফাঁসি দেখিতে আসিয়াছি, কি সে ভিড়! আর আজ!

১৬

দীপের আলো ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে!

দিনের আলো এখনি ফুটিবে! গির্জ্জার বড় ঘড়িতে ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

প্রহরীটী ধীরে ধীরে আসিয়া মাথার টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিল। নম্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আমার কিছু খাইতে সাধ আছে কি না! আশ্চর্য্য! এমন বিনয়-নম্র ব্যবহার!

আমার সারা অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! তবে কি আজই—?

১৭

হাঁ, আজ! কারাধ্যক্ষ স্বয়ং আসিয়াছিল! আমি কি চাহি, না চাহি, তাহারি সন্ধান করিতেছিল! আরো সে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, কোন ভৃত্য বা প্রহরী আমার মর্য্যাদার হানি করে নাই ত! আমার স্বাস্থ্য কেমন, রাত্রে নিদ্রা হইয়াছিল কি না! আমাকে 'স্যার' বলিয়া সে সম্বোধন করিল! কোন সন্দেহ নাই আজ - আজই তবে সেই স্মরণীয় দিন! যে দিনের কথা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলি নাই!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আমেরিকাপ্রবাসীর পত্র।

ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়
১০ই এপ্রিল।

শ্রীচরণেষু

কলেজে এইটি আমার শেষ term, তাই বিশেষ ব্যস্ত আছি। এখান হইতে যাহা আহরণ করিবার তাহা দুই তিন মাসের মধ্যেই শেষ করিতে হইবে, তাই কাজের এত ভিড়। এই জননীস্বরূপা শিক্ষাভূমি (আমার প্রকৃত alma mater) এখানকার পরমবন্ধু-প্রতিম শিক্ষকগণ ও অন্যান্য বন্ধুগণকে ছাড়িয়া যাইতে মন সরিতেছে না। তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের স্নেহাতিশয্যে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছেন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটু আভাষ দিলে ব্যস্ততার কারণ বুঝিতে পারিবেন। আমরা এখানে তিনজন ভারতীয় ছাত্র—একজন পাঞ্জাবী দুইজন বাঙ্গালী—একটি ছোট বাড়ী লইয়া আছি। আমাদের দুইটি শুইবার, একটি বসিবার, একটি খাইবার তদ্ভিন্ন একটি পাকের ঘর। ঘরের আসবাব পত্র সামান্য,—কিছু নাই বলিলেই হয়, (ইংরাজীতে যাহাকে severe and simple বলে) কিন্তু ভারতবাসী আমাদের পক্ষে তাহা যথেষ্ট। এদেশবাসীর পক্ষে অবশ্য ইহা যথেষ্ট নহে এবং ইঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ আরও জটিল। সাধারণতঃ এদেশে দৈন্য ও অভাবের কোন স্থান বা সমাদর নাই—তাহা দুর্ব্বলতা ও পাপের প্রশ্রয়জনক বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু এদেশেও এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ভারতের আড়ম্বরহীন সরলজীবনের আদর্শকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদের বন্ধুবান্ধবের অভাব নাই। আমরাও কাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে লজ্জিত হই না। এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমরা মায়ের স্নেহ ও ভাইয়ের সমপ্রাণতা পাইয়া প্রবাসজীবনের



ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

অভাব ভুলিয়া যাই। প্রাতবাশ শেষ করিয়া ৮টার সময় ক্লাসে যাই। প্রাতে সাধারণতঃ ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ক্লাসের পড়া হয়। বৈকাল ১টা হইতে ৫টা যন্ত্রাগারে (Laboratory) কাজ করিতে হয়। দুপুরের খাদ্য কাগজে বাঁধিয়া লইয়া যাই, যন্ত্রাগারে কাজ করিতে করিতে আহার করি। ৫৷৷০টায় বাসায় আসিয়া রাঁধিতে হয়। আমাদের খাওয়া যথাসম্ভব সহজ সুলভ, অথচ পুষ্টিকর। মাথামুণ্ড কি যে পাক করি তা' আর বলিয়া কাজ নাই—জটিল রকম পাক করা পোষায়ও না। রুটি, মাখন, ওট, গম, মুড়ি খই জাতীয় জিনিষ, পনীর, দুধ, ফল, তরকারী ডাল, কথনও ডিম ও কচিৎ মাংস ইহাই আমাদের প্রধান খাদ্য। খাওয়ার পর বাসন কোসন মাজিয়া ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিয়া ৭টার সময় বিদ্যালয়ের পাঠাগারে (Library) ক্লাসের পড়া প্রস্তুত করিতে চলিয়া যাই।

এখানে সব বিশ্ববিদ্যালয়েই ছেলে মেয়েদের একত্র বসিয়া পড়িবার প্রকাণ্ড হল থাকে। ৩।৪ শত জন বসিবার স্থান। কলেজের পাঠাগার এ দেশের একটি অতি সুন্দর অনুষ্ঠান। পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান ভাষার সাহিত্য, বিজ্ঞান কলা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারের সাহিত্য প্রায় দুই সহস্র রকমের রাখা হয় এবং যাবতীয় দেশের ও ভাষার নানাবিধ পুস্তক সমূহ দ্বারা পূর্ণ থাকে। পুস্তক সংখ্যা ১৷৷০লক্ষ হইতে ৭।৮ লক্ষ পর্য্যন্ত। যে কোন নূতন পুস্তক বাহির হয় তাহা শীঘ্রই পাঠাগারে পাওয়া যায়। পুস্তকই বা কত, আর বিষয়ই বা কত! যেন জ্ঞানের সমুদ্র—ইচ্ছা হয় ইহারই মধ্যে ডুবিয়া থাকি। এদেশের প্রত্যেক পাঠাগার যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের কলেজের পাঠাগারগুলি কীটদষ্ট হইয়া বালুহীন অন্ধকার ঘরে দপ্তরী ও বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ানের সুষুপ্তি আনয়ন করে। ক্লাসে পড়াইবার সময় অধ্যাপক নানা পুস্তকের নাম বলিয়া দেন তাহা পাঠাগারে আসিয়া পড়িতে হয়। এইরূপে প্রতিদিন ৪।৫খানা বহির সহিত পরিচয় করিতে হয় ও তাহার মধ্যস্থিত কোন কোন বিষয়ে ক্লাসে আলোচনা হয়। আর একটি বেশ সুন্দর নিয়ম,—যে সব বইয়ের দাম বেশী বা খুব দরকারি এবং অনেক লোকে পড়ে লাইব্রেরিতে তাহা ১০।১২ খানা করিয়া রাখা হয়। প্রত্যেকে তাহা এক ঘণ্টার জন্য নাম লিখিয়া আনেন ও একঘণ্টা পরে তাহা ফিরাইয়া দিতে হয়। আমাদের গরীব দেশে গরীব ছাত্রগণের পক্ষে এই নিয়মটি পরম উপকারজনক।

এদেশের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু সাধারণতঃ এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা (under-graduate work) জ্ঞানের প্রসারতার দিকেই বেশী দৃষ্টি। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয় এবং আনুষঙ্গিক শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলি বিষয় নির্ব্বাচনে ছাত্রগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাঁহাদের অভিরুচি, শিক্ষা ও ক্ষমতা অনুসারে তাঁহারা সেগুলি বাছিয়া লন। এখানকার শিক্ষার আদর্শ,—ছাত্রগণের নিকট জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার অল্পে অল্পে উন্মুক্ত করা ও সেই জ্ঞান আহরণ করিবার শক্তিসামর্থ্য তাহাদের মধ্যে এমন ভাবে জাগাইয়া তোলা

যেন ছাত্র অবশেষে নিজেই রত্নরাশি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারেন। প্রথম দুই বৎসর আনুষঙ্গিক বিষয় ও নির্ব্বাচিত বিষয়ের প্রাথমিক ভাগ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। তৃতীয় বৎসর হইতে বিশেষ শিক্ষা আরম্ভ হয়। প্রথম উপাধির জন্য চারি বৎসর লাগে। গভীরতর শিক্ষা (research work) গ্রাজুয়েট হইবার পর আরম্ভ হয়। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন বিচিত্র আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ। ইহার দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত। আমাদের দেশের ন্যায় নিয়ম-কঠোর, নীরস ও প্রাণহীন নহে। এখানে কচিৎ কেহ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় বিফলমনোরথ হন। এমন কি শতকরা ৯০ জন শিক্ষা শেষ করিয়া বাহির হন। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পরীক্ষাকেন্দ্র নহে তাহা শিক্ষার স্থান—মানুষ তৈয়ারির স্থান। এদেশের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা (President) ও সকল বিখ্যাত লোকই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণতঃ পরীক্ষা দ্বারা আমাদের মূর্খতার পরিমাপেই ব্যস্ত থাকেন এদেশে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্য্য। সাধারণতঃ একই স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত ও জ্ঞানের নানা বিভাগ,—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান (ফলিত ও বিশুদ্ধ) রাজনীতি, সমাজনীতি, কলা, সঙ্গীত ইত্যাদি নানা বিষয়ের এক একটি কলেজ লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত। দুই হইতে তিন শত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। অধ্যাপক সংখ্যা দুই শত হইতে চারি শত। ছাত্র দেড় হাজার হইতে পাঁচ হাজার। এত ছাত্র ডিগ্রী পান্ ইহাতে মনে হইতে পারে যে এখানে পরীক্ষা ব্যাপারটি একেবারেই নাই। কিন্তু পরীক্ষা যথেষ্ট আছে; তাহা কেবল সেকেলে ধরণের ইংরাজী আদর্শে চালিত নহে। ক্লাসের প্রতিদিনের পড়া নির্দ্দিষ্ট থাকে ও তাহা না পড়িলে উপায় নাই। কারণ ক্লাসে আমাদের দেশের যে শ্রেণীর ছাত্রের মত সকলকে প্রশ্ন করা হয় এবং প্রতি মাসে একটি কখনও বা দুইটি বেশী পরীক্ষা হয়। ক্লাসের পড়া ও পরীক্ষার ফল ভাল না হইলে ঐ বিষয়টি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করা হয়। শেষ পরীক্ষায় তেমন কড়াকড়ি নাই, সারা বৎসরের ফলের উপর ছাত্রের উন্নতি অধোগতি নির্ভর করে। মোটের উপর পড়ায় অমনোযোগী হইলে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। যিনি সর্ব্বদা অধ্যাপনা করেন তিনিই পরীক্ষক,—ছাত্রের গুণাগুণ বা উপযুক্ততার বিচার তিনিই করেন। কারণ তিনিই প্রকৃত বিচার করিতে সমর্থ। এই নিয়মটি জার্ম্মেণি হইতে এদেশে প্রচলিত হইয়াছে ও ইহার সাফল্য যথেষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ইহার তুলনায় আমাদের দেশের আধুনিক পরীক্ষপ্রণালী বুদ্ধিহীন ও অর্থশূন্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীর সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পূর্ব্বে গুরু শিষ্যকে বিদ্যাদানে নিজে নানা গুণে গড়িয়া তুলিতেন ও উপযুক্ত বিবেচনা করিলে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। আমাদের বিকৃত রুচির আর এক পরিচয়,—সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ধঅনুকরণে সংস্কৃত উপাধি ও পরিক্ষিত পরীক্ষাগুলি!

এখানে অধ্যাপক ও ছাত্রগণের মধ্যে

কোন ব্যবধান নাই। কারণ অধ্যাপকগণ আমাদের নিত্য সঙ্গী ও প্রিয় বন্ধু। অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত আমরা যেমন প্রাণ খুলিয়া সর্ব্ববিষয়ে আলাপ করি অধ্যাপকের সহিতও তেমনি করি। মতদ্বৈধ হইলে ক্লাসে যথেষ্ট তর্ক আলোচনা হয় ও বাহিরে রহস্যালাপেরও অভাব নাই। ইঁহারা কেবল অধ্যাপক নহেন একপ্রকার সমপাঠী ও বন্ধু।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়ে ও ছেলে একত্র পড়েন; একই ক্লাস, একই অধ্যাপক। কেবল ছাত্রদিগের ও ছাত্রীদিগের ডর্ম্মিটরি অর্থাৎ শয়নাগার স্বতন্ত্র। আমেরিকা রমণীর দেশ,—তাঁহাদেরই একাধিপত্য; সেজন্য কি শিক্ষা কি চরিত্রগুণ কি কার্য্যতৎপরতা অনেক বিষয়েই ইঁহারা পুরুষকে পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। পড়ায় ক্লাসে ইঁহাদের



ছাত্রদিগের ডর্ম্মিটরি। ছাত্রীদিগের ডর্ম্মিটরিও এইরূপ।

সহিত আঁটিয়া উঠা সহজ নহে। সাধারণতঃ ইঁহারা সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, কলা, শিক্ষাশাস্ত্র, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয় বেশী অধ্যয়ন করেন। এক এঞ্জিনিয়ারীং বিভাগ ছাড়া জ্ঞানের সমস্ত বিভাগই ইঁহারা আক্রমণ করিয়াছেন ও সে জন্য পুরুষকে তাঁহারা সদাই সজাগ ও ব্যতিব্যস্ত রাখেন। হতভাগ্য আমরা কোনও প্রকারে ক্লাসে টিকিয়া থাকি, কারণ প্রতিদ্বন্দিতায় ইঁহাদেরই জিত!

এখানে দুই টার্ম্মে কলেজের একবৎসর। অগষ্ট হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রথম টার্ম্ম ও জানুয়ারি হইতে মে দ্বিতীয় টার্ম্ম। প্রথম টার্ম্মে ভর্ত্তি হওয়াই প্রশস্ত। তবে দ্বিতীয় টার্ম্মেও ভর্ত্তি হওয়া যায়। গ্রীষ্মের ছুটী তিন মাস ও বড়দিনের একমাস আন্দাজ।

কলেজের সময় বড় ছুটী থাকে না। এক নিশ্বাসে একটি টার্ম্ম শেষ করিতে হয়। * *

আমেরিকায় প্রথম শ্রেণীর প্রায় ২০টী বড় বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহা ছাড়া ছোট ত অসংখ্য আছে। আমাদের এখান হইতে অনতিদূরে ক্যালিফোর্নিয়া ষ্টেটের বিশ্ব-বিদ্যালয়। এদেশের অন্য কোন ষ্টেটে এত নিকটে ও এই রকম উচ্চ অঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় নাই। ইহা আমাদের প্রাচ্য দেশবাসীর পক্ষে একটী পরম সুবিধা। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে এখন ১০।১১ জন ভারতীয় ছাত্র আছেন। ঘটনা-চক্রে তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালী—না, একজন উড়িষ্যাবাসী আছেন, তাঁহাকেও আমরা এক প্রকার বাঙ্গালী করিয়া লইয়াছি। একজন পাঞ্জাবী, একজন মান্দ্রাজী ও ৩।৪ জন বাঙ্গালীছাত্র শিক্ষা শেষ করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। সব বাঙ্গালী হওয়ায় আমাদের অবস্থা একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে! এখানে একটা কথা বলিয়া যাই। আমরা আজকাল বড় একটু বেশী রকম বাঙ্গালী বাঙ্গালী করি। সকলেই যদি নিজ গ্রাম ও প্রদেশকে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করেন তবে ভারতবর্ষ—আমাদের সকলের ভারতবর্ষ কোথায় দাঁড়াইবে? ভারতবর্ষই যে আমাদের সকলের পিতা ও সকলের উপরে,—এই ভারতবর্ষকেই সর্ব্বাগ্রে আমাদের প্রাণের অভ্যন্তরে আপন বলিয়া অনুভব করিতে হইবে। যেমন পিতাকে অনুভব করিতে চেষ্টার আবশ্যক হয় না ভারতবর্ষকে তেমনই করিয়া আপন বলিয়া অনুভব করিতে হইবে। অনেকে বলেন যে আপনার পরিবারকে ও সেইরূপ আপনার গ্রামকে ও প্রদেশকে আপন বলিয়া অনুভব না করিতে পারিলে সমগ্র দেশকে আপন করা যায় না। কিন্তু এইখানে আমরা একটা ভুল করি। যাহা আমাকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে স্নেহ ও আনন্দদ্বারা অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে—তাহার প্রতি আমার হৃদয় স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়া আছে—সেখানে বেশী করিয়া তাহাকে আপন করিতে গেলে অনেক সময় সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়ে, ভাব বিস্তৃত না হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। আমার মাতৃভাব মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ মাত্র নহে,—ইহা বিশ্বজনীন মাতৃভাবের একটী অভিব্যক্তি মাত্র বলিয়া বিশাল গভীর ও প্রাণস্পর্শী। সেইরূপ আমার গ্রাম, আমার প্রদেশ সমগ্র ভারতের একটী অংশ মাত্র। এবং সেইজন্যই তাহা আমার প্রিয় ও আপনার—তাহার ভিন্ন বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি না। ভারতবর্ষ আমাদের সকলের পিতা এবং আমরা প্রথমে ভারত-বাসী ও পরে বাঙ্গালী। প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা আমাদের স্বদেশভক্তিকে এখনও ম্লান করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অনেকেই প্রাদেশিকতাকেই স্বদেশভক্তি বলিয়া মনে করিতেছেন। সেদিন 'প্রবাসী'তে দেখিলাম বিহার হইতে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বিহারের কোন কোন বিদ্যালয়ে বাঙ্গালীর প্রবেশ কষ্টসাধ্য বলিয়া অনেক আক্ষেপ ও দুঃখ করিয়া এক "বাঙ্গালী বিদ্যালয়" খুলিতে চান—যেখানে কেবলই বাঙ্গালীর প্রবেশাধিকার থাকিবে! বিশেষতঃ তিনি এমন বলিতেও লজ্জিত হন নাই যে

তাহা জাতীয় বিদ্যালয় হইলে চলিবে না। পড়িয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে আমরা পীড়িত হইয়াছি। এই প্রকার একদেশদর্শী চিন্তা-প্রণালীর কারণ কি? লেখকের মঙ্গল উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিদ্যালয়টী 'জাতীয়' হইবে না কেন ও যে সঙ্কীর্ণতার জন্য তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন সেই সঙ্কীর্ণতাই ইহার ভিত্তি হইবে কেন? বোধ করি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বিকৃত প্রাণহীন শিক্ষাই ইহার এক প্রধান কারণ। আমাদের জাতীয় শিক্ষাপরিষদ প্রকৃত শিক্ষার সূত্রপাত করিয়াছেন কিন্তু তাহা যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতেছে না, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। ২য় কারণ, আমরা এখনও প্রাদেশিকতার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারি নাই। এই প্রাদেশিকতা কালক্রমে আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া গ্রাম্যতা ও পারিবারিকতাতে পরিণত হইয়া আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ হইয়াছে। একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এবং সামান্য পরিমাণে মুসলমান যুগে সমগ্র ভারতের জীবনে একটা যোগ ছিল। তখন কেবলমাত্র জ্ঞান ও শিক্ষার আদানপ্রদান নহে সমগ্র ভারতে একটা সামাজিক সম্বন্ধও অল্পাধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। সে যুগের সংস্কৃতসাহিত্যে তাহার অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু ক্রমে নানা প্রদেশের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নিজগ্রাম ও পারিবারিক স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই আমাদের জাতীয় জীবন লয় পাইল। বিস্তৃতি ও বিকাশই জীবনের লক্ষণ, সঙ্কীর্ণতা পতন ও মৃত্যুর অগ্রদূত।

আমরা যখন ভারতের নানা প্রদেশের ছাত্রবৃন্দ একত্র থাকি এবং আমাদের সামান্য ক্ষুদ্রতা ও দ্বন্দকোলাহলের মধ্য দিয়া ভারতের সেই বিশাল ও সুগভীর একত্ব যখন উপলব্ধি করি তখন আনন্দ ও উৎসাহে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। বিদেশে আমার ইহাই এক প্রধান শিক্ষা ও এমন আনন্দ ও বল আর কিছুতে পাই নাই। এখন মনে হয় ভারতের যে কোন স্থানে যাইয়া জীবন কাটাইতে পারি, কারণ তাহারা সকলেই যে আমার আপনার জন।

আমেরিকাস্থিত ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ অধিকাংশই নিজে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এদেশের সমস্ত খরচপত্র নির্ব্বাহ করেন। কেহ কেহ এজন্য দৈনিক ৩,৪ ঘণ্টাকাল অবসর সময়ে কাজ করেন কেহ কেহ ছুটীর সময় বা কিছুদিন কলেজে না যাইয়া বাহিরে পয়সা উপার্জ্জন করিয়া পরে কলেজে ভর্ত্তি হন। যদিও ইহাতে কিছু বেশী সময় লাগে তবুও ইহাই প্রশস্ত বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহার পর সমস্ত সময় কলেজের কাজে নিযুক্ত থাকা যায় ও বিদ্যালয়ে এত শিখিবার জিনিষ আছে যে যত সময় দেওয়া যায় ততই ভাল। কাজ ও পড়া এক সঙ্গে করিলে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হয় কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে শেষ করিবার আশায় অনেকে ইহাই পছন্দ করেন। কেহ বাড়ী হইতে কিছু কিছু অর্থ পান কিন্তু তাহাতে খরচ কুলায় না, সুতরাং সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে কাজ করিতেই হয়। এই স্বাবলম্বনে একটা সবল আনন্দ আছে ও কোন দুঃখ কষ্টই আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না। ইহাতে অবশ্য আমাদের গৌরব করিবার

কিছু নাই। দেশের নানারূপ দুঃখ দৈন্যের তুলনায় আমরা এখানে ভালই আছি। আমাদের অভাব দৈন্য দেশের তুলনায় সামান্য। কেহ কেহ এই সামান্য ব্যাপারকেই মহা স্বার্থত্যাগ ও দেশের পক্ষে গৌরবজনক বলিয়া বৃথা বাড়াইয়া থাকেন। কিন্তু এই অযথা প্রশংসায় আমাদের অপকারেরই সম্ভাবনা। ইহা আমাদের আত্ম-মর্য্যাদাকে আঘাত করে এবং সামান্য কার্য্যকে বড় করিয়া আমাদের কর্ত্তব্যের গুরুত্ববোধকে আমরা ক্ষুণ্ণ করি। * * *

আমাদের দেশের জনসাধারণের ব্যবহারের বিষয়ে আরও দুই একটী কথা বলিবার আছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের দোষ দুর্ব্বলতা বিষয়ক নিন্দায় আমাদের শিক্ষিত সমাজের একদল মুখরিত হইয়া আছেন। আবার আর এক দলের বিশ্বাস যাহা কিছু পুরাতন তাহাই ভাল নিখুঁত ও তাহা হইতে আর কিছু মহত্তর হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত দলের মধ্যে অনেকেই অসহিষ্ণু সমাজসংস্কারক, যুগযুগান্তরের আবর্জ্জনা তাঁহারা একদিনেই পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে চান, এবং তাহা অসম্ভব দেখিয়া স্বয় আদর্শ বজায় রাখিবার জন্য সমাজ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কালক্রমে এতদূরে চলিয়া যান যে সমাজ হৃদয়ের স্পন্দন তাঁহাদিগকে আর স্পর্শ করে না। ফলে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি। তাঁহারা যে উচ্চ উদ্দেশ্য ও মঙ্গল ইচ্ছা লইয়া কার্য্যারম্ভ করেন পরিশেষে তাহাই অজানিত ভাবে সঙ্কীর্ণতায় পরিণত হয়। সমাজের কাজ করিবার জন্য যে সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, ও অনন্তপ্রেমের আবশ্যক তাহার অভাব বশতঃই এরূপ হইয়া থাকে। অপরদিকে শিক্ষিত সমাজের গোঁড়া দল, চিন্তা শূন্য, উদ্যমহীন ও মৃতপ্রায়। সমাজের সহস্র দোষ দুর্ব্বলতা দেখিয়াও বুঝিয়াও তাহার নিবারণের কোন চেষ্টা নাই; মূকের মত তাহাই সহ্য করিয়া পিষ্ট হইতেছেন। ইহারাও সমাজ শরীরের ব্যাধি স্বরূপ। কেবল সমাজের দোষ দেখিয়া ও কীর্ত্তন করিয়া বিশেষ লাভ নাই। সেবা ও শিক্ষা বিস্তার দ্বারা সমাজের এই দুর্ব্বলতাগুলিকে দূর করিতে হইবে। ভারতের প্রত্যেক নরনারী লইয়া আমাদের যে সমাজ গঠিত তাহা শত দোষ দুর্ব্বলতা সত্বেও আমার প্রাণেরপ্রাণ, আমি তাহারই একজন, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন আমার কোন অস্তিত্ব নাই। মাতার যে ব্যাধি তাহা নিবারণের জন্য কায়মন প্রাণে আমাদের তাঁহার সেবা করিতে হইবে। মাটীর মত সহিষ্ণু হইয়া যেন চিরকাল তাঁহারই সেবা করিতে পারি। সেবাই আমাদের ধর্ম্ম ও সেবাই আমাদের কর্ম্ম। * * *

নিম্নশ্রেণীর উপর অত্যাচার পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই হইয়া আসিয়াছে ও এখনও যথেষ্ট হইতেছে। অথচ জনসাধারণ পৃথিবী ভরিয়াই আজ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে ও তাহাদের ন্যায্য অধিকারের দাবী করিতেছে। এই অত্যাচার প্রসঙ্গে আমাদের অনেক লজ্জাকর কথার সহিত প্রশংসার কথাও কিছু আছে। পাশ্চাত্য দেশের প্রবলজাতি সমূহের সংঘর্ষে আসিয়া অনেক দুর্ব্বল জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে এমন কি এমন অনেক জাতি ইহা পৌরুষকর বলিয়া মনে

করেন! আমাদের ইতিহাস এ কলঙ্কে মলিন নহে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতে সমস্ত অধিবাসী লইয়া একটী বিশাল জাতি গঠনের চেষ্টা করিয়াছেন ও সে চেষ্টা আজও চলিতেছে। ভারতের ইতিহাস গভীরভাবে আলোচনা করিলে আমরা এই চেষ্টার অনেক প্রমাণ পাই। কার্য্যতঃ তাহা লাভ না করিতে পারিলেও তাঁহারা আমাদের এমন এক মহান আদর্শ দিয়াছেন যে সেই ভিত্তির উপরই আমাদের এই বিচিত্র মহাজাতি সংগঠন সম্ভব। সর্ব্বভূতে ঈশ্বরত্ব বেদান্তের এই শিক্ষা আমাদের বিচিত্র জাতি সমূহকে এক করিবার এক প্রধান উপায় বলিয়া মনে হয়, এবং ইহাই আমাদের জাতীয়তার এক প্রধান অবলম্বন হইবে। এই জটিল জাতি সমস্যার সমাধানই আমাদের গৌরবের জিনিস হইবে এবং বিধাতা ইহারই জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। আমরা অতীত ভারতের গৌরব করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন এবং যাহা সম্পূর্ণ না হওয়ায় আমাদের পতনের কারণ হইয়াছে সেই কার্য্যকে সম্পূর্ণ করিয়া আমাদের দেশ ও জাতিকে আরও গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত করিতে পারিলেই আমরা সেই গৌরব করিবার অধিকারী। * *

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন ইতিহাস অতি বিচিত্র। একটী রমণীর (Mrs. Stanford) মহদন্তঃকরণ ও উদারতায় ইহা আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অর্থশালী বিদ্যালয়। পরীক্ষা হইয়া গেলে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠাইবার ইচ্ছা রহিল। এই মে মাসের পর হইতে নিয়ম মত লিখিতে পারিব বলিয়া ভরসা করি।

ইতি, সেবক শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

সদানন্দের বৈরাগ্য।

বাপমায়ে বড় সাধ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল সদানন্দ। পাড়ার দুষ্টলোকেরা তাঁহাদের স্নেহের ভুলটাকে সংশোধন করিয়া তাহাকে নিরানন্দ বলিত।

সে ছেলেবেলা হইতেই কেমন অনাবশ্যক গম্ভীর। শৈশবে সে 'তাই তাই' করিয়া হাসে নাই। বাল্যে পাঠশালায় গিয়া চঞ্চলতা প্রকাশ করে নাই। এজন্য তাহার সহপাঠীরা তাহাকে গুরুমশায় বলিত। এখন সদানন্দ যৌবনপথের অনেকখানি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, এখন ত তাহার না হাসিবারই কথা।

সদানন্দ হাসে নাই কিন্তু তাহার যথারীতি বিবাহ হইয়াছে; এবং গুটিকত শিশুর কলকাকলিতে তাহার গৃহ মুখর হইয়া উঠিতেছে।

এইসব ব্যাপারগুলা সদানন্দের জীবনের সঙ্গে ঠিক খাপ খাইতেছিল না। প্রথম, বিবাহ ব্যাপারটাই তাহার গাম্ভীর্য্যের প্রতি নিষ্ঠুর উপহাস—বাপমায়ের দারুণ ষড়যন্ত্র। ছাদনাতলায় শালাশালীতে কান মলিয়া, বাসরঘরে বিদ্রূপ করিয়া, কথায় কথায় ঠকাইয়া সদানন্দের গাম্ভীর্য্যকে টলটলায়মান করিয়া তুলিয়াছিল।

স্ত্রীটি অপরিবর্জ্জনীয় উপদ্রব। খাও দাও থাক। তা না, তাঁহার আবার সখ কত। হাসি চাই, ঠাট্টা চাই, রসিকতা চাই। সদানন্দের প্রাণ এই এক কোথাকার-কে উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া-বসা অত্যাচারীর উৎপাতে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিল। বেচারার বারবার মনে হইত—

"স্ত্রীর চাইতে কুমীর ভালো
বলে সর্ব্ব শাস্ত্র।
কুমীর ধরলে ছাড়ে তবু,
ধরলে ছাড়ে না স্ত্রী।"

বিবাহের দুচার বছর পরেই স্ত্রীটি নূতনতর উপদ্রবের পন্থা আবিষ্কার করিল। বছরে একটি করিয়া শিশুর আমদানিতে ঘর ভরিয়া ফেলিবার উপক্রম। শুধু তাই হইলেও ত সদানন্দ বাঁচিত। শিশুগুলা হাসে! তাহারা নাচে গায়, বত্রিশ রকম মুখভঙ্গী করে, সদানন্দের ভীষণ গম্ভীর শ্মশ্রুবহুল মুখ দেখিয়া একটুও ভয় করে না, বরং তাহাদের আক্রোশ দাড়ির উপরেই অধিক। এইসব দেখিয়া শুনিয়া সদানন্দের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত।

গাঁয়ের লোকেরাও কি কম উৎপাত করে। তাহারা সদানন্দের অমন গাম্ভীর্য্যের কিছুমাত্র খাতির না করিয়া কেহ বা তাহার মাথায় চাঁটি মারিত, কেহ বা গায়ে হুঁকার জল ঢালিত, কেহবা তাহার দাড়ি ধরিয়া টানিত।

বাল্যাবধি লোকের অভদ্র উৎপাতে সদানন্দ মনে মনে ভারি বিরক্ত হইতেছিল। ক্রমে তাহার গৃহ যখন পাঁচ ছয়টি শিশুর ক্রন্দন কোলাহল আবদারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল তখন একদিন সদানন্দ "ধুত্তোর" বলিয়া গৃহ ছাড়িয়া প্রস্থান করিল।

সে গৃহ ছাড়িল, অদৃষ্ট কিন্তু তাহাকে ছাড়িল না।

সদানন্দ চায় বেশ একটি নিঃসঙ্গ নির্জ্জনে সে আপনাকে লইয়া গুম হইয়া জীবনটা কাটাইয়া দেয়। তাহার ভাগ্যবিধাতা কিন্তু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন অন্যরূপ। দূর হইতে পর্ব্বতের গুহা, গহন বন মনের মধ্যে বেশ একটা বিরাট রকমের ভাবসঞ্চার করে, কিন্তু বাস্তব জীবনে সেগুলার মধ্যে কবিত্বের অংশটা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। গুহার মধ্যে কাঁকর বা বনের মধ্যে ফলপাকড় খাইয়া ত জীবনটাকে অধিক দিন ঠেকাইয়া রাখা যায় না। ক্ষুধা জিনিষটা সদানন্দের অতবড় গাম্ভীর্য্যকে একেবারেই ভয় করিত না।

সদানন্দ এক গ্রামের সুদূর প্রান্তে একখানা কুঁড়ে বাঁধিল। আঃ সেখানেও কী জ্বালাতন! হাটের ব্যাপারী লোকগুলা তাহারই কুটীরে গিয়া তামাক খাইবার আগুন চায়, কৃষকেরা গান গাহিয়া শান্তিভঙ্গ করে, ভবঘুরে ছেলেগুলো মরিবার আর জায়গা না পাইয়া তাহারই কুটীরের চারিদিকে ঘুরপাক খায়।

আহারের সঞ্চয়ের জন্য মাঝে মাঝে গ্রামেও ঢুকিতে হয়। সেখানেও কি যত জঞ্জাল! গ্রামের কুকুরগুলা ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহাকে নাচাইয়া তুলে, ছেলেগুলা সেই সঙ্গে হাততালি দিয়া ক্ষেপাইয়া দেয়, মেয়েরা পর্য্যন্ত ঘোমটার আড়াল হইতে সন্ন্যাসী মিনসের নাকাল দেখিয়া কটাক্ষ হানিয়া মুচকি হাসে—অত বড় গাম্ভীর্য্যটাকে একটুও

গ্রাহ্য না করিয়া একেবারে নাস্তানাবুদ করিয়া দেয়।

সদানন্দের সে গ্রামে আর বাস করা চলিল না। সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক গ্রামের বাহিরে তেপান্তর মাঠে শ্মশানের মাঝে আপনার আস্তানা গাড়িল।

শ্মশানডাঙ্গায় কেহ তাহাকে বিরক্ত করিতে আসিত না। কালেভদ্রে শব-সঙ্গীরা তাহার কুটীরে আশ্রয় লইত, প্রতিদানে যাহা দিয়া যাইত সদানন্দের তাহাতেই কোনো রকমে দিন-গত পাপক্ষয় হইত।

এখানে সদানন্দ এক রকম মনের সুখেই নিশ্চিন্ত ছিল। বেচারার ভাগ্যবিধাতা কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

একদিন কয়েক জন লোক একটি শব সৎকার করিতে শ্মশানে আসিয়াছে। ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাহারা তাড়াতাড়ি শবটাকে আনিয়া সদানন্দের কুটীরের বাহিরে রাখিল এবং অভ্যর্থনার অপেক্ষা না করিয়াই সদানন্দের কুটীরের মধ্যে ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

ছোট কুটীর। তাহার মধ্যে পাঁচ ছয় জন লোক ঢুকিয়া জটলা কলরব আরম্ভ করিয়া দিল। সদানন্দের তাহা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার উপর তাহারা তামাকের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়া সদানন্দ বেচারাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। সদানন্দ আস্তে আস্তে পাশ কাটাইয়া কুটীরের দ্বারের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মুষল ধারে বৃষ্টি হইতেছে। শব বাহিরে পড়িয়া ভিজিতেছে। সদানন্দ তাহাই দেখিতেছে। হঠাৎ তাহার মনে হইল, শব যেন একটু নড়িল। দানো পাইল নাকি!

সদানন্দ ভয়ের বড় একটা তোয়াক্কা রাখিত না, রাখিলে শ্মশান আপনার বাসস্থান বলিয়া বাছিয়া লইতে পারে? সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রোমবহুল ঝাঁপালো ভ্রূর তলদেশ হইতে চক্ষু চাড়িয়া দেখিতে লাগিল বাস্তবিকই শব নড়িতেছে। যাহারা শব আনিয়াছিল তাহারা ঘরের ভিতরে আপন মনে ধূমপানে ও গল্পজল্পনায় মত্ত ছিল, আর সদানন্দ ছিল দ্বার আগুলিয়া; তাহারা বাহিরের ব্যাপার কিছুই জানিতেছিল না।

সদানন্দ যখন দেখিল যে শব স্পষ্টই নাড়িতেছে তখন সে কুটীর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। শববাহী একজন বলিল "কি ঠাকুর, কোথায় যাও।"

সদানন্দ কোনো উত্তর দিল না। শবের কাছে গিয়া মুখের ঢাকা খুলিয়া ফেলিল। শব চক্ষু মেলিয়াছে, বৃষ্টিধারা হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া পান করিতেছে। সদানন্দ শবের ম্যাচকা ধরিয়া হড় হড় করিয়া কুটীরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। শববাহীরা কোলাহল করিয়া আপত্তির স্বরে বলিল "ওকি ঠাকুর, ওটাকে আবার এর মধ্যে ভরছ কেন?"

সদানন্দ এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া শবের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল শব চেতনা লাভ করিয়া উজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। সকলে ভয়ে বিস্ময়ে অবাক আড়ষ্ট হইয়া গেল। সন্ন্যাসী বাবা সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহার পুণ্যস্পর্শে মৃত শব সঞ্জীবিত হয়, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া তাহাদের রোমাঞ্চ হইল। সকলে ভক্তিভরে মহাপুরুষের পায়ের ধূলা মাথায় লইল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল

সন্ন্যাসী মরা মানুষ বাঁচাইতে পারেন; গাঁ ভাঙিয়া রাজ্যের নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতা সদানন্দের কুটীর ঘিরিয়া ভিড় জমাইয়া তুলিল। পীড়িতের আত্মীয় স্বজন সদানন্দের চরণে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সদানন্দের খ্যাতি দাবানলের মতো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতিদিন কত দেশের বাসি মড়া, গলিত কুষ্ঠ আসিয়া তাহার দ্বারে ধন্না দিতে লাগিল। শ্মশানডাঙায় মেলা বসিল, দোকান পসার হাটে জমজমাট। কত দেশের কত লোক কত রকম মানসিক করিয়া সন্ন্যাসী বাবার চরণে আসিয়া পড়িতে লাগিল। সদানন্দের কোনো পুরুষে কেহ বৈদ্য ছিল না, অথচ বেচারাকে ঘিরিয়া দুনিয়ার রোগীর সনির্ব্বন্ধ করুণ প্রার্থনা দিবানিশি ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নাচার সদানন্দ হাতের মাথায় যাহা পায় তাহাই দেয়। সকলে ভক্তিভরে সেবন করে, মাদুলি করিয়া ধারণ করে। অনেকের রোগ বিশ্বাসের জোরেই সারিতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী বাবার খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িয়া চলিল। যাহাদের রোগ সারিত না তাহারা দ্বিগুণ আগ্রহে সদানন্দের চরণ চাপিয়া ধরিয়া বলিত "হে বাবাঠাকুর, কি পাপ দেখে আমার ওপর দয়া হল না।"

সদানন্দ বেচারা উত্যক্ত হইয়া উঠিল। সংসার ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে বলিয়া বিশ্ববিধাতা আজ সারা সংসার ডাকিয়া তাহারই কুটীরদ্বারে আনিয়া হাজির করিয়াছেন। সদানন্দ দেখিল এর চেয়ে সে নিজের গ্রামে নিজের গৃহে ঢের শান্তিতে, ঢের আরামে, ঢের শান্তিতে ছিল। তাহার বৈরাগ্যের উপর বৈরাগ্য আসিল।

একদিন সকালে সকলে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করিল—বাবা সিদ্ধপুরুষ অন্তর্ধান করিয়াছেন। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। সিদ্ধপুরুষের অন্তর্ধানে শ্মশানডাঙা ক্রমে ক্রমে আবার শ্মশান হইয়া গেল।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ষাপ্রভাত।

বর্ষা এল, প্রিয়তম অসীম অম্বর
সীমাগত পুঞ্জমেঘে, প্রাতঃ সূর্য্যকর
নিরুদ্যম একেবারে সুধীর মতন,
সুশ্যামল তরুলতা, বন উপবন
মর্ম্মর সঙ্গীত মুগ্ধ পল্লব নিচয়
পবনের আন্দোলনে আজি ছন্দোময়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

শতদল।

আজি ভরা শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারে,
মেঘের কাজল-কালো শ্যাম অন্ধকারে,
অপূর্ব্ব-উজ্জ্বল শুভ্র বিদ্যুল্লেখা সম
নিরাশা-নিকষ-কৃষ্ণ হৃদয়েতে মম
জাগিছে তোমার স্মৃতি করুণ কোমল!
অসিত সরসী জলে পূর্ণ—শতদল।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বরষা।

আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে ;
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে।
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠেছে ভীমা,
ধাইতে ধাইতে লোপ করে চলে সীমা,
কোন্ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে!
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

পুঞ্জে পুঞ্জে দূর সুদূরের পানে
দলে দলে চলে কেন চলে নাহি জানে।
জানেনা কিছুই কোন্ মহাদ্রি তলে
গভীর শ্রাবণে গলিয়া পড়িবে জলে,
নাহি জানে তার ঘন ঘোর সমারোহে
কোন্ সে ভীষণ জীবন মরণ রাজে!
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

ঈশান কোণেতে ঐ যে ঝড়ের বাণী
গুরু গুরু রবে কি করিছে কানাকানি!
দিগন্তরালে কোন্ ভবিতব্যতা
স্তব্ধ তিমিরে বহে ভাষাহীন ব্যথা,
কালো কল্পনা নিবিড় ছায়ার তলে
ঘনায়ে উঠেছে কোন্ আসন্ন কাজে!
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমালোচনা।

জীবনের দৃশ্যমালা। 'ইংলণ্ডে বঙ্গ-মহিলার' প্রণীত। দাসযন্ত্রে মুদ্রিত। ১৩১৬। মূল্য লিখিত নাই। এ খানি কবিতাগ্রন্থ। শতাধিক কবিতায় গ্রন্থের কলেবর পূর্ণ। বাঙালী নারীর জীবনের দুঃখকাহিনী। বেদনার একটা করুণ সুর আগাগোড়া বহিয়া গিয়াছে। তবে এরূপ ব্যক্তিগত কবিতা ঠিক সমালোচনার সামগ্রী নহে।

মোসলেম কর্ম্মবীর চরিতমালা— প্রথম খণ্ড। হামেদ আলী প্রণীত। ৪নং উইলিয়মস্ লেন, দাসযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। মুসলমান

সমাজের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কর্ম্মীদের জীবনী ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা বিশুদ্ধ, গম্ভীর—তবে রচনায় সরসতার অভাব। মুসলমান বালকের চরিত্রগঠনে আদর্শগুলি অদ্বিতীয় সহচর এবং সাধারণের পক্ষে জ্ঞাতব্য ভাবে পূর্ণ এই গ্রন্থখানি বিশিষ্ট আদর লাভের যোগ্য।

বিলাত ভ্রমণ। প্রথম ভাগ। বিলাতের পথে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ, এম, ডি, প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা মাত্র। বাঙালী পাঠকের নিকট ইন্দুবাবুর নাম সুপরিচিত। বিলাত যাইবার সময় তিনি পথে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহারি বিবরণী লইয়া পাঠক সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয় কবির হৃদয়—সেই জন্যই তাঁহার রচিত ভ্রমণ কাহিনী উপন্যাসের মত সুললিত, কবিতার মত মর্ম্মস্পর্শী! লেখকের যেমনি উদার সহানুভূতি তেমনি সূক্ষ্ম দৃষ্টি! অতি ছোট বিষয়টি—যাহা সাধারণের চক্ষু এড়াইয়া যায় তাহা তাঁহার চিত্তে গভীর ভাবের তরঙ্গ তুলে! ইন্দুবাবুর রচনার বিশেষ সৌন্দর্য্য কি—গ্রন্থের ভূমিকায় সুলেখক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার প্রতি মনোজ্ঞ ইঙ্গিত করিয়াছেন। বাঙালায় 'ভ্রমণ কাহিনী' ছাপমারা গ্রন্থের সংখ্যা প্রচুর কিন্তু—তাহার মধ্যে প্রকৃত 'ভ্রমণ কাহিনী' অল্পই। সেই অল্পসংখ্যক গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইন্দুবাবুর 'বিলাত ভ্রমণ' যে বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল লেখকের ভাষার দিকে একটু সতর্ক দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ দেখিবার আশায় আমরা উদ্গ্রীব রহিলাম।

ঋগ্বেদসংহিতা। (বঙ্গানুবাদ পদ্যে) শ্রীরামচন্দ্র সাহিত্য সরস্বতী কর্ত্তৃক অনুবাদিত, রাজসাহী আর্য্যসম্মিলনী হরিসভা হইতে প্রকাশিত। বঙ্গাব্দ ১৩১৭। বার্ষিক মূল্য সাধারণের পক্ষে ৩৷৵৹, ছাত্রগণের পক্ষে ৩৲। টাকা শ্রীনাথ প্রেসে মুদ্রিত। প্রতি মাসে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবে। অনুবাদক 'ভূমিকা'য় লিখিয়াছেন, "গদ্য অপেক্ষা পদ্যময় বাক্য আমাদের মনের উপর বেশী ক্রিয়া করে—কবিতার চৌদ্দ অক্ষরের একটি ক্ষুদ্র পঙ্‌ক্তি মানবের মনে যে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয় শত ঐতিহাসিকের সহস্র পৃষ্ঠা নিঃশেষিত ইতিহাসও তাহা দূর করিতে পারে না"; তাই বেদগ্রন্থের বহুল প্রচারার্থ অনুবাদকের প্রয়াস। সাহিত্য সরস্বতী মহাশয় ক্ষমা করিবেন, তাঁহার উদ্দেশ্যের সফলতা সম্বন্ধে আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কারণ এই গ্রন্থে অনুবাদের ভাষা ও বাক্য এমনি উৎকট যে তাহার রস গ্রহণে সাধ হইলেও সাধ্য হইবে না। ইহাপেক্ষা সরল গদ্যে অনুবাদ করিলে লোকে সহজেই বুঝিতে পারিত—এবং অনুবাদককেও এই দারুণ গ্রীষ্মে 'চৌদ্দ' গণিয়া গলদঘর্ম্ম হইতে হইত না।

বিদ্যালয় বিধায়ক বিবিধ বিধান—শ্রীঅঘোরনাথ অধিকারী প্রণীত। ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। বাধাই মূল্য দুই টাকা। কবিতা নাটক নভেল প্লাবিত বঙ্গসাহিত্যে প্রয়োজনীয় শিশু-শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ বিরল বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয়। 'জাতি,' 'জাতি বলিয়া গগনভেদী বক্তৃতায়—আমরা রীতিমত করতালি সংগ্রহ করি, প্রবন্ধ লিখিয়া 'বাহবা' লই, অথচ সেই জাতি-গঠনের মূলে যে ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের সুশিক্ষা নির্ভর করিতেছে—সে সম্বন্ধে আমরা ভুলিয়াও দুইটা কথা কহি না। বাঙলার অধ্যাপক ও শিক্ষকমহাশয়গণ কাব্য সমালোচনা, রসরচনাতেই অবসরকাল যাপন করেন, অথচ তাঁহাদিগের ভূয়ো দর্শন বা অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মতামত সাধারণে জানিতে পারিলে কত উপকার হয় তাহা কেহ ভাবিয়াও দেখেন না। অবশ্য আমরা এমন বলিতেছি না যে তাঁহারা কাব্যালোচনা প্রভৃতি ছাড়িয়া দিউন। তবে এ বিষয়েও তাঁহাদিগের একটি কর্ত্তব্য আছে। আমাদের অধ্যাপক ও শিক্ষক মহাশয় গণের মধ্যে এমন অনেক আছেন, ওকালতী ডাক্তারী করিলে যাঁহারা ধনকুবের হইতে পারিতেন, তাঁহারা শুধুই উদরান্নের জন্য যে শিক্ষকতা

করিতেছেন, এ কথা মনে করাও পাপ। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি অঘোর বাবুর বহুদর্শিতার অমূল্য ফল। পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। বালকগণের শিক্ষা, শাসন, শরীর পালন, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় কথা, গ্রন্থকার এই পুস্তকে বলিয়াছেন। এই গ্রন্থ সাধারণে প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার ও প্রকাশক, বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন। বালকবালিকা, অধ্যাপক, অভিভাবক সকলের পক্ষেই গ্রন্থখানি অতুলনীয় সামগ্রী। সকলেরই পাঠ করিয়া দেখা উচিত। গ্রন্থখানি গৃহ পঞ্জিকার মত বাঙালীর গৃহে বিরাজ করুক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

জাপানী ফানুস। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য আট আনা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। এক বৎসরের মধ্যেই এদেশে যে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহার আবার নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ইহার গল্পগুলি মনোরম—শিশু-সাহিত্যের গৌরব। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের ভাষা স্থানে স্থানে পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বাঁধাইটুকুও চমৎকার হইয়াছে। অথচ মূল্য বাড়ে নাই।

টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্। প্রকাশক শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। এখানিও শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। শিশু-সাহিত্য রচনায় তিনি প্রভূত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বেগুন-ক্ষেতে শৃগালের নাসিকায় কাঁটা ফুটিয়া যাওয়ার পুরাতন চিত্তসুন্দর গল্পটি নাট্যাকারে পরিণত করা সহজ নহে। লেখকের প্রয়াস সার্থক হইয়াছে। সাতটি দৃশ্যে শিয়ালের অদৃষ্টের অপূর্ব্ব গতি-পর্য্যায় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সহজ এবং মিষ্ট—শিশুহৃদয় নিমেষেই তাহাতে আকৃষ্ট হইবে। শিশুগণ 'টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্' পাইয়া যে আনন্দে উৎফুল্ল হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আটখানি উৎকৃষ্ট চিত্রে সোনায় সোহাগা মিশিয়াছে। গ্রন্থের মূল্য চার আনা।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

বর্ষা।

ঐ দেখ গো আজ্‌কে আবার পাগ্‌লি জেগেছে,
ছাই মাখা তার মাথার জটায় আকাশ ঢেকেছে!
ম'লিন হাতে ছুঁয়েছে সে ছুঁয়েছে সব ঠাঁই।
পাগল মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন কিছুই নাই।

মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে,
বিশাল শাখা পাতায় ঢাকা শালের বনেতে;
হঠাৎ হেসে দৌড়ে এসে খেয়ালের ঝোঁকে;
ভিজিয়ে দিলে ঘরমুখো ওই পায়রা গুলোকে।

বজ্র হাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বুকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায়;
ভয় দেখিয়ে হাসে আবার ফিক্ ফিকিয়ে সে,
আকাশ জুড়ে চিক্ মিকিয়ে চিক্ মিকিয়ে রে।

ময়ূর বলে 'কে গো?' এযে আকুল করা রূপ,
ভেকেরা কয় 'নাহিক ভয়,' জগৎ রহে চুপ্;
পাগ্‌লি হাসে আপন মনে পাগ্‌লি কাঁদে হায়
চুমার মত চোখের ধারা পড়ছে ধরার গায়।

কোন্ মোহিনীর ওড়্‌না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,
পূবে হাওয়ায় ঘুরিয়ে আমার অঙ্গে হেনেছে;
চম্‌কে দেখি চক্ষে মুখে লেগেছে এক রাশ
ঘুম পাড়ানো কেয়ার রেণু, কদম ফুলের বাস!

বাদল্ হাওয়ায় আজ্‌কে আমার পাগ্‌লি মেতেছে;
ছিন্ন কাঁথা সূর্য্যশশীর সভায় পেতেছে।
আপন মনে গান গাহে সে নাই কিছু দৃক্‌পাত,
মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

শোকবার্ত্তা।

চন্দ্রনাথ বসু।

সাহিত্যসেবী শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গত ৬ই আষাঢ় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাসাহিত্য একটি পুরাতন প্রিয় সেবক হারাইল।

চন্দ্রনাথ ১২৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আপন প্রতিভাবলে যশের সহিত প্রবেশিকা হইতে আইন পরীক্ষায় পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদিন ওকালতী করেন।



চন্দ্রনাথ বসু।

পরে সে কর্ম্ম ভাল না লাগায় অল্প দিনের জন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী করিয়া বেঙ্গল লাইব্রেরির অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান বলিয়াই সকলে তাঁহাকে জানিত।

বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করা এবং বাঙালী হইয়া মাতৃভাষায় মূর্খ হওয়া সে যুগের একটা রোগ ছিল। চন্দ্রনাথও অর্দ্ধজীবন পর্য্যন্ত বাংলা জানিতেন না বা অনুশীলনও করিতেন না। ইংরাজিতে প্রবন্ধ লিখিতেন, ইংরাজি সাহিত্যের অনুশীলন করিতেন। পরে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি মাতৃ-ভাষার প্রতি মনোযোগ দান করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হইয়া উঠেন। বঙ্গদর্শন ভারতী নব্যভারত প্রভৃতি মাসিক পত্রে তাঁহার যে সকল লেখা বাহির হইয়াছিল তাহাই ক্রমে ক্রমে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। শকুন্তলাতত্ত্ব, ত্রিধারা, সংযমশিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি স্বর্গীয় চন্দ্রনাথের স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিবে।

ভোলানাথ চন্দ্র।

ইঁহার নাম আজকালকার পাঠক পাঠিকারা হয়ত অনেকেই জানেন না। মৃত্যুকালে তাঁহার ৯২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রামতনু লাহিড়ীর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিতে ভারাক্রান্ত না হইলেও তাঁহার ন্যায় ইংরাজি ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে পণ্ডিত খুব অল্প লোকই আমাদের মধ্যে দেখা যায়। তিনি যেমন পণ্ডিত ছিলেন তেমনি অক্লান্ত সাহিত্যসেবী ছিলেন। শৈশব হইতে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তিনি যশের বা খ্যাতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নীরবে সরস্বতীর পূজা করিয়া গিয়াছেন। অর্থের প্রতিও তাঁহার লোভ ছিল না। কলিকাতার এক পুরাতন এটর্ণির অফিসে কর্ম্ম করিয়া যাহা পাইতেন তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। তিনি রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনী এবং ভারতে ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক ইংরাজি ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাই বাঙ্গালীর নিকট তাঁহার স্মৃতিস্বরূপ বিরাজ করিবে।

চিত্রব্যাখ্যা।

রাজকুমার ও শক্তিময়ী—নদীতীরে। (ফুলের মালা)। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্র হইতে।

বহুদিন পরে আবার বাল্যসখা গণেশদেবের সহিত বাল্যসখী শক্তিময়ীর সহসা দেখা হইয়াছে, তাঁহারা বিজন নদীতীরে আসিয়া বসিয়াছেন। এখন গণেশদেব যুবা পুরুষ—শক্তিময়ী যুবতী।

সূর্য্য অস্তে গিয়াছে, কিন্তু তখনো সন্ধ্যার ধূম্রবরণে পৃথিবী আচ্ছাদিত হয় নাই। পশ্চিম গগনে উজ্জ্বল লাল মেঘের স্তর জমিয়াছে—তাহার আভায় জলস্থল উজ্জ্বল লাল হইয়া

উঠিয়া—শক্তির মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শোভিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই রূপমাধুর্য্যে রাজকুমার মুগ্ধ—আত্মবিস্মৃত, তাঁহার মনে হইতেছে,—নদীতীরের এই বনতল—তাঁহাদের বাল্য-কালেরই সেই ক্রীড়া-উপবন, তিনি সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক, আর শক্তি তাঁহার বালিকাসখী, তাঁহার রাণী। • • • তিনি তখনকার দিনের মত শক্তিকে বাঁশি বাজাইয়া শুনাইতেছেন,—শক্তি তন্ময় হইয়া শুনিতেছে। কবিও তন্ময় হইয়া এই চিত্র আঁকিয়াছেন।

সুরদাস ও কৃষ্ণ—শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি।

পরম কৃষ্ণভক্ত অন্ধ কবি সুরদাস একদিন বনের ভিতর একলা আপন মনে চলিয়াছেন, সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড খাল, আর দুই পা অগ্রসর হইলেই অগাধ জলে গিয়া পড়িবেন—রক্ষা করিবার কেহ নাই—এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। সুরদাস তাঁহার স্পর্শ মাত্রেই বুঝিতে পারিলেন তাঁহার চিরজীবনের আরাধ্য দেবতা স্বয়ং সম্মুখে! তিনি ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে ধরিতে গেলেন; কিন্তু কৃষ্ণ ধরা না দিয়া নির্ম্মমভাবে হাত ছিনাইয়া পলাইয়া গেলেন। কবি তখন ব্যথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন ;—

কর ছিটকায়ে যাত হো
দুর্ব্বল জানকে মোয়।
হৃদয়'তে যব যাও গে
মর্দ্দ বাখানু তোয়॥

আমাকে দুর্ব্বল পেয়ে হাত ছিনিয়ে পালিয়ে গেলে—যদি হৃদয় থেকে পালাতে পার তবেই বুঝব তুমি মরদ!

উপরোক্ত শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া এই চিত্রখানি অঙ্কিত।

কবি রজনীকান্ত।

স্বচ্ছতা ও মুক্তপ্রাণতা আজকালের কবিতায় বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া যে কথা উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে কিছু-না-কিছু সত্য নিহিত আছে। ভাবের স্পষ্টতা কবিতার প্রাণ—আধুনিক অজাতশ্মশ্রু বালক-কবির মঞ্জীর, নীপকুঞ্জ, বীথি, মঞ্জুল প্রভৃতি কথার আড়ম্বরে তাহার অন্তর্নিহিত খাঁটি ভাবটুকুও প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। সেকালের—সেকালেই বা বলি কি করিয়া,—এইত সেদিনের কথা—কবি ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু প্রভৃতির কবিতাদ কূপমণ্ডূকশ্রেণীভুক্ত রুচি-বাগীশ পাঠককে আমোদ দিতে না পারিলেও, রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সে সকল কবিতায় ভাবের স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতা এবং মুক্তপ্রাণ কবির আন্তরিক উচ্ছ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না! তাহা খাঁটি জিনিস—বিচিত্র বর্ণচ্ছটার আলোকে তাহা পাঠকের চকিত বিভ্রমের সৃষ্টি না করিয়া একটা চিরন্তন সত্যের সহিত পরিচয় ঘটাইয়া দেয়।

দেশের এই দুর্দ্দিনে কবি রজনীকান্ত রচিত "বাণী" ও "কল্যাণী" পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। রজনীকান্ত খাঁটি বাঙালী কবি। বহুদিন পরে এমন অনা-ড়ম্বর গীতিময় স্বচ্ছ সরল ভাবোন্মাদনা প্রকৃত

পক্ষেই আমাদিগকে বিশিষ্ট আনন্দ দান করিয়াছে। ইহাতে পাশ্চাত্য বিভ্রমের লেশ নাই, বিলাতী এসেন্সের তীব্র গন্ধ নাই, ইহা যেন বাণীদেবীর চরণাঞ্জলির যোগ্য অনাঘ্রাত অনবদ্য নির্ম্মল পুষ্প!

শুধু ভাবের স্বচ্ছতা কেন, রজনীকান্তের ভাষা ও ছন্দের মধ্য দিয়া এমন একটি তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছে যে পাঠকের চিত্ত নাচিয়া নাচিয়া ভাবের অনুসরণ করে! সংক্ষেপে রজনীকান্তের কাব্যের সহিত পাঠকের পরিচয়



সাধনের আমরা চেষ্টা করিব। এই স্বল্পপরিসর স্থানে রজনীকান্তের কাব্যের সম্যক আলোচনা অসম্ভব এবং বোধ হয় সে সময় এখনো আসে নাই। স্বদেশীর পুণ্যমন্ত্র যেদিন বাঙলার ঘাটমাঠ কুটীর প্রাসাদ মুখরিত করিয়া তুলিল বাঙলার কবি সেদিন গাহিলেন,

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই—"

"তাই ভালো মোদের
মায়ের ঘরের শুধু ভাত,
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব,
মার বাগানের কলার পাত।

বাঙালীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল! ঠিক কথা! এমন খাঁটি প্রাণের কথা শাস্ত্রে নাই—কোথাও নাই। প্রাণের সুপ্ত তারে যেন ঘা লাগিল—সমস্বরে তার বাজিয়া উঠিল। এই প্রাণের গান প্রথম গাহিয়াছিলেন, কবি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন।

শুধু কি প্রাণের গান গাহিয়াই কবি নীরব? না! মাতৃপূজার যোগ্য অর্ঘ্য তিনি ভারে ভারে বহন করিয়া আনিয়াছেন। করুণ-কণ্ঠে মাতৃনাম গাহিয়া তিনি মাতৃপূজায় বহু ভক্তকে দীক্ষিত করিয়াছেন—তাহাতে জ্বালা নাই, ঈর্ষা নাই, সে শুধু কবি হৃদয়ের "ফুল-চন্দন বন্দন-উপহার!" সাধকের সাধনার উপহার। সাধকের সাধনার অনুরূপ! ধ্যানের তুল্য! অভিসারিকার চঞ্চল চরণের নূপুর রব সে ধ্যানের বিঘ্ন সম্পাদন করে নাই!

তারপর হাসির গান! রজনীকান্ত হাসির গানেও অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। কেহ কেহ রজনীকান্তকে "রাজসাহীর ডি, এল, রায়" বলেন—ইহাতে রজনীকান্তের প্রতি অবিচার করা হয়। কীট্‌স্ কীট্‌স্, সেলি সেলি—তেমান রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্র লালেও প্রভেদ আছে। রজনীকান্তের হাসির গান অনুকরণ নহে, অনুবাদও নহে—তাহাতে বিলাতীর সংস্পর্শ নাই—তাহা খাঁটি স্বদেশী। রজনীকান্তের মিষ্ট স্বরটুকু যে তাঁহার নিজেরই তাহা সহজেই বুঝা যায়।

বাণীর কবিতাগুলি কেবল কবিতা নহে—সেগুলি গান। কবি স্বয়ং তাহাতে সুর সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। অনেকগুলি গান আমা-দিগের শুনিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল তাহা হইতেই বলিতে পারি গানগুলি সজীব—ভাব যেন মূর্ত্তি ধরিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

কবি গাহিয়াছেন,—

"তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দুনয়নে তোমারি শোকবারি
তোমারি ব্যাকুলতা তোমারি হা হা রব।"

* * * *

আমিও তোমার গো তোমারি সকলি ত
জানিয়ে জানে না এ মোহ হত চিত
আমারি বলে কেন ভ্রান্তি হল হেন
ভাঙ্গ এ অহমিকা মিথ্যা গৌরব।"

বিশ্বরাজের সম্মুখে কুণ্ঠিত কবির আত্ম-নিবেদন,—

তুমি কি মহান বিভু আমি মলিন ক্ষুদ্র,
আমি পঙ্কিল সলিলবিন্দু তুমি যে সুধাসমুদ্র!
তবু তুমি মোরে ভালবাস, ডাকিলে হৃদয়ে এস
তাই এত অযোগ্যের লাজ!"

কি সুন্দর, কি মর্ম্মস্পর্শী! বিশ্বজগতের ক্ষুদ্রতা সেই বিশ্বরাজের মহিমার বিরাটতারই অংশ বিশেষ। কবির সুনিপুণ ইঙ্গিত—

"চির প্রেমনির্ঝরের একটি বুদ্বুদ লয়ে
ফেলে দিলে প্রেমধারা চলিল অশ্রান্ত বয়ে,
অমান জননী করিল স্নেহ, সতীপ্রেমে পূর্ণ গেহ*
গ্রহ ছুটে এ উহার পাছ!"

এই কয় ছত্র দর্শনশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের কি সহজ বিশ্লেষণ! রজনীকান্তের "সিন্ধু-সঙ্গীত" ভাবে-ভাষায় এক বিচিত্র সৃষ্টি!